শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ

দর্শনে ও সাহিত্যে

*   *   *   *

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

*   *   *

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা—১২



প্রকাশক :—
অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৫৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬৪
মূল্য—৭৲ (সাত টাকা) মাত্র

মুদ্রাকর :—
শ্রীশশধর চক্রবর্তী
কালিকা প্রেস প্রাঃ লিঃ
২৫ ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রত্যেক জাতির দেহের কাঠামোর যেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনই মনের কাঠামোরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহার ধর্ম, দর্শন. সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির ভিতরে অনেক সময় দেখা দেয় এমন অভিনবত্ব—যাহা একান্তভাবেই তাহার নিজস্ব। বৈষ্ণবধর্মের লীলাবাদ—বিশেষ করিয়া রাধাবাদ—আমাদের জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্যেরই দ্যোতক। ধর্ম ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত এই জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্য বহুদিন আমার মনকে নাড়া দিয়াছে, সুতরাং জিনিসটিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি—সেই লক্ষ্য নিত্য নূতন তথ্য ও দৃষ্টি দিয়াছে। জিনিসটির একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আরও দেখিতে পাইয়াছি—রাধাবাদের ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়—সে-বৈশিষ্ট্য শুধু রাধাবাদে নয়, ব্যাপকভাবে সে-বৈশিষ্ট্য ভারতীয় শক্তিবাদে। এই দৃষ্টি লইয়া ভারতীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্র এবং আনুষঙ্গিক শৈব-শাক্ত-শাস্ত্র নূতন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই অধ্যয়নের ফল বর্তমান গ্রন্থ।

আমি গ্রন্থ-মধ্যে বলিয়াছি, বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার একটি 'কমলিনী' রূপ দেখিয়াছেন; ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেও শ্রীরাধার একটি 'কমলিনী' রূপ ধরা পড়ে। 'কমলিনী'র যেমন বহু স্তরের ভিতর দিয়া একটা ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে, শ্রীরাধারও তেমনিই ভারতীয় দর্শন এবং সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া বহুদিনের একটি ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। বর্তমান গ্রন্থে শ্রীরাধার এই ক্রমবিকাশের ধারাটিই লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই ক্রম-বিকাশের ইতিহাসের মধ্যে দর্শনের ধারা এবং সাহিত্যের ধারা কি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

গ্রন্থ-রচনা কার্যে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একবার কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সহিত একদিন এ-বিষয়ে আলাপ-আলোচনার সুযোগ হইয়াছিল এবং তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ-উপদেশও লাভ করিয়াছি। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সদানন্দ ভাদুড়ী মহাশয় সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগার হইতে প্রয়োজন-মত বই দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার বহু কাজের ভিতরেও তিনি বইখানির প্রথম দিকের কতগুলি ফর্মার মুদ্রণ পরীক্ষা করিয়া বিষয়ের প্রতি তাঁহার অনুরাগ এবং

লেখকের প্রতি তাঁহার প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থখানির রচনা শেষ হইয়া গেলে প্রথমাংশের অনেকখানি পাণ্ডুলিপি আমার অধ্যাপক, অধুনা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গবেষণা-বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, এম্. এ. মহাশয়কে দেখিতে দেই; তিনি পাণ্ডুলিপি যত্ন করিয়া পড়িয়াছেন এবং স্থানে স্থানে সংস্কৃতের অনুবাদের কিছু কিছু ত্রুটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনিও তাঁহার বহুবিধ কাজের ভিতরে কিছু কিছু অংশের মুদ্রণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি আমার অধ্যাপক; সুতরাং স্নেহের দাবীতেই তাঁহার নিকট হইতে সকল কাজ আদায় করিয়া লইয়াছি। গ্রন্থখানির নাম করিয়া দিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্. এ. মহাশয়। তাঁহার কঠিন অসুস্থতার ভিতরেও তিনি গ্রন্থখানির প্রকাশ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে তিনিই প্রথম রতি জন্মাইয়াছেন, সে-কথা সশ্রদ্ধচিত্তে এই উপলক্ষ্যে স্মরণ করিতেছি।

বন্ধুবর শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় গ্রন্থখানির প্রকাশের ভার সাগ্রহে ও সযত্নে গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থখানির মুদ্রণ যথাসম্ভব নির্ভুল করিবার চেষ্টা করিয়াছি; সংস্কৃত উদ্ধৃতির বাহুল্যের জন্যই বিশেষ করিয়া সাবধান হইতে হইয়াছে। কিন্তু সাবধান হওয়া সত্ত্বেও দু'একটি ভুল যে থাকিয়া যায় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না,—কিছু কিছু ভুলত্রুটি পাঠকের চোখে পড়িলে তাহার জন্য মার্জনা চাহিতেছি। গ্রন্থখানির শেষে গ্রন্থ-সূচী এবং শব্দ-সূচী করিয়া দিয়াছেন আমার কৃতিমান্ প্রিয় ছাত্র শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ। প্রীতির বিনিময়েই তাঁহার এই পরিশ্রম।

গ্রন্থকার

সূচী-পত্র

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

রাধাতত্ত্বের মূল—প্রাচীন ভারতীয় শক্তিতত্ত্ব

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে বাঙলাদেশে যে বৈষ্ণব-সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্য রাধাবাদে। বাঙলাদেশের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবি জয়দেব বিষ্ণুর পূর্ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়াই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'গীত-গোবিন্দ' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই প্রেমলীলার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় শ্রীরাধা। রাধাকে অবলম্বন করিয়াই সকল প্রেমলীলার স্ফূর্তি। বিষয়-স্বরূপ কৃষ্ণের রাধিকাই আশ্রয়-স্বরূপ হওয়াতে বাঙলার বৈষ্ণব-কবিতারও রাধিকাই মুখ্য আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছেন। জয়দেবের সমসাময়িক শ্রীধরদাসের (ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে) সংস্কৃত-কবিতা-সঙ্কলন গ্রন্থ 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' যে বৈষ্ণব-পদাবলী পাওয়া যায়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমই তাহার অধিকাংশের অবলম্বন। তৎপরবর্তী কালে বাঙলার কবি চণ্ডীদাস এবং বৃহত্তর বঙ্গের অন্তর্গত মিথিলার কবি বিদ্যাপতি যে বৈষ্ণব-কবিতা রচনা করিয়াছেন রাধাই সেই বৈষ্ণব-কবিতার প্রাণ। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মপ্রেরণায় ষড়্‌গোস্বামী এবং অসংখ্য দার্শনিক এবং কবিভক্তগণের সম্মিলিত সাধনায় যে প্রেমধর্ম এবং প্রেম-সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, শ্রীরাধার পরিকল্পনাই তাহাতে একটা অভিনব চারুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। অবশ্য বাঙলা-দেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলে যে এই রাধাবাদের কোন প্রচার এবং প্রসার ঘটে নাই তাহা নহে; এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমরা যথাস্থানে করিব। এখানে সংক্ষেপে শুধু এইটুকুই বলা চলে যে, এই রাধাবাদ বাঙলার ধর্ম ও সাহিত্যের উপরে যে ব্যাপক এবং গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথাও তাহা করে নাই। বাঙলার বৈষ্ণবের পরমারাধ্য দেবতার প্রিয়তম নামটি হইল 'রাধারমণ'; বাঙালীর প্রভাবেই আজও শ্রীধাম বৃন্দাবনে 'জয় রাধে' ধ্বনি দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, বাঙলার বৈষ্ণব ভিখারী

আজও 'জয় রাধে' বলিয়াই দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বাঙালীর এই রাধা-প্রীতি অতি সহজ সরল অথচ অতি গভীর এবং মধুর রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে গোবিন্দ অধিকারীর শুক-সারীর দ্বন্দ্বে।[১]

বাঙলাদেশের ধর্মে এবং সাহিত্যে—শুধু বাঙলাদেশ নহে, ভারতবর্ষের ধর্মে ও সাহিত্যে—আমরা রূপ ও তত্ত্ব মিশ্রিত রাধার যে মূর্তিখানি পাইতেছি তাহার ভিতরে প্রধানতঃ দুইটি উপাদান লক্ষ্য করিতে পারি; একটি হইল দার্শনিক তত্ত্বের দিক্ বা ধর্মতত্ত্বের (Theology) দিক্, অপরটি হইল কাব্যোপাখ্যানের দিক্। রাধার ভিতরে এই উভয় দিক্ই একটি আশ্চর্য অবিনাবদ্ধ ভাব লাভ করিয়া

---

১ শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
সারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারবে কেন?
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা।
সারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা,
ঐ যে যায় গো দেখা।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
সারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে ব'লে,
চূড়া তাইতে হেলে।

*　　*　　*　　*

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ-চিন্তামণি।
সারী বলে, আমার রাধা প্রেমপ্রদায়িনী,
সে তোমার কৃষ্ণ জানে।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
সারী বলে, সত্য বটে, বলে রাধার নাম,
নৈলে মিছে সে গান।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
সারী বলে, আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু,
নৈলে কে কার গুরু? —ইত্যাদি

আছে। যে রূপে সে আমাদের ধর্মে ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার স্বষ্ঠুতম পরিচয় পাই একটি ভক্তকবির গানের একটি পদে :

'সে যে চেতন-জলের ফুটন্ত ফুল,
তাই লোকে বলে কমলিনী।'

রাধা সত্য-সত্যই কমলিনী। ভারতীয় মনের চেতন-সলিলের অন্তস্তলে গভীর চিত্তভূমির ভিতরে যে পরমশ্রেয়োবোধ, যে পরমপ্রেম, সৌন্দর্য এবং মাধুর্য-বোধের বীজ লুক্কায়িত ছিল, বহুকালের ধীর-স্বকুমার পরিণতির ভিতর দিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বে এবং রূপে-রসে-মাধুর্যে সে আমাদের ধর্মে ও সাহিত্যে পরিপূর্ণ কমলিনীর ন্যায়ই বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই পূর্ণবিকশিত কমলিনীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানিতে হইলে আমাদিগকে তাই মুখ্যতঃ উপরোক্ত উভয় দিকেই অনুসন্ধান করিতে হইবে, প্রথমতঃ তত্ত্বের দিকে, দ্বিতীয়তঃ কাব্যোপাখ্যানের দিকে।

এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাইব, রাধাবাদের বীজ রহিয়াছে ভারতীয় সাধারণ শক্তিবাদে; সেই সাধারণ শক্তিবাদই বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনের সহিত বিভিন্ন ভাবে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে বিচিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে; সেই ক্রমপরিণতির একটি বিশেষ অভিব্যক্তিই রাধাবাদ। যিনি ছিলেন বিশুদ্ধ শক্তিরূপিণী, ক্রমপরিণতির প্রবাহের ভিতর দিয়া তিনিই আসিয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন পরমপ্রেমরূপিণী মূর্তিতে। এই যে বিশুদ্ধ শক্তিরূপিণীর পরিপূর্ণ প্রেমরূপিণীতে পর্যবসান, ইহা শুধু তত্ত্ব-পরিণতির ভিতর দিয়াই ঘটিয়া ওঠে নাই; এই রূপান্তরের ভিতরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বহু লৌকিক শ্রুতি-স্মৃতি-বাহিত প্রেমোপাখ্যান। এই উপাখ্যানগুলি তাহাদের লোকপ্রিয় কাব্য-চমৎকারিত্বের জন্য ক্রমেই বৈষ্ণব শাস্ত্রে ও সাহিত্যে গৃহীত হইতে লাগিল; এই উপাখ্যানগুলিকে স্বীকারের ফলে তত্ত্বদৃষ্টিতেও অনেক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। ফলতঃ দেখা যায়, বৈষ্ণব ধর্মে এবং দর্শনে শক্তিবাদের যে ক্রমপরিণতি তাহার পিছনে মুখ্য কারণ হইল দুইটি; প্রথমতঃ, বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন কালের যে বিভিন্ন বৈষ্ণব তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য বৈষ্ণবদর্শনের শক্তিবাদের ভিতরে নানা পরিবর্তন সাধিত হইল; দ্বিতীয়তঃ, আবার বিভিন্ন কালের বহু লৌকিক উপাখ্যান বৈষ্ণব ধর্মে এবং সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করার ফলে উপাখ্যানগুলির সহিত মূল সিদ্ধান্তের সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য কিছু কিছু তত্ত্বদৃষ্টির পরিবর্তন বা

পরিবর্তন প্রয়োজন হইল। এই উভয়বিধ কারণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই ভারতীয় শক্তিবাদের রাধাবাদে ক্রমপরিণতি।

ভারতবর্ষ শক্তিবাদেরই দেশ। সৃষ্টিতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া একটি অস্পষ্ট আদিদেবীর কল্পনা অন্যান্য দেশেও দেখা যায় এবং এই আদিদেবীতে মাতৃত্বের আরোপ করিয়া দেবীকল্পনা অন্যত্রও কিছু কিছু মেলে; কিন্তু এই বিশ্ব-প্রসূতি একটি বিশ্ব-শক্তিকে ভারতবর্ষ তাহার ধর্মজীবনে যেমন করিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এমনটি আর পৃথিবীতে অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই শক্তিবাদের প্রভাব ভারতবর্ষের শুধু শাক্ত বা শৈব সম্প্রদায়ের উপরেই নয়; ইহার প্রভাব ভারতবর্ষের প্রায় সকল ধর্মসম্প্রদায়ের উপরেই। এমন কি বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মের ভিতরেও বিবিধ দেবীর কল্পনা হিন্দুধর্ম হইতে নেহাৎ কিছু কম নহে। হিন্দুধর্মের ভিতরে শৈব বা শাক্ত সম্প্রদায়গুলি ব্যতীত অন্য যতগুলি ধর্ম-সম্প্রদায় রহিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটির ভিতরে শক্তির কল্পনা এবং ধর্মমতে শক্তিবাদের প্রভাব অল্পবিস্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। একথা শুনিতে প্রথমে একটু আশ্চর্য লাগিতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে বৈষ্ণব মতবাদগুলির উপরে শক্তিবাদের একটি বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। সাধারণভাবে বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী; রাম-সম্প্রদায়ে এই লক্ষ্মীর স্থান গ্রহণ করিয়াছেন সীতা; কৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের ভিতরে রাধাই এই শক্তি। এ-বিষয়ে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি। সৌর এবং গাণপত্য সম্প্রদায়গুলির ভিতরেও এই শক্তির কল্পনা রহিয়াছে। তন্ত্র-পুরাণাদি লৌকিক শাস্ত্রে সূর্য এবং গণেশের যত বর্ণনা ও ধ্যানমন্ত্র পাওয়া যায়, সেখানে দেখা যায় যে শিব যেমন দুর্গা, পার্বতী বা উমা রূপ শক্তির সহিত যুগল-ভাবে বর্তমান, সূর্য-গণেশাদি দেবতারাও সেইরূপ নিজ নিজ 'বল্লভা'র সহিত যুক্ত। উমা-মহেশ্বরের যুগলমূর্তির ন্যায় (অর্থাৎ শিবের বাম উরুতে উপবিষ্টা উমা) শক্তি-সমন্বিত গণেশমূর্তিও পাওয়া যায়। দর্শনের ক্ষেত্রে যে-জাতীয় দর্শনই ভারতবর্ষে যখন প্রাধান্য লাভ করুক না কেন, ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের গণ-মানসের ভিতরে এই শক্তিবাদের বিশ্বাস স্থিরবদ্ধ হইয়া ছিল। তাই ভারতবর্ষে এমন কোন দেবতা, উপদেবতা বা আবরণ-দেবতা পাওয়া যাইবে না, পুরাণাদি শাস্ত্রে বা লৌকিক কিংবদন্তীতে যাহার কোন শক্তি কল্পনা করা হয় নাই। লৌকিক দেবতাগণও সহায়হীন নন, তাঁহারাও 'শক্তি'-সমন্বিত। পরবর্তী কালের বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের ভিতরে বিভিন্ন স্তরের বহু লৌকিক দেবতা নূতন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের শক্তি কল্পনাও করা

হইয়াছে।[১] ভারতবর্ষের এই লৌকিক বিশ্বাস অনুধাবন করিলে মনে হয়, তন্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত,—অর্থাৎ শিব এবং শক্তি কেহই আপনাতে আপনি পূর্ণ নন, তাঁহারা উভয়েই একটি পরম অদ্বয় সত্যের দুইটি খণ্ড অংশ মাত্র, যুগলেই তাঁহাদের পূর্ণ একরূপ,—ইহা যেন ভারতীয় গণমনেরই একটি মূল সিদ্ধান্ত। এই জন্যই শক্তির সহিত যুক্ত না হইলে কোন দেবতাই যেন পূর্ণ নহেন। এই শক্তিবাদের প্রভাবেই হয়ত পুরাণাদিতে সকল দেবতারই পত্নী কল্পনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র, বরুণাদি প্রসিদ্ধ দেবতাগণেরই যে পত্নী রহিয়াছে তাহা নহে; এক ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের একটি অধ্যায়েই বহু গৌণ দেবতা ও দেবস্থানীয় ব্যক্তি বা বস্তুর পত্নী-কল্পনার একটি কৌতূহলপ্রদ তালিকা দেখিতে পাই।[২] এই সকল পত্নীই এই মূল প্রকৃতির কলা-স্বরূপা। এখানে মূল প্রকৃতিই আদ্যা শক্তি।

শক্তিবাদের প্রতি ভারতীয় গণমনের এই জাতীয় একটি সহজাত প্রবণতার ফলে বহু দার্শনিক সিদ্ধান্তকেই ভারতীয় গণমন নিজেদের মতন করিয়া রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছে। ফলে বেদান্তের ব্রহ্ম এবং মায়ার তত্ত্ব আসলে যাহাই থাকুক এবং বেদান্তিগণ ইঁহাদের ভিতরকার সম্বন্ধ বিষয়ে যাহাই বলিয়া থাকুন না কেন, লোকবিশ্বাসে ইঁহারা শিব-শক্তির অনুরূপ ভাবেই কল্পিত। আমাদের পরবর্তী আলোচনার ভিতরে দেখা যাইবে, পুরাণাদির ভিতরে বহু স্থানে মায়া এবং ব্রহ্ম এই শক্তি-শক্তিমান্ রূপেই মোটের উপরে পরিকল্পিত হইয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের ভাগ্যবিপর্যয়ও এইরূপেই ঘটিয়াছে। সাংখ্যের পুরুষ এবং প্রকৃতি দার্শনিক দৃষ্টিতে যাহাই হউক এবং তাহাদের ভিতরকার সম্পর্কের স্বরূপ লইয়া তার্কিকগণ যত ইচ্ছা তর্ক করুন না কেন, জনসাধারণের মনে এসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত অতি সরল

১ এই প্রসঙ্গে ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য প্রণীত Indian Buddhist Iconography এবং বর্তমান লেখকের An Introduction to Tantric Buddhism গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য।

২ কার্ত্তিকের পত্নী ষষ্ঠী, বহ্নির পত্নী স্বাহা, যজ্ঞের পত্নী দক্ষিণা, পিতৃগণের পত্নী স্বধা; বায়ুর পত্নী স্বস্তি; পুষ্টি গণেশের স্ত্রী, তুষ্টি অনন্তদেবের পত্নী; সম্পত্তি ঈশানের, ধৃতি কপিলের, ক্ষমা যমের, রতি মদনের, উক্তি সত্যের পত্নী; দয়া মোহের, প্রতিষ্ঠা পুণ্যের, কীর্তি সুকর্মের, ক্রিয়া উদ্‌যোগের, মিথ্যা অধর্মের, শান্তি ও লজ্জা সুশীলের; বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি জ্ঞানের; মূর্তি ধর্মের; নিদ্রা কালাগ্নিরুদ্রদেবের; সন্ধ্যা, রাত্রি ও দিন কালের; ক্ষুধা ও পিপাসা লোভের; প্রভা ও দাহিকা তেজের; মৃত্যু ও জরা প্রজ্বরের; প্রীতি ও তন্দ্রা সুখের; শ্রদ্ধা ও ভক্তি বৈরাগ্যের পত্নী। রোহিণী চন্দ্রের, সংজ্ঞা সূর্যের, শতরূপা মনুর, শচী ইন্দ্রের, তারা বৃহস্পতির বনিতা। ইহারা সকলেই এক প্রকৃতিরই বিভিন্ন কলাস্বরূপা। (প্রকৃতি খণ্ড, ১ম অ—বঙ্গবাসী সং।)

এবং স্পষ্ট ; সে সিদ্ধান্ত এই—পুরুষ-প্রকৃতি শিব-শক্তিরই রূপান্তর বা নামান্তর মাত্র। তন্ত্রপুরাণাদির বহু স্থানেও এই মতেরই স্পষ্ট পোষকতা পাওয়া যাইবে। আবার রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে গৌড়ীয় গোস্বামিগণ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া যত কথাই বলুন না কেন, কিঞ্চিৎ-তত্ত্বজ্ঞানাভিমানী যে কোনও জন-সাধারণ বলিবেন,—আসলে তো উহা পুরুষ-প্রকৃতি, অর্থাৎ কিনা শেষ পর্যন্ত শিব-শক্তি!

আরও একদিক্ দিয়া ভারতীয় ধর্মমতের উপরে এই শক্তিবাদের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে, তাহা সাধনার ক্ষেত্রে। পূজা-পার্বণ, ব্রত-নিয়মাদি ব্যতীত হিন্দুধর্মের সাধকশ্রেণীর ভিতরে যে বিবিধ প্রকারের সাধন-পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে তাহার উপরে শক্তিবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব অনেক রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষের বহুস্থানে কতগুলি ছোট ছোট ধর্মসম্প্রদায় রহিয়াছে, যাহাদের সাধন-প্রণালী এই শিব-শক্তিবাদের উপরেই মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সহজিয়া সম্প্রদায়, নাথ সম্প্রদায়,—এমন কি কবীর-পন্থী, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ও কতকাংশে এই শ্রেণীভুক্ত।[১]

ভারতবর্ষের এই শক্তিবাদ বৈদিক কি অবৈদিক, এসম্বন্ধে সংশয় এবং বিতর্ক রহিয়াছে। শাক্ত তন্ত্রপুরাণ-পূজাপার্বণবিধি প্রভৃতির ভিতরে এই শক্তিবাদের মূল উৎস ধরা হয় ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তটিকে ; ইহাই দেবী-সূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু একদল পণ্ডিত মনে করেন, এই শক্তিবাদ এবং শক্তি-পূজার বহুল প্রসারে আর্যেতর ভারতীয় আদিম অধিবাসিগণের দানই মুখ্য। এই সকল আর্যেতর জাতিগণের মধ্যে পিতৃপরিচয় ছিল গৌণ, মাতৃপরিচয়েই সন্তানের পরিচয়। সমাজ-জীবনের এই মাতৃতান্ত্রিকতাই ধর্মজীবনেরও নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছিল ; এই ভাবেই তাহাদের ধর্মে মাতৃপ্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা এবং হয়ত এই মাতৃপ্রধান ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই শক্তিবাদের উদ্ভব এবং ক্রমপ্রসার। বেদে অবিসংবাদিত ভাবে পুরুষ-দেবতারই প্রাধান্য। দু'চারিজন স্ত্রী-দেবতার যে উল্লেখ ও বর্ণনা রহিয়াছে তাহা তুলনায় একেবারেই গৌণ। অন্যদিকে দেবী এবং দেবীপূজার উল্লেখ প্রাচীন ইতিহাস-পুরাণ-কাব্যে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে দেবীর পার্বত্য বন-প্রদেশের আর্যেতর অধিবাসিগণ কর্তৃক পূজিত হইবার সমর্থন যথেষ্ট মেলে। এ-সকল বিষয়ে পূর্বেই বহু আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমি আর বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করিলাম না।

১ এ-বিষয়ে লেখকের Obscure Religious Cults গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

আসলে আমরা আজিকার দিনে হিন্দুধর্ম বলিয়া যে ধর্মকে অভিহিত করি তাহা একটি জটিল মিশ্রধর্ম ; বহুদিকের বহুধারা আসিয়া একত্র হইয়া তাহার বর্তমান বহু-বিচিত্ররূপ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। দেবীপূজার উদ্ভব এবং প্রচলন আর্যজাতি অপেক্ষা আর্যেতর ভারতীয় আদিম অধিবাসিগণের মধ্যেই হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকিলেও একথা আজ স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দেবী-পূজাকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া ভারতীয় শক্তিবাদ আজ যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার ভিতরে উন্নত দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন আর্যমনীষি-গণের দানও যথেষ্ট। আর্যেতর জাতিগণ বিশ্বাস, সংস্কার, কল্পনা, পূজা-প্রকরণ প্রভৃতি তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন, আর আর্য দার্শনিক প্রতিভা তাহাতে নিরন্তর উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব এবং আধ্যাত্ম-অনুভূতি সংযুক্ত করিয়াছেন। এই জন্যই কালী, তারা প্রভৃতি দেবীর দশমহাবিদ্যারূপ একাধারে অসংস্কৃত আদিম সংস্কারের—আবার অন্যদিকে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের—প্রতীকরূপে আমাদের নিকট দেখা দিয়াছে। এই জটিল সংমিশ্রণ আমাদের সমাজ এবং ধর্মের সর্বত্রই বিদ্যমান।

ঋগ্‌বেদের যে সূক্তটি দেবীসূক্ত নামে পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, আসলে তাহা অম্ভৃণ ঋষির বাক্‌নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কন্যার উক্তি। স্বরূপ-প্রতিষ্ঠার ফলে তাঁহার ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ ঘটিয়াছিল ; সেই ব্রহ্মতাদাত্ম্য উপলব্ধির মুহূর্তে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, "ব্রহ্ম-স্বরূপা আমিই রুদ্রবসু, আদিত্য এবং বিশ্ব-দেবগণরূপে বিচরণ করি ; মিত্র-বরুণ, ইন্দ্র-অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমিই ধারণ করি। আমি শত্রুহন্তা সোম, ত্বষ্টা, পূষা এবং ভগ নামক দেবতাগণকে ধারণ করি, যজ্ঞের যজমানের জন্য আমিই যজ্ঞফলরূপ ধন ধারণ করিয়া থাকি। আমি জগতের একমাত্র অধীশ্বরী, আমি ধনদাত্রী ; আমিই যজ্ঞাঙ্গের আদি—জ্ঞানরূপা ; বহুভাবে অবস্থিতা, বহুভাবে প্রবিষ্টা আমাকেই দেবগণ ভজনা করিয়া থাকেন। জীব যে অন্ন ভক্ষণ করে, দেখে, প্রাণ ধারণ করে,—এ সকল আমা কর্তৃকই সাধিত হইতেছে ; এই রূপে যে আমাকে বুঝিতে না পারে সে-ই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। আমি নিজেই এই সব যাহা কিছু বলি, দেবতা এবং মানবগণ কর্তৃক তাহাই সেবিত হয় ; যাহাকে যাহাকে আমি ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকে আমি বড় করিয়া তুলি ; তাহাকে ব্রহ্মা, তাহাকে ঋষি, তাহাকে সুমেধা করি। ব্রহ্মবিদ্বেষী হননযোগ্যের হননের নিমিত্ত আমিই রুদ্রের জন্য ধনুতে জ্যা আরোপণ করি, জনগণের জন্য (রক্ষার জন্য, কল্যাণের জন্য) আমিই সংগ্রাম করি ; আমিই দ্যুলোকে ও ভূলোকে সর্বতোভাবে প্রবিষ্ট হইয়া আছি। এই

সকলের (দৃশ্যমান সব কিছুর) পিতাকে আমিই প্রসব করি; ইহার উপরে আমার যোনি—জলে—অন্তঃসমুদ্রে (সায়ণ-মতে সমুদ্র এখানে পরমাত্মা, জল ব্যাপনশীলা ধীবৃত্তি)। এই জন্যই বিশ্বভুবনকে আমি বিবিধভাবে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করি; ঐ দ্যুলোককেও আমিই দেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছি। আরভমাণ বিশ্বভুবনকে বায়ুর ন্যায় আমিই প্রবর্তিত করি, আমি দ্যুলোকেরও পর, আমি পৃথিবীরও পর—ইহাই আমার মহিমা”।[১]

এখানে উদ্‌গীত হইয়াছে আত্ম-স্বরূপ পরমব্রহ্মেরই মহিমা,—তিনিই সর্বভূতে বিরাজমান থাকিয়া সকল কিছু ধারণ এবং পরিচালন করিতেছেন। যেখানে যাহা কিছু হইতেছে, যেখানে যে কেহ যাহা কিছু করিতেছে—এই সকল হওয়া ও করা ক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে তাঁহারই এক সর্বব্যাপিনী শক্তি। তিনি সর্বশক্তিমান্—সেই সর্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তিই সর্বক্রিয়ার মূল কারণ, সর্বজ্ঞানের মূল কারণ; এই ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা বিশ্বব্যাপিনী শক্তিই তো দেবী—তিনিই মহামায়া। এখানে আত্মার মহিমাখ্যাপন উপলক্ষে ব্রহ্মের মহিমাখ্যাপন এবং ব্রহ্মের মহিমাখ্যাপনের ভিতর দিয়া ব্রহ্মশক্তিরই যেন মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। শক্তিমান্ এবং শক্তি অভেদ; তথাপি ব্রহ্মের মহিমাখ্যাপনের জন্যই যেন ব্রহ্মশক্তিকেই প্রধান করিয়া দেখান হইয়াছে। এই যে শক্তি ও শক্তিমানের মূল অভেদত্ব সত্ত্বেও অভেদে ভেদ কল্পনা করিয়া শক্তির মহিমা-প্রকাশ, এইখানেই ভারতীয় দার্শনিক শক্তিবাদের বীজ। ভগবানের অনন্ত শক্তি সকল দেশে সর্বকালে সকল শাস্ত্রেই স্বীকৃত এবং কীর্তিত হইয়াছে; কিন্তু সেই শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ করিয়া তাহাতে একটা স্বতন্ত্র সত্তা এবং মহিমা আরোপ করিয়া স্বীয় মহিমায় শক্তিরই প্রতিষ্ঠা—ইহাই ভারতীয় শক্তিবাদের অভিনবত্ব। এই শক্তিবাদ ভারতের যত ধর্মমতের ভিতরে যেভাবেই প্রবেশ করিয়াছে সর্বত্রই এই অভেদে ভেদবুদ্ধির মূলতত্ত্বটি বর্তমান। উপরি-উক্ত বৈদিক সূক্তটির ভিতরে শক্তিমান্ ও শক্তি একান্ত অবিনাভাবে বদ্ধ হইয়া আছে; কিন্তু এখানে যে একটি ‘দুই’য়ের সূক্ষ্ম কল্পনার ব্যঞ্জনা রহিয়াছে তাহাই পরবর্তী কালে বিবিধ ধর্মে ধর্ম-বিশ্বাস ও দার্শনিক তত্ত্ব উভয়রূপেই বিচিত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই কারণেই বোধ হয় উপরি-উক্ত বৈদিক সূক্তটি পরবর্তী কালে শক্তিবাদের বীজরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্যে যে শক্তিরূপিণী চণ্ডীর তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, এই দেবীসূক্তই তাহার ভিত্তিভূমি বলিয়া পরিগৃহীত হয়। অবশ্য

১ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি ইত্যাদি। (১০।১২৫।১-৮)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত দেবী-মাহাত্ম্যের সহিত নিকটতর যোগ দেখা যায় অথর্ব-বেদের আর একটি সূক্তে বর্ণিত দেবীর সহিত। সর্বভূতাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এখানে ইন্দ্র-জননী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং এই ইন্দ্র-জননী দেবীর নিকটে যেভাবে প্রার্থনা জানান হইয়াছে তাহা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অন্তর্গত এই জাতীয় প্রার্থনাকেই স্মরণ করাইয়া দিবে।[১] বেদের 'রাত্রি-সূক্ত'টিকেও দেবীর সহিত এক করিয়া লওয়া হয়। পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, দেবীকে বহুস্থানে 'রজনী'-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দেখি, দিন শিবের এবং রাত্রি শক্তির প্রতীক। অথর্ববেদের প্রসিদ্ধ 'পৃথিবী-সূক্তে' (১২।১) পৃথিবীকে বিশ্বজননী দেবী রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; বেদে বর্ণিত পৃথিবীর এই দেবীমূর্তির সহিত পরবর্তী কালের বিষ্ণুর ভূ-শক্তির পরিকল্পনা স্মরণ করা যাইতে পারে।[২] ইহার পরে শ্রুতির ভিতরে আমরা শক্তির আর লক্ষণীয় উল্লেখ পাই কেনোপনিষদে, যেখানে ব্রহ্মশক্তিই যে আসল শক্তি—সেই শক্তিই যে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবতাগণের ভিতর দিয়া ক্রিয়মাণা—দেবতাদিগকে এই তত্ত্ব শিক্ষাদানের

১ সিংহে ব্যাঘ্র উত যা পৃদাকৌ
ত্বিষিরগ্নৌ ব্রাহ্মণে সূর্যে যা।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান
সা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা॥
যা হস্তিনি দ্বীপিনি যা হিরণ্যে
ত্বিষিরপ্সু গোষু যা পুরুষেষু।
ইন্দ্রং যা দেবী ইত্যাদি।
রথে অক্ষেষ্ৱৃষভস্য বাজে
বাতে পর্জন্যে বরুণস্য শুষ্মে।
ইন্দ্রং যা দেবী ইত্যাদি।
রাজন্যে দুন্দুভাবায়তাযা-
মশ্বস্য বাজে পুরুষস্য মায়ৌ।
ইন্দ্রং যা দেবী ইত্যাদি।

যে দেবী সিংহে ব্যাঘ্রে এবং যে দেবী সর্পের ভিতরে; দীপ্তি যিনি অগ্নিতে, ব্রাহ্মণে, সূর্যে; ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন যে সুভগা দেবী, তেজোদীপ্তা সেই দেবী আমাদের নিকটে আসুন। যিনি হস্তীতে, দ্বীপীতে, যিনি হিরণ্যে,—দীপ্তি যিনি জলরাশিতে, গোসমূহে, পুরুষসমূহে; ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন, ইত্যাদি। যিনি রথে, অক্ষসমূহে, ঋষভের শক্তিতে; যিনি বাতাসে, মেঘে এবং বরুণের শক্তিতে; ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন যে দেবী ইত্যাদি। যিনি রাজন্যে দুন্দুভিতে; যিনি অশ্বের গতিতে, পুরুষের গর্জনে; ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন ইত্যাদি। (৬।৩৮।১-৪)।

২ নারায়ণোপনিষদে পৃথিবীকেই শ্রীদেবীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

নিমিত্ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বহু-শোভমানা হৈমবতী উমা রূপে আকাশে আবির্ভূতা হইলেন।[১] 'হৈমবতী' এখানে হেমমণ্ডিতা এই অর্থে প্রযুক্ত, কিন্তু এই 'হৈমবতী' বিশেষণই বোধ হয় উত্তরকালে দেবীকে হিমালয়পর্বত-দুহিতা হইয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভিতরে আমরা আর একটি উল্লেখযোগ্য শ্রুতি লক্ষ্য করিতে পারি। সেখানে বলা হইয়াছে, আত্মাই আদিতে সন্মাত্ররূপে একাকী অবস্থান করিতেছিলেন। সেই আত্মা কখনও রমণ করিতে পারেন নাই, কারণ একাকী কেহ রমণ করিতে পারে না; সুতরাং তিনি দ্বিতীয় কাহাকেও ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার যে আত্মভাব তাহা যেন স্ত্রী-পুরুষের গভীর আলিঙ্গনাবদ্ধ একটি একীভূত ভাব; তিনি তদ্বিধ নিজকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন, স্ত্রী ও পুরুষরূপে। ইহাই আদি মিথুন-তত্ত্ব; এই আদি মিথুন-তত্ত্বেরই প্রকাশ জগতের সর্বপ্রকার মিথুনের ভিতর দিয়া।[২] শ্রুতিটি গভীর অর্থদ্যোতক। এখানে দেখিতেছি, পরমসত্যের যে একরূপে অবস্থান তাহা যেন মিথুনেরই একটা অদ্বয়াবস্থা; সেই অদ্বয়ের ভিতরেই দুই লুকাইয়াছিল, এবং তাহাদের দুই রূপে অভিব্যক্তি আত্মরতির প্রয়োজনে। এই আত্মরতির আনন্দসম্ভোগহেতুই এক অদ্বয়তত্ত্বের যেন একটা কল্পিতভেদ স্বীকার, একেরই দুইরূপে লীলা। পরবর্তী শাক্তন্ত্রে এবং বৈষ্ণবমতেও এই মূল তত্ত্বটি গভীরভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে। এই আত্মরতি এবং তন্নিমিত্ত একটা অভেদে ভেদ-কল্পনা ব্যতীত বৈষ্ণবগণের লীলাতত্ত্বই দাঁড়াইতে পারে না। পরবর্তী কালের শাক্ত এবং বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণই এই শ্রুতিটিকে প্রয়োজনানুরূপ যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন।

উপনিষদ্গুলির ভিতরে,—বিশেষ করিয়া বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য এবং প্রশ্নোপনিষদে,—আর একটি মিথুন-তত্ত্ব দেখিতে পাই। সৃষ্টিপ্রকরণের প্রসঙ্গে বহু স্থানেই দেখি সৃষ্টিকাম প্রজাপতি প্রথমে একটি 'মিথুন' সৃষ্টি করিলেন, এই মিথুনের দুই অংশকে সাধারণতঃ 'প্রাণ' এবং 'রয়ি', বা 'প্রাণ' এবং 'অন্ন', অথবা 'অন্নাদ' এবং 'অন্ন' বলা হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যে 'বাক্' ও 'প্রাণে'র মিথুনের কথা পাই; বহুস্থলে 'অগ্নি' ও 'সোমে'র মিথুনের কথা পাই। তত্ত্বতঃ প্রাণ ও রয়ি, প্রাণ ও অন্ন, প্রাণ ও বাক্, অন্নাদ ও অন্ন, অগ্নি ও সোম একই জিনিস। ইহাকেই কোথাও শুক্ল-পক্ষ কৃষ্ণ-পক্ষ, দিবা ও রাত্রি, রবি ও চন্দ্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশ্ব-প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতি যে তপস্যা দ্বারা প্রথমে এই-

১ কেন, ৩।১২
২ ১।৪।৩

মিথুন সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে, বিশ্ব-প্রপঞ্চের যাহা কিছু তাহা সকলই প্রাণ ও অন্ন, বা প্রাণ ও রয়ি এই দুই অংশের মিলনে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার একটি অন্তরাংশ, একটি বাহ্যাংশ, একটি 'প্রকাশক, স্থায়ী, অমৃত; অপরটি অপ্রকাশক, উপজান-অপায়-ধর্মক, স্থূল মর্ত্য'। ইহার ভিতরে প্রাণ 'করণাংশ', রয়ি বা অন্ন 'কার্যাংশ'। অন্ন বা রয়ি হইল প্রাণের আধার, এই আধারকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণের যদ্‌যাবতীয় ক্রিয়া। অগ্নিই এই প্রাণ, কারণ সে 'অত্তা', সে অন্নের ভক্ষক; এই জন্যই অগ্নি বা প্রাণই হইল 'অন্নাদ'। সোমই হইল অন্ন বা রয়ি, সে ভোজ্য। ঋগ্‌বেদে অগ্নিকেই 'আয়ুঃ' বা প্রাণ-শক্তির প্রথম বিকাশ বলা হইয়াছে। এই 'অগ্নি গূঢ়-ভাবে অবস্থান করিতেছিল; মাতরিশ্বা বা প্রাণশক্তি মন্থন করিতে করিতে উহাকে আবির্ভূত করিল'। প্রাণিদেহের ভিতরেও দেখিতে পাই, এই অগ্নি বৈশ্বানর রূপে অবস্থান করিয়া অন্নকে গ্রহণ করিতেছে; এবং এই অন্নের আহুতি ও অগ্নির পচনক্রিয়া এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে আমাদের দেহযাত্রা। দেহযাত্রা সম্বন্ধে যাহা সত্য, বিশ্বযাত্রা সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। এই প্রাণ ও রয়ি, বা অগ্নি ও সোম কোথাও স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করে না, তাহারা সর্বদা অন্যোন্যাশ্রিত,—একে অপরের পরিপোষকতা করিয়া থাকে; উভয়েই যেন এক অবিচ্ছেদ্য সত্যের দুইটি অংশ মাত্র। গীতার ভিতরে দেখিতে পাই, এই অগ্নি ও অন্ন এক অদ্বয় সত্য পুরুষোত্তমের ভিতরে বিধৃত হইয়া আছে।[১] পরবর্তী কালের শৈব শাক্ত তন্ত্রগুলিতে এই প্রাণ বা অগ্নিকেই শিব, এবং অন্ন, রয়ি বা সোমকে শক্তির প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এই প্রাণ-রয়ি বা অগ্নি-সোম তত্ত্বই পরবর্তী কালের শিব-শক্তি তত্ত্বের ভিত্তিভূমিকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রে অবশ্য বিষ্ণু-শক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে যে কয়েকটি শ্রুতির বহু উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়, তাহার ভিতরে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের দুইটি শ্রুতি খুবই প্রসিদ্ধ; একটি হইল—

> ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
> ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
> পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
> স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ ৬।৮

"তাঁহার কার্য এবং করণ কিছুই নাই; তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা অধিকও

১ গীতা, ১৫।১৩-১৪

কেহই নাই। ইঁহার বিবিধা পরা শক্তির কথা শ্রুত হইয়া থাকে, এবং ইঁহার জ্ঞানবল-ক্রিয়া স্বাভাবিকী।"

দ্বিতীয় শ্লোকটি হইল,—

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥ ৪।১০

"মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, মায়ীকে জানিবে মহেশ্বর। তাঁহার অবয়বভূত বস্তু দ্বারাই এই সকল জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে।"

ইহা ব্যতীতও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শক্তি এবং মায়া-মায়ীর উল্লেখ অন্যত্রও রহিয়াছে; যেমন সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকে—

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। ৪।১

'যিনি এক এবং অবর্ণ, এবং নিগূঢ় প্রয়োজনে বহুধা শক্তির যোগে অনেক বর্ণের বিধান করেন।' ইত্যাদি।

এখানকার এই 'বহুধা শক্তিযোগাৎ' কথাটির ভিতরে পরবর্তী কালে গভীর অর্থের দ্যোতনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবার বলা হইয়াছে,—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥ ঐ, ৪।৫

এক লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা (ত্রিগুণাত্মিকা ?) অজা (জন্মরহিতা অনাদি মায়াশক্তি)—আত্মানুরূপা (ত্রিগুণাত্মক) বহু প্রজা (সন্তান, কার্য) সৃষ্টি করিতেছে; এইরূপ সৃজমানা অজাকে একটি অজ (মায়াবদ্ধ জীব) সেবাপরায়ণ হইয়া ভোগ করিতেছে; অপরে (ব্রহ্ম বা পরমাত্মা) ভুক্তভোগা এই অজাকে ত্যাগ করে। অন্যত্রও দেখিতে পাই,—

অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥ ঐ, ৪।৯

"মায়ী এই বিশ্বকে সৃজন করেন, এবং তাহাতে (এই সৃষ্টিতে) অন্য সব (জীব) মায়া দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে।"

প্রাচীনতর উপনিষদ্‌গুলিতে শক্তির উল্লেখ এবং আলোচনা মোটামুটি ইহাই। পরবর্তী কালে অবশ্য অনেক উপনিষদ্ রচিত হইয়াছে এবং তাহার

ভিতরে শিবশক্তির প্রসঙ্গ নানাভাবে উত্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে। এইসব উপনিষদের রচয়িতা এবং রচনা-কাল উভয়ই সন্দিগ্ধ হওয়াতে ইহাদের সম্বন্ধে আর আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়াই ভাল। অন্ত কিছু কিছু সংহিতা, আরণ্যক ও গৃহ্যসূত্রে বিভিন্ন দেবীর উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়; শক্তি-তত্ত্বের আলোচনায় তাহাদের বিশেষ কিছু মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার পরবর্তী কালে আসিয়া রামায়ণে শক্তির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।[১] মহাভারতের স্থানে স্থানে দুর্গার উল্লেখ পাই এবং স্বতন্ত্র দেবীরূপে তাঁহাকে স্তুত ও পূজিত হইতে দেখা যায়। তবে বিরাট মহাভারতের মধ্যে এই সকল অংশ কতটা খাঁটি এবং কতটা প্রক্ষিপ্ত নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইহার পরেই আমাদিগকে আসিতে হয় পুরাণ ও তন্ত্রের যুগে। এই পুরাণ ও তন্ত্রের যুগ যে আসলে কোন্ যুগ তাহা ঠিক ঠিক ভাবে বলিবার কোন উপায় নাই। পুরাণের কাল সম্বন্ধে যদি বা কোন কথা বলা চলে, অসংখ্য উপপুরাণ সম্বন্ধে ত' কিছুই বলা চলে না। তন্ত্রের কাল নিরূপণ ত' আরও দুঃসাধ্য ব্যাপার। তন্ত্রশাস্ত্র অধিকাংশই রচিত হইয়াছে ভারতবর্ষের দুইটি প্রান্তে অবস্থিত দেশে; একটি—পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত কাশ্মীর দেশে, অপরটি পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বাঙলা দেশে। কাশ্মীরে যে সকল তন্ত্র রচিত হইয়াছে কাশ্মীরী শৈবদর্শনের সাহায্যে তাহার রচনাকাল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা চলে; কিন্তু বাঙলা দেশে এবং সংলগ্ন দেশসমূহে যে অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র রচিত হইয়াছে (হিন্দুতন্ত্র এবং বৌদ্ধতন্ত্র) তাহার রচনাকাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অধিকন্তু এইসকল তন্ত্রপুরাণাদিতে বা শৈবদর্শনে শক্তিতত্ত্ব যেখানে ভাল করিয়া আলোচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে সেখানে দেখিতে পাই, শক্তিবাদ বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনেও প্রবেশ লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; এবং আমাদের বিশ্বাস, বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনে প্রবিষ্ট এই শক্তিবাদই পরবর্তী কালে পূর্ণ-বিকশিত রাধাবাদে গিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং এইসকল তন্ত্র-পুরাণাদিতে ব্যাখ্যাত শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আর পৃথক্‌ভাবে আলোচনা না করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনে গৃহীত শক্তিতত্ত্ব লইয়াই এইবারে আমরা আলোচনা আরম্ভ করিতে চাই। তা' ছাড়া দার্শনিক ভিত্তিতে শক্তি-তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমরা পাই কাশ্মীরী শৈবদর্শনে; ইহা বিশ্বাস করিবার আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্র মতবাদের অন্ততঃ কিছু কিছু গ্রন্থ কাশ্মীরী শৈবদর্শনের গ্রন্থগুলি রচিত হইবার পূর্বে রচিত।

১ অবশ্য বাল্মীকি-রামায়ণের দুই একটি শ্লোকে শ্রী ও বিষ্ণুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; এ বিষয়ে আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীসূক্ত ও শ্রীদেবী বা লক্ষ্মীদেবীর প্রাচীন ইতিহাস

বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ভিতরে উৎপন্ন ও ক্রম-বিকশিত শক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাই, শক্তি বা দেবী 'শ্রী' বা 'লক্ষ্মী'রূপেই প্রথমে বৈষ্ণব ধর্মে আত্ম-প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালের তন্ত্রপুরাণাদি যেমন ঋগ্‌বেদীয় 'দেবীসূক্তে'র ভিতরেই দেবীর মূল খুঁজিয়া পাইয়াছে, তেমনই ঋগ্‌বেদীয় 'শ্রীসূক্তে'র ভিতরেই বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু-শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীর উৎপত্তি ধরিয়া লওয়া হয়। এই শ্রীসূক্ত হইল ঋগ্‌বেদের ৫ম মণ্ডলের অন্তে খিল সূক্তস্থ পঞ্চদশটি ঋক্ মন্ত্র। ইহার রচয়িতা হইলেন আনন্দ, কর্দম, শ্রীদ প্রভৃতি ঋষিগণ। সূক্তটি এই :—

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ॥
তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্॥
অশ্বপূর্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রবোধিনীম্।
শ্রিয়ং দেবীমুপহ্বয়ে শ্রীর্মা দেবী জুষতাম্॥
কাং সোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারা-
মার্দ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীম্।
পদ্মে স্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম
চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং
শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্টামুদারাম্।
তাং পদ্মিনীমীং শরণং প্রপদ্যে
ঽলক্ষ্মী র্মে নশ্যতাং ত্বা বৃণে॥
আদিত্যবর্ণে তপসোধি জাতো
বনস্পতিস্তব বৃক্ষোঽথ বিল্বঃ।
তস্য ফলানি তপসা নুদন্তু
যা অন্তরা যাশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ।
উপৈতু মাং দেবসখঃ কীর্তিশ্চ মণিনা সহ।
প্রাদুর্ভূতো ঽস্মি রাষ্ট্রেস্মিন্ কীর্তিমৃদ্ধিং দদাতু মে॥

ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্।
অভূতিমসমৃদ্ধিং চ সর্বাং নির্ণুদ মে গৃহাৎ॥
গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥
মনসঃ কামমাকূতিং বাচঃ সত্যমশীমহি।
পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ॥
কর্দমেন প্রজাভূতা ময়ি সম্ভব কর্দম।
শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে মাতরং পদ্মমালিনীম্॥
আপঃ সৃজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে।
নি চ দেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে॥
আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং পদ্মমালিনীম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ॥
আর্দ্রাং যঃ করণীং যষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীম্।
সূর্যাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ॥
তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যো ঽশ্বান্
বিন্দেয়ং পুরুষানহম্॥

এখানে জাতবেদ (জাতপ্রজ্ঞ) অগ্নির নিকট লক্ষ্মীকে আহ্বান করিবার জন্য প্রার্থনা জানান হইতেছে। অগ্নি হইলেন দেবহোতৃ, সকল আহ্বানই তদধীন, এই জন্য তাঁহার নিকটেই এই আহ্বানের প্রার্থনা জানান হইতেছে। "হে জাতবেদ অগ্নি, তুমি আমার জন্য হিরণ্যবর্ণা, হরিতকান্তি অথবা হরিণীরূপ-ধারিণী[১], সুবর্ণ-রজতের পুষ্পমালাধারিণী, চন্দ্রবৎপ্রকাশমানা হিরণ্ময়ী লক্ষ্মীকে আহ্বান কর॥ জাতবেদ আমার জন্য সেই অপগমনরহিতা লক্ষ্মীকে আহ্বান কর, যিনি আহূত হইলে আমি সুবর্ণ, গো, অশ্ব এবং বহু লোকজন পাইব। যে দেবীর সম্মুখে অশ্ব, মধ্যে রথ, হস্তিনাদের দ্বারা যাঁহার (বার্তা) স্থাপিত হয়, সেই শ্রীদেবীকে আমি নিকটে আহ্বান করিতেছি, সেই শ্রীদেবী আমাকে ভজনা করুক॥ বাক্যমনের অগোচরা ব্রহ্মরূপা[২] হিরণ্যবর্ণা আর্দ্রা[৩] প্রকাশমানা তৃপ্তা অথচ তর্পয়ন্তী (ভক্তমনোরথসিদ্ধ-কারিণী), পদ্মে স্থিতা পদ্মবর্ণা সেই

১ 'শ্রীর্ধৃত্বা হরিণীরূপমরণ্যে সংচচার হ' ইতি পুরাণাৎ। (সায়ণ)
২ 'ক ইতি ব্রহ্মণো নাম' ইতি পুরাণাৎ। (সায়ণ)
৩ 'ক্ষীরোদধেরুৎপন্নত্বাৎ। (সায়ণ)

শ্রীকে আমার নিকটে আহ্বান করিতেছি ॥ চন্দ্রাভা প্রভাসা (প্রকৃষ্টভাসযুক্তা) মনের দ্বারা প্রকাশমানা দেবসেবিতা উদারা পদ্মিনী শ্রীর ইহলোকে শরণ গ্রহণ করিতেছি, আমার সকল অলক্ষ্মী বিনষ্ট হউক; আমি তোমাকেই বরণ করিতেছি॥ হে আদিত্যবর্ণা শ্রী, তোমার তপোহেতু (নিয়মহেতু) এই বনস্পতি বিল্ববৃক্ষ অধিজাত হইয়াছে[১]; তাহার ফলগুলি তোমার অনুগ্রহেই আমার অন্তরিন্দ্রিয়-বহিরিন্দ্রিয়-সম্বন্ধিনী মায়া (অজ্ঞান) এবং তৎকার্যসমূহ এবং আমার অলক্ষ্মী অপনোদন করুক ॥ দেবসখ (মহাদেবের সখা কুবের) এবং কীর্তি (যশ অথবা কীর্তিনাম্নী কীর্ত্যভিমানিনী দক্ষকন্যা) মণিসহ (মণি মণিরত্ন অর্থে অথবা কুবেরের কোষাধ্যক্ষ মণিভদ্র অর্থে) আমার সমীপে আসুক; আমি এই রাষ্ট্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি, আমাকে কীর্তি এবং ঋদ্ধি দান করুক ॥ ক্ষুৎপিপাসা-মলিন জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মীকে আমি নাশ করিব; সকল অভূতি ও অসমৃদ্ধি আমার গৃহ হইতে বিতাড়িত কর ॥ গন্ধলক্ষণা দুরাধর্ষা নিত্যপুষ্টা (শস্যাদি দ্বারা) শুষ্কগোময়বতী (অর্থাৎ গবাশ্বাদিবহুপশুসমৃদ্ধা) সর্বভূতের ঈশ্বরী সেই শ্রীকে আমি এখানে আহ্বান করিতেছি ॥ হে শ্রী, মনের কামনা-সঙ্কল্প, বাক্যের সত্য (যাথার্থ্য), পশুদের রূপ (অর্থাৎ ক্ষীরাদি) এবং অন্নের রূপ (ভক্ষ্যাদি চতুর্বিধ) আমরা যেন লাভ করি; আমাতে শ্রী এবং যশ আশ্রয় লাভ করুক ॥ কর্দম (ঋষি) দ্বারা তুমি অপত্যবতী হইয়াছ (অর্থাৎ কর্দম তোমার অপত্যত্ব স্বীকার করিয়াছে); অতএব হে শ্রীপুত্র কর্দম, তুমি আমার গৃহে বাস কর; আর পদ্মমালিনী মাতা শ্রীকে আমার কুলে বাস করাও ॥ অপ্ সকল স্নিগ্ধ কার্যসকল উৎপন্ন করুক; হে শ্রীপুত্র চিক্লীত, তুমি আমার গৃহে বাস কর; আর মাতা শ্রীদেবীকে আমার কুলে বাস করাও ॥ হে জাতবেদ, তুমি আমার জন্য আর্দ্রা, গজশুণ্ডাগ্রবতী, পুষ্টিরূপা, পিঙ্গলবর্ণা, পদ্মমালিনী, চন্দ্রাভা, হিরণ্ময়ী লক্ষ্মীকে আহ্বান কর ॥ হে জাতবেদ, তুমি আমার জন্য আর্দ্রা, যষ্টিহস্তা, সুবর্ণা, হেমমালিনী, সূর্যাভা, হিরণ্ময়ী লক্ষ্মীকে আহ্বান কর ॥ হে জাতবেদ, আমার জন্য তুমি সেই অনপগামিনী লক্ষ্মীকে আহ্বান কর, যাহার ভিতরে আমি পাইব হিরণ্য, প্রভূত সম্পদ্, দাসসকল, অশ্বসকল এবং অনেক পুরুষ ॥"

উপরি-উক্ত শ্রীসূক্তটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, এখানকার বর্ণিত শ্রী বা লক্ষ্মী যে শুধুমাত্র সম্পদ্‌রূপিণী এবং কান্তিরূপিণী তাহা নহে, এই বর্ণনার মধ্যে শ্রী বা লক্ষ্মীর অনেক বিশেষণের ভিতরে পরবর্তী কালের লক্ষ্মীদেবীর

১ 'বিল্বো লক্ষ্ম্যাঃ করে ঽভবৎ' ইতি বামনপুরাণে কাত্যায়নবচনাৎ। (সায়ণ)

অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানের বীজও লুক্কায়িত আছে। লক্ষ্মীকে এখানে হরিণী বলা হইয়াছে, পুরাণে অরণ্যমধ্যে লক্ষ্মীর হরিণীরূপ ধারণ করিয়া বিচরণের কথা আছে। এই লক্ষ্মীদেবীকে বহুস্থানেই 'আর্দ্রা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; ইহাই বোধ হয় পরবর্তী কালে লক্ষ্মীর সমুদ্রসম্ভূতত্বের মূল। লক্ষ্মীকে 'পদ্মে স্থিতা' এবং 'পদ্মবর্ণা', 'পদ্মিনী', 'পদ্ম-মালিনী' বলা হইয়াছে; ইহার সহিত পদ্মাসনা বা পদ্মালয়া 'কমলা'র বা 'কমলিনী'র যোগ অতি ঘনিষ্ঠ বলিয়াই মনে হয়। (বিল্ববৃক্ষ এবং বিল্বফলের সহিত দেবীর সম্পর্ক লক্ষণীয়; এখন পর্যন্তও কোজাগর পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজায় কলাগাছ দ্বারা লক্ষ্মীর যে প্রতীকমূর্তি তৈয়ার করা হয়, বিল্বফলের দ্বারা তাহার স্তন রচনার প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা শুধু দেবীকে 'বিল্ব-স্তনী' করিয়া গড়িবার জন্য বলিয়াই মনে হয় না।) 'রাজনির্ঘণ্টে' বিল্বকে লক্ষ্মীফল বলা হইয়াছে। দেবীকে একস্থানে 'পুষ্করিণী' বলা হইয়াছে; 'পুষ্কর' শব্দ গজশুণ্ডাগ্র-বাচক; এই প্রসঙ্গেও পরবর্তী কালের গজলক্ষ্মীর মূর্তি এবং উপাখ্যান স্মরণীয়। একস্থানে অলক্ষ্মীকে লক্ষ্মীর অগ্রজা বলা হইয়াছে। পুরাণে এই লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ঝগড়া দেখা যায়। শ্রীসূক্তের সপ্তম মন্ত্রটিতে কুবেরের সহিত লক্ষ্মীর যোগ দেখিতে পাই; পুরাণ-তন্ত্রাদি-নির্দিষ্ট লক্ষ্মী-পূজার সহিত কুবের-পূজার যোগও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

অহির্বুধ্ন্য-সংহিতার ৫৯তম অধ্যায়ে বেদের পুরুষসূক্ত এবং শ্রীসূক্ত সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। শ্রীসূক্তের আলোচনায় 'হিরণ্যবর্ণা' শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই শ্রীশক্তিই পরমামৃতা দেবী। এই যে শ্রীসূক্ত ইহা শুধু দেবীর সূক্ত নয়, ইহার ভিতরে বিষ্ণু এবং শ্রী এই উভয়ের মিথুনের চিহ্নই বর্তমান। এই উভয়ে প্রথম হইতেই অন্যোন্যমিশ্র বলিয়া ইহার যে-কেহ সম্বন্ধে সূক্তই অন্যোন্যপ্রতিপাদক।[১] বৈখানস-সম্প্রদায়ের 'কাশ্যপ-সংহিতা' গ্রন্থখানি অতি প্রাচীন বলিয়া মনে করা হয়। এই 'কাশ্যপ-সংহিতা'র অংশ বলিয়া কথিত 'কাশ্যপজ্ঞানকাণ্ডম্' নামে যে গ্রন্থখানি তিরুপতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে

---

১ হিরণ্যবর্ণাং শ্রীসূক্তং কৃত্তো হ্যস্তত্রা হ্যস্য বিস্তরঃ।
বর্ণো বরয়তে রূপং বর্ণো বর উতাপতিঃ॥
হিতশ্চ রমণীয়শ্চ যস্যা বর্ণ ইতি স্থিতিঃ।
হিরণ্যবর্ণা সা দেবী শ্রীশক্তিঃ পরমা হ্যমৃতা॥
তদেতৎ সূক্তমিত্যুক্তং মিথুনং পরিচিহ্নিতম্।
আদাবন্যোন্যমিশ্রত্বাদন্যোন্যপ্রতিপাদকম্॥ ৫০।৪০-৪২

তাহার ভিতরেও আমরা পদ্মপ্রভা, পদ্মাক্ষী, পদ্মমালাধরা, পদ্মহস্তা শ্রীদেবীর ধ্যান-প্রসঙ্গে শ্রীসূক্তের দ্বারা তাঁহার হোম করিবার বিধি দেখিতে পাই।[১] পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে এই শ্রীসূক্তের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দেখিতে পাই; সেখানে বলা হইয়াছে,—

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং বিষ্ণোরনপগামিনীম্॥
গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাম্তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥
এবং ঋক্-সংহিতায়াস্তু স্তূয়মানা মহেশ্বরী। ইত্যাদি

(২২৭।২৯-৩১)

অগ্নিপুরাণে দেখিতে পাই শ্রীসূক্তের দ্বারা লক্ষ্মীর শিলা-স্থাপন করিবার বিধান।[২] লক্ষ্মী-প্রতিষ্ঠার সব মন্ত্রই শ্রীসূক্তের। শ্রীসূক্তের বিভিন্ন মন্ত্রাংশ দ্বারা দেবীর চক্ষু উন্মীলন করিতে হয়, বিশেষ মন্ত্রাংশ দ্বারা মধুরত্রয় দান করিতে হয়, বিশেষ বিশেষ মন্ত্রাংশ দ্বারা অষ্টদিক হইতে দেবীর অভিষেক করিতে হয়।[৩] ইহার পর পূজা-অর্চা যাহা কিছু সবই শ্রীসূক্তের দ্বারা করিবার বিধান।[৪] স্কন্দপুরাণে 'গন্ধদ্বারা' মন্ত্রটিকে লক্ষ্মীর আবাহনমন্ত্র এবং 'হিরণ্যবর্ণাং' প্রভৃতি মন্ত্রটিকে লক্ষ্মীর ধ্যানমন্ত্ররূপে ব্যবহৃত দেখি। বিষ্ণুপুরাণে (১।৯।১০০)

১ শ্রিয়ং পদ্মপ্রভাং পদ্মাক্ষীং পদ্মমালাধরাং পদ্মহস্তাং সুমুখীং সুকেশীং শুক্লাম্বরধরাং সর্বাবরণভূষিতাং সুপ্রভয়া জ্বলন্তীং সুবর্ণকুম্ভস্তনীং সুবর্ণপ্রাকারাং সুদন্তোষ্ঠীং সুভ্রূলতাং চিন্তয়েৎ। এবং বুদ্ধিস্থাং কৃত্বা পদ্মৈঃ শ্রীসূক্তেন হোমং কুর্যাৎ। ইত্যাদি (সপ্তম অধ্যায়)

২ শ্রীসূক্তেন চ তথা শিলাঃ সংস্থাপ্য সজ্যশঃ। ৪১।৮

৩ হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং নেত্রে চোন্মীলয়েচ্ছ্রিয়াঃ॥
তন্ম আবহ ইত্যেবং প্রদদ্যান্মধুরত্রয়ম্।
অশ্বপূর্বেতি পূর্বেণ তাং কুম্ভেনাভিষেচয়েৎ॥
কাং সো ঽস্মিতেতি যাম্যেন পশ্চিমেনাভিষেচয়েৎ।
চন্দ্রাং প্রভাসামুচ্চার্যাদিত্যবর্ণেতি চোত্তরাৎ॥
উপৈতু মেতি চাগ্নেয়াৎ ক্ষুৎপিপাসেতি নৈঋ্‌তাৎ।
গন্ধদ্বারেতি বায়ব্যান্মনসঃ কামমাকূতিম্॥ ৬২।৩-৬

৪ যেমন :—
প্রায়স্তীয়েন শয্যায়াং শ্রীসূক্তেন চ সন্নিধিম্।
লক্ষ্মীবীজেন চিচ্ছক্তিং বিন্যস্যাভ্যর্চয়েৎ পুনঃ॥ ৬২।৯

এবং পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড, ৪।৫৮ প্রভৃতি) দেখিতে পাই সমুদ্রমন্থনে বিকশিত-কমলে ধৃতপঙ্কজা লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইলে পর দেবতাগণ এবং মহর্ষিগণ শ্রীসূক্তের দ্বারাই তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন।

অগ্নিপুরাণের মতে শ্রীসূক্ত চারিবেদের চারিটি। 'হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং' ইত্যাদি পঞ্চদশ মন্ত্র ঋগ্‌বেদোক্ত; 'রথেষক্ষেষু বাজে' ইত্যাদি চারিটি মন্ত্র যজুর্বেদোক্ত; 'শ্রায়ন্তীয়ং সাম' প্রভৃতি মন্ত্র সামবেদোক্ত শ্রীসূক্ত এবং 'শ্রিয়ং ধাতর্ময়ি ধেহি' এই একটি মাত্র অথর্ববেদোক্ত শ্রীসূক্ত।[১] বৈদিক লক্ষ্মী দেবী 'শ্রী' নামে সুপ্রসিদ্ধা ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় পুরাণাদিতে স্থানে স্থানে দেবীর বর্ণনায় এই 'শ্রী'র ব্যবহার লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে।[২] বিষ্ণুর বর্ণনায়ও অনেক সময় 'শ্রী'র সহিত তাঁহার অবিনাবদ্ধ যোগই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।[৩]

১ শ্রীসূক্তং প্রতিবেদঞ্চ জ্ঞেয়ং লক্ষ্মীবিবর্ধনম্।
হিরণ্যবর্ণাং হরিণীমৃচঃ পঞ্চদশ শ্রিয়ঃ॥
রথেষক্ষেষু বাজেতি চতস্রো যজুষি শ্রিয়ঃ।
শ্রায়ন্তীয়ং তথা সাম শ্রীসূক্তং সামবেদকে॥
শ্রিয়াং ধাতর্ময়ি ধেহি প্রোক্তমাথর্বণে তথা।
শ্রীসূক্তং যো জপেদ্ভক্ত্যা হুত্বা শ্রীস্তস্য বৈ ভবেৎ॥ ২৬৩।১-৩

২ যেমন কূর্মপুরাণে সর্বাত্মিকা পরমেশ্বরী শক্তির বর্ণনায়ই দেখিতে পাই :—
শ্রীফলা শ্রীমতী শ্রীশা শ্রীনিবাসা শিবপ্রিয়া।
শ্রীধরী শ্রীকরী কল্যা শ্রীধরার্ধশরীরিণী॥ ইত্যাদি॥ ১২।১৮০-৮১

৩। যেমন :—
শ্রিয়ঃ কান্ত নমস্তেঽস্তু শ্রীপতে পীতবাসসে।
শ্রীদ শ্রীশ শ্রীনিবাস নমস্তে শ্রীনিকেতন॥ ব্রহ্মপুরাণ (বঙ্গবাসী), ৪৯।১০
ওঁ নমঃ শ্রীপতে দেব শ্রীধরায় বরায় চ।
শ্রিয়ঃ কান্তায় দান্তায় যোগিচিন্ত্যায় যোগিনে॥ ঐ—৫৯।৫১
শ্রীনিবাসায় দেবায় নমঃ শ্রীপতয়ে নমঃ॥
শ্রীধরায় সশার্ঙ্গায় শ্রীপদায় নমো নমঃ।
শ্রীবল্লভায় শান্তায় শ্রীমতে চ নমো নমঃ॥
শ্রীপর্বতনিবাসায় নমঃ শ্রেয়স্করায় চ।
শ্রেয়সাং পতয়ে চৈব হ্যাশ্রমায় নমো নমঃ॥
গরুড়পুরাণ (বঙ্গবাসী), ৩০।১৩-১৫
শ্রীদঃ শ্রীশঃ শ্রীনিবাসঃ শ্রীধরঃ শ্রীনিকেতনঃ।
শ্রিয়ঃ পতিঃ শ্রীপরম এতৈঃ শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ॥ অগ্নিপুরাণ (বঙ্গবাসী), ২৮৪।৫

শতপথ ব্রাহ্মণে শ্রীদেবীর পূজার উল্লেখ রহিয়াছে। সেখানে শ্রী প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন। তিনি সৌভাগ্য, সম্পদ্ ও সৌন্দর্যের দেবতা।[১] বোধায়ন ধর্মসূত্রেও শ্রীদেবীর পূজার উল্লেখ রহিয়াছে।[২] বাল্মীকি-কৃত রামায়ণে একাধিক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে শ্রী বা লক্ষ্মীর উল্লেখ দেখিতে পাই। অযোধ্যা-কাণ্ডের ১১৮শ অধ্যায়ে দেখি সীতা বলিতেছেন,—'শোভয়িষ্যামি ভর্তারং যথা শ্রীর্বিষ্ণুমব্যয়ম্'।[৩] অরণ্যকাণ্ডে একস্থানে সীতাকে বলা হইয়াছে 'শ্রীরিবাপরা'।[৪] সুন্দরকাণ্ডের একস্থানেও সীতাকে লক্ষ্মী বলা হইয়াছে।[৫] সুন্দরকাণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, লক্ষ্মী সমুদ্রমন্থনে জাত ফেন হইতে আবির্ভূতা। অবশ্য এই সকলের কোন্ অংশ যে খাঁটি, কোন্ অংশ যে পরবর্তী কালের প্রক্ষিপ্ত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। মহাভারতের বনপর্বে একস্থানে শ্রী বা লক্ষ্মীকে স্কন্দপত্নীরূপে দেখিতে পাই। এই উল্লেখও কতটা খাঁটি বলা যায় না।

শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, ভরহুত এবং অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলিতে এই দেবীর প্রতিমূর্তি পাওয়া যায়।[৬] রাজুবুল মুদ্রাতেও এই দেবীর প্রতিমূর্তি পাওয়া যায়।[৭] ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী আরও কতগুলি শিলালিপি এবং তাম্রলিপিতে লক্ষ্মীদেবীর উল্লেখ লক্ষ্য করিয়াছেন।[৮] উদয়গিরি গুহালিপিতে (৮২ গুপ্তাব্দ) দুইখানি মূর্তি উৎসর্গ করিবার উল্লেখ রহিয়াছে,—একখানি বিষ্ণুমূর্তি, অপরখানি দ্বাদশভুজা একদেবী, তিনি বোধ হয় লক্ষ্মীদেবীরই বিশেষ মূর্তি। স্কন্দগুপ্তের সময়কার

১ ১১।৪।৩

২ ২।৫-২৪ ; ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত Materials for the Study of the Early History of the Vaishnava Sect গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

৩ ১১৮।২০ ; বোম্বাই নির্ণয়সাগর সংস্করণ।

৪ ৩৪।১৫—ঐ

৫ ১১৭।২৭—ঐ

৬ দ্রষ্টব্য—Buddhist India by Dr. T. W. Rhys Davids, পৃঃ ২১৭-১৮। ডক্টর রায়চৌধুরীর প্রাগুক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত।

৭ Coins of Ancient India, পৃঃ ৮৬। ডক্টর রায়চৌধুরীর প্রাগুক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত।

৮ ডক্টর রায়চৌধুরীর প্রাগুক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

একটি জুনাগড়লিপিতে একটি বিষ্ণুস্তোত্রে বিষ্ণুকে কমলনিবাসিনী লক্ষ্মীদেবীর শাশ্বত আশ্রয় বলা হইয়াছে। পরিব্রাজক মহারাজ সংক্ষোভের (৫২৯ খ্রী: অ:) খোহ্‌ তাম্রলিপিতে বাসুদেবের স্তব-প্রসঙ্গে পিষ্টপুরী নামক এক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই স্থানের শর্বনাথের রাজত্বকালের আর দুইখানি লিপিতে পিষ্টপুরিকা দেবীর পূজার জন্য অনেক গ্রাম দান করিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এই পিষ্টপুরী বা পিষ্টপুরিকা দেবী লক্ষ্মীদেবীরই রূপান্তর বা নামান্তর বলিয়া মনে করা হয়।

শ্রী বা লক্ষ্মীর উল্লেখ বা তাঁহার পূজার উল্লেখ প্রাচীনতর গ্রন্থাদিতে কিছু কিছু পাওয়া গেলেও মনে হয়, দেবী হিসাবে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার পূজার প্রচলন গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে হইয়াছিল। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে। শ্রী বা লক্ষ্মী এবং তাঁহার পূজার প্রাচীন যে সকল উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, যদিও শক্তিরূপে বা পত্নীরূপে তিনি বিষ্ণুর সহিত যুক্ত তবু এই বিষ্ণু-শক্তি রূপ বা বিষ্ণু-পত্নী রূপই তাঁহার মুখ্য পরিচয় নহে; তিনি শস্য, সৌন্দর্য, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে আপন স্বতন্ত্র মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিতা। কোজাগর লক্ষ্মীপূজা অন্ততঃ বাঙলা দেশের প্রত্যেক গৃহেই করা হইয়া থাকে; জনসাধারণের ভিতরে লক্ষ্মীর এই বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুপত্নী রূপ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত না হইলেও একেবারেই গৌণ; তিনি আপন শক্তি ও মহিমাতেই বরণীয়া। 'লক্ষ্মীর আসন' বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত; এই আসনে দৈনন্দিন জলঘট-প্রতিষ্ঠা এবং সন্ধ্যায় ধূপদীপ দেওয়া হিন্দু নারীর অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। ইহা ছাড়া বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর ব্রতকথা বাঙলা দেশের প্রায় প্রত্যেক হিন্দুরই ঘরে ঘরে প্রচলিত। এই ব্রতকথার আরম্ভে এবং শেষ প্রণামে বিষ্ণুর সাহচর্য জুড়িয়া দেওয়া আছে বটে, কিন্তু ব্রতকথা-মধ্যে লক্ষ্মী স্বতন্ত্র দেবী। মৎস্যপুরাণের ভিতরে একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারা যায়; সমস্ত মৎস্যপুরাণে বিষ্ণুর স্তুতি বা বর্ণনা উপলক্ষে লক্ষ্মী বা শ্রীর উল্লেখ খুব কম; কিন্তু ২৬১তম অধ্যায়ে[১] দেখি, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা প্রভৃতির রূপ-বর্ণনায় (প্রতিমা-প্রস্তুত করা প্রসঙ্গে) 'শ্রীদেবী'র বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। এখানেও শ্রীদেবী গজলক্ষ্মী;—করিভ্যাং স্নাপ্যমানাঽসৌ। এখানেও তাই মনে হয়, লক্ষ্মীর প্রসিদ্ধি স্বতন্ত্র দেবী রূপেই। বৈষ্ণব শাস্ত্রের

১ পঞ্চানন তর্করত্নের সংস্করণ।

ভিতর আসিয়াই লক্ষ্মী তাঁহার সকল স্বাতন্ত্র্য বিষ্ণুর ভিতরে লুপ্ত করিয়া কেবলমাত্র বিষ্ণু-শক্তি বা বিষ্ণু-প্রিয়া সত্তা লাভ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, লক্ষ্মী ভারতবর্ষের অন্যান্য বহু দেবীর ন্যায় মূলতঃ একজন স্বতন্ত্র দেবী; ভারতীয় ধর্মেতিহাসের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিষ্ণু-দেবতার সহিত ধীরে ধীরে অবিনাভাবে বদ্ধ হইয়া গেলেন। আমাদের বর্তমান আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন লক্ষ্মী বা শ্রীর এই বিষ্ণুশক্তি-মূর্তি লইয়া, সুতরাং আমাদের আলোচনাকে সেইদিকেই নিবদ্ধ করা যাক্।

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চরাত্রে বিষ্ণু-শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মী

বিষ্ণু-শক্তিরূপা শ্রী বা লক্ষ্মী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা প্রথমে পাঞ্চরাত্র মতবাদের আলোচনা করিতে চাই। অবশ্য এই পাঞ্চরাত্র মতের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা যে-সকল গ্রন্থকে মুখ্যতঃ অবলম্বন করিব সে-সকল গ্রন্থ ঠিক কোন্‌কালে কাঁহা কর্তৃক রচিত হইয়াছে সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই। পাঞ্চরাত্র মতের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণে। মহাভারতের মোক্ষ-ধর্মের অন্তর্গত নারায়ণীয় অংশে এই পাঞ্চরাত্র মতের বিস্তৃততর বিবরণ রহিয়াছে; কিন্তু সেখানে শুধু মাত্র নারায়ণের উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে, নারায়ণের শক্তি বা পত্নীরূপে লক্ষ্মী প্রভৃতি কাহারও উল্লেখ নাই। নারদ কর্তৃক এই পাঞ্চরাত্র মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়; কিন্তু 'নারদ পঞ্চরাত্র' বলিয়া যে গ্রন্থখানি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে[১] তাহা অনেক পরবর্তী কালের গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। ইহার ভিতরে একাধিকস্থলে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং রাধা সম্বন্ধে নিতান্ত পরবর্তী কালের যে-সকল বর্ণনা তাহাও ইহার ভিতরে স্থান পাইয়াছে। বহু প্রাচীন এবং অর্বাচীন বিবিধ রকমের বৈষ্ণব গ্রন্থ পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র নামে চলিয়া গিয়াছে। পণ্ডিতবর স্‌চ্‌হ্রাডার (Schrader) তাঁহার Introduction to the Pancaratra and the Ahirbudhnya-samhita গ্রন্থে বলিয়াছেন যে মোট ১০৮ খানা পঞ্চরাত্র-সংহিতার নাম পাওয়া যায়; তিনি যে-সকল পঞ্চরাত্র-সংহিতার পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছেন বা পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাইয়াছেন তাহার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। আমরা পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের যে সকল গ্রন্থ পড়িয়াছি তাহার ভিতরে অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা[২] গ্রন্থখানিকে সর্বপ্রাচীন না হইলেও সর্বপ্রধান বলিয়া মনে হইয়াছে। অন্ততঃ পঞ্চরাত্রে শক্তিবাদের আলোচনা যাহা আছে তাহা এই অহির্বুধ্ন্য-সংহিতায়ই সর্বাপেক্ষা সুসম্বদ্ধ ভাবে আছে। এই সংহিতাখানির রচনাকাল সম্বন্ধে স্‌চ্‌হ্রাডার সাহেব বলিয়াছেন যে এই জাতীয় সংহিতাগুলির

১ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

২ দেবশিখামণি রামানুজাচার্য সম্পাদিত। (অডেয়ার্ পুস্তকালয় প্রকাশিত)

রচনা-কালের শেষ সীমা ধরা যায় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী[১]; কিন্তু তাঁহার মতে অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে রচিত। পঞ্চরাত্রের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ জয়াখ্য-সংহিতাকে কেহ কেহ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের রচনা[২], কেহ কেহ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী রচনা[৩] বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক বা তাহার কিছু পূর্ববর্তী কালে রচিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইলেও এইসকল গ্রন্থ যে পুরাণগুলি অপেক্ষা প্রাচীন একথা বলা যায় না। অষ্টাদশ পুরাণের অনেকগুলি পুরাণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের পরবর্তী কালের রচনা মনে করিলেও বিষ্ণুপুরাণ, কূর্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণকে অনেকে পঞ্চম শতকের পূর্ববর্তী কালের রচনা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অনেকগুলি পুরাণ এবং উপপুরাণই (অন্ততঃ যে রূপে আজকাল তাহাদিগকে পাওয়া যাইতেছে) পরবর্তী কালের রচনা মনে হয় বলিয়া পঞ্চরাত্রের মতই আমরা পূর্বে আলোচনা করিতেছি।

পাঞ্চরাত্রমতে ভগবান্ বাসুদেবই হইলেন পরমদেবতা, পরমতত্ত্ব, তিনিই ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে বর্ণিত পরমপুরুষ। তিনিই অনাদি-অনন্ত পরমব্রহ্ম, তিনি অক্ষর অব্যয়, নামরূপের দ্বারা অভেদ্য, বাক্য-মনের অগোচর। তিনি সর্বশক্তিমান্, ষড়্‌গুণসম্পন্ন, অজর, ধ্রুব। তিনিই জগতের কারণ এবং জগতের আধার, জগতের প্রমাণ। এই বাসুদেবই সুদর্শনাখ্য বিষ্ণু। ইনি সর্বভূতের আবাস-স্থল, সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন; নিস্তরঙ্গ সাগরের ন্যায় তিনি অবিক্ষিপ্ত। প্রাকৃতগুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, অথচ তিনি অপ্রাকৃত গুণাস্পদ[৪]; ভবার্ণবের পরপারে নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন রূপে তাঁহার অবস্থান। পরমরূপে আত্মভাবী বলিয়া তিনি পরমাত্মা[৫], প্রণবাপন্ন বলিয়া সর্বতত্ত্বপ্রবিষ্ট; ষড়্‌গুণযুক্ত বলিয়া ভগবান্ এবং সমস্ত ভূতের ভিতরেই বাস করেন বলিয়া বাসুদেব নামে খ্যাত[৬]। বহুপ্রকারে রূপের ভিতরে ব্যক্ত নন বলিয়া তিনি অব্যক্ত, আর সর্বপ্রকৃতি তাঁহার শক্তি বলিয়া তিনি 'সর্বপ্রকৃতি' নামে অভিহিত; আর

১ Introduction to the Pancaratra etc, ৯৭ পৃষ্ঠা।

২ গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজে (৫৪ সংখ্যা) প্রকাশিত জয়াখ্য-সংহিতার ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখিত ইংরেজি ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩ ঐ গ্রন্থে অধ্যক্ষ কৃষ্ণমাচার্য-কৃত সংস্কৃত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪ অপ্রাকৃতগুণস্পর্শমপ্রাকৃতগুণাস্পদম্। অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা, ২।২৪

৫ পারম্যেণাত্মভাবিত্বাৎ পরমাত্মা প্রকীর্তিতঃ। ঐ—২।২৭

৬ সমস্তভূতবাসিত্বাদ্বাসুদেবঃ প্রকীর্তিতঃ। ঐ—২।২৮

তাহার ভিতরে সকল কার্যের সম্পাদন হইতেছে বলিয়াই তিনি প্রধান[১]। তিনি অক্ষয়হেতু অক্ষর, অবিকার্য-স্বভাবহেতু অচ্যুত, ব্যয়নাশন-হেতু অব্যয়, বৃহত্ত্বহেতু ব্রহ্ম, হিত-রমণীয়-গর্ভহেতু হিরণ্যগর্ভ, মঙ্গলকর বলিয়া তিনিই পাশুপতোক্ত শিব। অপ্রাকৃত-গুণস্পর্শ (অর্থাৎ প্রাকৃতগুণ যাঁহাকে স্পর্শ করে না) বলিয়াই তিনি নির্গুণ। এই নির্গুণ ব্রহ্মই যখন 'জগৎপ্রকৃতিভাব' গ্রহণ করেন তখন সেই বাসুদেব ব্রহ্মই 'শক্তি' বলিয়া পরিকীর্তিত হন[২]। জ্ঞানই বাসুদেবের প্রথম অপ্রাকৃত গুণ; জ্ঞানই পরমাত্মা ব্রহ্মের পরমরূপ[৩]; এই জ্ঞানের শক্তি, ঐশ্বর্য, বল, বীর্য এবং তেজ এই পঞ্চশক্তি; জ্ঞান ও তাহার এই পঞ্চশক্তি লইয়াই ব্রহ্মের যাড়্‌গুণ্য, এই জন্যই তিনি 'ভগবান্'।

শ্রুতিতে দেখিতে পাই যে, পরমপুরুষ প্রথমে সৎ-রূপে আত্ম-সমাহিত ছিলেন; সেই যে আত্ম-সমাহিত সৎ-রূপ ইহা তাঁহার সৎ-রূপও বটে, অসৎ-রূপও বটে; সৎ-রূপ এই জন্য যে ইহার ভিতরেই সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের সর্বপ্রকারের প্রকাশ-সম্ভাবনা নিহিত আছে; অসৎ-রূপ এইজন্য যে সৃষ্টিপ্রপঞ্চ-রূপে এখানে কিছুই নাই। এই পরমপুরুষ প্রথমে নিজকে ঈক্ষণ বা দর্শন করিলেন; এই ঈক্ষণ হইতেই সৃষ্টির ইচ্ছা। এখানেই দেখিতে পাই, স্বশক্তি-পরিবৃংহিত ব্রহ্মের ভিতরে প্রথমে আসিল 'বহু স্যাম্' এই সঙ্কল্প[৪]; এই সঙ্কল্পই হইল ঈক্ষণ; ইহাই স্বরূপদর্শন[৫]। ব্রহ্মের শক্তি বা গুণই হইল ব্রহ্মের স্বরূপ[৬]; ব্রহ্মের প্রথম সঙ্কল্প হইল এই স্ব-স্বরূপ বা স্ব-গুণ বা স্ব-শক্তির ঈক্ষণ। এই যে নিস্তরঙ্গ অর্ণবোপম বাসুদেবের ভিতরে প্রথম সঙ্কল্প-রূপ স্পন্দন ইহাই স্বরূপে-সুপ্তা শক্তির ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা প্রথম জাগরণ। এই যে শক্তিতত্ত্ব ইহা সর্বদাই অচিন্ত্য, কারণ শক্তিমান্ বা শক্তির আশ্রয়বস্তু হইতে এই শক্তিকে কখনই পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না। এই জন্য স্বরূপে শক্তিকে দেখাই যায় না, তাহাকে দেখিতে বা বুঝিতে হয় তাহার বাহিরের কার্যের ভিতর দিয়া। সূক্ষ্মাবস্থায় সকল

১ সর্বপ্রকৃতিশক্তিত্বাৎ সর্বপ্রকৃতিরীরিতঃ।
প্রধীয়মানকার্যত্বাৎ প্রধানঃ পরিগীয়তে ॥ অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা, ২।৩০

২ জগৎপ্রকৃতিভাবো যঃ সা শক্তিঃ পরিকীর্তিতা ॥ ঐ—২।৫৭

৩ ঐ—২।৫৬, ৬২

৪ ঐ—২।৭, ৬২

৫ যত্তৎপ্রেক্ষণমিত্যুক্তং দর্শনং তৎপ্রগীয়তে ॥ ঐ—২।৮

৬ স্বরূপং ব্রহ্মণস্তচ্চ গুণশ্চ পরিগীয়তে। ঐ—২।৫৭

শক্তি তাহাদের আশ্রয়-বস্তু বা ভাবেরই সম্পূর্ণ অনুগামিনী; সুতরাং সেই শক্তিকে ইহা বা ইহা না এইরূপ কিছুই বলা যায় না।[১] এইরূপ ভগবান্ পরব্রহ্মের যে অচিন্ত্য শক্তি তাহা স্বরূপতঃ ব্রহ্মের সহিত অপৃথক্স্থিতা; ব্রহ্মের সর্বভাবাভাবানুগা সর্বকার্যকরী এই শক্তি কিরণমালী চন্দ্র ও তাহার জ্যোৎস্নার মত, অথবা সূর্য ও তাহার রশ্মির মত, অথবা অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গের মত, অম্বুধি ও তাহার উর্মিমালার মত ব্রহ্মের সহিত অভিন্না।[২] বিষ্ণুস্বরূপে প্রলীন এই অপৃথক্-রূপা শক্তি বিষ্ণু-সঙ্কল্পকে অবলম্বন করিয়া স্পন্দনাত্মিকা-রূপে প্রথম যখন জাগ্রত হইলেন তখন হইতে তিনি যেন একটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেন; অর্থাৎ বিশ্ব-সৃষ্টিকার্যের যাহা কিছু ভার তাহা যেন বিষ্ণু তদাত্মিকা এই শক্তির উপরেই ন্যস্ত করিলেন, ইহা যেন শক্তিরই একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার; এই কারণে এই জগন্ময়ী শক্তিকে 'স্বাতন্ত্র্যরূপা' বা স্বতন্ত্র-শক্তি বলা হয়। তাঁহার সৃষ্টি-কার্যের ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্রা। অবশ্য পরে দেখিব, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তাই স্বেচ্ছায়ই তিনি বিষ্ণু-প্রীত্যর্থে সব কাজ করেন; ঘরের গৃহিণী যেমন স্বামীর প্রীত্যর্থে সব গৃহকর্ম করিলেও গৃহকর্মের ক্ষেত্রে তিনি যেন স্বতন্ত্রা। এই স্বতন্ত্র শক্তি তখন স্বেচ্ছায় 'উদিতানুদিতাকারা' 'নিমেষোন্মেষ-রূপিণী' হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করিতে থাকেন। নিরপেক্ষতাহেতু তিনি আনন্দা, কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন বলিয়া তিনি নিত্যা, আকারহীনা বলিয়া তিনি সর্বদাই পূর্ণা। তিনি একাধারে রিক্তা, একাধারে পূর্ণা। জগৎ-রূপে তিনি লক্ষ্যমাণা বলিয়া তিনি লক্ষ্মী, বৈষ্ণব ভাব

১ শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যা অপৃথক্স্থিতাঃ।
স্বরূপে নৈব দৃশ্যন্তে দৃশ্যন্তে কার্যতস্তু তাঃ॥
সূক্ষ্মাবস্থা হি সা তেষাং সর্বভাবানুগামিনী।
ইদন্তয়া বিধাতুং সা ন নিষেদ্ধুং চ শক্যতে॥ অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা, ৩।২-৩

২ সর্বভাবানুগা শক্তির্জ্যোৎস্নেব হিমদীধিতেঃ।
ভাবাভাবানুগা তস্য সর্বকার্যকরী বিভোঃ॥ ঐ—৩।৫; তুলনীয় ঐ—৬০।৩

জয়াখ্য-সংহিতায় বলা হইয়াছে:—
সূর্যস্য রশ্ময়ো যদ্বদূর্ময়শ্চাম্বুধেরিব।
সর্বৈশ্বর্যপ্রভাবেন কমলা শ্রীপতেস্তথা॥ ৬।৭৮

আরও:—
ততো ভগবতো বিষ্ণোর্ভাসা ভাস্করবিগ্রহাৎ॥
লক্ষ্ম্যাদির্নিঃসৃতা ধ্যায়েৎ স্ফুলিঙ্গনিচয়া যথা। জয়াখ্য-সংহিতা, ১৩।১০৫-০৬

আশ্রয় করেন বলিয়া তাঁহাকে 'শ্রী' বলা হয়; তাঁহাতে কোন কালভাব বা পুংভাব ব্যক্ত হয় না বলিয়া তিনি 'পদ্মা', পর্যাপ্ত সুখযোগের দ্বারা কামদান করেন বলিয়া তিনি 'কমলা'[১], বিষ্ণুর সামর্থ্যরূপা বলিয়া তিনি বিষ্ণুশক্তি; হরির ভাব পালন করেন বলিয়া তিনি বিষ্ণুপত্নী, নিজের ভিতরে নিখিল জগদাকারকে সঙ্কুচিত করেন বলিয়া কুণ্ডলিনী, মনোবাক্যাদির দ্বারা তিনি আহতা (গোচরীভূতা) হন না বলিয়া তিনি অনাহতা। মন্ত্র-স্বরূপে সূক্ষ্মরূপা হইয়াও তিনি 'পরমানন্দ-সংবোধা'; শুদ্ধসত্ত্বের আশ্রয় করেন বলিয়া তিনি গৌরী, বিশেষণহীনা বলিয়া তিনি অদিতি। নিজের চৈতন্যদ্বারা সমস্ত কিছুকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন বলিয়া তিনি জগৎ-প্রাণা, যাহারা গান করে (ভগবন্মহিমা) তাহাদের সকলকে ত্রাণ করেন বলিয়া তিনি 'গায়ত্রী', নিজের দ্বারাই জগৎকে প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্টি করেন বলিয়া তিনি প্রকৃতি, তিনি পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিমাণও করেন, আবার সমস্ত কিছুতেই ব্যাপ্ত হইয়াও থাকেন এই কারণে তিনি মাতা বলিয়া পরিকীর্তিতা।[২] সকলের মঙ্গল করেন বলিয়া তিনি শিবা, কাম্যমানত্ব হেতু তরুণী, সংসার হইতে তারণ করেন বলিয়া তারা; অশেষবিকার তাঁহার ভিতরেই শান্ত হয় বলিয়া তিনি শান্তা, মোহ অপনোদন করেন এবং মোহিত করেন এই দুই কারণেই তিনি 'মোহিনী'। হরির অধিষ্ঠান এবং ইষ্যমাণা বলিয়া তিনি ইড়া, রমণ করান (লীলাদ্বারা আনন্দ দান করান) বলিয়া তিনি রন্তী বা রতি, স্মরণ করান বলিয়া সরস্বতী, অবিচ্ছিন্ন প্রভা হেতু 'মহাভাসা'। সর্বাঙ্গসম্পূর্ণা ভাবাভাবানুগামিনী বিষ্ণুর এই দিব্যা শক্তিই নারায়ণী।[৩]

ভগবান্ বাসুদেবের যে প্রথম স্পন্দনাত্মক সৃষ্টি-সঙ্কল্প ইহাই তাঁহার সুদর্শন রূপ।[৪] এই সুদর্শন-তত্ত্ব হইতেই শক্তিতত্ত্বের অভিব্যক্তি। মূলতত্ত্বদৃষ্টিতে এই শক্তির কোন পৃথক্ সত্তা নাই বলিয়া শক্তিতত্ত্ব যেন একটা উৎপ্রেক্ষা মাত্র; এই

১ জগত্তয়া লক্ষ্যমাণা সা লক্ষ্মীরিতি গীয়তে।
শ্রয়ন্তী বৈষ্ণবং ভাবং সা শ্রীরিতি নিগদ্যতে॥
অব্যক্তকালপুংভাবাৎ সা পদ্মা পদ্মমালিনী।
কামদানাচ্চ কমলা পর্যাপ্তসুখযোগতঃ॥ অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা, ৩।৯-১০

২ প্রকুর্বন্তী জগৎ স্বেন প্রকৃতিঃ পরিগীয়তে॥
মিমীতে চ ততা চেতি সা মাতা পরিকীর্তিতা। ঐ—৩।১৬-১৭

৩ ঐ—৩।২৪

৪ সোঽহং সুদর্শনং নাম সঙ্কল্পঃ স্পন্দনাত্মকঃ। ঐ—৩।৩৯

জন্য সুদর্শনতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত শক্তিকে বলা হইয়াছে উৎপ্রেক্ষা-রূপিণী।[১] আসলে শক্তি হইল পরমপুরুষ বাসুদেবেরই 'পূর্ণাহন্তা' রূপ; শক্তি ও শক্তিমান্ তাই সর্বদাই ধর্মধর্মিত্বভাবে সংযুক্ত।[২] এই জন্য বলা হইয়াছে যে ভগবানের এই সর্বভাবনা 'অহংতা'-রূপিণী শক্তি 'অপৃথক্‌চারিণী' আনন্দময়ী পরা সত্তা।[৩] অন্যত্র দেখি,—"যিনি এই পরমাত্মা সনাতন নারায়ণ দেব তাঁহারই হইল এই 'অহং-ভাবাত্মিকা শক্তি', (এবং এইজন্যই) এই শক্তি হইল তদ্ধর্মধর্মিণী। এই এক এবং অদ্বয়তত্ত্বই জগৎ-সৃষ্টির জন্য ভেদ্যভেদক-রূপে পৃথক্ পৃথক্ উদিত হইয়াছে। শক্তিব্যতীত শক্তিমান্ কখনও কারণরূপে অবস্থান করে না, আবার শক্তিমান্ ব্যতীত একা শক্তি কখনও অবস্থান করে না।"[৪] ব্রহ্মভাবময়ী বলিয়াই শক্তিকে বৈষ্ণবী বলা হয়, নারায়ণই পরব্রহ্ম, এইজন্যই শক্তি নারায়ণী।[৫]

মহাপ্রলয়াবস্থায় পরব্রহ্ম নারায়ণ 'প্রসুপ্তাখিলকার্য' (প্রসুপ্ত রহিয়াছে অখিল কার্য যাহাতে) রূপে এবং 'সর্বাবাস'রূপে বিরাজ করেন। তখন ষাড়্‌গুণ্য তাঁহার ভিতরে পূর্ণরূপে স্তিমিত হইয়া থাকে, এবং তিনি অবস্থান করেন 'অসমীরাম্বরোপম' হইয়া। তখন তাঁহার ভিতরে তাঁহার শক্তি থাকে 'স্তৈমিত্য-রূপা' এবং 'শূন্যত্ব-রূপিণী'।[৬] এই স্তৈমিত্যরূপা শক্তিই পরব্রহ্মের আত্মভূতা শক্তি। এই স্তৈমিত্যরূপা আত্মভূতা শক্তির সৃষ্ট্যর্থে যে প্রথম উন্মেষ, শক্তির সেই রূপই লক্ষ্মীরূপ। এই লক্ষ্মীময় সমুন্মেষ দুই প্রকারের, ক্রিয়া এবং ভূতি। ভূতি

---

১ উৎপ্রেক্ষারূপিণী শক্তিঃ সুদর্শনপরাহ্বয়া ॥ অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা, ৬০।৯

২ সর্বভাবাত্মিকা লক্ষ্মীরহংতা পারমাত্মিকা।
তদ্ধর্মধর্মিণী দেবী ভূত্বা সর্বমিদং জগৎ ॥ ঐ—৩।৪৩

তুঃ— এষ চৈষা চ শাস্ত্রেষু ধর্মধর্মিত্বভাবতঃ ॥ ঐ—৩।২৫

৩ যা সা ভগবতঃ শক্তিরহংতা সর্বভাবগা ॥
অপৃথক্‌চারিণী সত্তা মহানন্দময়ী পরা। ঐ—৪।৭৩

৪ ঐ—৬।১-৩। জয়াখ্য-সংহিতায় আছে—
যা পরা বৈষ্ণবী শক্তিরভিন্না পরমাত্মনঃ ॥ ১৪।৩৪

তুঃ—জীবগোস্বামীর ভগবৎ-সন্দর্ভোদ্ধৃত শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্র—
পরমাত্মা হরির্দেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা।
শ্রীর্দেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা ॥

৫ অহির্বুধ্ন্য, ৪।৭৭

৬ ঐ—৫।২-৩; তুঃ-ঐ—৫১।৪৯-৫০

হইল শক্তির জগৎ-প্রপঞ্চ রূপ, আর শক্তির ক্রিয়াখ্য যে উন্মেষ তাহাই হইল ভূতিপ্রবর্তক। এই ক্রিয়াশক্তিই হইল বিষ্ণুর সঙ্কল্প, ইহাই হইল বিশ্বের প্রাণরূপা শক্তি।[১] এই প্রাণরূপা ক্রিয়া-শক্তি এবং ভূতি-শক্তি—ইহারা যেন সূত্র এবং মণি, ক্রিয়া-শক্তিই ভূতি-শক্তিকে বিধৃত করিয়া আছে ; একটিকে সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ এবং অপরটিকে সৃষ্টির উপাদান-কারণ বলা যাইতে পারে। এই ভূতি-শক্তি এবং ক্রিয়া-শক্তিকে বিষ্ণুর ভাব্যভাবকরূপও বলা যাইতে পারে। ভাবক হইল সুদর্শনাত্মক বিষ্ণু-সঙ্কল্প ; ইহাই ক্রিয়াশক্তি, ইহাই বিষ্ণুর সামর্থ্য, যোগ, মহাতেজ বা মায়াযোগ। ভাব্য নামে শক্তির যে উন্মেষ তাহাই ভূতি-শক্তি, তাহা শুদ্ধ্য-শুদ্ধিময়ী। অগ্নির যে জ্বালা তাহা বিষ্ণুর সঙ্কল্পের দ্বারাই বিস্তার লাভ করে, তাই ভাব্য অগ্নি হইল ভূতি-শক্তি আর অগ্নির জ্বালা-প্রবর্তক যে সর্বব্যাপী সঙ্কল্পাত্মক শক্তি তাহাই ক্রিয়া-শক্তি।[২] এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করিতে পারি, বিষ্ণুর পূর্ণাহংতা রূপে বিষ্ণুর স্বরূপভূতা বা বিষ্ণুলীনা যে শক্তি তাহাকে বলা হয় বিষ্ণুর সমবায়িনী-শক্তি[৩] ; বিষ্ণুর জগৎ-প্রপঞ্চকারিণী যে শক্তি তাহা হইল ত্রিগুণাত্মিকা মায়া-শক্তি ; ইহাই পরিণামিনী প্রকৃতি।[৪] অহির্বুধ্ন্য-সংহিতায় অন্যত্র অবশ্য দেখি, বিষ্ণুর প্রধানা দুই শক্তি হইল ইচ্ছাত্মিকা শক্তি ও ক্রিয়াত্মিকা শক্তি। ইচ্ছাত্মিকা শক্তি হইল লক্ষ্মী এবং ক্রিয়াত্মিকা বা সঙ্কল্পরূপা শক্তি হইল সুদর্শন।[৫]

শক্তিদ্বারা বিষ্ণুর যে সৃষ্টি তাহা দুই প্রকারের, শুদ্ধসৃষ্টি এবং শুদ্ধেতর সৃষ্টি। শুদ্ধসৃষ্টি হইল বিষ্ণুর 'গুণোন্মেষদশা' ; অর্থাৎ মহাপ্রলয়াবস্থিত ব্রহ্মের নিস্তরঙ্গ সত্তার ভিতরে যে গুণসমূহের প্রথম উন্মেষ। এই গুণোন্মেষের দ্বারাই হইল পূর্ণাহংতা রূপে ষড়্‌গুণময় পূর্ণ ভগবত্তার স্বানুভূতি। ভগবানের এই সকল গুণই হইল অপ্রাকৃত। শুদ্ধেতরা সৃষ্টি হইল মন্বাদি-অবলম্বনে প্রজা-সৃষ্টি। শুদ্ধসৃষ্টির ভিতরে চারিটি ক্রম-পরিণতির অবস্থা বা স্তর লক্ষ্য করিতে পারা যায় ; ইহাই হইল পাঞ্চরাত্রের প্রসিদ্ধ চতুর্ব্যূহ-তত্ত্ব। এক একটি ব্যূহকে আমরা বলিতে পারি ভগবানের এক একটি প্রকাশ-স্তর ; এই প্রকাশ প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়,

১ অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা—৩।২৮ প্রভৃতি ; ঐ—৮।২৯-৩২

২ ঐ—১৬।৩১-৩৫

৩ যা সা শক্তির্জগদ্ধাতুঃ কথিতা সমবায়িনী ॥ ঐ—৮।২৯

৪ ঐ—৭ম অধ্যায়।

৫ ৩৬।৫৩-৫৭

দ্বিতীয়টি হইতে তৃতীয়,তৃতীয়টি হইতে চতুর্থ ; ইহা যেন অনেকটা একটি প্রদীপ হইতে আর একটি এবং দ্বিতীয়টি হইতে আর একটি জ্বলিবার মত।[১]

চতুর্ব্যূহের যথাক্রমে নাম হইল,—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ।[২] বাসুদেব ব্যূহ হইল পরব্রহ্ম বিষ্ণুর আত্ম-সংবৃত স্তিমিত স্বরূপের ভিতরে প্রথম গুণোন্মেষের অবস্থা, ইহা সঙ্কল্পকল্পিত বিষ্ণুর অব্যক্তাবস্থা হইতে প্রথম ব্যক্তিলক্ষণ। পরতত্ত্ব হইলেন পরবাসুদেব ; সেই পরবাসুদেব হইতেই ব্যূহ-বাসুদেবের উৎপত্তি। পরবাসুদেবই এক অংশে ব্যূহবাসুদেব রূপে আবির্ভূত হন, অন্য অংশে তিনি নারায়ণ-স্বরূপে অবস্থান করেন।[৩] এই বাসুদেব-তত্ত্বই বিষ্ণুশক্তির প্রথমাবস্থা, আর এই বিষ্ণুশক্তিই প্রকৃষ্টরূপে সব করেন বলিয়া তিনিই বিশ্বপ্রকৃতি বলিয়া খ্যাতা। সুতরাং ভগবান্ বাসুদেবই পরমা প্রকৃতি। তবে এই প্রকৃতি বিশুদ্ধসত্ত্বের ষড়্‌গুণময়ী প্রকৃতি ; সত্ত্ব, রজ, তম এই অবিশুদ্ধ-গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি নহে। এই স্তরে গুণত্রয়ের মোটে উৎপত্তিই নাই। শক্তি ও শক্তিমানের প্রথম ভেদাবস্থাকেই বাসুদেব-তত্ত্ব বলা যাইতে পারে।[৪] সর্বশক্তিমান্ বাসুদেব সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া নিজের ভিতরেই নিজেকে ভাগ করেন ; এই আপনাতে আপনি বিভক্ত রূপই হইলেন সঙ্কর্ষণ।[৫] বাসুদেব হইতে এই

১ পাদ্ম-তন্ত্র, ১।২।২১ ; স্‌চ্‌হ্রাডারের প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত।

২ ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রথম ব্যূহবাসুদেব হইলেন বসুদেব-সুত শ্রীকৃষ্ণ; সঙ্কর্ষণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই বলরাম বা বলদেব, প্রদ্যুম্ন হইলেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এবং অনিরুদ্ধ পৌত্র।

৩ স্‌চ্‌হ্রাডারের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ৫২ পৃঃ।

৪ তেষাং যুগপদুন্মেষঃ স্তৈমিত্যবিরহাত্মকঃ।
সঙ্কল্পকল্পিতো বিষ্ণোর্যঃ স তদ্ব্যক্তিলক্ষণঃ॥
ভগবান্ বাসুদেবঃ স পরমা প্রকৃতিশ্চ সা।
শক্তির্যা ব্যাপিনো বিষ্ণোঃ সা জগৎপ্রকৃতিঃ পরা॥
শক্তেঃ শক্তিমতো ভেদাদ্বাসুদেব ইতীর্যতে। অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা, ৫।২৭-২৯

অহির্বুধ্ন্য-সংহিতার একস্থানে আবার এই বাসুদেবকেই পরব্রহ্মের অনির্দেশ্য অব্যক্তাবস্থা বলা হইয়াছে :—

নাসদাসীত্তদানীং হি ন সদাসীত্তদা মুনে॥
ভাবাভাবৌ বিলোপ্যান্তর্বিচিত্রবিভবোদয়ৌ।
অনির্দেশ্যং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবোঽবতিষ্ঠতে॥
সা রাত্রিস্তৎপরং ব্রহ্ম তদব্যক্তমুদাহৃতম্। ইত্যাদি। ৪।৬৮-৭০

৫ ঐ—৫।২৯-৩০

সঙ্কর্ষণের প্রকাশকে একটি চমৎকার দৃষ্টান্তের দ্বারা বোঝান হইয়াছে। ইহা এমন একটি অবস্থা, এখানে সূর্য যেন স্পষ্ট উদিত হয় নাই, শুধু উদয়শৈলস্থ সূর্যের প্রভা দিঙ্মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; ভগবান্ বাসুদেব এখন পর্যন্ত স্পষ্ট সৃষ্টিরূপে নিজেকে ছড়াইয়া দেন নাই, অথচ এই বহ্বাত্মিকা সৃষ্টির রশ্মিজাল যেন তাঁহার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ইহাই হইল সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব।[১] সঙ্কর্ষণ ব্যূহেই শুদ্ধসৃষ্টি হইতে ক্রমান্বয়ে অশুদ্ধ সৃষ্টির অস্পষ্ট প্রকাশ। সৃষ্টি এখন পর্যন্ত যেন স্পষ্ট কোন রূপ পরিগ্রহ করে নাই, সকলই একটা ভ্রূণাবস্থায়। এখন পর্যন্ত চিতে চিতে বা অচিতে অচিতে বা চিদচিতে কোনও ভেদ নাই। চিদচিৎখচিত শুদ্ধাশুদ্ধ অশেষ বিশ্বকে যেন এই অচ্যুত সঙ্কর্ষণ জ্ঞানময় নিজদেহে তিলকালকের ন্যায় ধারণ করিয়া আছেন[২]; অর্থাৎ তিলকালক যেরূপ পুরুষদেহে প্রচ্ছন্ন থাকে, চিদচিৎখচিত শুদ্ধাশুদ্ধ বিশ্বও সেইরূপ সঙ্কর্ষণের জ্ঞানময় দেহের ভিতরে প্রচ্ছন্ন আছে।

সঙ্কর্ষণ ব্যূহ হইতে প্রদ্যুম্ন ব্যূহের উৎপত্তি। এই ব্যূহে আসিয়া পুরুষ হইতে প্রকৃতি ভাগ হইল; অর্থাৎ এই স্তরেই সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতির উদ্ভব। এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির উদ্ভবের পর পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে যে সৃষ্টি-প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে মোটামুটি ভাবে সাংখ্যদর্শনকেই অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি। অনিরুদ্ধ যেন প্রদ্যুম্নের নিকট হইতেই সৃষ্টিভার গ্রহণ করিয়া প্রদ্যুম্নের আরব্ধ কার্যকেই সুসম্পন্ন করেন। কালের সাহায্যে তিনি জড় ও চিতের সৃষ্টি করিয়া জগৎব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিরূপে বিরাজ করেন।

বাসুদেব ষড়্‌গুণান্বিত ভগবান্, সঙ্কর্ষণে এই ষড়্‌গুণের জ্ঞান ও বল-গুণের প্রকাশ, প্রদ্যুম্নে ঐশ্বর্য ও বীর্যের প্রকাশ, অনিরুদ্ধে শক্তি ও তেজোগুণের প্রকাশ, আবার প্রদ্যুম্নকে সৃষ্টি, অনিরুদ্ধকে স্থিতি এবং সঙ্কর্ষণকে লয়ের দেবতা বলা হইয়া থাকে।[৩] মহাসনৎকুমার-সংহিতায় বলা হইয়াছে, বাসুদেব তাঁহার মন হইতে শ্বেতবর্ণা শান্তিদেবীকে এবং সঙ্কর্ষণরূপ শিবকে সৃষ্টি করেন; শিবের

১ ভানাবুদয়শৈলস্থে প্রভা যদ্বদ্বিজৃম্ভতে ॥
উদয়স্থে তথা দেবে প্রভা সঙ্কর্ষণাত্মিকা। অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা, ৫।৩০-৩১

২ ঐ—৪।৬৪-৬৫

৩ ইহাই বিষক্সেন-সংহিতার মত। লক্ষ্মীতন্ত্র-মতে অনিরুদ্ধ সৃষ্টি, প্রদ্যুম্ন স্থিতি এবং সঙ্কর্ষণ লয়ের দেবতা।—সৃচন্থাডারের প্রাগুক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বামাঙ্গ হইতে শ্রীদেবীর উৎপত্তি, তাঁহারই পুত্র হইল প্রদ্যুম্ন, তিনিই ব্রহ্মা। ব্রহ্মা আবার পীত-সরস্বতীকে এবং পুরুষোত্তমরূপ অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি করেন। অনিরুদ্ধের শক্তি হইল কৃষ্ণরতি, তিনিই ত্রিধা মায়াকোষ।[১] আবার বলা হইয়াছে, সঙ্কর্ষণ ভগবৎপ্রাপ্তিসাধন ঐকান্তিক মার্গ প্রকাশ করেন, প্রদ্যুম্ন ভগবৎ প্রাপ্তির বর্ত্মরূপ শাস্ত্রার্থভাবে অবস্থান করেন এবং অনিরুদ্ধ ভগবৎপ্রাপ্তিলক্ষণ শাস্ত্রার্থের ফল সাধকদিগকে প্রাপ্ত করান।[২] দার্শনিক দৃষ্টিতে আবার এই সঙ্কর্ষণ জীবতত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, প্রদ্যুম্ন মন বা বুদ্ধি-তত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, অনিরুদ্ধ অহঙ্কারতত্ত্বের দেবতা।

শক্তিতন্ত্রাদিতে বিশ্বব্যাপিনী এই আদ্যাশক্তিকে 'যোনি'-রূপা বলা হইয়া থাকে। পঞ্চরাত্রেও পরমাত্ম-ধর্মধর্মি-লক্ষ্মীরূপা শক্তিকে জগতের 'যোনি' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[৩] এই ব্রহ্মলীনা বা পরমাত্মলীনা অনপায়িনী দেবী 'তারা' নামে খ্যাতা, 'হ্রীং' বলিয়াও কীর্তিতা।[৪] অশেষ দুরিত হরণ করেন, সুরাসুরগণ কর্তৃক স্তুত হন (ঈড্যতে), অখিলমানের দ্বারা তাঁহার পরিমাণ নিরূপণ করা হয় (মীয়তে), এই 'হরতি'র 'হ','ঈড্যতে'র 'ঈ' এবং 'মীয়তে'র 'ম' একত্রিত হইয়া 'হ্রীং' বীজ উৎপন্ন হয়।[৫] আবার বিষ্ণুর ভূতি-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তির ভিতরে ক্রিয়া-শক্তির একটি মন্ত্রময়ীস্থিতি আছে। এই ক্রিয়া-শক্তি যখন জাগ্রতা হয় তখন তাহা নাদরূপতা গ্রহণ করে। এই পরম নাদ যেন দীর্ঘঘণ্টাস্বনের মত ; পরমযোগীরাই শুধু এই পরমনাদরূপা শক্তিকে সাক্ষাৎ করিতে পারেন। সমুদ্রের ভিতরে বুদ্বুদের ন্যায় এই নাদ কচিৎ উন্মেষ লাভ করে, উন্মেষহীন অবস্থায় ইহাকে যোগিগণ বিন্দু বলিয়া থাকেন। এই বিন্দু নামনামিস্বরূপে দ্বিধা ভিন্ন হয় ; ইহার ভিতরে নামের উদয়কে অবলম্বন করিয়া শব্দব্রহ্ম প্রবর্তিত হয়, আর নামীর উদয়কে অবলম্বন করিয়া পূর্বোদ্দিষ্টা ভূতির প্রবর্তন হয়। নাম আর কিছুই নহে, বিন্দুময়ী শক্তিই স্বেচ্ছায় নামতা গ্রহণ করেন। সেই নাম অবর্ণ হইয়াও স্বরব্যঞ্জন-ভেদে দ্বিধা অবস্থান করে। শব্দসৃষ্টিময়ী 'একানেকবিচিত্রার্থা' 'নানাবর্ণবিকারিণী' সাক্ষাৎ সোমরূপা এই যে শক্তি ইহাই লক্ষ্মীর শব্দময়ী তনু, ইহাই তাঁহার

---

১ স্চ্ট্রাডারের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ৩৬ পৃষ্ঠা।

২ অহির্বুধ্ন্য, ৫।২২-২৪

৩ যা চ সা জগতাং যোনি র্লক্ষ্মী স্তদ্ধর্মধর্মিণী। ঐ—৫১।৭

৪ ঐ—৫১।৫৪-৬১

৫ ঐ—৫১।৫৫

'পরা'রূপ। লক্ষ্মীর এই নাদরূপিণী 'পরা'শক্তি কুণ্ডলিনী রূপে, শান্তা এবং নিরঞ্জনারূপে মূলাধার-পদ্মে বাস করে। সেখান হইতে সে নটীর ন্যায় চঞ্চলা হইয়া উর্ধ্বগামিনী হয়[১]; এই নাদরূপা শক্তি যখন দৃষ্টিদৃশ্যাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া শব্দার্থত্বের বিবর্তিনী রূপে নাভি-পদ্মে অবস্থান করে তখনই ইহা 'পশ্যন্তী' নাম ধারণ করে। এই 'পশ্যন্তী'ই আবার ভৃঙ্গীর ন্যায় ধ্বনি করিতে করিতে হৃৎপদ্মে প্রবেশ করিয়া বিস্তৃতি লাভ করে।[২] তখন এই শক্তি বাচ্যবাচকভাবে লোলীভূতা হইয়া ক্রিয়াময়ী হইয়া উঠে। ইহাই বিভিন্ন তন্ত্র এবং স্ফোটবাদোক্ত 'মধ্যমা' রূপ। ইহার পর এই শক্তি কণ্ঠে প্রবেশ করিয়া কণ্ঠস্পর্শে স্পষ্ট ব্যঞ্জনাদি রূপে প্রকাশিত হয়। ইহাই নাদের রূপ—তন্ত্র এবং স্ফোটবাদোক্ত 'বৈখরী'রূপ। এইরূপে স্বর-ব্যঞ্জনাদি সকল বর্ণই বিষ্ণুশক্তি হইতে সমুৎপন্ন, এবং এইজন্য বর্ণসকলকে বিষ্ণুশক্তিময় এবং বিষ্ণুসঙ্কল্পজৃম্ভিত বলিয়া বলা হয়।[৩] বিষ্ণুর এই নাদরূপা শক্তি সোমসূর্যাগ্নিকা, অথবা বলা যায় ইহা বিষ্ণুর সোমসূর্যাগ্নিভূষণা, ত্রৈলোক্যৈশ্বর্যদা উজ্জ্বলা মায়াতনু।[৪] এই সোম-সূর্য হইতেই সকল স্বর-ব্যঞ্জনাদি বর্ণমালার উদ্ভব। শাক্ততন্ত্রাদিতে যেরূপ এই বর্ণাত্মিকা স্বর-ব্যঞ্জনরূপা মাতৃকাকে দেহের সর্বঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ন্যস্ত করিয়া অঙ্গ-ন্যাস কর-ন্যাসের দ্বারা সর্বতোভাবে শক্তিময়ী হইয়া যাইবার বিধান রহিয়াছে এই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বহুক্ষেত্রেও এই একই বিধান দেখিতে পাই।

পাঞ্চরাত্রে বর্ণিত এই শক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি মৌলিক প্রশ্ন উঠিতে পারে, শক্তি ও শক্তিমানের সম্পূর্ণ অভেদত্ব সত্ত্বেও আপনার ভিতরেই যেন আপনি একটা ভেদ সৃষ্টি করিয়া এই যে বিশ্ব-সৃষ্টি, ইহা আদৌ কেন? ইহার একমাত্র উত্তর হইল, ইহাই বিষ্ণুর লীলা। এইখানেই পাঞ্চরাত্রে লীলাবাদের প্রবর্তন। মহাপ্রলয়ের সময়ে এই সর্বশক্তিময়ী বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার স্বামীর অঙ্গে—পুরুষ-দেহেই লীনা ছিলেন; পরব্রহ্ম বিষ্ণু তখন ছিলেন একেবারেই একা; তাই তিনি রমণ করিতে পারেন নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যেমন দেখি, ব্রহ্ম একা রমণ করিতে না পারিয়া নিজেকেই স্ত্রী-পুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন, এখানেও

১ নটীব কুণ্ডলীশক্তিরাদ্যা বিষ্ণোর্বিজৃম্ভতে। ঐ—১৬।৫৫

২ ভৃঙ্গীব নিনদন্তী সা হৃদব্জে যাতি বিস্তৃতিম্॥ ঐ—১৬।৬১

৩ বিষ্ণুশক্তিময়া বর্ণা বিষ্ণু-সঙ্কল্পজৃম্ভিতাঃ। ঐ—১৭।৩

৪ ঐ—১৮।৪

তাহাই দেখি। একা রমণ করিতে না পারিয়া সেই একাকী সনাতন বিষ্ণুও লীলার জন্য এই সকল সৃষ্টি করিলেন। সেই সর্বগ দেব সকলের নাম রূপ প্রভৃতি পূর্বে সৃষ্টি করিলেন, এবং তারপরে লীলার উপকরণভূতা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াসংজ্ঞা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিতই রমণ করিতে লাগিলেন।[১] কল্পাবসানে লীলারসসমুৎসুক হইয়াই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতে মন করিলেন।[২] এই ক্রীড়ারসেই ব্যক্ত সব কিছু আনন্দ লাভ করে, ঈশ্বরও এই সৃষ্টিরূপা দেবী দ্বারাই নিজে আনন্দ লাভ করিতেছেন। ঈশ্বরের যে হৃষীকেশত্ব, তাঁহার যে দেবত্ব—ইহার সকলই সেই লীলাদ্বারা সাধিত হইয়াছে।[৩]

শক্তির প্রকার-ভেদ লইয়া বিভিন্ন পাঞ্চরাত্র গ্রন্থে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। আমরা অহির্বুধ্ন্য-সংহিতার মতে মুখ্যতঃ শক্তির দুই ভাগ দেখিয়াছি, ক্রিয়াশক্তি ও ভূতিশক্তি (বা ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি)। সাত্বত-সংহিতায় বিষ্ণুর মুখ্য দুই শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই, ভোক্তৃশক্তি ও কর্তৃশক্তি; এই ভোক্তৃশক্তিকে লক্ষ্মী ও কর্তৃশক্তিকে পুষ্টি বলা হইয়া থাকে।[৪] এই সংহিতার অন্যত্র শক্তিকে চারি, ছয়, অষ্ট এবং দ্বাদশ শক্তিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; যথা,—শ্রী, কীর্তি, জয়া ও মায়া এই চারি; শুদ্ধি, নিরঞ্জনা, নিত্যা, জ্ঞানমুক্তি (?), প্রকৃতি ও সুন্দরী এই ছয়; লক্ষ্মী, শব্দনিধি, সর্বকামদা, প্রীতিবর্ধিনী, যশস্করী, শান্তিদা, তুষ্টিদা ও পুষ্টিদা এই অষ্ট[৫]; লক্ষ্মী, পুষ্টি, দয়া, নিদ্রা, ক্ষমা, কান্তি, সরস্বতী, ধৃতি, মৈত্রী, রতি, তুষ্টি, মতি (=মেধা)—এই দ্বাদশ। পদ্মতন্ত্রে শ্রী ও ভূমি এই দুই শক্তির উল্লেখ

১ একাকী স তদা নৈব রমতে স্ম সনাতনঃ।
স লীলার্থং পুনশ্চেদমসৃজৎ পুষ্করেক্ষণঃ॥
স পূর্বং নামরূপাণি চক্রে সর্বস্য সর্বগঃ।
লীলোপকরণাং দেবঃ প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকাম্॥
মায়াসংজ্ঞাং পুনঃ সৃষ্ট্বা তয়া রেমে জনার্দনঃ।

২ পুরা কল্পাবসানে তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
জগৎ স্রষ্টুং মনশ্চক্রে লীলারসসমুৎসুকঃ॥ ঐ—৪১।৪

৩ ক্রীড়য়া হৃষ্যতি ব্যক্তমীশস্তৎসৃষ্টিরূপয়া।
হৃষীকেশত্বমীশস্য দেবত্বং চাস্য তৎ স্ফুটম্॥ ঐ—৫৩।৪৪

৪ তস্য শক্তিদ্বয়ং তাদৃগমিশ্রং ভিন্নলক্ষণম্।
ভোক্তৃশক্তিঃ স্মৃতা লক্ষ্মীঃ পুষ্টির্বৈ কর্তৃসংজ্ঞিতা॥
সাত্বত-সংহিতা, কঞ্জিবেরম্ সংস্করণ, ১৩।৪৯

৫ ঐ—১২।৭-১২

পাই।[১] পরমেশ্বর-সংহিতায়ও শ্রী ও ভূমি এই দুই শক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানে ভূমিশক্তিই পুষ্টিশক্তি। বিহগেন্দ্র-সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ও পরাশর-সংহিতার অষ্টম হইতে দশম অধ্যায়ে তিন শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়,—শ্রী, ভূ (বা ভূমি) ও লীলা। বিহগেন্দ্র-সংহিতায় কীর্তি, শ্রী, বিজয়া, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা এই অষ্ট শক্তির উল্লেখ পাই।[২] জয়াখ্য-সংহিতায় লক্ষ্মী, কীর্তি, জয়া, মায়া এই চারি দেবীর উল্লেখ পাই।[৩] মহা-সংহিতায় পরমাত্মার শ্রী, ভূ ও দুর্গা এই তিন শক্তির উল্লেখ আছে।[৪]

১ স্‌চ্‌ত্রাডারের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫৪।

অহির্বুধ্ন্য-সংহিতায়ও পৃথিবীকে বৈষ্ণবী-শক্তি বলা হইয়াছে।

পৃথিবী বৈষ্ণবী শক্তিঃ প্রথমানা স্বতেজসা। ৫৮।৫৪

২ স্‌চ্‌ত্রাডারের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫৫।

৩ ৬।৭৭

৪ জীবগোস্বামীর ভগবৎ-সন্দর্ভে উদ্ধৃত।

চতুর্থ অধ্যায়

পাঞ্চরাত্রে বর্ণিত শক্তিতত্ত্ব ও কাশ্মীর-শৈবদর্শনে ব্যাখ্যাত শক্তিতত্ত্বের মিল

আমরা উপরে পাঞ্চরাত্রে বর্ণিত শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি যাহা আলোচনা করিলাম ইহার সহিত কাশ্মীর-শৈবদর্শনে বর্ণিত শক্তিতত্ত্বের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। পণ্ডিত স্‌চ্‌রাডার অবশ্য মনে করেন—প্রাচীন পাঞ্চরাত্র-সংহিতাগুলি অধিকাংশই কাশ্মীরে রচিত, অন্ততঃ অহির্বুধ্ন্য-সংহিতাখানি কাশ্মীরে রচিত হইয়াছিল। স্‌চ্‌রাডারের এই মত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক, শক্তিবাদের দিক হইতে পাঞ্চরাত্রের সহিত কাশ্মীর-শৈবদর্শনের যোগ যে অতি ঘনিষ্ঠ সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। কাশ্মীর-শৈবদর্শনের একজন প্রধান আচার্য উৎপল-বৈষ্ণব বহু প্রসঙ্গে এই পাঞ্চরাত্র মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। মোটামুটিভাবে প্রসিদ্ধ সংহিতোক্ত পাঞ্চরাত্র মতবাদ যে কাশ্মীর-শৈবদর্শন (অন্ততঃ কাশ্মীর-শৈবধর্মের প্রচলিত প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলিতে প্রতিষ্ঠিত শৈবদর্শন) হইতে প্রাচীনতর এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ কম।[১] অবশ্য নবম ও দশম শতকে আলোচিত ও প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীর-শৈবধর্মের মূল রহিয়াছে প্রাচীনতর (?) কয়েকখানি তন্ত্র-গ্রন্থে। মোটামুটিভাবে আমরা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি, পাঞ্চরাত্র শক্তিতত্ত্ব এবং কাশ্মীর-শৈবধর্মের শক্তিতত্ত্ব একই ধারায় আবর্তিত হইয়াছে।

অতি প্রাসঙ্গিকভাবেই আমরা তাহা হইলে একটি সাধারণ সত্য এখানে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি; তাহা এই যে ভারতীয় শক্তিবাদ বলিয়া আমরা যে মতবাদটিকে গ্রহণ করি তাহা মূলতঃ বা প্রধানতঃ কতগুলি শৈব বা শাক্ত তন্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই যে গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের এই সাধারণ সংস্কার ঠিক নহে। তন্ত্র-শাস্ত্রের উদ্ভব এবং প্রসার মুখ্যতঃ কাশ্মীরে এবং বাঙলাদেশে। বাঙলাদেশে যে-সকল তন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে তাহার কোন তন্ত্রেরই কোন রচনাকাল নির্দেশ

১ সাধারণভাবে অহির্বুধ্ন্য, জয়াখ্য, পরমানন্দ, বিষক্‌সেন প্রভৃতি সংহিতাগুলির রচনাকালের শেষ সীমা ধরা হয় অষ্টম শতাব্দী; কাশ্মীর-শৈবদর্শনের প্রথম আচার্য শ্রীকণ্ঠকে নবম শতকের প্রথম ভাগের লোক বলিয়া গ্রহণ করা হয়।—শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত Kashmir Shaivism গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

করিবার উপায় নাই। তবে একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে ইহার কোন তন্ত্রই দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। নবম দশম শতাব্দীতে প্রচারিত কাশ্মীর-শৈবদর্শনের ভিতরে কয়েকখানি প্রাচীন তন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] এই তন্ত্রগুলি দশম বা নবম শতাব্দী হইতে প্রাচীনতর এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে, কিন্তু পাঞ্চরাত্রের প্রসিদ্ধ সংহিতাগুলি হইতে প্রাচীনতর না হইতে পারে। এইসকল তথ্য বিচার করিয়া আমাদের মনে হয়, একটি দার্শনিক মতবাদরূপে ভারতীয় শক্তিবাদের যে বিকাশ, কোন বিশেষ ধর্ম বা শাস্ত্র তাহার বাহন ছিল না; এই শক্তিবাদের বিকাশ শৈবধর্ম বা শৈবশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ, শাক্তধর্ম বা শাক্তশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ, প্রথমাবধিই বৈষ্ণবধর্ম বা বৈষ্ণবশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াও সেইভাবেই হইয়াছে। সুতরাং শাক্ত-শৈব ধর্মের প্রভাবেই এই শক্তিবাদ বৈষ্ণব ধর্মে গৃহীত হইয়াছে এই ধারণা অনেকখানি অমূলক বলিয়া মনে হয়; একটি ভারতীয় বিশ্বাস ও চিন্তার ধারা প্রায় সমভাবেই সব ধর্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। যেখানে এই শক্তিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেখানে শাক্তধর্ম বা শাক্তশাস্ত্রের উদ্ভব, যেখানে শক্তিমান্ শিব বা বিষ্ণু প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেখানে শৈব বা বৈষ্ণব মতের উদ্ভব এবং প্রসার। আমরা উপরে পাঞ্চরাত্রে আলোচিত শক্তিবাদের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া আসিয়াছি তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, পরবর্তী (অথবা সমসাময়িক) শৈব-শাক্ত তন্ত্রাদিতে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে মোটামুটিভাবে তাহার সব কথা অথবা তাহার আভাস পাঞ্চরাত্র মতের ভিতরেও পাওয়া যায়। ইহাকে আমি পাঞ্চরাত্রের উপরে কোন প্রকারের শৈব-শাক্ত প্রভাব না বলিয়া একটা স্বাধীন বিকাশ বলিয়াই মনে করি।

কাশ্মীর-শৈবদর্শন মতে পরম শিবই হইলেন পরম তত্ত্ব। এই পরম শিব পরম আত্ম-সমাহিত, এই পরম আত্ম-সমাহিত রূপই তাঁহার নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কল রূপ। এই পরম শিব পরম অদ্বয়তত্ত্ব, একটি যামল-তত্ত্ব। তাঁহার এই আত্ম-সংবৃত অদ্বয়রূপের ভিতরে নিঃশেষে লীন হইয়া আছেন পরা শক্তি, যিনি অনন্তসম্ভাবনারূপে ভাবিচরাচরবীজরূপে শিবের সহিত এক হইয়া অবস্থান

১ যথা, মালিনী-বিজয় (বা মালিনী-বিজয়োত্তর), স্বচ্ছন্দ, বিজ্ঞানভৈরব, উচ্ছুষ্মভৈরব, আনন্দভৈরব, মৃগেন্দ্র, মতঙ্গ, নেত্র, রুদ্র-যামল ইত্যাদি। বৌদ্ধতন্ত্র এবং তাহার টীকা-টিপ্পনীর ভিতরেও উপরি-উক্ত তন্ত্রমধ্যে কয়েকখানি তন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

করিতেছেন। পরম শিব তাই হইলেন শিব-শক্তির মিলন বা সঙ্ঘট্ট[১]; এই সঙ্ঘট্ট বা যামল হইল 'শক্তি-শক্তিমৎসামরস্যাত্মা'[২]। এই পরম শিব যেমন নিত্য, মূলকারণ-রূপিণী শক্তিও এই পরম শিবের সহিত অবিনাভাবে যুক্ত বলিয়া তিনিও নিত্যা।[৩] শিবসূত্রবার্তিকের (ভাস্কর-কৃত বার্তিক) ভিতরে এই শক্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

স্বপদশক্তিঃ ॥—১।১৭

ইহার বিবৃতিতে বলা হইয়াছে,—"স্বপদ হইল সৎপদ, ইহাই শিবাখ্য তত্ত্ব; এই শিবাখ্যের দৃক্‌ক্রিয়ারূপ যে বীর্য তাহাই শক্তি বলিয়া প্রকীর্তিত হয়"।[৪] শক্তি-তত্ত্বের প্রথম উন্মেষ হইল পরম শিবের পূর্ণাহন্তা অবস্থায়; ইহাই হইল তাঁহার স্পন্দরূপ। চিৎরূপ শিবে আত্মদৃষ্টি-ইচ্ছার যে প্রথম উন্মেষ তাহাই তাঁহার স্পন্দরূপ পূর্ণাহন্তা অবস্থা। এই অবস্থাকে বলা হইয়াছে তাঁহার 'চিদাহ্লাদ-মাত্রানুভবতল্লয়' অবস্থা; সে অবস্থায় কোনও তদতিরিক্ত কারণকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার আনন্দানুভূতি নাই, শুধু নিজের চিৎ-স্বরূপের ভিতরে যে আহ্লাদ-স্বরূপতা বর্তমান তাহারই আস্বাদে তিনি আত্মমগ্ন। এই আত্ম-বেক্ষণ অবস্থা হইতেই জাগ্রত হয় তাঁহার ভিতরে তাবৎ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া; এই স্বরূপের ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা যে স্পন্দন তাহাই হইল তাঁহার শক্তি। এই যে শক্তি-ত্রিতয় ইহা এই পূর্ণাহন্তার ভিতরে সুসূক্ষ্ম অবস্থায় পূর্ণসামরস্যে বর্তমান থাকে; কিন্তু তখন পর্যন্তও সেই পরশিব থাকেন নির্বিভাগ এবং 'চিদ্রূপাহ্লাদপরম'।[৫] এই পূর্ণাহন্তারূপ নিবৃত্তচিন্তাবস্থায়ও—যে অবস্থায় তাঁহার ভিতরে কোন ভাগ-বিভাগ কিছুই থাকে না তখনও—এই ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-রূপা ত্রিতয়াত্মা শক্তির

---

১ তয়োর্যদ্‌যামলং রূপং স সংঘট্ট ইতি স্মৃতঃ। তন্ত্রালোক, অভিনবগুপ্ত-কৃত, ৩।৬৭ (কাশ্মীর-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা)

২ তন্ত্রালোকের ১।১ শ্লোকের জয়রথ-কৃত টীকা।

৩ শিবশক্ত্যবিনাভাবান্নিত্যৈকা মূলকারণম্ ॥ তন্ত্রালোক, ৯।১৫২

৪ স্বপদং সৎপদং জ্ঞেয়ং শিবাখ্যং যদুদীরিতম্ ॥
তদ্বীর্যং দৃক্‌ক্রিয়া-রূপং যৎ সা শক্তিঃ প্রকীর্তিতা। (কা-সং-গ্র, ৫ ও ৬ সংখ্যা।)

৫ স যদাস্তে চিদাহ্লাদমাত্রানুভবতল্লয়ঃ।
তদিচ্ছা তাবতী তাবজ্‌ জ্ঞানং তাবৎ-ক্রিয়া হি সা ॥
সুসূক্ষ্ম-শক্তিত্রিতয়সামরস্যেন বর্ততে।
চিদ্রূপাহ্লাদপরমো নির্বিভাগঃ পরস্তদা ॥ শিবদৃষ্টি, সোমানন্দ-কৃত। কাশ্মীর-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, ৫৪ সংখ্যা। ১।৩-৪

সহিত তাঁহার কোন বিয়োগ নাই।[১] এই পূর্ণাহন্তার 'চিদ্ধর্মবিভবামোদ-জৃম্ভণে'র দ্বারাই হয় শক্তির জাগরণ।[২] শিব শক্তিমান্, তিনি ইচ্ছামাত্রেই সব কিছু করিতে পারেন, তাঁহার দৃষ্টিমাত্রেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়; এই নিজের ইচ্ছা-মাত্রতাই হইল তাঁহার শক্তি। সুতরাং শিব কখনও শক্তি-রহিত নহেন, শক্তিও কখনও ব্যতিরেকিণী নহেন, প্রকৃত শৈব যাঁহারা তাঁহারা শক্তি-শক্তিমানের ভেদ কখনও করেন না, শক্তি-শূন্য শিবের কোনও কেবল রূপও তাঁহারা স্বীকার করেন না।[৩] পাঞ্চরাত্রে যেরূপ শক্তি-শক্তিমানের ধর্মধর্মিত্ব-সম্বন্ধের বর্ণনাই পাইয়াছি, এখানেও সর্বত্র সেই বর্ণনাই পাই। বলা হইয়াছে, বহ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তি যেমন পৃথক্ নয়, শিব ও শক্তিও সেইরূপ কখনও পৃথক্ হইতে পারে না।[৪] নেত্রতন্ত্রে বলা হইয়াছে,—"সেই যে শক্তি সে আমারই ইচ্ছা-রূপা পরা শক্তি, সে আমার শক্তিতেই শক্তিযুক্তা, আমার স্বভাব বা স্বরূপ হইতেই জাতা; বহ্নির উষ্ণতার মত, রবির রশ্মির মত; আমারই কারণাত্মিকা যে শক্তি তাহাই সমস্ত জগতের শক্তি।"[৫] শ্রীমৃগেন্দ্রতন্ত্রে বলা হইয়াছে, এই শক্তিই শিবের সকল দেহকৃত্য করিয়া থাকেন; অতনু চিদেকমাত্র শিবের কোন দেহ নাই, এইজন্য

১ এবং ন জাতু চিত্তস্য বিয়োগস্ত্রিতয়াত্মনা ॥
শক্ত্যা নিবৃত্তচিত্তস্য তদভাগবিভাগয়োঃ। ঐ—১।৬-৭

২ ঐ—১।৭

৩ ন শিবঃ শক্তিরহিতো ন শক্তির্ব্যতিরেকিণী ॥
শিবঃ শক্তস্তথা ভাবান্ ইচ্ছয়া কর্তুমীহতে।
শক্তিশক্তিমতো র্ভেদঃ শৈবে জাতু ন বর্ণ্যতে ॥ ঐ—৩।২-৩
ন কদাচন তস্যাস্তি কৈবল্যং শক্তিশূন্যকম্। ঐ—৩।৯০

৪ এবংবিধা ভৈরবস্য যাবস্থা পরিগীয়তে।
সা পরা পররূপেণ পরা দেবী প্রকীর্তিতা ॥
শক্তিশক্তিমতো র্যদ্বদ্ অভেদঃ সর্বদা স্থিতঃ।
অতস্তদ্ধর্মধর্মিত্বাৎ পরা শক্তিঃ পরাত্মনঃ ॥
ন বহ্নে র্দাহিকা শক্তি র্ব্যতিরিক্তা বিভাব্যতে।
কেবলং জ্ঞান-সত্তায়াং প্রারম্ভো ঽয়ং প্রবেশনে ॥
শক্ত্যবস্থাপ্রবিষ্টস্য নির্বিভাগেন ভাবনা।
তদাসৌ শিবরূপী স্যাৎ শৈবী মুখমিহোচ্যতে ॥ বিজ্ঞানভৈরব, ১৭-২০
(কা-সং-গ্র, ৮, ৯)

৫ নেত্রতন্ত্র, ১।২৫-২৬ (কা-সং-গ্র, ৪৬)

শক্তিই যেন শিবের দেহ এই কথাই বলা হইয়াছে ;[১] অর্থাৎ শক্তিদ্বারে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু ক্রিয়া তিনিই সাধন করিয়া থাকেন।

শক্তি ও শক্তিমানের ভিতরে যে ভেদ-কল্পনা, উহা একটা ভেদের ভান মাত্র। শক্তির যাহা পৃথক্ সত্তা উহা পরমপুরুষের অবভাসন মাত্র, তথাপি তাহা যে কিছুই নয় তাহা নহে, প্রতীতিরূপেই তাহা বাস্তব।[২] শিবসূত্রবার্তিকের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, শক্তিমান্ পরম শিবের যে শক্তিসমূহ তাহা তাঁহার নিজেরই চিৎ-পরিণাম ; সেই চিৎ-পরিণামেরই যে নব নব উল্লাস-স্পন্দনের সমূহ তাহাই হইল বিশ্ব ; শক্ত্যাত্মক বিভু (সর্বব্যাপী) যিনি তিনিই এই জগৎ-রূপে প্রস্ফুটিত হইতেছেন, নিজেই নিজেকে তিনি স্ফুরিত করিতেছেন।[৩] অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, পরমেশ্বরের পরা শক্তি কি ? যাহা দ্বারা তিনি তাঁহার অবিকল্প সংবিন্মাত্র রূপে অবস্থান করিয়াই 'শিবাদিধরণ্যন্ত' সকল কিছুকে ভরণ করেন, দেখেন, প্রকাশিত করেন তাহাই হইল তাঁহার পরা শক্তি।[৪]

কাশ্মীর-শৈবদর্শনের ভিতরে আলোচিত শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমরা পাঞ্চরাত্রে শক্তিবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, শক্তিদ্বারে যে বিশ্ব-সৃষ্টি তাহার মূল প্রয়োজন পরমপুরুষের আত্মোপলব্ধি ; শক্তিকে স্বেচ্ছায় খানিকটা যেন পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহার ভিতর দিয়া পরম-পুরুষ নিজেকেই অনন্তরূপে সৃষ্টি করেন, নিজেকে এই অনন্তরূপে সৃষ্টির ভিতর দিয়াই তাঁহার অনন্তভাবে আত্মোপলব্ধি। এই সত্যটি কাশ্মীর-শৈবদর্শনের বহুস্থানে

১ ১।৩।১৪ (কা-সং-গ্র, ৫০)। শ্রীমৃগেন্দ্রতন্ত্রকে 'কামিকতন্ত্রে'রই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা হয়।

২ ভানমন্তরেণ অন্যৎ কিঞ্চিন্নাস্তি, ইত্যসৌ ভেদোঽপি ভাসমানত্বাদ্বস্তুতো ন ন কিঞ্চিৎ। তন্ত্রালোকের জয়রথ-কৃত টীকা, পৃ. ১১০-১১

তুঃ—স্বাভাসা মাতৃকা জ্ঞেয়া ক্রিয়াশক্তিঃ প্রভোঃ পরা।

শিবসূত্রবার্তিকের ২।৭-এর বিবৃতি।

৩ এবং শক্তিমতশ্চাস্য শক্তয়ঃ স্বাচ্চিদাদয়ঃ।

তাসাং নবনবোল্লাসস্পন্দা যে প্রচয়াঃ স্মৃতাঃ॥

ত এব বিশ্বং বিজ্ঞেয়ং যতঃ শক্ত্যাত্মনা বিভুঃ।

জগদ্রূপঃ প্রস্ফুরতি স্ফুরন্নেবাত্মনা সদা॥ ঐ, ৩।৩০ বিবৃতি।

৪ যদেয়ং শিবাদিধরণ্যন্তমবিকল্প-সংবিন্মাত্ররূপতয়া বিভর্তি চ পশ্যতি চ ভাসয়তি চ পরমেশ্বরঃ সাস্য পরাশক্তিঃ।

পরাত্রিংশিকায় (কা-সং-গ্র, ১৮) অভিনবগুপ্তের উদ্ধৃতি।

আভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টিস্থিতি-উপসংহাররূপা এই শক্তিকে বলা হইয়াছে 'তদ্ভরণে রতা'।[১] 'তৎ-ভরণ' শব্দের এখানে তাৎপর্য হইল পরম শিবের মনোরঞ্জন বা তৃপ্তি-বিধান। এই দেবী হইলেন পরম শিবের 'ইচ্ছানুবিধায়িনী', এইজন্যই ইঁহার পতি ইঁহাকে কামনা করিয়া থাকেন।[২] নিজের ভোক্তৃত্ব রূপকে অনুভব করিবার জন্যই পরমেশ্বর এই শক্তিরূপিণী মূল-প্রকৃতিকে বারবার ক্ষোভিত করিয়া তাহাকে সৃষ্টির উন্মুখিনী করিয়া তোলেন।[৩] পরমপুরুষের এই ভোক্তৃত্ব কিরূপ? গাঢ়নিদ্রাভিভূত কোন ব্যক্তি তাহার সুন্দরী প্রিয়তমা দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে, সেই গভীর নিদ্রার ভিতরেই তাহার স্তিমিত চৈতন্যের মধ্যে সে যেরূপ নিজের একটা 'ভোক্তৃত্ব' অনুভব করে, এই মহাশক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত পরম শিবের ভোক্তৃত্ব-বোধও তদনুরূপ।[৪] নিজেকেই নিজে এইরূপে বহুভাবে ভোজ্য-রূপে ভাগ করিয়া, পৃথগ্‌বিধ পদার্থরূপে বহুধা সৃষ্টি করিয়া সর্বেশ্বর এবং সর্বময় পরমেশ্বর যে নিজেকে নিজে ভোগ করেন এই ভোক্তৃত্ব যেন লীলাময়ের একটা স্বপ্নে ভোগ মাত্র।[৫] নিজেকেই তিনি জ্ঞেয়ী এবং জ্ঞেয়রূপে পৃথক্ করিয়া লন; এই জ্ঞেয় সর্বদাই জ্ঞেয়ীর উন্মুখ, এইজন্যেই জ্ঞেয় কখনও জ্ঞেয়ীর স্বাতন্ত্র্য খণ্ডন করে না। প্রভু, ঈশ্বর প্রভৃতি সঙ্কল্পের দ্বারাই তিনি নিজেকে নিজে নির্মাণ করেন, এ নির্মাণ শুধুমাত্র তাঁহার ব্যবহারের জন্য।[৬] এই জ্ঞেয়রূপে 'ইহার' ভাবে (ইদন্তয়া) যাহা কিছুর প্রকাশ, নামরূপের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ঘটাদি-রূপে যাহা কিছুর প্রকাশ তাহা পরমেশ্বরের শক্তিরই 'ভাস' মাত্র, আর কিছুই নয়।[৭] বিজ্ঞানভৈরবে বলা হইয়াছে যে, আলোকের দ্বারা যেমন দীপকে জানা যায়, কিরণের দ্বারা যেমন সূর্যকে জানা যায়, তেমনই শক্তিদ্বারাই শিবের যাহা কিছু সমস্ত প্রকাশ।[৮]

১ তন্ত্রালোকের ১।১ শ্লোকের জয়রথের টীকা দ্রষ্টব্য।

২ কাময়তে পতিরেনামিচ্ছানুবিধায়িনীং যদা দেবীম্।—তন্ত্রালোক, ৮।৩০৯

৩ ভোক্তৃত্বায় স্বতন্ত্রেশঃ প্রকৃতিং ক্ষোভয়েদ্ ভৃশম্।—ঐ, ৯।২২৫

৪ গাঢ়নিদ্রাবিমূঢ়ো ঽপি কান্তালিঙ্গিতবিগ্রহঃ।
ভোক্তৈব ভণ্যতে সো ঽপি মনুতে ভোক্তৃতাং পুরা।—ঐ, ১০।১৪৫

৫ প্রবিভজ্যাত্মনাত্মানং সৃষ্ট্বা ভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
সর্বেশ্বরঃ সর্বময়ঃ স্বপ্নে ভোক্তা প্রবর্ততে॥
ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার ৩।২।১ শ্লোকের অভিনবগুপ্ত-কৃত বিমর্শিনী টীকায় উদ্ধৃত।

৬ ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা, উৎপলদেব প্রণীত (কা-সং-গ্র, ২২), ১।৫।১৫-১৬

৭ ঐ, ১।৫।২০

৮ যথালোকেন দীপস্য কিরণৈর্ভাস্করস্য চ।
জ্ঞায়তে দিগ্বিভাগাদি তদ্বচ্ছক্ত্যা শিবঃ প্রিয়ে॥ ২১॥

অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই অবভাস বা প্রতিফলনের জন্ত একখানি স্বচ্ছ মুকুর (আয়না) চাই; সেই স্বচ্ছ মুকুর হইল পরমেশ্বরের 'স্ব-সংবিৎ'। এই স্ব-সংবিৎই যখন স্বপ্নে যেন একটা প্রমাতৃত্ব গ্রহণ করে, তখন সেই প্রমাতৃ-রূপ স্ব-সংবিৎ স্বচ্ছ-মুকুরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অবভাস হয়। শক্তি-দ্বারে সৃষ্ট এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাই পরমেশ্বরের নিজের বিমল সংবিতের ভিতরে নিজেরই একটা প্রতিফলন মাত্র; অর্থাৎ নিজের চৈতন্যের ভিতরে নিজেকেই দৃশ্য রূপে দেখা।[১] শক্তিদ্বারে নিজের ভিতরেই যে পর্যন্ত নিজের প্রতিফলন না হয় সে পর্যন্ত নিজেকেই নিজের দেখা হয় না; তাই শক্তিরূপে এক দ্রষ্টাই নিজেকে দৃশ্য করিয়া তোলেন। একস্থানে বলা হইয়াছে যে, এই বিশ্ব ভৈরবের (পরম শিবের) চিদ্রূপ স্বচ্ছ অম্বরে প্রতিবিম্ব মল-স্বরূপ; নিজের চিদম্বরে এই যে জ্ঞেয়রূপ প্রতিবিম্ব-মল তাহা ভৈরবের নিজের প্রসাদেই সম্ভব হয়, অন্ত কাহারও প্রসাদে নয়।[২]

শক্তিদ্বারে পরম শিব নিজেকে নিজে দেখেন বলিয়া কামকলাবিলাসে এই শক্তিকেই শিবের নির্মল-আদর্শ বলা হইয়াছে।

সা জয়তি শক্তিরাদ্যা নিজসুখময়নিত্যনিরুপমাকারা।
ভাবিচরাচরবীজং শিবরূপবিমর্শনির্মলাদর্শঃ ॥ ২ ॥

এখানে 'নিজসুখময়' শব্দের তাৎপর্য শিবসুখময়; অর্থাৎ শিবের সুখরূপিণী। এই শক্তি ভাবিচরাচরবীজরূপিণী বলিয়া নিত্যনিরুপমাকারা; আবার ভাবিচরাচর-বীজরূপিণী বলিয়াই সেই শক্তি শিবরূপবিমর্শনির্মলাদর্শ। 'শিবরূপবিমর্শ' শব্দের অর্থ শিবের 'আমি এইরূপ' এই প্রকারের যে জ্ঞান তাহারই বিমর্শ বা বিস্ফুরণ। এই বিমর্শের সাধকতমা বা করণ-রূপাই হইল শক্তি, সুতরাং এই শক্তিই হইল শিবরূপের নির্মল-আদর্শ; এই আদর্শের ভিতর দিয়াই তিনি সর্বদা নিজে নিজের রূপ দেখেন। অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, পরশিব হইলেন রবি-স্বরূপ, শক্তি হইলেন তাঁহার কর-নিকর-স্বরূপা; এই শক্তিরূপা বিশদ বিমর্শ-দর্পণে প্রতিফলিত হন

১ শিবশ্চালুপ্তবিভব স্তথা সৃষ্টৌ হবভাসতে।
স্বসংবিন্মাতৃমুকুরে স্বাতন্ত্র্যাদ্ভাবনাদিষু ॥ তন্ত্রালোক, ১।৭৩

২ ইত্থং বিশ্বমিদং নাথে ভৈরবীয়চিদম্বরে।
প্রতিবিম্বমলং স্বচ্ছে ন খল্বন্যপ্রসাদতঃ ॥ ঐ, ৩।৬৫

তুঃ বিমল মকুর সামাও যত্যাভয়ন কমাকম সেয়।
—মহানয়প্রকাশ, রাজানক ক্ষিতিকণ্ঠ প্রণীত:(কা-সং-গ্র, ২১), ১১।৫

পরমাক্ষর পরমাব্যক্ত মহাবিন্দু; অথবা এই মহাবিন্দু অধিষ্ঠান করেন প্রতি-সৌন্দর্যের দ্বারা সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে শিবের এমন চিত্তময় শক্তিরূপ কুড্যে বা দেয়ালে।[১] শিবের সকল ইচ্ছা বা কাম পূরণ করেন বলিয়াই শক্তিকে বলা হইয়াছে বিমর্শরূপিণী কামেশ্বরী।[২] এই পরম শিব এবং তাঁহার শক্তি ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভিণী পরমেশ্বরী যেন হংস-হংসীরূপে নিত্য লীলারত।[৩]

পরম শিবের যাহা কিছু প্রমাতৃত্ব জ্ঞাতৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব তাহা সকলই শক্তিকে অবলম্বন করিয়া; এইজন্য এই শক্তি শুধুমাত্র জ্ঞানরূপিণী বা ক্রিয়ারূপিণী নহেন, শক্তি আনন্দরূপিণী, এই শক্তিই আনন্দশক্তি।[৪] তিনি কারণাত্মিকা হইয়াই অদ্ভুতানন্দা রূপে চিদ্রূপাত্মক শিব হইতে প্রসূতা হন।[৫] এই আনন্দই সব সৃষ্টির মূলে; নারী-পুরুষের মিলনের দ্বারা আমরা যাহা কিছু সৃষ্টি দেখি সেখানে এই মিলন একটি বাহ্য-প্রক্রিয়া মাত্র, আসলে আনন্দ-শক্তিই উচ্ছলিত হইয়া নিজে নিজেকে সৃষ্টি করেন।[৬] এখানে আনন্দই নিমিত্ত-কারণ, আবার আনন্দই উপাদান-কারণ। বিশ্বসৃষ্টির মহানন্দময় যজ্ঞের ভিতরেই যে অনুচরণ করে, যে অবস্থান করে সে-ই আনন্দময়ী শক্তির ভিতরে সমাবিষ্ট পরম হইয়া ভৈরবকে প্রাপ্ত হয়।[৭] জাগতিক পদার্থরূপে যাহা কিছু প্রতিভাত হয় তাহা সকলই সেই আনন্দ-শক্তির আনন্দরস-বিভ্রম মাত্র; যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আমাদের চিত্ত আনন্দ লাভ করে সেই বস্তুও আনন্দরসবিভ্রম, আবার হৃদয়ের যে আনন্দ-অনুভূতি তাহাও মূলতঃ সেই আনন্দ-শক্তি;[৮] আনন্দ এখানে ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া আছে।

১ পরশিবরবিকরনিকরে প্রতিফলতি বিমর্শদর্পণে বিশদে।
প্রতিরুচিরুচিরে কুড্যে চিত্তময়ে নিবিশতে মহাবিন্দুঃ॥ কামকলাবিলাস, ৪

২ ঐ, ৫১

৩ ব্রহ্মাণ্ডগর্ভিণীং ব্যোমব্যাপিনঃ সর্বতোগতেঃ।
পরমেশ্বরহংসস্য শক্তিং হংসীমিব স্তুমঃ॥
স্তবচিন্তামণি, শ্রীভট্টনারায়ণ-বিরচিত। (কা-সং-গ্র, ১০)

৪ আনন্দশক্তিঃ সৈবোক্তা যতো বিশ্বং বিসৃজ্যতে॥ তন্ত্রালোক, ৩।৬৭

৫ নেত্রতন্ত্র (কা-সং-গ্র, ৪৬), ৮।৩৪-৩৫

৬ আনন্দোচ্ছলিতা শক্তিঃ সৃজত্যাত্মানমাত্মনা।
বিজ্ঞানভৈরবের ৬১ নং শ্লোকের ক্ষেমরাজকৃত টীকায় উদ্ধৃত।

৭ বিজ্ঞানভৈরব, ১৫৫

৮ তন্ত্রালোক, ৩।২০৯-২১০

পরম শিবের পরা শক্তিই আনন্দময়ী, মায়াশক্তি বা প্রাকৃতশক্তি আনন্দময়ী নহে। আনন্দশক্তি পরম শিবের স্বরূপ-শক্তি ; এইজন্য আনন্দরূপিণী অমৃতময়ী এই পরা শক্তিকে বলা হইয়াছে শক্তিচক্রের জননী।[১] যে শক্তি আনন্দময়ী তিনি মায়ার উপরে মহামায়া।[২] এই আনন্দ-শক্তিকেই বলা হয় 'বৈন্দবী কলা' ;[৩] অর্থাৎ শক্তির ষোড়শ-কলার উর্ধ্বে ইহাই হইল সপ্তদশী কলা।

পরম শিবের এই যে আনন্দরূপিণী স্বরূপ-শক্তি—যাহা পরম শিবের সহিত সর্বদা অবিনাবদ্ধভাবে অবস্থান করে তাহাকেই বলা হইয়াছে 'সমবায়িনী' শক্তি। এই শক্তির সকল অস্তিত্ব এবং তাৎপর্য শুধুমাত্র সৃষ্টিকাম পরমেশ্বরের ইচ্ছায়।[৪] এই সমবায়িনী শক্তির সহিতই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ; সেইজন্য এই শক্তিকেই তিনি অনুগ্রহ করেন।[৫] মায়াশক্তি বা প্রাকৃতশক্তি এই সমবায়িনী শক্তি হইতেই উদ্ভূতা হয় ; সুতরাং পরমেশ্বরের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। মায়া বা প্রাকৃত-শক্তি সমবায়িনী শক্তি হইতেই উদ্ভূতা বলিয়া সমবায়িনী শক্তিকে সকল শক্তির শক্তি এবং সকল গুণের গুণ বলা হইয়া থাকে।[৬] এই সমবায়িনী শক্তি 'মায়ার' উপরে 'মহামায়া'।[৭] এই মায়াশক্তি বা প্রাকৃতশক্তিকে বলা হয় 'পরিগ্রহ-শক্তি'। আমরা পূর্বে পাঞ্চরাত্রের আলোচনা প্রসঙ্গেও দেখিয়া আসিয়াছি,

১ যা সা শক্তিঃ পরা সূক্ষ্মা ব্যাপিনী নির্মলা শিবা।
শক্তিচক্রস্য জননী পরানন্দামৃতাত্মিকা ॥
শিবসূত্র-বার্তিকম্ (কা-সং-গ্র, ৪৩)

২ মায়োপরি মহামায়া ত্রিকোণানন্দরূপিণী। কুব্জিকাতন্ত্র,
পরাত্রিংশিকায় উদ্ধৃত, ১৮৪ পৃষ্ঠা।

৩ তন্ত্রালোক, ১।১ শ্লোকের জয়রথ কর্তৃক টীকা দ্রষ্টব্য।

৪ যা সা শক্তির্জগদ্ধাতুঃ কথিতা সমবায়িনী।
ইচ্ছাত্বং তস্য সা দেবি সিসৃক্ষোঃ প্রতিপদ্যতে ॥
মালিনীবিজয়োত্তর-তন্ত্র (কা-সং-গ্র, ৩৭), ৩।৫

তুঃ ইচ্ছা সৈব স্বচ্ছা সংততসমবায়িনী সতী শক্তিঃ।
ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বসংদোহ (কা-সং-গ্র, ১৩), ২য় শ্লোক।

৫ তাং শক্তিং সমবায়াখ্যাং ভেদাভেদপ্রদর্শিনীম্।
অনুগৃহ্লাতি সংবন্ধ ইতি পূর্বেভ্য আগমঃ ॥
ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার ২।৩।৬ শ্লোকের অভিনবগুপ্ত কর্তৃক টীকায় উদ্ধৃত।

৬ শক্তীনামপি সা শক্তিগুর্ণানামপ্যসৌ গুণঃ ॥ ঐ

৭ পূর্বোদ্ধৃত কুব্জিকাতন্ত্র।

সেখানেই শক্তির এই দ্বৈবিধ্য স্বীকার করা হইয়াছে; সেখানেও ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ-শক্তিকে তাঁহার সমবায়িনী শক্তি বলা হইয়াছে, আর বিষ্ণুর জগৎ-প্রপঞ্চ-কারিণী শক্তিকেই বলা হইয়াছে তাঁহার মায়া-শক্তি, ইহাই পরিণামিনী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। স্বরূপভূতা সমবায়িনী শক্তি কখনও পরম শিবের স্বরূপ আচ্ছাদন করে না, কিন্তু যে মায়া হইতে ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপার সাধিত হয় সেই মায়াশক্তি যেন অনাবৃত-স্বরূপ বিভুরই একটা আত্মাচ্ছাদন।[১] বিভুর এই মায়াশক্তি দ্বারাই বিভুর সমবায়িনী স্বরূপভূতা বিমর্শ-শক্তি জ্ঞান, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়াদি নামে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীত হয়।[২] এই মায়া হইল বিভুর নিজাংশজাত নিখিল জীবের ভিতরেই একটা ভেদবুদ্ধি; ইহা হইল তাঁহার নিত্য এবং নিরঙ্কুশ অর্থাৎ অপ্রতিহত বিভব—সমুদ্রের যেমন বেলাভূমি।[৩] স্থানে স্থানে এই সমবায়িনী শক্তি ও পরিগ্রহা শক্তিকে একই শক্তি-সমুদ্রের বিভিন্নাবস্থা রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এক পরা চিচ্ছক্তি—সে 'মহাসত্তাস্বভাবা' এবং 'চিন্মাত্রশান্তস্বভাবা'; এই প্রশান্ত সমুদ্ররূপা শক্তিরই কিঞ্চিৎ স্ফীতি ভাব এবং অভাব এই উভয়ব্যাপিকারূপে, সৎ এবং অসৎ এই উভয় রূপে, বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ এবং অধিকরণ উভয়রূপে বিরাজ করে; ইহাই শক্তির দ্বিতীয়াবস্থা। তৃতীয়াবস্থায় এই সমুদ্রস্ফীতি হইতেই যেন ঊর্মিরূপে চরাচরের অন্তশ্চারিণী পরিগ্রহবর্তিনী শক্তির আবির্ভাব হয়, এই শক্তিই বিশ্বময়ী শক্তি।[৪] পরম শিবের যে মায়াচ্ছাদিত রূপ, 'পূর্ণাহন্তা'র স্ফুটাস্ফুট 'ইদন্তা' রূপে যে প্রকাশযোগ্যতা ইহা লইয়াই হইল সদাশিব-তত্ত্ব বা ঈশ্বর-তত্ত্ব।[৫] শিবতত্ত্ব হইল মায়াতীত; আর মায়ার হইল স্বপ্রকাশ শিবের অধোদেশে ব্যাপ্তি।[৬] এই

১ তন্ত্রালোক, ৪।১১

২ ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা, ১।৫।১৮

৩ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব-সংদোহ, ৫

৪ মহানয়-প্রকাশের ৫।২ শ্লোকের বিবৃতি (কা-সং-গ্র, ২১), ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫ তুঃ—স্বাতন্ত্র্যাত্মিকা তাবদিচ্ছৈব ভগবতঃ শক্তিঃ। সা তু কৃত্যভেদেন বহুধা উপচর্যতে। তত্র যথাপ্ররূঢ়স্ফুটাস্ফুটেদন্তাপ্রকাশনে সদাশিবেশ্বরতা জ্ঞানক্রিয়াশক্তিরূপা, চিন্মাত্রগ্রাহকত্বে ঽপি ইদন্তাপ্ররূঢ়ৌ ক্রিয়াশক্তিশেষরূপৈব মহামায়া বিদ্যেশশক্তিঃ, গ্রাহ্যগ্রাহকবিপর্যাসে পশু-প্রমাতৃষু মায়াশক্তিঃ।—ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা, ৩।১।৬ শ্লোকের অভিনবগুপ্ত-কৃত বিবৃতি।

৬ 'মায়াতীতং শিবতত্ত্বং'।

'অধোব্যাপ্তিঃ শিবস্যৈব স্বপ্রকাশস্য সা'।

ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞায় ৩।১।১ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত।

যে ঈশ্বররূপ সদাশিব তিনি হইলেন বাহ্য উন্মেষ-নিমেষশালী।[১] এই সদাশিব-তত্ত্ব পর্যন্ত সবই প্রাকৃত, সদাশিবের উর্ধ্বের যাহা কিছু তত্ত্ব সেখানে প্রকৃতি বা মায়ার কোনও প্রবেশ-অধিকার নাই, তাহাই হইল অপ্রকৃত মায়াতীত ধাম বা তত্ত্ব।

আমরা পাঞ্চরাত্রে শক্তিতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, সেখানেও ভগবানের 'লীলা'র পরিকল্পনা রহিয়াছে; কিন্তু সে লীলা মায়াতীত বা গুণাতীত অবস্থায় স্বরূপ-শক্তির সঙ্গে নয়; এই যে বিশ্বসৃষ্টির ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ আবার মহাপ্রলয়ের ভিতর দিয়া আত্ম-সংহরণ, এই সৃজনে-প্রলয়েই তাঁহার লীলা। সমগ্র সৃষ্টিই তাই তাঁহার লীলা-স্পন্দন। স্বচ্ছন্দতন্ত্রের ক্ষেমরাজকৃত টীকার অনুবন্ধে প্রণাম-শ্লোকে শিবকে বলা হইয়াছে, 'প্রসরচ্ছক্তিকল্লোলজগল্লহরিকেলয়ে'; স্রোতোময়ী শক্তির কল্লোলের ভিতর হইতেই জাগিয়াছে এই জগৎরূপ লহরি; এই শক্তি-কল্লোলের ভিতরে বসিয়া জগৎ-লহরি লইয়াই হইতেছে পরমেশ্বরের কেলি বা লীলা।

১ ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা, ৩।১।৩

২ যৎ সদাশিবপর্যন্তং পার্থিবান্তং চ সুব্রতে।
তৎসর্বং প্রাকৃতং জ্ঞেয়ং বিনাশোৎপত্তিসংযুতম্॥
স্বচ্ছন্দতন্ত্র (কা-সং-গ্র, ৩১), ১০।১২।৬৪-৬৫

পঞ্চম অধ্যায়

পুরাণাদিতে ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব-শক্তিতত্ত্ব

ইহার পরে এবং শ্রী-রুদ্র-মাধ্ব-সনকাদি দার্শনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতবাদ আলোচনার পূর্বে আমরা পুরাণ-তন্ত্রাদিতে আলোচিত বৈষ্ণব-শক্তিবাদের আলোচনা করিয়া লইতে চাই। এই আলোচনার ভিতরেও খাঁটি ঐতিহাসিক আলোচনা সম্ভব নহে। বৈষ্ণবশাস্ত্ররূপে অনেকগুলি পুরাণ, সংহিতা, উপনিষৎ ও তন্ত্র নামধেয় গ্রন্থ রহিয়াছে, এইগুলির রচনাকাল ঠিক করিবার কোন উপায় নাই। এ-সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাঁহারা আলোচনা করিতে গিয়াছেন তাঁহাদের ভিতরেও কোন সাধারণ ঐকমত্য দেখা যায় না। উইলসন্-আদি পণ্ডিতগণও কোনও পুরাণকেই খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের বেশী পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করেন না, পরন্তু অধিকাংশ পুরাণকেই দশম শতকের পরবর্তী বলিয়া মনে করেন। কতগুলি পুরাণ-উপপুরাণকে তাঁহারা তিন-চারিশত বৎসরের অধিক পুরাতন বলিয়া মনে করেন না। অবশ্য কিছু কিছু পুরাণ-তন্ত্র-নামধেয় গ্রন্থ যে একান্ত অর্বাচীন কালেও রচিত হইয়াছে এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। আবার ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রভৃতি পুরাণের রচনা-কাল সম্বন্ধে অন্তরকম মত পোষণ করেন। অনেকগুলি বৈষ্ণব ও শৈব (শাক্তও আছে) এবং সাধারণ যোগ-উপনিষদ্ রহিয়াছে যাহার অধিকাংশই অনেক পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। বৈষ্ণব তন্ত্রগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা। এই জাতীয় গ্রন্থাদির কাল-নিরূপণ-রূপ গহন-অরণ্যের ভিতরে আমরা প্রবেশ করিতে চাহি না; তাহাতে কোন সুফল অপেক্ষা প্রসঙ্গচ্যুতি-রূপ কুফলের সম্ভাবনাই বেশী। আমাদের দিক্ হইতে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, দার্শনিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভিতরে প্রাচীনতম সম্প্রদায় শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে বিষ্ণু, গরুড়, ব্রহ্ম প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন (অধিকাংশই বিষ্ণু-পুরাণ হইতে)। আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ত' প্রায় পুরাণ-প্রামাণ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রামানুজাচার্যের আবির্ভাব-কাল একাদশ শতাব্দী; সুতরাং বিষ্ণু, গরুড়, ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণগুলি তৎপূর্বেই শাস্ত্রহিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রামানুজাচার্যের আবির্ভাবের অন্ততঃ তিন চারি শতক পূর্বে

রচিত না হইয়া থাকিলে এই পুরাণগুলি রামানুজাচার্যের সময়ে প্রামাণিক শাস্ত্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং রামানুজাচার্যকর্তৃক উদ্ধৃত পুরাণগুলি অন্ততঃ সপ্তম অষ্টম শতকের রচনা বলিয়া মনে হয়। অবশ্য রামানুজাচার্য ভাগবত-পুরাণের কোথাও উল্লেখ করেন নাই, এইজন্য কেহ কেহ ভাগবতকে রামানুজাচার্যের পরবর্তী কালের গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু আবার এমনও হইতে পারে যে ভাগবত-প্রচারিত বৈষ্ণব মত ঠিক রামানুজাচার্য প্রচারিত বৈষ্ণব মতের একান্ত পরিপোষক নয় বলিয়াও হয়ত রামানুজাচার্য এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ করেন নাই। পুরাণের কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র[১] বলিয়াছেন যে মহাকবি কালিদাস তাঁহার মেঘদূত কাব্যে ময়ূর-পুচ্ছশোভিত গোপবেশধারী বিষ্ণুর উল্লেখ করিয়াছেন;[২] পুরাণাদির পূর্বে গোপ-বেশধারী বিষ্ণুর প্রসিদ্ধি ছিল না; সুতরাং কালিদাসকে যদি ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়াও গ্রহণ করা হয় তবে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই কিছু কিছু বৈষ্ণব পুরাণের প্রচলন ও প্রসিদ্ধি ছিল মনে করিতে হইবে।

এই পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত বিষ্ণু-শক্তি সম্বন্ধে আলোচনার ভিতরে আমরা দুইটি ধারা লক্ষ্য করিতে পারি; একটি হইল কিংবদন্তি ও উপাখ্যানের ধারা, আর একটি হইল তত্ত্ব-বিশ্বাসের ধারা। পূর্বধারায় দেখিতে পাই, বিষ্ণু-শক্তি লক্ষ্মী বা শ্রী সম্বন্ধে প্রাচীন যে সকল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বা প্রসিদ্ধি ছিল তাহাকেই অনেকখানি কবি-কল্পনার দ্বারা পল্লবিত করিয়া বিভিন্ন উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয় ধারাটি বিশুদ্ধ কোন দার্শনিক তত্ত্বের ধারা বলিতে পারি না, উহাতেও দেখিতে পাই বিভিন্ন প্রকারের তত্ত্ব ও ধর্মবিশ্বাসের কতগুলি জনপ্রিয় সংমিশ্রণ। আমরা প্রথমে এই কিংবদন্তি ও উপাখ্যানের ধারাটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া পরে তত্ত্ব-বিশ্বাসের ধারাটি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথারও সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে চাই, পরে আমরা এই কথার তাৎপর্য আরও অনেক প্রসঙ্গে আরও স্পষ্ট এবং গভীর করিয়া অনুভব করিবার সুযোগ পাইব। কথাটি এই, আমাদের একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে, ধর্মতত্ত্ব প্রথমে বোধ হয় কতগুলি দার্শনিক তত্ত্ব রূপেই অভিব্যক্ত হয়; এই দার্শনিক তত্ত্ব জনসাধারণের ধর্মসংস্কার ও বিশ্বাস, আচার-বিচার, প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া নানাপ্রকার লৌকিক প্রবাদ, কিংবদন্তি ও কাহিনীতে পল্লবিত হইতে থাকে।

---

১ কৃষ্ণ-চরিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র।

২ পূর্বমেঘ, ১৫ শ্লোক।

কিন্তু ধর্মের ইতিহাসে ইহার বিপরীত জিনিসটিই বোধহয় বেশী ঘটিয়া থাকে। লৌকিক সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-বিচার, প্রথা-পদ্ধতিগুলিই সমাজ-জীবনে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে; অধ্যাত্ম-চিন্তাশীল মনস্বিগণ এই সকল লৌকিক উপাদানকে গ্রহণ করিয়াই তাহাদ্বারা তত্ত্বের সৌধ গড়িয়া তোলেন।

পুরাণাদি শাস্ত্রের ভিতরে এই লৌকিক উপাদানেরই প্রাধান্য। দেশের বৃহত্তর জন-সমাজের বিশ্বাস, রুচি, ধ্যান-মনন এখানে অনেক সময় অধিক পরিমাণে প্রকাশের সুযোগ লাভ করিয়াছে; সুতরাং প্রবাদ-কিংবদন্তী-উপাখ্যানাদিকে একেবারে বাদ দিয়া ইহার ভিতর হইতে কোন বিশুদ্ধ তত্ত্বকে ছাঁকিয়া বাহির করিবার চেষ্টাকে দুশ্চেষ্টাই বলিতে হইবে।

দার্শনিক দৃষ্টিতে লক্ষ্মী বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, শক্তিমান্ বিষ্ণুরই শক্তিমাত্র; কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী স্বামি-স্ত্রী মাত্র। এই জন্যই শিব-শক্তির দার্শনিক তত্ত্ব যাহাই হোক্ না কেন, লৌকিক বিশ্বাসে তাঁহারা পরিষ্কার স্বামী-স্ত্রী। সাধারণ জনগণ তাহাদের সমাজবোধের দ্বারাই ধর্মবোধকে গড়িয়া তোলে; এই সমাজবোধ দ্বারাই সর্বত্র শক্তি ও শক্তিমান্ স্বামি-স্ত্রীরূপে পরিকল্পিত। তবে দেবতা-সম্বন্ধে এই স্বামি-স্ত্রীরূপ সমাজ-বোধটি পূর্বের, না শক্তিমান্-শক্তির তত্ত্ব-বোধটি পূর্বের তাহা একেবারে স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না। অনেক সময় উভয় বোধই পরস্পরের পরিপূরক; সমাজবোধও অধ্যাত্ম-তত্ত্ববোধের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, আবার অধ্যাত্ম-তত্ত্ববোধও সমাজবোধের দ্বারা বিচিত্রভাবে রূপায়িত হয়।

(ক) পুরাণাদিতে লক্ষ্মী সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী ও উপাখ্যান

পুরাণাদিতে আমরা বিষ্ণুর বর্ণনায় প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাই, তিনি লক্ষ্মী-পতি, শ্রীপতি, রমাপতি, কমলাপতি, শ্রীনাথ, শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত ইত্যাদি। লক্ষ্মীও হইলেন বিষ্ণুপ্রিয়া বা হরিপ্রিয়া, বিষ্ণুবক্ষোবিলাসিনী, বৈষ্ণবী, নারায়ণী। বিষ্ণু হইলেন 'লক্ষ্মীমুখাম্বুজমধুব্রতদেবদেব'[১], 'লক্ষ্মীমুখপদ্মভৃঙ্গ'[২], 'লক্ষ্মী-বিলাসাঙ্গ'[৩], 'রমামানস-হংস'[৪]। পুরাণাদিতে লক্ষ্মীর এই বিষ্ণুপত্নীত্ব লাভের

১ পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগসার), ১।৬৮

২ ঐ, ৪।৭৫

৩ ঐ, ভূমিখণ্ড, ১৯।৫৪

৪ গোপালতাপনী, ৩৯

ফলে তাঁহার বিষ্ণু-শক্তিরূপত্ব যেন অনেক স্থানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এই জন্যই স্থানে স্থানে দেখি বিষ্ণু যতই শ্রীপতি বা লক্ষ্মীপতি হোন্ না কেন, জগৎ-সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার প্রকৃতি বা মায়া-শক্তিদ্বারাই সাধিত হইয়াছে এবং প্রকৃতি বা মায়া-শক্তির সহিত লক্ষ্মীরূপা আদিবিষ্ণুশক্তির সর্বত্র যোগ দেখান হয় নাই।

পুরাণগুলিতে লক্ষ্মীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার ভিতরে দুইটি উপাখ্যানকেই প্রধান বলিয়া মনে হয়; এই দুইটি উপাখ্যানই প্রথমে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল মনে হয়; পুরাণকারগণ সর্বত্রই এই দুইটি উপাখ্যানকে আবার জোড়াতালি দিয়া এক করিয়া দিয়াছেন। প্রথম উপাখ্যান মতে, স্বায়ম্ভুব মনু রুদ্রজাতা শতরূপা দেবীকে বিবাহ করিলেন্। এই দেবীর গর্ভে মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে পুত্রদ্বয় এবং প্রসূতি ও আকুতি নামে কন্যাদ্বয় জন্মগ্রহণ করে। দক্ষ প্রসূতিকে বিবাহ করেন এবং প্রসূতির গর্ভে চতুর্বিংশতি কন্যা উৎপাদন করেন। এই চতুর্বিংশতি কন্যার মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি এবং কীর্তি এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যাকে ধর্ম পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, ঊর্জা, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ দক্ষকন্যাকে ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বসিষ্ঠ, বহ্নি এবং পিতৃগণ বিবাহ করেন।[১] এই ধর্মের ঔরসে লক্ষ্মীর (চলা) গর্ভে দর্প নামক পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। বিষ্ণু-পুরাণের পরবর্তী অধ্যায়ে আবার দেখিতে পাই, ভৃগু-পত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা-বিধাতা নামে পুত্রদ্বয় এবং লক্ষ্মী নাম্নী কন্যার জন্ম হয়; এই ভৃগু-কন্যা লক্ষ্মীই দেবদেব নারায়ণকে পতিরূপে বরণ করেন।[২] মোটের উপরে দেখা যাইতেছে, লক্ষ্মী হয় প্রসূতিগর্ভে দক্ষকন্যা অথবা খ্যাতির গর্ভে ভৃগুকন্যা। এই সকল বর্ণনাতেই পুরাণগুলিতে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে শোনা যায়, লক্ষ্মী হইলেন সমুদ্রোদ্ভবা, ক্ষীরাব্ধি হইতে কমলাসনে তাঁহার আবির্ভাব,—তাহা হইলে আবার তাঁহার দেবকন্যাত্ব বা ঋষিকন্যাত্ব সম্ভব হয় কি করিয়া। এই প্রশ্নটি দেখিলেই মনে হয়, সমুদ্রমন্থনে ক্ষীরাব্ধি হইতে কমলাসনা

১ বিষ্ণুপুরাণ, ১।৭।১৪-২৬; পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৩।১৮৩ প্রভৃতি; গরুড়পুরাণ, ৫।১৪-২৬

২ বিষ্ণুপুরাণ, ১।৮।১৩; বায়ুপুরাণ, ২৮।১-৩; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ২৯।১-৪; কূর্মপুরাণ, পূর্বভাগ, ১৩।১। বায়ুপুরাণ মতে লক্ষ্মীর গর্ভে নারায়ণের বল ও উৎসাহ নামক দুই পুত্র জন্মে। যাঁহারা স্বর্গচারী ও যাঁহারা পুণ্যকর্মা ও দেবগণের বিমানবহনকারী, তাঁহারা সকলেই এই লক্ষ্মী বা শ্রীদেবীর মানস-পুত্র।

লক্ষ্মীর আবির্ভাবের কিংবদন্তীটিই প্রাচীনতর। পরবর্তী কালে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে মানব-সৃষ্টির প্রসঙ্গে লক্ষ্মী সম্বন্ধে দেব-ঋষি-ঘটিত নূতন উপাখ্যান গড়িয়া উঠিয়াছে ; পরে দুইটি উপাখ্যানকে অতি শিথিলভাবে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

লক্ষ্মীর ক্ষীরাব্ধি হইতে আবির্ভাব সম্বন্ধে পুরাণগুলিতে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি নিম্নলিখিতরূপ। শঙ্করাংশে জাত দুর্বাসা মুনি এক বিদ্যাধরীর নিকট হইতে সন্তানকপুষ্পের দিব্য গন্ধমালা যাচ্ঞা করিয়া লইলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে তাহা উপহার দিলেন। 'শ্রী'র নিবাসভূতা সেই মালা ইন্দ্রকর্তৃক অবহেলিত হইলে দুর্বাসা ইন্দ্রকে শাপ দিলেন যে তাঁহার (ইন্দ্রের) ত্রৈলোক্য 'প্রনষ্টলক্ষ্মীক' হইবে। এইরূপে দুর্বাসার শাপে ত্রিলোকের শ্রী বা লক্ষ্মী বিনাশ-প্রাপ্ত বা অন্তর্হিত হইলে হতবীর্য হৃতশ্রী দেবগণ অসুরগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মাকে লইয়া দেবগণ দেবাদিদেব বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলে বিষ্ণু দেবাসুরে মিলিয়া সমুদ্র-মন্থনের উপদেশ দিলেন ; সেই সমুদ্র-মন্থনের ফলেই—

> ততঃ স্ফুরৎকান্তিমতী বিকাসিকমলে স্থিতা।
> শ্রীর্দেবী পয়সস্তস্মাদুত্থিতা ভূতপঙ্কজা॥ (বিষ্ণুপুরাণ, ১।৯।৯৯)

তখন তাঁহাকে মহর্ষিগণ শ্রীসূক্তের দ্বারা স্তব করিলেন, বিশ্বাবসুপ্রমুখ গন্ধর্বগণ তাঁহার সম্মুখে গান করিতে লাগিলেন, ঘৃতাচী প্রমুখ অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন, গঙ্গাদি সরিৎসকল দেবীর স্নানার্থ উপনীত হইলেন, দিগ্‌গজগণ হেমপাত্র গ্রহণ করিয়া সর্বলোকমহেশ্বরী সেই দেবীকে স্নান করাইয়া দিলেন ; ক্ষীরোদসাগর নিজে রূপধারী হইয়া অম্লানপঙ্কজা মালা দান করিলেন এবং স্বয়ং বিশ্বকর্মা দেবীর অঙ্গবিভূষণ সম্পাদন করিলেন। এইরূপে স্নাতা, ভূষণ-ভূষিতা এবং দিব্যমাল্যাম্বরধরা হইয়া সেই দেবী সকলের সম্মুখে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলই আশ্রয় করিলেন।

লক্ষ্মীর এই সমুদ্রমন্থনে আবির্ভাব বর্ণনের পর পুরাণগুলিতে বলা হইয়াছে, ভৃগুপত্নী খ্যাতিতে উৎপন্না শ্রী (অথবা মতান্তরে দক্ষকন্যা শ্রী) দেবদানবের যত্নে অমৃত-মথনে পুনর্বার প্রসূত হন ; অর্থাৎ লক্ষ্মীর এই দেব-কন্যাত্ব বা ঋষি-কন্যাত্ব লক্ষ্মীর পুনরাবির্ভাব। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু-পুরাণে বলা হইয়াছে, জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দন যেমন বারবার নানাভাবে অবতার গ্রহণ করেন তৎ-সহায়িনী শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীও তদ্রূপ। হরি যখন আদিত্য (বামন) হইয়াছিলেন, লক্ষ্মী তখন পুনশ্চ পদ্ম হইতে উদ্ভূতা হন ; যখন ভার্গব রাম হন, তখন ইনি ধরণী হইয়া-

ছিলেন; রাঘবত্বে সীতা, কৃষ্ণজন্মে রুক্মিণী এবং অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী। ইনি দেবত্বে দেবদেহা ও মনুষ্যত্বে মানুষী হইয়া বিষ্ণুর দেহানুরূপ আত্মতনু গ্রহণ করিয়া থাকেন।[১]

নারদীয়-পুরাণ, ধর্ম-পুরাণ ও কূর্ম-পুরাণে আবার লক্ষ্মী ও সরস্বতী শিবদুর্গার কন্যা। বাঙলাদেশে শরৎকালীন দুর্গাপূজার সময় ভগবতীর যে প্রতিমা প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে দুর্গামূর্তির দক্ষিণে ও বামে দুর্গার দুই কন্যার ও কার্ত্তিক-গণেশ দুই পুত্রের মূর্তি থাকে। এই দুই কন্যা জয়া-বিজয়া নামেও পরিচিতা, লক্ষ্মী-সরস্বতী রূপেও পরিচিতা; দেবীর দক্ষিণস্থা কন্যামূর্তি কমলবর্ণা, কমলাসনা এবং কমলহস্তা; বামস্থা মূর্তি হয় শ্বেতপদ্মারূঢ়া বা মরালবাহনা এবং বীণাহস্তা। বাঙলা দেশের লৌকিক প্রবাদে লক্ষ্মী আবার কার্ত্তিকের স্ত্রী। কখনও কখনও লক্ষ্মীকে গণেশের স্ত্রী বলিয়াও কল্পনা করা হয়। তাহার কারণ বোধহয় এই, দুর্গাপূজায় দেবীর শস্য-প্রতীক নবপত্রিকাটি অনেক সময় গণেশের পাশেই বসান হয়। সান্নিধ্যহেতু এই নবপত্রিকাকে গণেশের স্ত্রী বলিয়া ভুল করা হয়। এই শস্যরূপিণী নবপত্রিকাই আবার কোজাগর লক্ষ্মী পূজায় লক্ষ্মীর প্রতীকরূপে পূজিতা; এইভাবেই বোধ হয় লক্ষ্মী আবার গণেশের পত্নীত্ব লাভ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে (১৮ ও ১৯ অধ্যায়) লক্ষ্মী দত্তাত্রেয় ঋষির পত্নী। অসুরগণ-কর্তৃক লাঞ্ছিত দেবগণ দত্তাত্রেয়ের শরণাপন্ন হন; দত্তাত্রেয়ের পত্নী লক্ষ্মীর রূপে মুগ্ধ হইয়া দেবগণ তাঁহাকে হরণ করিয়া মস্তকে তুলিয়া লইয়া যান; লক্ষ্মী এই-ভাবে মস্তকে স্থাপিতা হওয়ায়ই দেবগণ বিজয় লাভ করেন।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, লক্ষ্মীর প্রাচীন মূর্তি কল্পনার ভিতরে গজলক্ষ্মীর প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। এই গজলক্ষ্মীর পরিকল্পনাটি সাধারণতঃ এইরূপঃ—সমুদ্রের মধ্যে একটি বিকশিত কমলের উপরে লক্ষ্মী দণ্ডায়মানা, তাঁহার দুই দিক্ হইতে দুইটি হস্তী শুণ্ডের দ্বারা স্বর্ণকুম্ভের জলে (অথবা শুধু শুণ্ডোৎক্ষিপ্ত জলে) তাঁহাকে স্নান করাইতেছে। আমরা শ্রীসূক্তের ভিতরেই লক্ষ্য করিয়াছি, লক্ষ্মী নানাভাবে পদ্মের সহিত সংশ্লিষ্টা।[২] এই শ্রী বা লক্ষ্মী সৃষ্টিরূপিণী; সবদেশেই পদ্ম সৃজনী-শক্তির প্রতীকরূপে গৃহীত। এই জন্যই বিষ্ণুর নাভি-কমলে প্রজাপতি ব্রহ্মার অবস্থানের কল্পনা। এই জন্যই লক্ষ্মী প্রথমাবধি পদ্মা, পদ্মাসনা, পদ্মালয়া

১ বিষ্ণুপুরাণ, ১।৯ অধ্যায়। অন্যান্য পুরাণেও মোটামুটি এই বর্ণনাই পাওয়া যায়।

২ দ্রঃ— তস্মিন্ পদ্মে ভগবতী সাক্ষাৎ শ্রীর্নিত্যমেব হি।
লক্ষ্ম্যাস্তত্র সদা বাসো মূর্তিমত্যা ন সংশয়ঃ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৩৯।৮

বা কমলা, কমলাসনা, কমলালয়া। এই কমল সলিলোদ্ভূত। সেইজন্যই কি লক্ষ্মীর সমুদ্রোদ্ভব কল্পনা করা হইয়াছে? আমরা শ্রীসূক্তেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, লক্ষ্মী পদ্মা, পদ্মবর্ণা, পদ্মেস্থিতা, আবার 'আর্দ্রা'। এই পদ্ম ও সাগরের সহিত লক্ষ্মীর সম্বন্ধের ফলেই পরবর্তী কালের রাধা 'পদুমিনী'র উদরে 'সাগরে'র ঘরে (অর্থাৎ সাগরের ঔরসে, পদুমিনীর গর্ভে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[১] বিষ্ণুপুরাণে দেখিতেছি, সমুদ্রোদ্ভূতা পদ্মাসনা লক্ষ্মীকে দিগ্‌গজগণ আসিয়া হেমকুম্ভের দ্বারা স্নান করাইতেছে। এই ভাবেই কি সমুদ্রমধ্যে পদ্মস্থিতা লক্ষ্মীর সহিত দুই পাশে গজের কল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছিল? অবশ্য গজলক্ষ্মীর আর একটি রূপ পাওয়া যায়, তাহা আরও দুর্বোধ্য। এই রূপে পদ্মস্থিতা লক্ষ্মী একহাতে একটি গজকে ধরিয়া একবার গ্রাস করিতেছেন, আবার তাহাকে বমন করিয়া বাহির করিতেছেন।[২] এই পরিকল্পনাটির কি ভাবে উদ্ভব হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলেও এই কল্পনাটিরও যে প্রাচীন ভিত্তি রহিয়াছে, শ্রীসূক্তের 'পুষ্করিণীং' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। কেহ কেহ এই পরিকল্পনার ভিতরে বৌদ্ধ উপাখ্যান বুদ্ধদেবের মাতৃগর্ভে আবির্ভাবের পূর্বে বুদ্ধ-মাতা মায়াদেবীর হস্তী গ্রাস ও বমনের স্বপ্নের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি পৌরাণিক তথ্যও লক্ষণীয়। পুরাণে অঘটন-ঘটনপটীয়সী বিষ্ণুমায়ার বর্ণনায় স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে এই দেবী সদেবাসুর-মানুষ সর্ব জগৎকে গ্রাস করেন আবার সৃজন করেন।[৩] ইহাই কি লক্ষ্মীদেবীর গজ-ভক্ষণ ও গজ-মোক্ষণের তাৎপর্য? বৃহদাকার পশু হস্তী কি এখানে বিরাট্ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক মাত্র?[৪]

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

২ ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলা মঙ্গলকাব্যের প্রসিদ্ধ কবি মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি-সদাগরের উপাখ্যানে যে 'কমলে কামিনী'র বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেও লক্ষ্মীর এই হস্তি-গ্রাসকারিণী ও হস্তি-বমনকারিণী মূর্তিরই পরিচয় পাই।

৩ অনয়ৈব জগৎ সর্বং সদেবাসুরমানুষম্।
মোহয়ামি দ্বিজশ্রেষ্ঠা গ্রসামি বিসৃজামি চ॥
কূর্মপুরাণ (পূর্বভাগ) ১।৩৫

৪ পরবর্তী কালের কবীর প্রভৃতির প্রহেলিকা-কবিতার ভিতরেও এই ভাবের আভাস আছে।

'তন্ত্রসার' প্রভৃতি গ্রন্থে লক্ষ্মীর যে ধ্যানমন্ত্র দেখিতে পাই সেখানে লক্ষ্মীর উভয়পার্শ্বে হেমকুম্ভধারী করিদ্বয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই।[১]

খিল-হরিবংশে দেখি, শ্রী, ধী ও সন্নতি নিত্য কৃষ্ণে বিরাজমানা।[২] বিষ্ণু-পুরাণে বিষ্ণু-শক্তি মহামায়া ভূতি, সন্নতি, কীর্তি, ক্ষান্তি, দ্যৌ, পৃথিবী, ধৃতি, লজ্জা, পুষ্টি, উষা বলিয়া অভিহিতা।[৩] অন্যান্য পুরাণাদিতেও বহুবিধা শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। শক্তির এ-জাতীয় বহুবিধ উল্লেখের কথা আমরা পঞ্চরাত্র-গ্রন্থগুলিতেও লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। তন্ত্রসারে ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষ্মী প্রভৃতি লক্ষ্মীর দ্বাদশ নাম এবং স্কন্দপুরাণে লক্ষ্মী, পদ্মালয়া, পদ্মা, কমলা, শ্রী, ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি সপ্তদশ নামের উল্লেখ পাই। বিষ্ণুর শ্রী ও ভূ এই দুই শক্তি বা শ্রী, ভূ ও লীলা এই ত্রিশক্তির উল্লেখও অনেক আছে। ব্রহ্ম-পুরাণে লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর ভিতরে বেশ ঝগড়া দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণে লক্ষ্মীর প্রিয়-অপ্রিয় ব্যক্তি, কার্য ও স্থানের বিশদ আলোচনা রহিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাণগুলির ভিতরে লক্ষ্মীর কতগুলি বর্ণনা রহিয়াছে যেগুলি স্পষ্টতঃ কোন তত্ত্বাশ্রিত নহে, তাহাতে লক্ষ্মী সম্বন্ধে জনগণের যে সাধারণ বিশ্বাস তাহাই কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায় প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে বলা হইয়াছে, মূলপ্রকৃতির ভিতরে যিনি দ্বিতীয় শক্তি, যিনি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা তিনিই পরমাত্মা বিষ্ণুর লক্ষ্মী। তিনি সম্পৎ-স্বরূপা, সমস্ত সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি মনোহারিণী, দান্তা, শান্তা, সুশীলা, মঙ্গলদায়িনী, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারাদি দোষবর্জিতা। তিনি পতিভক্তার অনুরক্তা, পতিব্রতা, আদিভূতা, ভগবৎ-প্রাণতুল্যা, প্রেমপাত্রী ও প্রিয়ভাষিণী। তিনি শস্যস্বরূপা, অতএব জীবের জীবন-রূপিণী, মহালক্ষ্মী। তিনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুসেবাপরায়ণা, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, রাজভবনে রাজলক্ষ্মী, মর্ত্যে গৃহলক্ষ্মী। তিনি সর্বপ্রাণী ও দ্রব্যের শোভাস্বরূপা[৪],

১ কান্ত্যা কাঞ্চন-সন্নিভাং হিমিগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্। ইত্যাদি।

তুঃ···শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত অন্য ধ্যানমন্ত্র :—

মাণিক্যপ্রতিমপ্রভাং হিমনিভৈস্তুঙ্গৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
র্হস্তগ্রাহিতরত্নকুম্ভসলিলৈরাসিচ্যমানাং সদা। ইত্যাদি।

২ ১০১।৭৩ (বঙ্গবাসী)

৩ ৫।১।৮১

৪ তুঃ—ত্বং লক্ষ্মীশ্চারুরূপাণাম্। কূর্মপুরাণ, পূর্বভাগ, ১২।২১৯ (বঙ্গবাসী

নৃপতির প্রভাস্বরূপা, বণিকের বাণিজ্যস্বরূপা, চঞ্চলের চঞ্চলা[১]। বিষ্ণু-পুরাণের একস্থানের লক্ষ্মী-বর্ণনা কোন স্পষ্ট তত্ত্বমূলক না হইলেও গভীর ভাবদ্যোতক। সেখানে বলা হইয়াছে, বিষ্ণুর সেই অনপায়িনী শ্রী জগন্মাতা এবং নিত্যা; বিষ্ণু যেমন সর্বগত ইনিও সেইরূপ। বিষ্ণু হইলেন অর্থ, ইনি হইলেন বাণী; হরি হইলেন নয় (উপদেশ), ইনি নীতি। বিষ্ণু হইলেন বোধ, ইনি বুদ্ধি; বিষ্ণু ধর্ম, ইনি সৎক্রিয়া। বিষ্ণু স্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি; শ্রী ভূমি, হরি ভূধর; ভগবান্ সন্তোষ, লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি। শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্ কাম; বিষ্ণু যজ্ঞ, শ্রী দক্ষিণা; আজ্য-আহুতি হইলেন এই দেবী, জনার্দন পুরোডাশ। লক্ষ্মী পত্নীশালা, মধুসূদন প্রাগ্বংশ; লক্ষ্মী চিতি (যজ্ঞের ইষ্টক-বেদী), হরি যূপ; শ্রী ইধ্যা, ভগবান্ কুশ। ভগবান সাম-স্বরূপী, কমলালয়া উদ্গীতি; লক্ষ্মী স্বাহা, বাসুদেব জগন্নাথ হুতাশন। ভগবান্ শৌরি শঙ্কর, ভূতি গৌরী; কেশব সূর্য, কমলালয়া তৎপ্রভা। বিষ্ণু পিতৃগণ, পদ্মা শাশ্বততুষ্টিদা স্বধা; শ্রী হইলেন দ্যৌ, আর বিষ্ণু হইলেন অতিবিস্তর অবকাশ। শ্রীধর হইলেন শশাঙ্ক, শ্রী তাঁহারই অনপায়িনী কান্তি। লক্ষ্মী ধৃতি জগচ্চেষ্টা, হরি সর্বত্রগ বায়ু। গোবিন্দ জলধি, শ্রী তাঁহার বেলাভূমি; লক্ষ্মী ইন্দ্রাণী, মধুসূদন দেবেন্দ্র।······লক্ষ্মী জ্যোৎস্না, সর্বেশ্বর হরি প্রদীপ; জগন্মাতা শ্রী লতা, বিষ্ণু হইলেন দ্রুম। শ্রী হইলেন বিভাবরী, চক্রগদাধর দেব হইলেন দিবস; বিষ্ণু হইলেন বরপ্রদ বর, পদ্মবনালয়া হইলেন বধূ। ভগবান্ হইলেন নদ, শ্রী নদী; পুণ্ডরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া তাহার পতাকা। লক্ষ্মী তৃষ্ণা, নারায়ণ লোভ; লক্ষ্মী রতি, গোবিন্দ রাগ। অথবা বেশী কথা বলায় লাভ কি, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, দেবতির্যক্-মনুষ্যাদির মধ্যে পুরুষ হইলেন ভগবান্ হরি, স্ত্রী হইলেন লক্ষ্মী।[২]

(খ) তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে পুরাণ-বর্ণিত বিষ্ণুশক্তি ও বিষ্ণুমায়া

তত্ত্বের দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে সব পুরাণগুলির ভিতরেই ঈশ্বরবাদের একটা সমন্বয়-দৃষ্টি দেখিতে পাই। এই সমন্বয়-দৃষ্টির ফলে পুরাণগুলির ভিতরে পরস্পরবিরোধী সকল উপাখ্যান ও মতামতের ভিতর দিয়া ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা সাধারণ ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে অবশ্য যে সমন্বয়-দৃষ্টি দেখিতে

১ ব্রহ্মবৈবর্ত, প্রকৃতিখণ্ড, ১।২২-৩০ (বঙ্গবাসী)

২ ১।৮।১৫-৩২

পাই তাহার ভিতরে স্পষ্ট দার্শনিক বোধ অপেক্ষা সর্বসাধারণ্যে প্রচলিত একটা সাধারণ ধর্মবোধেরই প্রাধান্য দেখিতে পাই; কিন্তু ভারতীয় ধর্মমতের ইতিহাসে ভগবত্তত্ত্বের এই সমন্বয়বাদের একটি বিশেষ পরিণত রূপ আমরা দেখিতে পাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে।[১] গীতার মধ্যে যে পুরুষোত্তমবাদের পরিচয় পাই, সেই পুরুষোত্তমবাদেরই নানা রকমের প্রকাশ যেন দেখিতে পাই এই পুরাণাদি শাস্ত্রের মধ্যে। আমাদের বিচারে আমরা তত্ত্বের দিক্ হইতে পূর্বালোচিত পঞ্চরাত্রোক্ত বাসুদেব-তত্ত্ব, কাশ্মীর-শৈবদর্শনোক্ত পরম শিব-তত্ত্ব, পুরাণাদিতে আলোচিত ভগবৎ-তত্ত্ব এবং গীতায় আলোচিত পুরুষোত্তমতত্ত্বের ভিতরে মৌলিক কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। গীতা বা অন্য কোনও একটি বিশেষ উৎস হইতেই এই মতবাদ পুরাণাদিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এমন কথা আমরা বলিব না; আমাদের মনে হয় ইহা একটি বিশেষ ভারতীয় দৃষ্টি;—বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের ভিতর দিয়া ইহা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে।

গীতোক্ত এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব কি? 'ক্ষর' এবং 'অক্ষর' এই দুই পুরুষই ব্রহ্মের দুই রূপ; ক্ষয্য মর্ত্য ভূত সকলই হইল ক্ষর, আর পরিবর্তনহীন কূটস্থ চৈতন্য পুরুষই হইলেন অক্ষর। যিনি পুরুষোত্তম পরমাত্মা—যিনি অব্যয় ঈশ্বর হইয়া লোকত্রয়ে প্রবেশপূর্বক লোকত্রয়কে ভরণ করিতেছেন, তিনি এই ক্ষর এবং অক্ষর উভয়েরই উর্ধ্বে, উভয় হইতেই পৃথক্। যেহেতু তিনি ক্ষরের অতীত, অক্ষর হইতেও উত্তম, এইজন্যই লোকে এবং বেদে তিনি 'পুরুষোত্তম' বলিয়া প্রথিত।[২] ক্ষর এবং অক্ষর যাহা কিছু সকল তাঁহাতেই বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, অথচ সকল বিধৃত করিয়াও তিনি সকলের উর্ধ্বে অবস্থান করিতেছেন। এই পুরুষোত্তম ঈশ্বর তাই প্রকৃতির উর্ধ্বে (যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ); সত্ত্ব, রজ, তম আদি গুণসকল তাঁহা হইতেই উৎসারিত, কিন্তু তিনি তাহাদের ভিতরে নাই, তিনি গুণময় হইয়াও গুণাতীত।[৩] সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে উৎসারিত এবং

১ গীতা মহাভারতেরই অঙ্গ কি না এ বিষয়ে অনেক পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, অনেকের ধারণা ইহা অনেক পরবর্তী কালে মহাভারতের সহিত যোজনা। এ-জাতীয় মত সত্য হইলেও গীতা যে প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণাদি হইতে প্রাচীনতর শাস্ত্র এ-বিষয়ে বোধ হয় কোনও সংশয় নাই।

২ গীতা, ১৫।১৬-১৮

৩ গীতা, ৩।৪২, ৭।১২

তাঁহার শক্তিতেই বিধৃত হইয়া আছে ; অব্যক্ত মূর্তিতে তিনি সকল জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার ভিতরে সর্বভূতের অবস্থান হইলেও তিনি কিছুর ভিতরেই নহেন। এই যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ইহা তাঁহার নিজেরই প্রকৃতি (প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য)—তাহাতেই পুরুষরূপে অধিষ্ঠান করিয়া তিনি সকল সৃজন করিয়া থাকেন ; তাঁহারই অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সকল প্রসব করে, ইহাই জগৎ-বিপরিবর্তনের কারণ। এই মহদ্‌ব্রহ্ম-প্রকৃতিই হইল যোনি, তাহাতেই তিনি গর্ভাধান করিয়া থাকেন ; তাহারই ফলে যাহা কিছু সকলের উৎপত্তি। এই যে গুণময়ী প্রকৃতি ইহাই তাঁহার মায়াশক্তি ; এ মায়াও 'দৈবী' মায়া, পুরুষোত্তমেরই আশ্রিতা মায়া ; নিজের মায়াশক্তি অবলম্বন করিয়াই তিনি নিজেকে জগদাকারে পরিবর্তিত করেন।

পুরাণাদিতেও আমরা মায়াতীত প্রকৃতির উর্ধ্বাবস্থিত পরম দেবতারই নানাভাবে উল্লেখ পাই। স্বরূপাবস্থায় তিনি অবিকার শুদ্ধ নিত্য পরমাত্মা, সদেকরূপ[১] ; তিনি মায়া বা প্রকৃতির অপর পারে অবস্থিত। কিন্তু তিনি অপর পারে অবস্থিত হইলেও যাহা কিছু হইয়াছে, 'ইদং' রূপে যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান এবং যাহা কিছু ভবিষ্যৎ—যাহা কিছু চর এবং অচর—যাহা আছে এবং নাই—ইহার সকলই তিনি।[২] যাঁহাতে জগৎ প্রতিষ্ঠিত অথচ জগতের দ্বারা যাঁহাকে দেখা যায় না, নিজের মায়াজাল বিস্তীর্ণ করিয়া যিনি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া আছেন তিনিই নারায়ণ পুরুষ।[৩] সমুদ্রবারিতে উর্মিমালার ন্যায় যাঁহা হইতে অশেষ ভূতের উদ্ভব হয়, আবার যাঁহার ভিতরেই সকল বিলয় প্রাপ্ত হয় তিনিই ভগবান্ বাসুদেব।[৪]

এই ভগবান্ পুরুষোত্তম নিত্যশক্তিসমন্বিত। এই শক্তি সাধারণতঃ দুই রূপে কীর্তিতা, এক গুণাতীতা স্বরূপ-শক্তি আর গুণাশ্রয়া শক্তি। যে শক্তি বাক্যমনের অতীতগোচরা, বিশেষণহীনা, শুধু মাত্র জ্ঞানিগণের জ্ঞান দ্বারাই পরিচ্ছেদ্যা সেই ঈশ্বরীই হইলেন পুরুষোত্তমের স্বরূপভূতা পরা শক্তি ; আর সর্বভূতের মধ্যে যে গুণাশ্রয়া শক্তি তাহাই হইল অপরা শক্তি।[৫] এই পরা-শক্তি-সমন্বিত ব্রহ্মই

১ বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।১

২ মৎস্যপুরাণ (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত), ১৬৪।২৭-২৮ ; ১৬৭।৫০-৬০

৩ ঐ, ২৪৪।১৬, ২৬

৪ ঐ, ২৪৫।২৩

৫ বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৯।৭৬-৭৭

হইলেন অমূর্ত অক্ষর-ব্রহ্ম, আর গুণাশ্রয়া অপরা শক্তির যোগে জগদ্রূপে মূর্ত যে রূপ তাহাই হইল ক্ষর-ব্রহ্ম। একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ বিস্তারিণী, সেইরূপ ব্রহ্ম তাঁহার এই গুণাশ্রয়া বিস্তারিণী শক্তি দ্বারাই জগৎ-রূপে পরিণত। অগ্নির সহিত আসন্নত্বহেতু বা দূরত্বহেতু যেমন জ্যোৎস্নার ভিতরে বহুত্ব বা স্বল্পত্বময় বহুবিধ ভেদ হয় তেমনই পুরুষোত্তমের সহিত সান্নিধ্য বা দূরত্ব বশতঃ এই শক্তির ভিতরেও বহুবিধ ভেদ দেখা যায়।[১] ত্রিভুবনবিস্তারিণী প্রধানভূতা বিষ্ণু-শক্তির ভিতরে সর্বব্যাপী চেতনাত্মা বিষ্ণু সেইভাবেই অবস্থান করেন, যেভাবে কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি বা তিলে তৈল বর্তমান থাকে। সর্বভূতের ভিতরে আত্মভূতা যে বিষ্ণু-শক্তি তাহা দ্বারাই পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ে (নিয়ম্যনিয়ন্তৃভাবে) সংশ্রয়ধর্মী হইয়া থাকে; আবার সৃষ্টির পূর্বে এই বিষ্ণু-শক্তিই ক্ষোভকারণভূতা হইয়া পরস্পর-সংশ্রিত পুরুষ-প্রকৃতির ভিতরে পৃথক্ ভাবের কারণ হয়।[২] বায়ু যেমন জলকণাগত শৈত্য ধারণ করে অথচ তাহার সহিত মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ বিষ্ণুর জগচ্ছক্তি প্রধান-পুরুষাত্মিকা হইয়াও প্রধান-পুরুষের সহিত কখনও মিশ্রিত হয় না। এই পরা বিষ্ণু-শক্তিরূপে বিষ্ণু নিজেই হইলেন মূল-প্রকৃতি।[৩] বিষ্ণু-পুরাণের অন্যত্র এই তিন প্রকারের শক্তির কথা বলা হইয়াছে, প্রথম হইল পরা শক্তি, দ্বিতীয় হইল ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা অপরা শক্তি এবং তৃতীয় হইল কর্মসংজ্ঞা অবিদ্যা শক্তি। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তিই হইল

১ দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্তঞ্চামূর্তমেব চ।
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্বভূতেষ্ববস্থিতে॥
অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্বমিদং জগৎ।
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা॥
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তদেতদখিলং জগৎ।
তত্রাপ্যাসন্নদূরত্বাদ্ বহুত্বস্বল্পতাময়ঃ॥ ১।২২।৫৩-৫৫

২ তুঃ—কূর্মপুরাণ (পূর্বভাগ):—
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব প্রবিশ্যাশু মহেশ্বরঃ।
ক্ষোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ॥
যথা মদো নবস্ত্রীণাং যথা বা মাধবো হনিলঃ।
অনুপ্রবিষ্টঃ ক্ষোভায় তথাসৌ যোগমূর্তিমান্॥ ৪।১৩-১৪
মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৪৬।৯-১০ শ্লোকও এই একই শ্লোক।

৩ বিষ্ণুপুরাণ, ২।৭।২৮-৪২। তুঃ—পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড ৪র্থ অধ্যায়।

জীবভূতা শক্তি ; কর্মসংজ্ঞা অবিদ্যা শক্তির প্রভাবে এই ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি সংসারে অখিলতাপ ভোগ করিয়া থাকে এবং এই অবিদ্যার সংস্পর্শেই এই ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি সর্বভূতের ভিতরে তরতমভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। আর অমূর্ত যে ব্রহ্মের রূপ—যাহাকে জ্ঞানিগণ বিশুদ্ধ সন্মাত্র বলিয়া অভিহিত করেন—তাঁহার ভিতরেই সমস্ত শক্তির মূল শক্তি নিহিত রহিয়াছে—সেই মূলভূতা শক্তিই পরা শক্তি।[১] এই বিষ্ণুশক্তিকে আবার হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিন-ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ;[২] এবিষয়ে বিশদ আলোচনা পরে করিব।

পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই বিষ্ণু-শক্তির অন্তর্গত।[৩] প্রকৃতিকে পুরাণগুলিতে বিভিন্ন প্রকারে গ্রহণ করা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে প্রকৃতিই হইল পরা শক্তি বা আদ্যা শক্তি। বিষ্ণু-পুরাণে বিষ্ণুর পরা শক্তিকে বলা হইয়াছে মূল-প্রকৃতি। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—'প্র' শব্দ হইল প্রকৃষ্টবাচক, 'কৃতি' শব্দ হইল সৃষ্টিবাচক ; সৃষ্টিতে (অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যাপারে) যিনি হইলেন প্রকৃষ্টা তিনিই হইলেন 'প্রকৃতি'। শ্রুতিতে 'প্র' শব্দ প্রকৃষ্টসত্ত্ববাচক, 'কৃ' শব্দ রজোগুণবাচক এবং 'তি' শব্দ তমোগুণবাচক ; যিনি ত্রিগুণাত্মস্বরূপা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবই হইলেন এই তিন গুণ), সর্বশক্তিসমন্বিতা, সৃষ্টিকারণে প্রধান—তিনিই প্রকৃতি। অথবা 'প্র' হইল প্রথম-বাচক, 'কৃতি' হইল সৃষ্টি-বাচক ; যিনি হইলেন সৃষ্টির আদ্যা, তিনিই হইলেন প্রকৃতি।[৪] প্রধান পুরুষ পরমাত্মা যোগের দ্বারা নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন,

১ বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ইত্যাদি। ৬।৭।৬১ হইতে।

২ হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ। বিষ্ণুপুরাণ, ১।১২।৬৯

তুঃ—হ্লাদিনী ত্বয়ি শক্তিঃ সা ত্বয্যেকা সহভাবিনী। পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৪।১২৪

৩ বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৭।৩০ ; কূর্মপুরাণ (উপরিভাগ), ৪।২৬

৪ প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥
গুণে প্রকৃষ্টসত্ত্বে চ প্রশব্দো বর্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তিশব্দস্তমসি স্মৃতঃ ॥
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্বশক্তিসমন্বিতা।
প্রধানং সৃষ্টিকারণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে ॥
প্রথমে বর্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টেরাদ্যা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥ (বঙ্গবাসী)।

তাঁহার অঙ্গের দক্ষিণ ভাগ পুরুষ এবং বাম ভাগ প্রকৃতি স্বরূপ হইল। এই প্রকৃতি ব্রহ্ম-স্বরূপা, মায়াময়ী, নিত্যা এবং সনাতনী; অনলের দাহিকা শক্তির ন্যায় যে স্থানে আত্মা, প্রকৃতিও সেই স্থানে বিরাজ করে। এই আদ্যাশক্তিস্বরূপা মূল-প্রকৃতি সৃষ্টি-কার্যের জন্য পঞ্চধা বিভক্ত হইলেন, 'দুর্গা' হইল প্রকৃতির প্রথম রূপ, দ্বিতীয় লক্ষ্মী, তৃতীয়া শক্তি হইল সরস্বতী, চতুর্থী সাবিত্রী, পঞ্চমী রাধা।

পুরাণাদিতে বিষ্ণুর পরা শক্তিকে এইভাবে অনেক স্থলে প্রকৃতি বা মূল-প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকিলেও সাধারণভাবে প্রকৃতিকে বিষ্ণুর অপরা শক্তি বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা পঞ্চরাত্রে যেমন বিষ্ণুর স্বরূপভূতা বা সমবায়িনী পরা শক্তি এবং গুণাত্মিকা মায়ারূপিণী প্রাকৃত শক্তির কথা দেখিয়া আসিয়াছি, কাশ্মীর-শৈবদর্শনে যেরূপ সমবায়িনী শক্তি ও পরিগ্রহা শক্তির ভেদ দেখিয়া আসিয়াছি, পুরাণগুলিতেও মোটামুটিভাবে শক্তির সেই ভেদই রক্ষিত হইতে দেখি। সৃষ্টি-প্রকরণ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রকৃতির যত উল্লেখ দেখিতে পাই সেখানে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বই মোটামুটি স্থান পাইয়াছে; কিন্তু সাংখ্যের ন্যায় প্রকৃতি এখানে স্বতন্ত্রা নহে, প্রকৃতি এখানে ভগবান্ বিষ্ণুরই প্রাকৃত-শক্তি মাত্র। এই প্রাকৃত-শক্তির সহিত ভগবানের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বলিয়া ভগবান্‌কে সর্বত্রই 'প্রকৃতির পর' বলা হইয়াছে।[১] তিনি নিজের ভিতরে নিজে 'কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপে' বিরাজমান। নিজের প্রকৃতি দ্বারা ত্রিগুণাত্মক সকল 'ইদং'-পদার্থকে তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতরে অপ্রবিষ্ট হইয়াও প্রবিষ্ট-রূপে পরিভাবিত হন।[২] এই প্রকৃতির ভিতর দিয়া যে বিশ্ব-পরিণাম তাহা মূলতঃ সেই

শুদ্ধঃ সূক্ষ্মো ঽখিলব্যাপী প্রধানাৎ পরতঃ পুমান্। বিষ্ণুপুরাণ, ১।১২।৫৪
অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥
স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥ ভাগবতপুরাণ (বঙ্গবাসী), ৩।২৬।৩-৪
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥ ঐ, ১০।৮৮।৫
বিদিতো ঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিধৃক্॥
স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে॥ ১০।৩।১৩-১৪

বিষ্ণু-পরিণামই বটে।[১] সেইজন্ত বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুব কর্তৃক বিষ্ণুর স্তবে দেখিতে পাই,—অতি ক্ষুদ্র একটি বীজের ভিতরে যেমন একটি বিরাট্ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ নিহিত থাকে, সংযমকালে (অর্থাৎ বিষ্ণুর আত্ম-সংহরণকালে) অখিল বিশ্বও সেইরূপ বীজভূত বিষ্ণুতেই ব্যবস্থিত থাকে। বীজ হইতে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয়, অঙ্কুর হইতে বিরাট্ ন্যগ্রোধ সমুত্থিত হয় এবং বিস্তার প্রাপ্ত হয়, ভগবান্ বিষ্ণু হইতেও তেমনই সৃষ্টি। ত্বক্পত্রাদি ব্যতীত কদলী-বৃক্ষের যেমন পৃথক্ কোনও অস্তিত্ব দেখা যায় না, তেমনই জগদাশ্রয় বিষ্ণু ব্যতীত বিশ্বের আর কোনও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না।[২] বিষ্ণুর নাভিকমল (কমল হইল সৃষ্টিরই প্রতীক) হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি—সেই ব্রহ্মা দ্বারাই সব প্রাকৃত সৃষ্টি, এইজন্ত পুরাণে ব্রহ্মাকেই দু' এক স্থানে প্রকৃতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।[৩] অন্যত্র অবশ্য প্রকৃতি হইল ব্রহ্মার প্রসূতি।[৪]

আমরা গীতার ভিতরে দেখিয়াছি, প্রকৃতিকেই শ্রীভগবানের আত্মমায়া বলা হইয়াছে। পুরাণগুলিতেও প্রকৃতি অনেক স্থানে বিষ্ণুমায়া বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবত-পুরাণে সাংখ্যকার কপিলের মুখ দিয়াই বলান হইয়াছে যে ভক্তিযোগের দ্বারাই প্রাকৃত মায়ার বন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হইতে হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টির সময় পরমেশ্বর মায়ার সহিত মিলিত হইয়া নিজ শক্তিতে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন।[৫] ভাগবত-পুরাণেও দেখি, অগুণ বিভু গুণময়ী সদসদ্রূপা আত্মমায়া দ্বারাই এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।[৬] এক তিনি আত্মমায়ায় ভূত সকলের সৃষ্টি করিতেছেন; নিজের শক্তিকে অবলম্বন

---

১ বিষ্ণুপুরাণ, ২।৭।৩৬

আরও তুঃ— ভূমিরাপো ঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
ভূতাদিরাদিপ্রকৃতির্যস্য রূপং নতো ঽস্মি তম্॥ ঐ, ১।১২।৫৩

২ ১।১২।৬৬-৬৮

৩ প্রধানাত্মা পুরা হ্যেষ ব্রহ্মাণমসৃজৎ প্রভুঃ॥ ব্রহ্মপুরাণ (বঙ্গবাসী), ১৭৯।৭৪

৪ ষড়্বিংশত্তদ্গুণা হ্যেষা দ্বাত্রিংশাক্ষরসংজ্ঞিতা॥
প্রকৃতিং বিদ্ধি তাং ব্রহ্মংস্ত্বৎপ্রসূতিং মহেশ্বরীম্।
সৈষা ভগবতী দেবী ত্বৎপ্রসূতিঃ স্বয়ম্ভুব॥
চতুর্মুখী জগদ্যোনিঃ প্রকৃতি গৌঃ প্রকীর্তিতা।
প্রধানং প্রকৃতিঞ্চৈব যদাহুস্তত্ত্বচিন্তকাঃ॥
বায়ুপরাণ, (বঙ্গবাসী, ২৩।৫৩-৫৫)

৫ ব্রহ্মখণ্ড, ১।২

৬ ১।২।৩০; তুঃ—লীলা বিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া। ১।১।১৮

করিয়াই তিনি নিজ হইতে সকল সৃজন, আবার নিজের ভিতরেই সকলের সংহরণ করিতেছেন।[১] নির্গুণ ঈশ্বরেরও যে সত্ত্ব, রজ, তম প্রভৃতি গুণত্রয় গৃহীত হইয়া থাকে ইহা মায়া দ্বারাই হইয়া থাকে।[২]

মোটামুটিভাবে মায়া বিষ্ণুর প্রাকৃত শক্তি বলিয়া বর্ণিত হইলেও মায়া ও প্রকৃতিকে একেবারে এক করিয়া দেখা বোধ হয় উচিত নহে; প্রকৃতি যেন অনেকখানি মায়াশক্তিরই একটি বিশেষ ক্রিয়াত্মক রূপ।[৩] পুরাণ মতে তাহা হইলে মায়ার স্বরূপ কি? ভাগবত-পুরাণে এই মায়ার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা পাইতেছি। সেখানে বলা হইয়াছে,—'অর্থ বিনা যাহা প্রতীত হয়, কিন্তু আত্মায় যাহা প্রতীত হয় না (অর্থাৎ সৎ হইয়াও যাহার পরমার্থের কোন প্রতীতি নাই), তাহাকেই আমার নিজের মায়া বলিয়া জানিবে; যেমন দ্বিচন্দ্রাদির প্রতীতি, অথবা যেমন তম (যাহা থাকা সত্ত্বেও কখনও প্রকাশ পায় না)।[৪] মায়া তাহা হইলে হইল বিশ্বভুবনব্যাপিনী ভ্রমশক্তি। কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহাকে ভ্রম মাত্র না মনে করিয়া মনে করিয়াছেন 'বিলাসবিভ্রম'; বিলাসের জন্যই লীলাময় ভগবান্ স্বেচ্ছায় নিজের সর্বব্যাপী অখণ্ড এক সত্তার মধ্যে বহুর অস্তিত্ব প্রতিভাত করিলেন। এই যে একের ভিতরে বহুর অস্তিত্ব ইহা বৈকারিক মাত্র, বালকেরা মৃগতৃষ্ণিকাকে যেমন করিয়া জলাশয় বলিয়া মনে করে।[৫] তত্ত্বদৃষ্টি লাভ হইলে দেখা যাইবে, এক হইতেই সব পরিণত, আবার একের ভিতরেই সব সমাহিত।

১ ভাগবতপুরাণ, ২।৫।৪-৫

২ ঐ, ২।৫।১৮ ; আরও তুলনীয়—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড :—

তয়া জগৎ-সর্গলয়ৌ করোতি ভগবান্ সদা।
ক্রীড়ার্থং দেবদেবেন সৃষ্টা মায়া জগন্ময়ী ॥
অবিদ্যা প্রকৃতির্মায়া গুণত্রয়মযী সদা।
সর্গস্থিতি-লয়ানাং সা হেতুভূতা সনাতনী ॥
যোগনিদ্রা মহামায়া প্রকৃতিস্ত্রিগুণান্বিতা।
অব্যক্তা চ প্রধানঞ্চ বিষ্ণোর্লীলাবিকারিণঃ ॥ ২২৭।৫১-৫৩

৩ তুঃ—অতো মায়াশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী। প্রকৃতেশ্চ মায়া-শব্দাভিধানং বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাদেব।—রামানুজের শ্রীভাষ্য, ১।১।১

৪ ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥ ২।৯।৩৩

৫ মৃগতৃষ্ণাং যথা বালা মন্যন্ত উদকাশয়ম্।
এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্তা বস্তু চক্ষতে ॥ ১০।৭৩।১১

দেখিতে পাই,—"আমি বিশ্ব নই, কিন্তু আমা ব্যতীতও বিশ্বের কোন অস্তিত্ব নাই। এই সকলের নিমিত্তই হইল মায়া, সেই মায়া আমাদ্বারাই আশ্রিতা। প্রকাশসমাশ্রয়া এই মায়া হইল আমার অনাদিনিধনা শক্তি, এইজন্যই অব্যক্ত হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চের উদ্ভব হয়।"[১] যে শক্তি-বলে নির্গুণ অপ্রমেয় শুদ্ধ অমলাত্মা ব্রহ্ম হইতে ভাবসমূহের উৎপত্তি হয় সেই মায়া-শক্তি হইল 'অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরা'; কিন্তু এই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরা শক্তিও পাবকের উষ্ণতার মত ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বে বিস্তৃত।[২] বরাহ-পুরাণের ১২৫ অধ্যায়ে দেখি, পৃথিবী বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—'তোমার মায়া আমি জানিতে চাই।' উত্তরে বিষ্ণু বলিলেন, "আমার মায়া কেহই জানিতে পারে না। মেঘ যখন বর্ষণ করে তখন জলে সব প্রপূরিত হইয়া যায়, তারপরে আবার সেই দেশ একেবারে জলহীন হইয়া যায়, ইহাই হইল আমার মায়া। চন্দ্র এক পক্ষে ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে, অপর পক্ষে ক্রমে বর্ধিত হয়, অমাবস্যাতে তাহাকে আর দেখাই যায় না, ইহাই হইল আমার মায়ার তত্ত্ব।······এই যে শেষ-নাগের উপরে আমি শুইয়া আছি, তখনও আমার অনন্ত মায়ার দ্বারা আমি সকল ধারণ করিয়াও থাকি, আবার ঘুমাইয়াও থাকি।······এই যে একার্ণবা মহী সৃষ্টি করিয়াছি ইহাও আমারই মায়া, আবার আমি যে এই জলের উপরে অবস্থান করিতেছি ইহাও আমারই মায়া-শক্তি।"[৩]

এই যে ভগবানের অচিন্ত্য অনন্ত মায়া-শক্তি, মনে হয়, প্রকৃতি তাহারই একটি বিশেষ রূপ বা ব্যাপার বিশেষ। স্বরূপ-বিভ্রান্তি ঘটাইয়া যাহা আছে তাহাকে নাই দেখান এবং যাহা নাই তাহাকে আছে দেখানই হইল ইহার লীলা-বৈচিত্র্য। এই মায়াশক্তি-দ্বারেই ভগবানেরও বিচিত্র বিশ্ব-লীলা। এই মায়াশক্তি ভগবানেরই আশ্রিতা বলিয়া তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় ভগবৎ-স্মরণ। গীতায় যেমন বলা হইয়াছে, 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতং তরন্তি তে'—

১ নাহং বিশ্বো ন বিশ্বঞ্চ মামৃতে বিদ্যতে দ্বিজাঃ।
মায়া নিমিত্তমাত্রাস্তি সা চাত্মনি ময়াশ্রিতা॥
অনাদিনিধনা শক্তির্মায়া ব্যক্তিসমাশ্রয়া।
তন্নিমিত্তঃ প্রপঞ্চো ঽয়মব্যক্তাজ্জায়তে খলু॥
কূর্মপুরাণ (উপরিভাগ), ৯।২-৩

২ বিষ্ণুপুরাণ, ১।৩।২; পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৬।২ শ্লোকও ঠিক একই শ্লোক।

৩ বরাহপুরাণ (বঙ্গবাসী), ১২৫।৮-১০, ৪৫, ৪৮

শুধুমাত্র আমাকেই যে আশ্রয় করে এই মায়াকে সেই অতিক্রম করিতে পারে; পুরাণগুলিতেও নানা ভাবে এই কথারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। তাঁহাতে অচলা ভক্তি থাকিলে—তাঁহাতে সকল ধী স্থাপিত হইলেই এই দুস্তরা মায়াকেও তরিয়া যাওয়া যায়।[১] বিষ্ণু-পুরাণে অদিতি কর্তৃক বিষ্ণুস্তবে বলা হইয়াছে, যাহারা পরমার্থকে জানিতে পারে নাই তাহাদের বুদ্ধিকে অতিশয় মোহিত করিয়া রাখে যে শক্তি—সে তোমারই মায়া; এই যে অনাত্মায় আত্ম-বিজ্ঞান—যাহা দ্বারা মূঢ়গণ বদ্ধ হইয়া থাকে—তাহারও কারণ তোমারই মায়া। 'আমি', 'আমার'—এই জাতীয় যত ভাব মানুষের উদিত হয় তাহা তোমার সেই জগন্মাতা মায়ারই চেষ্টায়। যে সকল স্বধর্মপরায়ণ লোক তোমার আরাধনা করে কেবল তাহারাই এই অখিলমায়া হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকে।[২] গরুড়-পুরাণেও বলা হইয়াছে, তৃণাদি হইতে চতুরানন ব্রহ্মা পর্যন্ত চতুর্বিধ ভূতগণ-সহ চরাচর সর্ব জগৎ এই বিষ্ণুমায়াতেই প্রসুপ্ত আছে; সাধু-অসাধু সব রকমের লোক যাহা কিছু কাজ করে তাহা যদি নারায়ণে অর্পণ করিতে পারে তবে তাহারা কর্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না—মায়ার দ্বারা হয় না।[৩] কূর্ম-পুরাণে বলা হইয়াছে, ভগবানের যে আত্মভূতা পরা শক্তি তাহাই হইল 'বিদ্যা'; তাঁহার মায়া-শক্তিই হইল অপরা শক্তি—তাহাই লোকবিমোহিনী অবিদ্যা, এই পরা শক্তি বিদ্যা দ্বারাই তিনি তাঁহার মায়াকে নাশ করেন।[৪]

পুরাণাদিতে বিষ্ণু-শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীই বহুভাবে বিষ্ণুমায়া বলিয়া কীর্তিতা। কূর্ম-পুরাণে (পূর্বভাগ, প্রথম অধ্যায়) লক্ষ্মীর এই মায়া-রূপিণী মূর্তির বিশদ বর্ণনা

১ ইত্যাদিরাজেন সুতঃ স বিশ্বদৃক্
তমাহ রাজন্ ময়ি ভক্তিরস্তু তে।
দিষ্ট্যেদৃশী ধীর্ময়ি তে কৃতা যয়া
মায়াং মদীয়াং তরতি স্ম দুস্তরাম্॥ ভাবগতপুরাণ, ৪।২০।৩২

২ বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩০।১৪-১৬

৩ গরুড়পুরাণ (বঙ্গবাসী), পূর্বখণ্ড, ২৩৫।৬-৭

৪ অহমেব হি সংহর্তা সংস্রষ্টা পরিপালকঃ।
মায়া বৈ মামিকা শক্তির্মায়া লোকবিমোহিনী।
মমৈব চ পরা শক্তি র্যা সা বিদ্যেতি গীয়তে।
নাশয়ামি তয়া মায়াং যোগিনাং হৃদি সংস্থিতঃ॥
(উপরি-ভাগ), ৪।১৮-১৯

আরও তুলনীয়, ঐ, পূর্বভাগ, ১।৩৬

পাই। সমুদ্র-মন্থনে যখন নারায়ণ-বল্লভা শ্রী আবির্ভূতা হইলেন তখন পুরুষোত্তম বিষ্ণু তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তখন সেই বিশালাক্ষী দেবীকে দেখিয়া নারদাদি মহর্ষিগণ বিষ্ণুর নিকটে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বিষ্ণু বলিলেন, "ইনি হইলেন সেই পরমা শক্তি, ইনি মন্ময়ী ব্রহ্মরূপিণী; ইনি হইলেন আমার মায়া—আমার প্রিয়া—অনন্তা,—ইঁহা কর্তৃকই এই জগৎ বিধৃত আছে। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ, ইহা দ্বারাই আমি সদেবাসুর-মানুষ সর্ব জগৎকে মোহাবিষ্ট করি; গ্রাস করি—আবার সৃজন করি। ভূতসকলের উৎপত্তি ও প্রলয়,—গতি ও অগতি, এই সকল এবং নিজের আত্মাকে যাঁহারা বিদ্যা দ্বারা দেখেন তাঁহারাই ইঁহাকে তরিয়া যাইতে পারেন। ইঁহারই অংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া পুরাকালে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ শক্তিমন্ত হইয়াছিলেন[১]—ইনিই আমার সর্বশক্তি। ইনিই হইলেন সর্বজগৎ-প্রসূতি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, পূর্বে অন্য কল্পে ইনি পদ্মবাসিনী শ্রী রূপে আমা হইতে জাত হইয়াছিলেন। ইনি চতুর্ভুজা, শঙ্খচক্রপদ্মহস্তা, মাল্যধারিণী, কোটিসূর্যপ্রতীকাশা, সর্বদেহীর মোহিনী[২]। কূর্ম-পুরাণেরই (পূর্বভাগ) দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই, সৃষ্টির প্রথমে বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা ও শিবের আবির্ভাব। তৎপরে শ্রীদেবীর আবির্ভাব; আবির্ভাবের পরেই সেই নারায়ণী মহামায়া, অব্যয়া মূল-প্রকৃতি স্বধামের দ্বারাই এই সকল যাহা কিছু পূর্ণ করিয়া বিষ্ণুপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন,—

মোহায়াশেষভূতানাং নিযোজয় সুরূপিণীম্।

---

১ তুঃ—কেনোপনিষৎ, চতুর্থ খণ্ড; আরও—মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী।

ইয়ং সা পরমা শক্তি র্মন্ময়ী ব্রহ্মরূপিণী।
মায়া মম প্রিয়ানন্তা যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥
অনয়ৈব জগৎ সর্বং সদেবাসুরমানুষম্।
মোহয়ামি দ্বিজশ্রেষ্ঠা গ্রসামি বিসৃজামি চ॥
উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিম্।
বিদ্যয়া বীক্ষ্য চাত্মানং তরন্তি বিপুলামিমাম্॥
অস্যাস্ত্বংশানধিষ্ঠায় শক্তিমন্তো ঽভবন্ সুরাঃ।
ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সর্বে সর্বশক্তিরিয়ং মম॥
সৈষা সর্ব জগৎসূতিঃ প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা।
প্রাগেব মত্তঃ সঞ্জাতা শ্রীঃ কল্পে পদ্মবাসিনী॥
চতুর্ভুজা শঙ্খচক্রপদ্মহস্তা স্রগন্বিতা।
কোটিসূর্য-প্রতীকাশা মোহিনী সর্বদেহিনাম্॥ (পূর্বভাগ), ১।৩৪-৩৯

'অশেষ ভূতগণের মোহের জন্ত এই স্বরূপিণীকে নিয়োগ কর।' তখন নারায়ণ হাসিয়া এই দেবীকে বলিলেন, "হে দেবি, আমার আদেশে সদেবাসুর-মানব এই অখিল বিশ্বকে মোহিত করিয়া সংসারে বিনিপাতিত কর।" কিন্তু নারায়ণ এই লক্ষ্মীরূপা মহামায়াকে সাবধান করিয়া দিলেন,—"জ্ঞানযোগরত, দান্ত, ব্রহ্মিষ্ঠ, ব্রহ্মবাদিগণকে এবং অক্রোধন সত্যপরায়ণ ব্যক্তিগণকে তুমি দূর হইতেই পরিত্যাগ করিও।...সংক্ষেপে বলিতে গেলে, স্বধর্মপরিপালক ঈশ্বর-আরাধনারত ব্যক্তিগণকে তুমি আমাকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া কখনও মোহিত করিও না।"[১]

পুরাণে এই বিষ্ণুমায়ার দুইটি প্রধান ভেদ দেখিতে পাই; একটি হইল বিষ্ণুর আত্ম-মায়া, আর একটি হইল ত্রিগুণাত্মিকা বাহ্যমায়া। পূর্বেই দেখিয়াছি, এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বিষ্ণুর সহিত কোন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই, এই মায়া বিষ্ণুর আশ্রিত মাত্র। বিষ্ণুর আত্মমায়াকেই সাধারণতঃ বলা হয় 'বৈষ্ণবী মায়া'; এ মায়া সম্পূর্ণরূপে বিষ্ণুর স্বরূপভূতা নহে, তাই দার্শনিক দৃষ্টিতে 'বৈষ্ণবী মায়া' লক্ষ্মী নহে। আবার এ মায়া কোনও রূপে বিষ্ণুর স্বরূপ আবৃত করে না বা বিস্মৃত করায় না। অনন্ত শয়নে বিষ্ণু যখন শায়িত ছিলেন তখন এই 'বৈষ্ণবী মায়া'ই ছিল তাঁহার নিদ্রার কারণ; এই জন্ত তাঁহার তখনকার নিদ্রাও প্রাকৃত নিদ্রা ছিল না, ইহা ছিল বিষ্ণুর 'যোগনিদ্রা'। এই বৈষ্ণবী মায়ার দ্বারাই দৈবকীর অষ্টম গর্ভ আকর্ষণ করা হইয়াছিল।[২] কৃষ্ণের প্রাণরক্ষার্থ কন্যা-রূপিণী মায়াই কংসকে ছলনা করিয়াছিল। এই মায়াকে অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণ ভাগবত-পুরাণে ব্রহ্মাকে ছলনা করিয়া তাঁহার মায়ার খেলা দেখাইয়াছিলেন। এই বৈষ্ণবী মায়াই হইল 'যোগমায়া'। এ মায়া মায়া বটে, কিন্তু ভগবানের স্বরূপের সহিতও তাহার যোগ আছে, এই জন্যই ইহা হইল 'যোগমায়া'। এই যোগমায়াই হইল কৃষ্ণের সকল প্রকটলীলার সহায়, অর্থাৎ এই যোগমায়াকে আশ্রয় বা বিস্তার করিয়াই তাঁহার সকল প্রকটলীলা।[৩] ফলে প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত মানুষের মতন

১ ২।১২-১৩, ২০

২ দ্রঃ— যোগনিদ্রা মহামায়া বৈষ্ণবী মোহিতং যয়া।
অবিদ্যয়া জগৎ সর্বং তামাহ ভগবান্ হরিঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১।৭০
বিষ্ণোঃ শরীরজাং নিদ্রাং বিষ্ণুনির্দেশকারিণীম্। খিল হরিবংশ, ৪।১০

৩ তুঃ— ভাগবতপুরাণ, ১০।২
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥ ভাগবত, ১০।১৪।২১

তাঁহাকে সকল আচরণ করিতে হইলেও ইহার কোন কিছু দ্বারাই তিনি বন্ধন-গ্রস্ত হন না ; অথবা লীলার জন্ত তিনি যতটুকু বন্ধন নিজে স্বীকার করেন তাহা ব্যতীত আর মায়ার কোন প্রভাব তাঁহার উপরে থাকে না। গীতার ভিতরেই আমরা ভগবানের এই যোগমায়ার উল্লেখ দেখিতে পাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই যোগমায়া সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করিয়াছেন ; তাঁহাদের ভিতরে লীলাবাদের প্রাধান্তের জন্ত এই যোগমায়াও প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে এই যোগমায়া ভগবানেরই স্বরূপভূতা 'দুস্তর্কা চিচ্ছক্তি' ; অর্থাৎ ইহা ভগবানের এমনই এক অচিন্ত্য চিচ্ছক্তির প্রকার যে সে সম্বন্ধে তর্কদ্বারা কোনও ধারণায় পৌঁছান যায় না। যাহা দুর্ঘট তাহা সকলই ঘটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা রহিয়াছে এই যোগমায়ার ; এই জন্য এই যোগমায়াকে বলা হইয়াছে 'দুর্ঘটঘটনী চিচ্ছক্তিঃ'।[১]

আমরা আমাদের আলোচনার প্রারম্ভে বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি প্রসিদ্ধ শ্রুতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি ; সেখানে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম যে পর্যন্ত একা ছিলেন সে পর্যন্ত তিনি রমণ করিতে পারেন নাই, রমণ করিবার জন্য তখন তিনি নিজকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন, তাহারই একভাগ পুরুষ এবং একভাগ নারী হইল। এই শ্রুতিটির প্রতিধ্বনি পুরাণগুলির ভিতরে বহুস্থানে পাওয়া যায় ; পরে আমরা লক্ষ্য করিব, ইহার রেশ অনেক পরবর্তী কালের শাক্ত-সাহিত্যের ভিতরেও চলিয়া আসিয়াছে। পুরাণগুলির ভিতরে দেখিতে পাই, রমণেচ্ছায়ই শক্তিমান্ যেন নিজের শক্তিকে নিজ হইতে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন ; নিজেই এইভাবে নিজের কাছে আস্বাদ্য এবং আস্বাদক হইয়া উঠিয়াছেন। বরাহপুরাণে বলা হইয়াছে, নারায়ণ রমণেচ্ছায় আপনার দ্বিতীয়া কামনা করিয়া নিজেকে দ্বিধা করিয়া প্রথম যে রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনিই হইলেন 'উমা'।[২]

---

১ জীব গোস্বামীর ভগবৎ-সন্দর্ভ।

২ পূর্বং নারায়ণস্ত্বেকো নাসীৎ কিঞ্চিদ্ধরেঃ পরম্।
সৈক এব রতিং লেভে নৈব স্বচ্ছন্দকর্মকৃৎ॥
তস্য দ্বিতীয়মিচ্ছন্তশ্চিন্তা বুদ্ধ্যাত্মিকা বভৌ।
অভাবেত্যেব সংজ্ঞায়া ক্ষণস্তাস্করসন্নিভা॥
তস্যা অপি দ্বিধা ভূতা চিন্তাভূদ্‌ব্রহ্মবাদিনঃ।
উমেতি সংজ্ঞয়া যত্তৎ সদা মর্ত্যে ব্যবস্থিতা॥
উমেত্যেকাক্ষরীভূতা সসর্জেমাং মহীস্তদা। ইত্যাদি। ৯।২-৫

আমরা পুরাণোক্ত বিষ্ণুর শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপরে যাহা আলোচনা করিলাম তাহা স্পষ্ট কোন দার্শনিক মতবাদকে অনুসরণ না করিলেও, মনে হয়, ইহার পশ্চাতে কতগুলি অস্পষ্ট দার্শনিক চিন্তা ইহার ভিত্তিভূমিরূপে রহিয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাণগুলিতে লৌকিক মনোবৃত্তিরই প্রাধান্য। এখানে 'লৌকিক' কথাটিকে আমরা কোন অবজ্ঞার্থে প্রয়োগ করিতেছি না; বৃহত্তর লোক-সমাজের সহিত যাহার যোগ তাহাকেই আমরা এখানে লৌকিক নামে অভিহিত করিতেছি। ধর্মমতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই লৌকিক মনোবৃত্তির কতগুলি বিশেষ ধর্ম বা কাজ আছে। লৌকিক মনোবৃত্তির একটি প্রধানতম প্রবণতা সমীকরণ। এই সমীকরণের প্রবণতা শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রে। আমাদের একটা সাধারণ ধারণা, অন্ততঃ ধর্মের ক্ষেত্রে জন-সাধারণের প্রবণতা হইল বহুর অভিমুখা; তাহারা বহু শাস্ত্রে বিশ্বাসী, বহু মতে বিশ্বাসী, বহু দেবতায় বিশ্বাসী—ধর্মের নামে বহু রকমের ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী; আর উচ্চকোটির দার্শনিক চিন্তাশীল যাঁহারা তাঁহারা যে মত, যে দেবতা, যে শাস্ত্র, যে সাধনপদ্ধতিতেই বিশ্বাসী হোন, তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া একটা জিনিস ভাবেন এবং বোঝেন এবং একটা পথকেই দৃঢ় ভাবে অনুসরণ করেন। এক দিক্ হইতে কথাটা সত্য, আবার অন্য দিক হইতে কথাটিকে ঠিক বিপরীত মুখেও দেখা যাইতে পারে। পৃথিবীর ধর্ম ও ধর্মাশ্রিত দর্শনের ইতিহাস ভাল করিয়া বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব, আসলে ধর্মের ভিতরে পরস্পর-বিরোধী কাটাছাঁটা বহু মত ও পথ—বহু দেবতা, দর্শন ও ক্রিয়াবিধি সৃষ্টি করেন উচ্চকোটির চিন্তাশীল সম্প্রদায়ই। তাঁহাদের তর্ক ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত, বুদ্ধি-বিচারের শাণিত তীক্ষ্ণাগ্র পরস্পরকে

তুঃ— স্কন্দপুরাণ কাশীখণ্ডে পুত্রাত্মকৃত শিবস্তবে—

বিশ্বং ত্বং নাস্তি বৈ ভেদস্ত্বমেকঃ সর্বগো যতঃ।
স্তুত্যং স্তোতা স্তুতিস্ত্বঞ্চ সগুণো নির্গুণো ভবান্॥
সর্গাৎ পুরা ভবানেকো রূপনামবিবর্জিতঃ।
যোগিনো হ্পি ন তে তত্ত্বং বিদন্তি পরমার্থতঃ॥
যদৈকলো ন শক্নোষি রন্তুং স্বৈরচরপ্রভো।
তদেচ্ছা তব যোৎপন্না সৈব শক্তিরভূত্তব॥
ত্বমেকো দ্বিত্বমাপন্নঃ শিবশক্তিপ্রভেদতঃ।
ত্বং জ্ঞানরূপো ভগবান্ স্বেচ্ছাশক্তি-স্বরূপিণী॥ ইত্যাদি।

সর্বদাই দূরে সরাইয়া আপনাপন স্পষ্ট-সীমাযুক্ত অধিকারের ভিতরেই রাখিয়া দিতে চায়। তাই আমাদের গোঁড়া দার্শনিক বুদ্ধির নিকট শিবতত্ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্ব, কালী, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, রাধা প্রভৃতির তত্ত্ব যতই সুস্পষ্টভাবে পৃথক্ হোক, জনসাধারণ সকল নৈয়ায়িক বিচারবুদ্ধি ও শাস্ত্র-শাসনকে অমান্য করিয়া তাহাদের সহজাত সমীকরণের প্রবণতায় সকলকে মোটামুটি এক করিয়া লয়। তাই উচ্চকোটির বুদ্ধিজীবী শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যতই মতান্তর এবং বিরোধ থাকুক না কেন, জনগণ ইহাদের সকলকেই নির্বিবাদে তাহাদের হৃদয়-মন্দির এবং গৃহ-মন্দির উভয়ক্ষেত্রেই স্থান দিতে পারিয়াছে।

আসলে গণমনের কার্যকলাপ হইল অনেকখানি বাংলা পয়ারছন্দের মতন। পয়ারছন্দের অন্তর্গত কোন অক্ষর বা ধ্বনিই পরস্পর-নিরপেক্ষভাবে একেবারে স্বতন্ত্র নহে; কয়েকটি অক্ষর বা ধ্বনিসমষ্টি-যোগে যে তানগুলির উদ্ভব হয় তাহারাই হইল এখানে প্রধান; ধ্বনিগুলি তাহাদের যাহা-কিছু ব্যক্তিধর্ম সকলই সেই মিশ্র তানধর্মের ভিতরে সমর্পণ করে। ধর্মের ক্ষেত্রে জনসাধারণের মনোধর্মও হইল এইরূপ। সেখানে ধর্মসম্পর্কিত কোন চিন্তা বা বিশ্বাসই অতি উগ্ররূপে স্বতন্ত্র নহে; কতগুলি চিন্তা ও বিশ্বাসের টুকরা মিলিয়া মিলিয়া একটি তানের সৃষ্টি করে; এই সমীকরণ-জাত তানগুলিই প্রধান হইয়া ওঠে।

আমরা পূর্বে বিষ্ণুশক্তি সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে বিষ্ণুশক্তির ভিতরেই পরা ও অপরা শক্তির দুইটি স্পষ্ট ভাগ দেখিতেছি। অপরা শক্তির মধ্যেও আবার জীবশক্তি ও জড়শক্তির ভেদ আছে। কিন্তু পুরাণগুলির বিভিন্ন স্থলে লক্ষ্মী বা শ্রীর যে স্তব রহিয়াছে তাহার ভিতরে বিষ্ণুর এইসব শক্তিই নিঃশেষে মিলিয়া গিয়াছে। দার্শনিক বেদান্তী ত' সর্বদাই তাঁহাদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মকে যুক্তি-বিচারের বেড়াজাল রচনা করিয়া মায়ার কলুষস্পর্শ হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; মায়া সৎ কি অসৎ এসম্বন্ধেও তাঁহারা মুখ ফুটিয়া স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু পুরাণকারগণ সকল বিবাদ ভঞ্জন করিয়া ব্রহ্মের সহিত মায়ার অতি অন্তরঙ্গ যোগ সাধন করিয়া দিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের ভিতরে পুরুষ ও প্রকৃতির ভিতরকার সম্পর্ক ঠিক কি তাহা লইয়া অনেক মতভেদ রহিয়াছে, কিন্তু তা বলিয়া পুরুষ ও প্রকৃতি শক্তিমান্ ও শক্তিরূপে অভেদে ভেদ—একথা কোনও সাংখ্যকারই কিছুতেই গ্রহণযোগ্য মনে করিবেন না; কিন্তু পুরাণকারগণ অতি সহজেই সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিকে তন্ত্রের শিব-শক্তির সহিত এবং বৈষ্ণব-

গণের বিষ্ণু-লক্ষ্মীর সহিত একেবারে অভিন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। ফলে পুরাণ-বর্ণিত লক্ষ্মীতত্ত্বে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, তন্ত্রের শিব ও শক্তি সকলে নিজেদের সকল স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া মিলিয়া মিশিয়া একেবারে এক যুগল-মূর্তি ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। পরবর্তী কালের রাধা-কৃষ্ণও অতি সহজ ভাবেই আসিয়া আবার এই যুগলের মধ্যেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ধর্মমতগুলি ভাল করিয়া দেখিলে মনে হয়, এই একটি আদিম যুগলে বিশ্বাস যেন ভারতীয় মনের একটি আদিম ধর্ম-বিশ্বাস; এই একটি বিশ্বাসই যেন ভারতবর্ষের বহুবিচিত্র দেশ-কালের পরিবেশের ভিতর দিয়া নিত্য নব-বৈচিত্র্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই যুগলে বিশ্বাসই হইল ভারতবর্ষের শক্তি-বাদের একটি বিশেষ রূপ। এইজন্যই ভারতবর্ষের এই শক্তিবাদকে কোন শৈব বা শাক্ত মতবাদের গণ্ডির ভিতরে সীমাবদ্ধ করিতে আমরা নারাজ। এই যে একটি আদিম যুগলে বিশ্বাস ইহা শৈব নহে, শাক্ত নহে, বৈষ্ণব নহে, সৌর গাণপত্য নহে,—ইহা বেদান্ত নহে, সাংখ্য নহে, তন্ত্র নহে—ইহা হিন্দুও নহে, বৌদ্ধ-জৈনও নহে—ইহা রহিয়াছে ভারতবর্ষের সর্বত্র, প্রায় সর্ব মতে; আমরা তাই বলিব, ইহা দর্শন-সম্প্রদায়-নিরপেক্ষভাবে ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষের সেই জাতীয় বিশ্বাসটিকে পুরাণকারগণ তাই সকল সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি হইতে টানিয়া আনিয়া একটি বৃহৎ ঐক্যের ভিতরে রূপদান করিয়াছেন। এই কারণেই পাঞ্চরাত্রের শক্তিবাদ আলোচনার পর কাশ্মীর-শৈবদর্শনের শক্তিবাদ আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা বলিয়া-ছিলাম, ভারতবর্ষের শক্তিবাদ শৈব-শাক্ত দর্শনকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, না, বৈষ্ণব দর্শনকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, একেবারে স্পষ্ট এবং নিশ্চিত করিয়া বলা শক্ত; আসলে বোধহয় শক্তিবাদ একটি প্রাচীন ভারতীয় বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে—সে বিশ্বাস অল্পবিস্তর রূপ লাভ করিয়াছে ভারতবর্ষের সকল দর্শনে, সকল ধর্মমতে। আমরা শৈব বা শাক্ত কোন শাস্ত্র-গ্রন্থের মধ্যে 'শক্তি'র যে বর্ণনা পাই, পুরাণগুলির ভিতরে লক্ষ্মীর বর্ণনার ভিতরেও বহুস্থানে প্রায় সেই একরূপ বর্ণনাই পাই। আবার একখানি শৈব পুরাণ (বা উপপুরাণ) গ্রহণ করিলে দেখিতে পাইব, সেখানকার বর্ণিত শিব-শক্তি বিষ্ণু-লক্ষ্মীরই একান্ত অনুরূপ। বর্ণনা সর্বত্র মোটামুটি একই, শুধু নামের পার্থক্য ঘটিয়াছে মাত্র। আমরা যেমন এতক্ষণ দেখিয়া আসিতেছি, যখন সৃষ্টির কিছুই ছিল না, তখন সদসদাত্মক একমাত্র বিষ্ণু ছিলেন; তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা হইল, সেই

ইচ্ছাই শক্তিরূপিণী হইল বা মূলপ্রকৃতি হইল ; সেই আদ্যাশক্তি বা মূলপ্রকৃতি হইতেই পুরুষ-প্রধানের উৎপত্তি—তাহা হইতেই অখিল সংসার ; আমরা 'শিব-পুরাণ' খানি আলোচনা করিলেও ঠিক এই জাতীয় বর্ণনাই পাইব।[১] পরমাত্মা শিব, তাঁহা হইতে উদ্ভূত পুরুষ এবং প্রকৃতিকে এখানে নারায়ণ ও নারায়ণী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।[২] মহেশ্বর হইলেন এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিলীন ভোক্তা পুরুষের উর্ধ্বে।[৩] শিব-পুরাণের অন্তর্গত বায়বীয় সংহিতায় বিষ্ণু-লক্ষ্মীর ন্যায় শিব-শক্তির বর্ণনায়ও বলা হইয়াছে, শিব হইলেন বিষয়ী, শক্তি বিষয় ; শিব ভোক্তা, শক্তি ভোগ্য ; শিব প্রষ্টা, শক্তি প্রষ্টব্য ; শিব দ্রষ্টা, শক্তি দ্রষ্টব্য ; শিব আস্বাদক, শক্তি আস্বাদ্য ; শিব মন্তা, শক্তি মন্তব্য।[৪] বৈষ্ণব মতে যেমন ক্ষর ও অক্ষরকে

১ ইদং দৃশ্যং যদা নাসীৎ সদসদাত্মকঞ্চ যৎ।
তদা:ব্রহ্মময়ং তেজো ব্যাপ্তিরূপঞ্চ সন্ততম্॥

... ...

কিয়তা চৈব কালেন তস্যেচ্ছা সমপদ্যত।
প্রকৃতির্নাম সা প্রোক্তা মূলকারণমিত্যুত॥
অষ্টৌ ভুজাশ্চ তস্যাসন্ বিচিত্রবসনা শুভা।
রাকাচন্দ্রসহস্রস্য বদনং তস্য নিত্যশঃ॥
নানাভরণসংযুক্তা নানাগতিসমন্বিতা।
নানায়ুধধরা দেবী প্রফুল্লপঙ্কজাক্ষিকা॥
অচিন্ত্যতেজসা যুক্তা সর্বযোনিসমন্বিতা।
একাকিনী যদা মায়া সংযোগাচ্চাপ্যনেকিকা॥
যতো বৈ প্রকৃতির্দেবী ততো বৈ পুরুষস্তদা।
উভৌ চ মিলিতৌ তত্র বিচারে তৎপরৌ মুনে॥

শিবপুরাণ, জ্ঞান-সংহিতা (বঙ্গবাসী), ২য় অধ্যায়।

২ ঐ—২।২৯ ; ৭৭।৬

৩ স এব প্রকৃতৌ লীনো ভোক্তা যঃ প্রকৃতে র্মতঃ॥
তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ।
তদধীনপ্রবৃত্তিত্বাৎ প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ॥

ঐ—বায়বীয় সংহিতা, পূর্বভাগ, ২৮।৩২-৩৩

৪ ঐ—বায়বীয় সংহিতা, উত্তরভাগ, ৫।৫৬-৬১

পুরুষোত্তম বিষ্ণুর দুই রূপ বলা হইয়াছে, এবং পুরুষোত্তমকে ক্ষরাক্ষরের উধ্বে বলা হইয়াছে, শিব-পুরাণেও তাহারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই।[১]

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের লক্ষ্মী বহুস্থানেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। বিষ্ণু-পুরাণে ইন্দ্র সমুদ্রোত্থিতা পদ্ম-সম্ভবা লক্ষ্মীদেবীকে সর্বভূতের জননী, জগদ্ধাত্রী বলিয়া স্তব করিয়াছেন। ইন্দ্র আরও বলিয়াছেন,—"তুমিই সিদ্ধি, তুমিই সুধা, তুমি স্বাহা ও স্বধা, তুমি সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, ভূতি, মেধা, শ্রদ্ধা, সরস্বতী। তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা এবং বিমুক্তিফলদায়িনী আত্মবিদ্যা। তুমিই অন্বীক্ষিকী (তর্কবিদ্যা), ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি। হে দেবি, তোমারই সৌম্যাসৌম্যরূপে এই জগৎ পূরিত।"[২] লক্ষ্মীর এই বর্ণনা এবং এই জাতীয় আরও অনেক বর্ণনার

১ ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।
উভে তে পরমেশস্য রূপং তস্য বশে যতঃ॥
তয়োঃ পরঃ শিবঃ শান্তঃ ক্ষরাক্ষরপরঃ স্মৃতঃ।
সমষ্টিব্যষ্টিরূপশ্চ সমষ্টিব্যষ্টিকারণম্॥
ঐ—বায়বীয় সংহিতা, উত্তরভাগ।

২ বিষ্ণুপুরাণ, ১৷৯৷১১৬-১১৯

তুঃ ত্বং ভূতিঃ সন্নতিঃ কীর্তিঃ ক্ষান্তির্দ্যৌঃ পৃথিবী ধৃতিঃ।
লজ্জা পুষ্টিরুষা যা চ কাচিদন্যা ত্বমেব সা॥
যে ত্বামার্যেতি দুর্গেতি বেদগর্ভে হম্বিকেতি চ।
ভদ্রেতি ভদ্রকালীতি ক্ষেম্যা ক্ষেমঙ্করীতি চ॥
প্রাতশ্চৈবাপরাহ্নে চ স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ।
তেষাং হি প্রার্থিতং সর্বং মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি॥
সুরামাংসোপহারৈস্তু ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা।
নৃণামশেষকামাংস্ত্বং প্রসন্না সম্প্রদাস্যসি॥ ঐ—৫৷১৷৮১-৮৪

আরও :—ব্রহ্মশ্রীশ্চ তপঃশ্রীশ্চ যজ্ঞশ্রীঃ কীর্তিসংজ্ঞিতা।
ধনশ্রীশ্চ যশঃশ্রীশ্চ বিদ্যা প্রজ্ঞা সরস্বতী॥
ভুক্তিশ্রীশ্চাথ মুক্তিশ্চ স্মৃতির্লজ্জা ধৃতিঃ ক্ষমা।
সিদ্ধিস্তুষ্টিস্তথা পুষ্টিঃ শান্তিরাপস্তথা মহী॥
অহং শক্তিরথৌষধ্যঃ শ্রুতিঃ শুদ্ধির্বিভাবরী।
জ্যোতির্জ্যোৎস্না আশিষঃ স্বস্তির্ব্যাপ্তি র্মায়া উষাঃ শিবা॥
যৎকিঞ্চিদ্ বিদ্যতে লোকে লক্ষ্ম্যা ব্যাপ্তং চরাচরম্।
ব্রাহ্মণেষথ ধীরেষু ক্ষমাবৎস্বথ সাধুষু॥

সহিত আমরা মার্কণ্ডেয়-পুরাণোক্ত চণ্ডীর বর্ণনা বেশ মিলাইয়া লইতে পারি। পদ্ম-পুরাণের উত্তরখণ্ডে লক্ষ্মীর যে স্তব বা স্বরূপবর্ণনা দেখিতে পাই তাহার ভিতরেও লক্ষ্মীর মায়ারূপ, প্রকৃতিরূপ, সর্বব্যাপিনী জগজ্জননী শক্তি রূপ সব মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে।[১]

বিদ্যাযুক্তেষু চান্যেষু ভুক্তিমুক্ত্যনুসারিষু।
যদ্‌যদ্রম্যং সুন্দরং বা তত্তল্লক্ষ্মীবিজৃম্ভিতম্॥
কিমত্র বহুনোক্তেন সর্বং লক্ষ্মীময়ং জগৎ। ইত্যাদি

ব্রহ্মপুরাণ, ১৩৭।৩২-৩৬

১। পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে মহালক্ষ্মীর স্তব দ্রষ্টব্য। ১৮৬।১৫-৩৩

আরও তুলনীয় :—

নিত্যং সম্ভোগমীশ্বর্যা শ্রিয়া ভূম্যা চ সংবৃতম্।
নিত্যৈবৈষা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী॥
যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথা লক্ষ্মীঃ শুভাননে।
ঈশানা সর্বজগতো বিষ্ণুপত্নী সদা শিবা।
সর্বতঃ পাণিপাদান্তা সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখী।
নারায়ণী জগন্মাতা সমস্তজগদাশ্রয়া॥
যদপাঙ্গাশ্রিতং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
জগৎস্থিতিলয়ৌ যস্যা উন্মীলননিমীলনাৎ॥
সর্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীস্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী।
লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা॥
শূন্যঃ তদখিলং বিশ্বং বিলোক্য পরমেশ্বরী।
শূন্যং তদখিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা॥
সা লক্ষ্মীর্ধরণী চৈব নীলা দেবীতি বিশ্রুতা।
আধারভূতা জগতঃ পৃথিবীরূপমাশ্রিতা॥
তোয়াদিরসরূপেণ সৈব নীলাবপুর্ভবেৎ।
লক্ষ্মীরূপত্বমাপন্না ধনবাগ্‌রূপিণী হি সা॥

* * *

লক্ষ্মীঃ শ্রীঃ কমলা বিদ্যা মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া সতী।
পদ্মালয়া পদ্মহস্তা পদ্মাক্ষী লোকসুন্দরী॥
ভূতানামীশ্বরী নিত্যা সত্যা সর্বগতা শুভা।
বিষ্ণুপত্নী মহাদেবী ক্ষীরোদতনয়া রমা॥
অনন্তা লোকমাতা ভূর্নীলা সর্বসুখপ্রদা।
রুক্মিণী চ তথা সীতা সর্বদেবব্রতী শুভা॥

তন্ত্রাদিতে শ্রীবিদ্যাখ্যা পরা শক্তি ললিতাদেবী নামে খ্যাতা।[১] এই শ্রীবিদ্যাকে 'ললিতা' বলিবার তাৎপর্য, ত্রিলোকে তিনিই কান্তিরূপিণী।[২] ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত 'ললিতা-ত্রিশতী'তে পাই, এই ললিতা দেবী একদিকে যেমন—

ককাররূপা কল্যাণী কল্যাণগুণশালিনী।
কল্যাণশৈলনিলয়া কমনীয়া কলাবতী॥

তেমনই তিনি আবার—

কমলাক্ষী কল্মষঘ্নী করুণামৃতসাগরা।
কদম্বকাননাবাসা কদম্বকুসুমপ্রিয়া॥

এই দেবীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে তিনি 'লাক্ষারসসবর্ণাভা'। বেদের শ্রীসূক্তের ভিতরকার লক্ষ্মী শব্দের ব্যাখ্যায়ও সায়ণাচার্য নিরুক্তের উল্লেখ করিয়াছেন,—'লক্ষ্মীর্লাক্ষালক্ষণাৎ'। পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে কৃষ্ণ নিজেই ললিতা দেবী—যে দেবী রাধিকা বলিয়া গীত হয়। কৃষ্ণ নিজে যোষিৎ-স্বরূপ, তিনি পুংরূপা কৃষ্ণ-বিগ্রহা ললিতা-দেবী ; এই উভয়ের ভিতরে কোনও রকমের প্রভেদ নাই।[৩] কোনও কোনও পুরাণে এই বিষ্ণু-লক্ষ্মী, ব্রহ্ম-মায়া, পুরুষ-প্রকৃতি, শিব-দুর্গার সহিত আবার রাম-সীতাও মিলিয়া গিয়াছে।[৪] এই লক্ষ্মী বিশ্বজননীরূপে শুধু ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত হন নাই, যোনিরূপা বলিয়াও বহুস্থানে বর্ণিতা হইয়াছেন। লক্ষ্মীর এই-জাতীয় সমীকরণজাত মিশ্ররূপের বর্ণনা পুরাণাদির

সতী সরস্বতী গৌরী শান্তিঃ স্বাহা স্বধা রতিঃ।
নারায়ণী বরারোহা বিষ্ণোর্নিত্যানপায়িনী॥

পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ২২৭।১২-২০, ২৪-২৭

১ 'শ্রীদেবী ললিতাম্বিকা'—ললিতাত্রিশতী, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

২ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত 'ললিতাত্রিশতী'র উপরে শঙ্করাচার্যের নামে যে ভাষ্য প্রচলিত আছে (দ্রঃ—'ললিতাত্রিশতী-ভাষ্যম্'—শ্রীবাণীবিলাসপ্রেস, শ্রীরঙ্গম) তাহাতে 'ললিতা' নামের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে 'ললিতং ত্রিষু সুন্দরম্'।

৩ অহং চ ললিতাদেবী রাধিকা যা চ গীয়তে॥
অহং চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাত্মকঃ।
সত্যং যোষিৎ-স্বরূপোঽহং যোষিচ্চাহং সনাতনী॥
অহং চ ললিতা দেবী পুং-রূপা কৃষ্ণ-বিগ্রহা।
আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ॥ পাতালখণ্ড, ৪৪।৪৫।৪৬

৪ পদ্ম-পুরাণ, উত্তরখণ্ড, ২৪৩।৩১-৩৭

মধ্যে খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিতে হয় না; ইহা পুরাণ-মধ্যে অতি সহজলভ্য।[১]

ভারতীয় তন্ত্রমতের একটি মূল কথা হইতেছে, যাহা কিছু ভগবত্তত্ত্ব সকলই হইল আমাদের দেহের ভিতরে; সুতরাং শরীরস্থ বিভিন্ন চক্রে বা বিভিন্ন পদ্মে শিবধাম এবং শক্তিধামের বর্ণনা করা হইয়া থাকে। আমরা কোন কোন পুরাণে এবং বৈষ্ণব-সংহিতা গ্রন্থে ভগবদ্ধাম মথুরা, গোকুল, বৃন্দাবন প্রভৃতিরও এইজাতীয় বর্ণনা পাইয়া থাকি। সাধারণতঃ মাথুর-মণ্ডলকে অথবা গোকুলকে সহস্রপত্র-কমলাকার ধাম বলা হয়; ইহার মধ্যস্থিত যে কর্ণিকার তাহাই হইল বৃন্দাবন

১ তুঃ বৃহন্নারদীয়-পুরাণ (বঙ্গবাসী) :—

তস্য শক্তিঃ পরা বিষ্ণো র্জগৎকার্যপরিশ্রমা।
ভাবাভাবস্বরূপা সা বিদ্যাবিদ্যেতি গীয়তে॥
যদা বিশ্বং মহাবিষ্ণোর্ভিন্নত্বেন প্রতীয়তে।
তদা হ্যবিদ্যা সংসিদ্ধা তদা দুঃখস্য সাধনী॥
জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদ্যুপাধিস্তু যদা নশ্যতি সত্তমাঃ।
সর্বৈকভাবনাবুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভিধীয়তে॥
এবং মায়া মহাবিষ্ণোর্ভিন্না সংসারদায়িনী।
অভেদবুদ্ধ্যা দৃষ্টা চেৎ সংসারক্ষয়কারিণী॥
বিষ্ণুশক্তিসমুদ্ভূতমেতৎ সর্বং চরাচরম্।
যস্মাভিন্নমিদং সর্বং যচ্চেদং যচ্চ নেঙ্গতে॥
উপাধিভির্যথাকাশো ভিন্নত্বেন প্রতীয়তে।
অবিদ্যোপাধিভেদেন তথেদমখিলং জগৎ॥
যথা হরির্জগদ্ব্যাপী তস্য শক্তিস্তথা মুনে।
দাহশক্তির্যথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি॥
উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীতি চাপরে।
ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ॥
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডী মাহেশ্বরীতি চ।
কৌমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহ্যৈন্দ্রীতি চাপরে॥
ব্রাহ্মীতি বিদ্যাবিদ্যেতি মায়েতি চ তথাপরে।
প্রকৃতিশ্চ পরা চৈতি বদন্তি পরমর্ষয়ঃ॥
সেয়ং শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্জগৎসর্গাদিকারিণী।
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপেণ জগদ্ব্যাপ্য ব্যবস্থিতা॥ (৩৬-১৬)

ধাম।[১] এই সহস্রপত্রকমলকেই মস্তকস্থিত সহস্রার পদ্ম বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে।[২] তন্ত্র-মতে এই সহস্রদল সহস্রার পদ্মই হইল চরমতত্ত্বের আবাসভূমি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকটে বিশেষভাবে প্রমাণ গ্রন্থ ব্রহ্ম-সংহিতায় এই ধামতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া বিষ্ণু এবং তৎ-শক্তি লক্ষ্মী বা রমা দেবীর যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা একান্তভাবে তন্ত্রানুরূপ। সেখানে বলা হইয়াছে যে, সহস্রপত্রকমলই হইল গোকুলাখ্য মহৎপদ; সেই পদ্মের কর্ণিকার (গর্ভকোষ) হইল তাঁহার (পরম কৃষ্ণের) আত্মধাম (বৃন্দাবন), এই ধামও হইল কৃষ্ণের অনন্তাংশের একাংশজাত। এই কর্ণিকারই হইল 'মহদ্‌যন্ত্র'; ইহা ষট্‌কোণ, বজ্রকীলক; ইহা হইল 'ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদীস্থান,' এখানে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই রহিয়াছে।[৩] এখানে লক্ষ্য করিতে পারি, এই ষট্‌কোণ যন্ত্রই হইল তন্ত্রোক্ত শক্তি-যন্ত্র—ইহাই দেবীর পীঠ বা আসন। এই মহদ্‌যন্ত্রই হইল ষড়ক্ষরী বা দ্বাদশাক্ষরী বা অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রের

---

১ স্বস্থানমধিকং নাম ধ্যেয়ং মাথুরমণ্ডলম্।
নিগূঢ়ং বিবিধং স্থানং পুর্যভ্যন্তরসংস্থিতম্॥
সহস্রপত্রকমলাকারং মাথুরমণ্ডলম্।
বিষ্ণুচক্রপরিমাণং ধাম বৈষ্ণবমদ্ভুতম্॥
... ...
সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যাং মহৎপদম্॥
কর্ণিকা তন্মহদ্ধাম গোবিন্দস্থানমুত্তমম্।
তত্রোপরি স্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতম্॥ ইত্যাদি।

পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ড (কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত), ৩৮ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে দেহাভ্যন্তরে শুধু মথুর-গোকুলেরই বর্ণনা নাই, দেহস্থ কোন পদ্মের কোন্ দল কৃষ্ণের গোকুলস্থ কোন্ লীলার ভূমি এ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে।

২ মথুরামণ্ডলমেতদ্ভূপ সহস্রারপঙ্কজং বিদ্ধি।
শ্রীবৃন্দাবনভুবনং পরমস্তৎকর্ণিকারঞ্চ॥
হংসাস্তত্র যহাস্তো ভক্তাঃ সংসারসাগরোত্তীর্ণাঃ।
তত্ত্বমগম্যং যোগিভিরপি জন্মকোটীভিঃ॥ ১৯১-১৯২

চিত্রচম্পূ, মহামহোপাধ্যায় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য বিরচিত।

৩ সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ-সম্ভবম্॥
কর্ণিকারং মহদ্‌যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকম্।
ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদী-স্থানং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ২, ৩

স্থান।[১] এইখানেই শ্রীপুরুষোত্তম দেবতা প্রকৃতি-পুরুষের বীজতত্ত্বরূপে বা অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে বিরাজ করেন। এইরূপ যে জ্যোতির্ময় সদানন্দ পরাৎপর দেব, তিনি হইলেন 'আত্মারাম,' নিজের স্বরূপের ভিতরেই তাঁহার সকল আনন্দানুভূতি, এ আনন্দানুভূতি একান্তভাবেই অন্যনিরপেক্ষ। এইজন্য এই পরদেবতার কখনও প্রকৃতির সহিত বা মায়ার সহিত সমাগম হয় না। কিন্তু একেবারে কখনই সমাগম হয় না তাহা বলা যায় না; যখন তিনি সৃষ্টিকাম হইয়া ওঠেন তখন সেই কালাতীত কালাধীশ পুরুষ 'কাল'কে ছাড়িয়া দেন এবং সেই 'কাল'কে আশ্রয় করিয়াই তিনি আত্মমায়া বা আত্মশক্তি রমা দেবীর সহিত রমণ করিতে থাকেন। এই যে দ্যোতমানা প্রকাশরূপা রমা দেবী, ইনিই হইলেন বিশ্ব-নিয়তি, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, সর্বদাই তদ্বশা। জ্যোতীরূপ সনাতন ভগবান্ শম্ভুই হইলেন সেই পরদেবতার লিঙ্গ-স্বরূপ, আর সেই পরাশক্তিই হইলেন যোনি-স্বরূপা; কামই হইল হরির মহৎ বীজ। এই লিঙ্গযোনি হইতেই নিখিল ভূতগণের উৎপত্তি।[২]

উপরিউক্ত বর্ণনা সকল পাঠ করিলে দেখা যায়, কি চিন্তার দিক্ হইতে, কি ভাষার দিক্ হইতে—কোন দিক্ হইতেই শৈব-শাক্ত-তন্ত্রোক্ত শক্তিবাদ এবং বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত শক্তিবাদের ভিতরে বিশেষ কোন পার্থক্য করা সম্ভব হয় না; সমজাতীয় ভাব ও চিন্তারই যেন বিভিন্ন আবেষ্টনীর ভিতরে বিভিন্ন প্রকাশ।

পুরাণোক্ত বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী সম্বন্ধে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি। পুরাণাদিতে যেখানে যেখানে বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতার প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেখানে কৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীই বিষ্ণুমহিষী লক্ষ্মীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। রুক্মিণীকেই

১ অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্র—'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা'—ইহার ছয়টি অঙ্গ; যথা,—(১) কৃষ্ণায়, (২) গোবিন্দায়, (৩) গোপীজন, (৪) বল্লভায়, (৫) স্বা, (৬) হা।

২ এবং জ্যোতির্ময়ো দেবঃ সদানন্দঃ পরাৎপরঃ।
আত্মারামস্য তস্যাস্তি প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ॥
মায়য়া রমমাণস্য ন বিয়োগস্তয়া সহ।
আত্মনা রময়া রেমে ত্যক্তকালং সিসৃক্ষয়া॥
নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশং তদা।
তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ॥
যা যোনিঃ সা পরা শক্তিঃ কামো বীজং মহদ্ধরেঃ।
লিঙ্গযোন্যাত্মিকা জাতা ইমা মাহেশ্বরী-প্রজাঃ॥

সাধারণতঃ লক্ষ্মীর অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করিতে পারি, অনেক পুরাণে রুক্মিণীর স্বয়ম্বর এবং স্বেচ্ছায় কৃষ্ণকে বরণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে লক্ষ্মীরও একটা স্বয়ম্বরের ধারণা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' এই লক্ষ্মী-স্বয়ম্বরের পাঁচটি শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। আসলে এই লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর কিছুই নহে,—সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া লক্ষ্মী স্বেচ্ছায় বিষ্ণুকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা হইতেই লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং এই লক্ষ্মী-স্বয়ম্বরই হয়ত প্রভাবান্বিত করিয়াছে রুক্মিণী-স্বয়ম্বরের ধারণা ও উপাখ্যান। কৃষ্ণ-লীলার প্রারম্ভ দেখিতে পাই খিল হরিবংশে; এই খিল হরিবংশে রুক্মিণীকে স্পষ্ট লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণিত না দেখিলেও দেখিতে পাই তাঁহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[১] এই সাক্ষাৎ-লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণীই কৃষ্ণের প্রধানা মহিষী হইলেও আমরা খিল হরিবংশে এবং বিষ্ণু-পুরাণাদিতে কৃষ্ণের আরও সপ্ত মহিষীর কথার উল্লেখ পাই। 'হরিবংশ' মতে এই সপ্ত মহিষীর নাম হইতেছে, কালিন্দী, মিত্রবৃন্দা, নাগ্নজিতী, জাম্ববতী, রোহিণী, লক্ষ্মণা ও সত্যভামা। রুক্মিণীকে লইয়া কৃষ্ণের এই অষ্টপত্নী। বিষ্ণু-পুরাণেও প্রধানা মহিষী রূপে রুক্মিণীর, ও কালিন্দী, মিত্রবৃন্দা, নাগ্নজিতী প্রভৃতি অন্যান্য সপ্ত মহিষীর উল্লেখ পাই। কোনও কোনও পুরাণে বিষ্ণুর ষোড়শ বা ষোড়শ সহস্র পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কৃষ্ণপত্নীর সংখ্যা আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাই, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অষ্টধা প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন। শক্তির অষ্টধা ভাগ লইয়াই শিবের অষ্টমূর্তির ধারণা জাগিয়াছিল। শক্তি বা প্রকৃতির অষ্টধা ভাগ লইয়াই কৃষ্ণের অষ্ট মহিষীর উপাখ্যানাদি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আবার দেখি শক্তিকে সর্বত্রই ষোড়শ-কলাত্মিকা বলা হইয়াছে। উপনিষদের যুগ হইতেই এই ষোড়শ-কলাতত্ত্বের প্রচার। এই ষোড়শ-কলাই কৃষ্ণের ষোড়শ পত্নীত্বে রূপ গ্রহণ করিয়াছে মনে হয়। চন্দ্র হইল ষোড়শ-কলাত্মক; তন্ত্রাদিতে বা অন্য যোগশাস্ত্রে সূর্যকে যেখানে পুরুষের বা শিবের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে চন্দ্রকে সেখানে শক্তির প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীসূক্তে বর্ণিতা লক্ষ্মী বা শ্রীও 'চন্দ্রা'; পুরাণাদিতেও

---

১ তাং দদর্শ তদা কৃষ্ণো লক্ষ্মীং সাক্ষাদিব স্থিতাম্।
রূপেণাগ্র্যেণ সম্পন্নাং দেবতায়তনাস্তিকে॥
বহ্নেরিব শিখাং দীপ্তাং মায়াং ভূমিগতামিব।
পৃথিবীমিব গম্ভীরামুত্থিতাং পৃথিবীতলাৎ॥ ৫৯।৩৫-৩৬

লক্ষ্মীর এই 'চন্দ্রা'রূপের উল্লেখ আছে। এক ষোড়শ-কলাত্মিকা 'চন্দ্রা' লক্ষ্মীই সম্ভবতঃ ষোড়শ পত্নীরূপে পুরাণে বিগ্রহবতী হইয়া উঠিয়াছেন। কৃষ্ণের ষোড়শ মহিষীর মূলে এই ষোড়শকলাত্ব স্কন্দ-পুরাণের প্রভাস-খণ্ডে শিব-গৌরী-সংবাদে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, পুরাকালে কৃষ্ণ যখন যাদবগণ-সহ প্রভাসের তীরে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত ষোড়শ সহস্র গোপী আসিয়াছিল। ইহাদের ভিতরে প্রধানা ষোড়শ গোপীর নাম করিয়া বলা হইয়াছে, কৃষ্ণ হইলেন চন্দ্রস্বরূপ—এই ষোড়শ গোপী হইল তাঁহার ষোড়শকলারূপা ষোড়শ-শক্তি। চন্দ্র যেমন প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথিকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে সঞ্চরণ করে, কৃষ্ণ সেইরূপ পর্যায়ক্রমে এই গোপীদের সহিত বিহার করেন। প্রতি-কলাত্মিকা প্রতিগোপী হইতেই আবার সহস্র গোপীর উদ্ভব,—এইরূপেই মোট গোপীর সংখ্যা ষোড়শ সহস্র।[১] জীব গোস্বামী তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে' বলিয়াছেন যে, লক্ষ্মীই হইলেন শ্রীভগবানের ষোড়শ-কলাত্মিকা স্বরূপ-শক্তি—সেই লক্ষ্মীরূপিণী এক স্বরূপ-শক্তি হইতেই ষোড়শ কৃষ্ণবল্লভা গোপীর উদ্ভব। আবার সাংখ্যদর্শনের দিক্ হইতে দেখিতে পাই, প্রকৃতির হইতেছে ষোড়শ বিকার। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির এই ষোড়শ বিকারও কৃষ্ণের ষোড়শ পত্নীর উদ্ভবে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পুরাণকারগণ প্রকৃতির এই ষোড়শ-বিকারের কথা বহু প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং প্রকৃতির এই ষোড়শ-বিকারের কথা পুরাণের যুগে প্রসিদ্ধই ছিল। সাংখ্যমতে অষ্ট-প্রকৃতি এবং ষোড়শ-বিকারের কথা দেখিতে পাই।[২] সাধারণতঃ মূলপ্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ-তন্মাত্র—এই অষ্ট প্রকৃতি; আর একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোড়শ বিকার। এই অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকারের প্রভাব কৃষ্ণ-মহিষীগণের অষ্ট ও ষোড়শ সংখ্যার উপরে থাকাই সম্ভব।

তুঃ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর। গোপালতাপনী, পূর্বভাগ, ৪৬

... ... শক্ত্যা সমাহিতঃ।

... ... রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ॥ ঐ—উত্তরভাগ, ৩৯

কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতী রুক্মিণী। ঐ উত্তরভাগ, ৫৬

১ তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্তিতাঃ।
চন্দ্ররূপী মতঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ।
সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শী কলা।
প্রতিপৎতিথিমারভ্য সঞ্চরত্যাসু চন্দ্রমাঃ॥ ইত্যাদি।

২ অপরে চ আথর্বণিকাঃ "অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শবিকারাঃ" (গর্ভোঃ) ইত্যভিধীয়তে।—রামানুজাচার্যের শ্রীভাষ্য, ৪ পা, ৮ সূ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রী-সম্প্রদায়ে ও মাধ্বী-সম্প্রদায়ে ব্যাখ্যাত বিষ্ণুশক্তি শ্রী

আচার্য রামানুজ প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈত মত হইতেই বৈষ্ণবধর্ম দার্শনিক ভিত্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ইহার পূর্ব পর্যন্ত বৈষ্ণবধর্মমতের বিভিন্ন কথা নানাভাবে নানাশাস্ত্রে ছড়ান ছিল, কিন্তু অনেকস্থলেই বায়বাকারে বা তরলাকারে। আচার্য রামানুজ তাঁহার পূর্ববর্তী কালে প্রচারিত প্রসিদ্ধ প্রায় সকল বৈষ্ণব মতই গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি এই সকলকে উপাদান-স্বরূপে ব্যবহার করিয়া স্বীয় লোকোত্তর দার্শনিক প্রতিভাস্পর্শে তাহাকে একটি দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট মতবাদে রূপায়িত করেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে প্রথমে বৈষ্ণব মতের জাগরণ ঘটিয়াছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল নাস্তিক্য-বাদের প্রতিক্রিয়ায়। পরবর্তী কালে আবার দেখিতে পাই, আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সমগ্র ভারতবর্ষে এক প্রকাণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল; এই আলোড়ন ভারতবর্ষের ভক্তিবাদের ভিত্তিতে যে নাড়া দিয়াছিল তাহাকে রোধ করিবার ক্ষমতা বিভিন্ন পুরাণ-তন্ত্র-সংহিতাদির ছিল না; শঙ্করের ক্ষুরধার তর্ক-বুদ্ধির সম্মুখীন হইতে অনুরূপ বলিষ্ঠ প্রতিভার একান্ত প্রয়োজন ছিল; সেই প্রয়োজনেই আবির্ভাব রামানুজাচার্যের। আচার্য রামানুজের পর হইতেই দার্শনিক বৈষ্ণব মত নানাভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল; এই সকল মতবাদেরই মুখ্য প্রতিপক্ষ আচর্য শঙ্কর; বেদান্তের অদ্বৈতবাদের খণ্ডনের উপরেই মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য প্রভৃতি পরবর্তী সকল প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্যগণের দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা।

বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী বা শ্রীর রামানুজ-প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে; সম্ভবতঃ এইজন্যই রামানুজ-প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রী-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। এই সম্প্রদায়ের লোকগণ লক্ষ্মীনারায়ণ বা শ্রী- ও ভূ-শক্তি সমন্বিত অথবা শ্রী এবং 'তচ্ছায়া-সঙ্কাশা' ভূ ও নীলা দেবী সহ (লোকাচার্যের তত্ত্বত্রয়

দ্রষ্টব্য) বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন।[১] রাম-সীতার উপাসনাও ইঁহাদের ভিতরে বহুল প্রচলিত, লক্ষ্মী-নারায়ণ বা লক্ষ্মী-বিষ্ণু সম্পর্কিত কোন শ্লোকাদির ভাষ্য করিতে গিয়া ভাষ্যকারগণ সীতা-রাম এবং তাঁহাদের রামায়ণ-বর্ণিত অনুরূপ ঘটনাদির উল্লেখ সর্বদাই করিয়াছেন। আমরা এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারি, রামানুজাচার্যের ব্রহ্মসূত্রের উপরে যে প্রসিদ্ধ ভাষ্য তাহাও শ্রীভাষ্য নামেই খ্যাত। কিন্তু এই শ্রীভাষ্যের ভিতরে লক্ষ্মী বা শ্রীর তেমন কোন উল্লেখ বা তাঁহার সম্বন্ধে তেমন কোনও আলোচনা নাই। শ্রীভাষ্যে রামানুজাচার্যের মায়া-সম্পর্কীয় আলোচনা সুপ্রসিদ্ধ। রামানুজ মায়াকে কখনও মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; মায়ার মিথ্যাত্ব লইয়াই শঙ্করের সহিত তাঁহার একটি প্রধান বিরোধ। রামানুজ-মতে মায়া ব্রহ্মাশ্রিতা, সুতরাং ব্রহ্মশক্তিই বটে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এই মায়ারই রূপ, এই প্রকৃতি হইতেই সকল সৃষ্টি। এসকল বিষয়ে রামানুজের মতবাদ গীতার পুরুষোত্তমবাদেরই একান্তরূপে পরিপোষক। ক্ষর-অক্ষর, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি-পুরুষ এক ব্রহ্মের ভিতরেই বিধৃত, তাঁহা হইতেই সব; কিন্তু তিনি কিছুতেই নাই। গীতায় এবং বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থে যেমন সৃষ্টি-প্রকরণে প্রকৃতিকে স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা কোনও রূপেই স্বীকৃত হয় নাই, রামানুজাচার্যের মতও তাহারই অনুরূপ। সৃষ্টিব্যাপার প্রকৃতি দ্বারা সাধিত হয় বটে, কিন্তু পুরুষোত্তমই হইলেন মহেশ্বর, মায়ী—তিনিই মায়াশক্তি প্রকৃতির অধীশ্বর। এই প্রসঙ্গে রামানুজাচার্য শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদের প্রসিদ্ধ শ্রুতিগুলি[২], গীতা ও বিষ্ণুপুরাণের মতই প্রধানভাবে অনুসরণ এবং উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত মায়াশক্তি বা প্রকৃতির সহিত রামানুজাচার্য লক্ষ্মী বা শ্রীকে কোনভাবেই যুক্ত করেন নাই।

রামানুজ-সম্প্রদায়ে লক্ষ্মী বা শ্রীর যে একটি বিশেষ স্থান ও কার্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে তাহার জন্যই রামানুজ-সম্প্রদায় শ্রী-সম্প্রদায় নামে পরিচিত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য রামানুজ-সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত শাস্ত্ররাশির ভিতরে লক্ষ্মীর স্থান খুব উল্লেখযোগ্য নহে, লক্ষ্মী-সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনাও অতি সামান্য।

১ এই সম্প্রদায়ের লোকেরা হৃদয়ে ও বাহুযুগলে গোপীচন্দন-মৃত্তিকা দ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের প্রতিরূপ চিহ্ন ধারণ করেন এবং ঐ শঙ্খাদির মধ্যস্থলে একটি রক্তবর্ণ রেখা অঙ্কিত করেন; এই রেখাও লক্ষ্মীর প্রতীক বলিয়া খ্যাত। দ্রঃ—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ১ম খণ্ড।

২ এই গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদের ভিতরে শ্রী বা লক্ষ্মীর স্থান গৌণ হইলেও ইঁহাদের ধর্মমতের ভিতরে শ্রী একটি মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া আছেন। প্রাচীন এবং অপেক্ষাকৃত নবীন শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্যগণের লেখা আলোচনা করিলে মনে হয়, শ্রী বা লক্ষ্মী ঈশ্বরকোটি এবং জীবকোটি উভয়ের ভিতরে যেন একটি স্নেহপ্রীতিময় সেতু রচনা করিয়া রহিয়াছেন। লক্ষ্মী মঙ্গলময়ী এবং করুণাময়ী, তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'করুণাগ্রানতমুখী'; অষ্টোত্তরসহস্রনামের ভিতরেও বলা হইয়াছে 'করুণাং বেদমাতরম্'[১]; তাই ঈশ্বরকোটিতে অবস্থান করিয়াও এই করুণাময়ী দেবীর দৃষ্টি রহিয়াছে সর্বদাই দুঃখতাপক্লিষ্ট তাঁহার সন্তান—বদ্ধ জগজ্জীবের প্রতি। তিনি তাই তাঁহার করুণা-স্নেহ-প্রেমের দ্বারা জীবকে সর্বদা ভগবন্মুখী করিবার চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহার ব্রহ্ম-বিদ্যাস্বরূপতা দ্বারা জীবের সকল অজ্ঞান-তমঃ—সকল মায়াচ্ছন্নতা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; আবার তিনি বিষ্ণু-স্বরূপভূতা তাঁহার প্রিয়তমা প্রধানা মহিষী বলিয়া জীবের পক্ষ হইয়া পরমেশ্বরের উপরেও গভীর প্রভাব বিস্তার করিতেছেন,[২] তাঁহার কৃপাদৃষ্টি প্রপন্নার্ত জীবগণের প্রতি আকর্ষিত করিতেছেন। মুক্ত-জীবরূপে নিত্যকাল ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করাই হইল শ্রীবৈষ্ণবগণের সাধ্য—আর এই সাধ্যের জন্ম প্রপত্তি বা অনন্যশরণতাই হইল প্রধান সাধন। এই প্রপত্তিই মুখ্য সাধন হওয়াতে লক্ষ্মীর স্থানও মুখ্য হইয়া উঠিল। প্রিয়তমা ভগবৎ-পত্নী এবং কল্যাণময়ী করুণাময়ী জীবমাতা রূপে তিনি ভগবান্ ও জীব এতদুভয়ের মধ্যবর্তিনী হইয়া জীবকে সুবুদ্ধিদানে নিরন্তর ভগবন্মুখী করিয়া তুলিতেছেন, আবার ভগবান্‌কে জীবমুখীন করিয়া অকৃপণভাবে কৃপাবিতরণে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। লক্ষ্মীর এই-জাতীয় সকল বর্ণনার পশ্চাতে সর্বদাই একটি মানবীয় দৃষ্টান্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সে দৃষ্টান্ত হইল একটি আদর্শ গৃহিণীর দৃষ্টান্ত। তিনি স্বামিপক্ষে প্রেমময়ী পত্নী—আবার সন্তানপক্ষে স্নেহময়ী মাতা। সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনে দেখা যায়, পুত্রগণ ও পিতার মধ্যে যে স্নেহ-সম্বন্ধ তাহার ভিতরে কেমন যেন একটা পাতলা ব্যবধানের যবনিকা থাকে; পুত্রগণ সব সময় যেন পিতৃ-ইচ্ছা ভাল

১ যামুনাচার্যের 'চতুঃশ্লোকী'র দ্বিতীয় শ্লোকের বেঙ্কটনাথ কৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২ দ্রঃ

তস্মাং দাস ইতি প্রপন্ন ইতি চ স্তোষ্যাম্যহং নির্ভয়ো।
লোকৈকেশ্বরি লোকনাথদয়িতে দান্তে দয়াং তে বিদন্॥

যামুনাচার্যের চতুঃশ্লোকী, ২য় শ্লোক।

করিয়া বুঝিতে পারে না, বুঝিতে পারিলেও সকল পুত্রে সেই পিতৃ-ইচ্ছা পালন করিয়া পিতার একান্ত প্রিয় স্নেহপাত্র হইয়া উঠিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে না, পিতাকে এড়াইয়া চলিয়া তাহারা কেমন বহির্মুখীন হইয়া পড়িতে চায়। কিন্তু মধ্যখানে বিরাজ করেন মা, তিনি প্রেমময়ী প্রিয়তমা রূপে স্বামীর স্বরূপ এবং ইচ্ছাও সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন, আবার স্নেহময়ী সন্তানবৎসলা বলিয়া পুত্রগণের চরিত্র, প্রবণতা, দোষগুণও ভাল জানেন। তিনি তখন চেষ্টা করেন তাঁহার স্নেহপ্রীতি দ্বারাই সন্তানগণের শুভবুদ্ধির উদ্বোধন করিতে এবং আস্তে আস্তে তাহাদিগকে পিতৃ-ইচ্ছার অভিমুখী করিয়া তুলিতে ; অন্যদিকে তিনি চেষ্টা করেন, কিঞ্চিৎ উদাসীন পিতার সক্রিয় স্নেহদৃষ্টি সন্তানগণের প্রতি আকৃষ্ট করিতে এবং সহজাত প্রবৃত্তিবশে ভ্রমপথে পরিচালিত পুত্রের সকল দোষত্রুটি ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে কাছে ডাকিয়া লইবার অনুপ্রেরণা দিতে। লক্ষ্মীর কার্যও হইল অনুরূপ। অবিদ্যারূপ মায়ায় মোহিত জীবগণ ভগবৎ-স্বরূপ এবং ভগবদ্-ইচ্ছা ভালভাবে বুঝিতে পারে না ; যেটুকু বুঝিতে পারে তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তিও সে-পথ হইতে টানিয়া লয় ভগবদ্-বিপরীত মুখে ; এদিকে ষড়্‌গুণশালী ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর—অথচ গুণময় হইয়াও গুণাতীত—এমন বিষ্ণুর দৃষ্টিও হয়ত সর্বদা জীবাভিমুখী নয় ; মধ্যবর্তিনী লক্ষ্মী উভয়কে উভয়মুখী করিয়া তাঁহার প্রেমময়ীত্বের সার্থকতা লাভ করেন। যামুনাচার্যের চতুঃশ্লোকীর ভাষ্যে বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন, "কর্মার্হফলদ পতিতে (বিষ্ণুতে) শ্রীদেবীর দুইটি কৃত্য রহিয়াছে ; একটি হইল নিগ্রহ হইতে বারণ ; অপরটি হইল অনুগ্রহের সন্ধুক্ষণ।"[১] এই প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুচিত্তের মতও উদ্ধৃত হইয়াছে ; তিনি বলিয়াছেন যে মাতৃরূপা শ্রীরই সকলে শরণাপন্ন হয়। মাতা হিত অপেক্ষাও পুত্রের প্রিয় যাহা সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন, পিতার দৃষ্টি উভয়ের প্রতি ; তাই পিতা যেরূপ দণ্ডধর হন, মাতা সেরূপ হন না। তাই বলিয়া লক্ষ্মী দুষ্টের দমন করেন না তাহা নহে ; সীতার তেজোরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াই রাবণ রামকোপ-প্রপীড়িত হইয়াছিল। এই মাতৃরূপা লক্ষ্মীদেবী 'প্রণিপাত-প্রসন্না', 'ক্ষিপ্রপ্রসাদিনী দেবী', 'সদানুগ্রহসম্পন্না' ; তিনি 'ক্ষান্তিরূপিণী, ক্ষমা-রূপিণী, অনুগ্রহপরা, অনঘা'। সর্বদাই ইনি অনিষ্টনিবর্তন এবং ইষ্টপ্রাপণ-গর্ভ করুণা-নিরীক্ষণের দ্বারা সব কিছু রক্ষা করিতেছেন। ইন্দ্র-ব্রহ্মাদি দেবগণের সকল

---

১ অস্তি কর্মার্হফলদে পত্যৌ কৃত্যদ্বয়ং শ্রিয়ঃ।
নিগ্রহাদ্বারণং কালে সন্ধুক্ষণমনুগ্রহে॥

ঐশ্বর্য ইঁহারই কটাক্ষাধীন। পুরুষোত্তমদেব যেমন শ্রীকান্ত, শ্রীও সেইরূপ 'অরবিন্দলোচনমনঃকান্তা'; এইরূপ পরস্পরানুকূলতা দ্বারা সর্বব্যাপারেই উভয়ের সামরস্য; এই জন্যই শ্রীর প্রসাদ ব্যতীত কাহারও শ্রেয়োলাভ হয় না;[১] শুধু ঐহিক শ্রেয় নয়, ইঁহার কৃপা ব্যতীত মোক্ষলাভও সম্ভব হয় না। লক্ষ্মীর এই অনন্তকৃপাময়ী মাতৃমূর্তি সম্বন্ধে লোকাচার্য তাঁহার শ্রীবচনভূষণ গ্রন্থে এবং বরবর মুনি এই গ্রন্থের বিস্তারিত ভাষ্যে অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অবতার রাম-সীতাকে অবলম্বন করিয়া এবং বাল্মীকি-রামায়ণে বর্ণিত উপাখ্যান-সমূহকে অবলম্বন করিয়া লোকাচার্য এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীবৈষ্ণবগণের লক্ষ্মী সম্বন্ধে এই যে দৃষ্টি তাহার আভাস আমরা পুরাণাদিতেই পাইয়া থাকি।[২] পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে দেখিতে পাই, লক্ষ্মীই মধ্যবর্তিনী হইয়া সর্বদোষের আকর হিরণ্যকশিপুর উপরেও বিষ্ণুর কৃপাবর্ষণ সঙ্ঘটিত করাইয়াছিলেন।[৩] ব্রহ্মপুরাণেও দেখিতে পাই, জগৎস্রষ্টা জগন্নাথ, সর্বলোক-বিধাতা অব্যয় বাসুদেবকে প্রণতি পূর্বক পদ্মজা লক্ষ্মী দেবী সর্বলোকের হিতকামনায় সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই যে মর্ত্যলোকরূপ মহাশ্চর্য কর্মভূমি—এই যে লোভমোহগ্রস্ত কামক্রোধমহার্ণব—এই যে বিস্তীর্ণ সংসার-সাগর—ইহা হইতে জীবগণ কি করিয়া মুক্তিলাভ করিবে, ইহাই হইল প্রশ্নের বিষয়।[৪] এই প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, দেবী-চরিত্রের এই যে বৈশিষ্ট্য ইহা বৈষ্ণবশাস্ত্রে-

১ চতুঃশ্লোকী, ৩য় শ্লোক।

২ বেঙ্কটনাথ যামুনাচার্যের 'চতুঃশ্লোকী'র তৃতীয় শ্লোকের ভাষ্যে বিভিন্ন পঞ্চরাত্র-সংহিতা ও পুরাণাদি হইতে এই মত-প্রতিপাদক বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

৩ ২৩৮।১২৪-৩০ (বঙ্গবাসী)।

৪ তত্র স্থিতং জগন্নাথং জগৎ-স্রষ্টারমব্যয়ম্॥
সর্বলোকবিধাতারং বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
প্রণম্য শিরসা দেবী লোকানাং হিতকাম্যয়া।
পপ্রচ্ছেমং মহাপ্রশ্নং পদ্মজা তমনুত্তমম্॥

ব্রূহি ত্বং সর্বলোকেশ সংশয়ং মে হৃদি স্থিতম্।
মর্ত্যলোকে মহাশ্চর্যে কর্মভূমৌ সুদুর্লভে॥
লোভমোহগ্রহগ্রস্তে কামক্রোধমহার্ণবে।
যেন মুচ্যেত দেবেশ অস্মাৎ সংসারসাগরাৎ॥ ৪৫।১৬-১৯

বর্ণিত লক্ষ্মীদেবীরই বৈশিষ্ট্য নহে, ইহাও আমরা ভারতবর্ষের শাস্ত্রে বর্ণিত দেবী-চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। শৈব-শক্তি আগম-গুলি অধিকাংশই শিব-পার্বতীর প্রশ্নোত্তর-ছলে লিখিত ; সর্বত্রই দেখিতে পাই, জীবের দুঃখে বিগলিত-হৃদয়া দেবী জীবের হিতকামনায়, জীবের মুক্তির উপায় নির্ধারণ করিবার জন্যই পরমেশ্বর শিবের নিকট সকল তত্ত্ব এবং সাধন-পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন ; দেবীর প্রতি গাঢ়প্রেমবশতঃই মহেশ্বর শিব দেবীর নিকট জীবমুক্তির সকল তত্ত্ব ও পন্থা উপদেশ করিয়াছেন। মধ্যযুগের কিছু কিছু বাঙলা গ্রন্থেও এই প্রাচীন ধারার রেশ দেখিতে পাই। বহুসংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্রও এই একই ধরণে রচিত। সেখানেও করুণাবিগলিত ভগবতী-প্রজ্ঞাই জীবহিতকামনায় সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, ভগবান্ বজ্রেশ্বর হেবজ্র বা হেরুকই সকল প্রশ্নের উত্তরে সব তত্ত্ব ও সাধন ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] সুতরাং জীবের মঙ্গলকামনায় করুণাবিগলিত দেবীর এই যে সন্তানবৎসলা মাতৃমূর্তি, ইহাও ভারতবর্ষেরই সাধারণ মাতৃমূর্তি। বিশেষ সম্প্রদায়ের ভিতরে আসিয়াই ইহা একটি বিশেষ মূর্তি লাভ করিয়াছে।

শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্যগণ পঞ্চরাত্র শাস্ত্র এবং মুখ্যতঃ পুরাণগুলিকে অবলম্বন করিয়াই লক্ষ্মীর এই বিশেষ রূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রী-সম্প্রদায়ের ভিতরে শ্রী বা লক্ষ্মী সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে যে সকল গ্রন্থে আলোচনা রহিয়াছে তাহার ভিতরে প্রাচীন মতাবলম্বী হিসাবে রম্যযামাতৃ মুনির 'শাস্ত্রদীপ' এবং যামুনাচার্যের 'চতুঃশ্লোকী' ও 'শ্রীস্তোত্ররত্ন' গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থদ্বয়ের এবং রামানুজাচার্যের সুপ্রসিদ্ধ 'গদ্যত্রয়'-গ্রন্থের ভাষ্য করিয়াছেন 'কবিতার্কিক-সিংহ' শ্রীবেঙ্কটনাথ, সব ভাষ্যেরই নাম 'রহস্যরক্ষা' ; এই রহস্যরক্ষা নামক তিনটি ভাষ্যেই শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রী-তত্ত্ব সর্বাপেক্ষা ভালভাবে আলোচিত হইয়াছে। লোকাচার্যের 'শ্রীবচন-ভূষণ' গ্রন্থেও শ্রী-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা রহিয়াছে।

শ্রী-সম্বন্ধে শ্রীবৈষ্ণবগণের সব আলোচনার ভিতরেই দেখিতে পাই, বিষ্ণু-কৈঙ্কর্যকে সাধ্য রাখিয়া লক্ষ্মী-প্রপত্তিকেই সাধনরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। যামুনাচার্যের চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোক 'কান্তস্তে পুরুষোত্তমঃ' প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন,[২] লক্ষ্মী শুধু বিষ্ণুর সহধর্মিণী নন, 'সর্বপ্রকার

---

১ এই লেখকের An Introduction to Tantric Buddhism এবং Obscure Religious Cults এই গ্রন্থ দুইখানি দ্রষ্টব্য।

২ আর, বেঙ্কটেশ্বর এণ্ড কোং (মাদ্রাজ) হইতে প্রকাশিত।

অভিমতানুরূপা' ধর্মপত্নী। এখানকার এই 'কান্ত' কথাটির ভিতরেই লক্ষ্মীর বিষ্ণু-সম্বন্ধে সর্বপ্রকারের অনুরূপতার ভাবটি দ্যোতিত হইয়াছে; 'তে' কথাটির ভিতরে লক্ষ্মীর সর্বমঙ্গলা রূপে প্রসিদ্ধির পরিচয় আছে; আর পুরুষোত্তম-কান্তা হওয়াতে বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে লক্ষ্মীরও শ্রেষ্ঠত্ব সাধিত হইতেছে। বিষ্ণুর ন্যায় লক্ষ্মীরও ফণিপতি শয্যা এবং গরুড় বাহন। এই শ্রীই বেদের আত্মা (অথবা বেদই শ্রীর আত্মা) বলিয়া এই দেবী 'বেদাত্মা'[১]; ত্রিগুণরূপ তিরস্করিণী দ্বারা 'ভগবৎ-স্বরূপ-তিরোধানকরী' বলিয়া ইনি 'যবনিকা'; ইনিই প্রকৃতি-রূপিণী মায়া, জীব-পরমাত্মাদি বিষয়ে বিপরীতবুদ্ধি সৃষ্টি করেন বলিয়া তিনি 'জগন্মোহিনী'; আবার এই দেবীই মুক্তিপ্রদা শ্রী। বলা হইয়াছে যে, "এই দেবী নিজে সেবা করেন (বিষ্ণুকে) আবার সেবিত হন (দেব নর সকলের দ্বারা), সকল শোনেন আবার সকল মিশ্রিত করেন; নিখিল দোষকে নষ্ট করেন, আবার গুণের দ্বারা জগৎ পরিবর্তিত করেন; অখিল জগৎ যাঁহাকে নিত্য আশ্রয় করে এবং যিনি পরম-পদকে প্রাপ্ত করান"—তিনিই হইলেন শ্রীদেবী।[২] পরমাত্মা রূপ অমৃতের আধারভূতা বলিয়া এই দেবীকে বলা হয় 'অকলঙ্কাঽমৃতধারা'। যেহেতু ভগবান্ পুরুষোত্তম এই দেবীর আশ্রয়, আবার তাঁহার (পুরুষোত্তমের) মূর্তিও হইল তদাত্মিকা,[৩] এই জন্যই পুরুষোত্তম হইলেন 'শ্রীনিবাস' এবং 'শ্রীধর'। এই দেবী নির্দোষমঙ্গলগুণের আকর বলিয়া ভগবতী। ব্রহ্মাদি দেবতাগণও এই দেবীর মহিমা কীর্তন করিতে সক্ষম হন না, পরিমিতজ্ঞানশক্তি মানুষ আর কি করিয়া তাঁহার কথা বলিবে?[৪]

'বহেয়ং যজ্ঞং প্রবিশেয়ং বেদান্' ইতি সৌপর্ণশ্রুতিবিবক্ষিতং
বেদাভিমানিদেবতাধিষ্ঠাতৃত্বম্ ইত্যাদি। ভাষ্য।

শ্রয়ন্তীং শ্রীয়মাণাং চ শৃণ্বতীং শৃণতীমপি।
শৃণাতি নিখিলং দোষং শৃণোতি চ গুণৈর্জগৎ।
শ্রীয়তে চাখিলৈর্নিত্যং শ্রয়তে চ পরং পদম্॥
বেঙ্কটনাথের ভাষ্যে ধৃত।

যতো ঽহমাশ্রয়শ্চাস্যা মূর্তির্মম তদাত্মিকা।
ঐ ভাষ্য-ধৃত সাত্বত-সংহিতা।

কান্তস্তে পুরুষোত্তমঃ ফণিপতিশ্ শয্যাঽসনং বাহনং
বেদাত্মা বিহগেশ্বরো যবনিকা মায়া জগন্মোহিনী।
ব্রহ্মেশাদিসুরব্রজস্সদয়িতত্বদ্দাসদাসীগণঃ
শ্রীরিত্যেব চ নাম তে ভগবতি ব্রূমঃ কথং ত্বাং বয়ম্॥

লক্ষ্মী সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মের যে জগদুৎপাদিকা শক্তি তাহাই প্রকৃতি বলিয়া খ্যাত, এই মূল-প্রকৃতি ঈশানীই লক্ষ্মী শ্রী আদি নাম-সহস্রের দ্বারা কীর্তিত হন্; আর প্রকৃতি-পুরুষ ব্যতীত আর তৃতীয় কোন সত্য নাই বলিয়া লক্ষ্মী এবং নারায়ণীই হইলেন এই প্রকৃতি-পুরুষ। কেহ বলেন, সত্তাদিবিশিষ্ট ভগবান্‌ই শ্রী, কেহ বলেন, দৈত্যাদিমোহনাদির জন্য ভগবান্‌ই কোনও কোনও সময়ে নিজেই যে কান্তা-বিগ্রহ গ্রহণ করেন তাহাই হইল শ্রী। কিন্তু শ্রীবৈষ্ণবগণ এই সকল কোনও মতই স্বীকার করেন না; প্রসিদ্ধ পঞ্চরাত্রমত এবং পুরাণমতের সঙ্গে একমত হইয়া তাঁহারাও মনে করেন, নারায়ণ হইলেন প্রকৃতি-পুরুষাত্মক, অথচ উভয়ের ঊর্ধ্বে অবস্থিত পুরুষ। চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় লক্ষ্মীও নারায়ণ ধর্মধর্মিরূপে অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে অঙ্কুরোপাদানাংশের ন্যায় বিশ্বোপাদান-স্বরূপ 'ব্রহ্মের' কার্যোপযুক্তস্বরূপৈকদেশই স্বভাবতঃ অথবা পরিণতি-শক্তিদ্বারা বা উপাধিভেদের দ্বারা যে ভিন্নাহন্তা-আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাই শ্রী বলিয়া পরিগণিত হয়; এইরূপ মতও সমীচীন নয়, কারণ ব্রহ্মের রূপ-পরিণামাদি বেদান্তেই নিরস্ত হইয়াছে। 'এই শ্রী বিষ্ণুর অনপায়িনী শক্তি', 'অসিতাক্ষ দেববর ত্রিলোকের সকল কিছুকে যেমন গ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন, এই বরদা লক্ষ্মীও সেইরূপ অবস্থান করেন,' 'ইঁহাদের উভয় হইতে আর শ্রেষ্ঠ কিছু নাই', 'ইঁহারা দুইজন একতত্ত্বের ন্যায়ই উদিত'—এই সকল পুরাণবচনের দ্বারাও লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। অন্যমতে আবার বলা যাইতে পারে, নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মস্বরূপের তিরোধানকরী মিথ্যাভূতা মায়াই কল্পিতরূপবিশেষের দ্বারা উপশ্লিষ্ট হইয়া ব্রহ্মপ্রতিচ্ছন্দবতী রূপে লক্ষ্মী বলিয়া খ্যাত হন। এ মতও এই কারণে ঠিক নয় যে, তাদৃশ ভাবে ব্রহ্ম-স্বরূপের কখনও তিরোধানই হইতে পারে না।

আমরা শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি, প্রলয়দশায় ব্রহ্ম একমাত্র অবস্থান করিতেছিলেন; বৈষ্ণবগণ বলিবেন, এই প্রলয়দশাতেও লক্ষ্মী সেই এক পুরুষোত্তমের সঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন; কারণ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, 'আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্', তিনি স্বধার দ্বারা (সহিত) একা অবস্থান করিতেছিলেন। পুরাণাদি মতে এই স্বধা হইলেন লক্ষ্মী, কারণ পুরাণে লক্ষ্মী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 'স্বধা ত্বং লোকপাবনী'। মহাভারতে (?) লক্ষ্মী স্বয়ং বলিয়াছেন, 'অহং স্বাহা স্বধা চৈব'।[১] কিন্তু তাহা হইলে সমস্যা দাঁড়ায়, এই 'স্বধা'র উপরেই যদি

১ 'চতুঃশ্লোকী'র বেঙ্কটকৃত ভাষ্যে ধৃত।

প্রলয়দশায়,ব্রহ্মের প্রাণত্ব নির্ভর করে, তবে স্বাধীনসর্বসত্তাক ব্রহ্মের প্রাণত্ব স্বধা-রূপিণী লক্ষ্মীর অধীন হইয়া পড়ে। আসলে এই লক্ষ্মী বা স্বধা ব্রহ্মেতর কোন বস্তু নহে; 'স্বস্মিন্ ধীয়তে' স্বধা শব্দের এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিলে স্বধা-রূপিণী লক্ষ্মীর তাৎপর্য হয় ব্রহ্মেরই স্বকীয় বিশ্বধারণসামর্থ্য। মহাভারতে যেখানে বলা হইয়াছে, 'হে দ্বিজোত্তম, আমি মৎপর চরাচর সর্বভূত সৃষ্টি করিয়া বিদ্যার সহিত একাকী বিহার করিব';[১] অথবা যেখানে বলা হইয়াছে, আমিই 'মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী','আমিই শ্রদ্ধা এবং মেধা','শ্রদ্ধা দ্বারাই দেব দেবত্ব ভোগ করেন'— এসব স্থলে বিদ্যা, মেধা, শ্রদ্ধা, সরস্বতী প্রভৃতি কেহই ব্রহ্মকে ইঁহাদের অধীন করেন না, পরন্তু ইঁহাদের যোগে তিনি মহিমান্বিতই হইয়া উঠেন, যেমন মহিমান্বিত হন সূর্যদেব তাঁহার প্রভাদ্বারা, অথবা যেমন কোন পুরুষের দ্যোতমানত্ব লাভ হয় অভিরূপ আভরণের সহযোগে। পরদেবতার বিহরণাদি-রূপ যে 'দেবন'-ক্রিয়া তাহা সর্বতোভাবে তদনুরূপা 'সর্বাতিশয়িনী প্রীতি'-রূপিণী স্ববল্লভার সঙ্গেই পরমোৎকর্ষ লাভ করে। লক্ষ্মীর স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে বেঙ্কটনাথ তাঁহার ভাষ্যে আর একটি প্রণিধানযোগ্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ তিনটি কোটি স্বীকার করেন,—ব্রহ্ম-কোটি, জীব-কোটি (চিৎ) এবং জড়-কোটি (অচিৎ); এখন প্রশ্ন হইল এই, লক্ষ্মীর সত্তা এই তিন কোটির ভিতরে কোন্ কোটির অন্তর্ভুক্ত হইবে? এ বিষয়ে রম্যযামাতৃ মুনির 'তত্ত্বদীপে'র ভিতরে যে প্রাচীন মত পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, লক্ষ্মী জীবকোটিভুক্তা এবং সেইজন্য অণু-স্বভাবা।[২] কিন্তু পরবর্তী কালের বৈষ্ণবগণ লক্ষ্মীর এই অণুস্বভাবত্ব স্বীকার করেন না; বিষ্ণুর ন্যায় লক্ষ্মীও বিভু-স্বভাবা। লক্ষ্মী চেতনশীলা বলিয়া তাঁহার অচিদন্যত্ব স্বীকার করিতে হয়; বিভুত্বহেতু জীবান্যত্ব স্বীকার করিতে হয়, আবার পারতন্ত্র্য হেতু তাঁহার ঈশ্বরান্যত্ব। বস্তুতঃ 'পতিপুত্রব্যাবৃত্তপত্নীন্যায়ে'র দ্বারা লক্ষ্মীর উপরি-উক্ত তিন কোটি ভিন্ন একটি কোট্যন্তর স্বীকার করিতে হয়। সেখানে লক্ষ্মীর সত্তাও যেমন ভগবদধীনা, ভগবানের বৈভবও তেমনি রত্নপ্রভান্যায়ে বা পুষ্প-পরিমলন্যায়ে লক্ষ্মীর আয়ত্ত।

রামানুজাচার্যের গদ্যত্রয় গ্রন্থে দেখিতে পাই, নারায়ণের শরণাগতি লাভ করিবার জন্য তিনি প্রারম্ভেই অনন্যশরণ হইয়া 'অশরণ্য-শরণ্যা' লক্ষ্মীর শরণ

১ বেঙ্কটভাষ্যে ধৃত।

২ A History of Indian Philosophy, by S. N. Das Gupta, Vol. III., পৃঃ ৮৯।

গ্রহণ করিয়াছেন। এই 'গদ্যত্রয়ে'র ভাষ্যে বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন যে, প্রথমেই লক্ষ্মীর শরণাপত্তির কারণ এই, "এই লক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়াই অচিরে এবং সুখে গুণোদধি পার হইতে হয়।"[১] এই লক্ষ্মীই হইলেন যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা এবং আত্মবিদ্যা এবং ইনিই বিমুক্তিফলদায়িনী ;[২] জ্ঞান ও মুক্তি প্রদানে শ্রীই অনুগ্রহৈক-স্বভাবা। আর বিষ্ণু হইতেও লক্ষ্মী অনন্যা, লক্ষ্মী হইতেও বিষ্ণু অনন্য ;[৩] সুতরাং একের আশ্রয়েই অন্যের আশ্রয় লাভ ঘটে। পরিপূর্ণ সামরস্য হেতু এই সূক্ষ্মমিথুন 'পরস্পর-বিচিহ্নিত', এবং মূলে অন্যোন্যমিশ্রত্বহেতু ইহারা অন্যোন্যপ্রতিপাদক।[৪] প্রভা ও প্রভাবানের অন্যোন্যাশ্রয় যেরূপ অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ-দুষ্ট হয় না, লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর অন্যোন্যাশ্রয়ত্বও সেইরূপ দোষদুষ্ট নহে। রামানুজাচার্য যে লক্ষ্মীর শরণাগতি গ্রহণ করিয়াছেন সেই লক্ষ্মী কিরূপ ? তিনি রূপ, গুণ, বিভব, ঐশ্বর্য, শীলাদি সর্বক্ষেত্রেই একান্তরূপে বিষ্ণুর অনুরূপ, বিষ্ণুযোগ্যা, অতএব বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুর নিত্যানুকূলা।[৫] ইনি ষড়ৈশ্বর্যশালিনী, তাই ভগবতী ; ইনি নিত্যা, অনপায়িনী, নিরবদ্যা, দেবদেবদিব্যমহিষী এবং অখিল জগন্মাতা।

লোকাচার্যের শ্রীবচনভূষণ এবং বরবরমুনিকৃত তাহার ব্যাখ্যায় দেখিতে পাই, সীতা-রূপিণী লক্ষ্মী যে রাবণের নিকট নিগৃহীত হইয়া কারাগার বরণ করিয়া-

১ ভাষ্যধৃত সাত্বত-সংহিতা।

২ বিষ্ণুপুরাণ, এই গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩ 'অনন্যা রাঘবেণাহহম্', 'অনন্যা হি ময়া সীতা'।
তুঃ শ্রীবচনভূষণ, লোকাচার্য-প্রণীত, বরবর মুনিকৃত ব্যাখ্যা সমেত।
পুরী সংস্করণ, ১৯২৬। ৪৮ পৃষ্ঠা।
আরও তুলনীয় :—
অন্যা দেব্যা মনস্তস্মিংস্তস্য চাস্যাং প্রতিষ্ঠিতম্।
তেনেয়ং স চ ধর্মাত্মা মুহূর্তমপি জীবতি ॥ বেঙ্কটভাষ্যধৃত।

৪ তদেতৎ সূক্ষ্মমিথুনং পরস্পরবিচিহ্নিতম্।
আদাবন্যোন্যমিশ্রত্বাদন্যোন্যপ্রতিপাদকম্ ॥
'গদ্যত্রয়ে'র বেঙ্কটভাষ্যে ধৃত।

৫ তুলনীয় :—
গুণেন রূপেণ বিলাসচেষ্টিতৈঃ
সদা তবৈবোচিতয়া তব শ্রিয়া ॥
যামুনাচার্যকৃত 'স্তোত্ররত্ন', ৩৮।

ছিলেন তাহার ভিতর দিয়াও তাপক্লিষ্ট বদ্ধ জীবগণের জন্য তাঁহার সহানুভূতিই প্রকাশ পাইয়াছে।[১] লক্ষ্মীর এই স্নেহ-প্রীতি-জনিত কৃপাবৈভবকে বলা হয় 'পুরুষকার' বৈভব ; আর নারায়ণের এই জাতীয় বৈভবকে বলা হয় 'উপায়' বৈভব। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে সংসারের অধঃপতিত জীবগণের ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য লক্ষ্মীই পুরুষকারত্বে মহর্ষিগণ কর্তৃক নির্দিষ্টা হইয়াছেন। ভগবান্ লক্ষ্মী-পতি স্বয়ং ও তৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপে একমাত্র লক্ষ্মীকেই স্বীকার করিয়াছেন।[২] নারায়ণের অবশিষ্ট দিব্যমহিষীগণ এবং সূরিপ্রভৃতিরও লক্ষ্মী-সম্বন্ধের দ্বারাই পুরুষকারত্ব। জীবের সহিত ঈশ্বর এবং লক্ষ্মীর সমান সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও জীব ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কেন প্রথমে লক্ষ্মীরই আশ্রয় গ্রহণ করে এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্বোক্ত স্নেহময়ী অনন্তক্ষমাশীলা লক্ষ্মীর মাতৃত্ব এবং ঈশ্বরের হিতকামী দণ্ডধারী কঠোর পিতৃত্বের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। ঈশ্বর নিগ্রহানুগ্রহ উভয়েরই কর্তা, কিন্তু লক্ষ্মী অনুগ্রহৈক-স্বভাবা, এই জন্যই ঈশ্বর-কৃপা হইতে লক্ষ্মী-কৃপা শ্রেষ্ঠ। সীতারূপে মনুষ্যাকারে লক্ষ্মীদেবীর যে প্রথম আবির্ভাব তাহা শুধুমাত্র স্বকৃপা প্রকাশের জন্য।[৩] লক্ষ্মীর কৃপা জীবকে অনুগ্রহ করিবার জন্যও বটে, আবার ঈশ্বরকে প্রেমে বশ করিবার জন্যও বটে। সংশ্লেষদশায় তিনি ঈশ্বরকে বশীভূত করেন, আর বিশ্লেষদশায় জীবকে বশীভূত করেন।[৪] স্নেহ-প্রেমের উপদেশের দ্বারাই তাঁহার উভয়কে বশীকরণ। আর উপদেশে কাজ না হইলে চেতন জীবকে তিনি কৃপা দ্বারা এবং ঈশ্বরকে সৌন্দর্যের দ্বারা বশীভূত করেন।[৫]

পূর্বেই বলিয়াছি, লক্ষ্মী সম্বন্ধে শ্রীবৈষ্ণবগণের আলোচনা পঞ্চরাত্র এবং পুরাণ-মতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ; শ্রীবৈষ্ণবগণ ইহার সঙ্গে খানিকটা তাঁহাদের দার্শনিক দৃষ্টি সংযোগ করিয়াছেন, খানিকটা ধর্মবিশ্বাস যুক্ত করিয়া বিষ্ণু-শক্তির কৃপাময় রূপটিকে প্রাধান্য দান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও একটি লক্ষণীয় সত্য দেখিতে পাই শ্রীবৈষ্ণবগণের আলোচনার ভিতরে, তাহা হইল লীলাবাদ। আমরা পঞ্চরাত্র, কাশ্মীর-শৈবধর্ম, পুরাণাদির ভিতরেও এই

১ শ্রীবচনভূষণ, ৫ম বচন।

২ ৭ম বচনের বরবরমুনিকৃত ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩ ৯ম বচন।

৪ ১৩শ বচন।

৫ ঐ, ১৬।

লীলাবাদের উল্লেখ দেখিয়াছি, কিন্তু আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি, এই লীলা হইল সৃষ্টি-লীলা ; নিজের যে বিশ্ব-সৃষ্টিরূপে বিচিত্র প্রকাশ এবং সেই বিচিত্র প্রকাশকে আবার বীজস্বরূপ নিজের ভিতরেই নিঃশেষে সংহরণ ইহাই মোটামুটি লীলার তাৎপর্য ; কিন্তু স্বরূপভূতা শক্তির সহিত কোনও রসলীলার আভাস আমরা এই পর্যন্ত পাই নাই। অবশ্য লক্ষ্মী বা কমলার 'রমা' রূপটি আমরা অনেক পূর্ব হইতেই পাই, তাঁহাকে বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুবল্লভা রূপেও পাইয়াছি ; কিন্তু এ-সব স্থলেও লক্ষ্মীকে অবলম্বন করিয়া লীলার কোনও স্পষ্ট বর্ণনা কোথায়ও আমরা পাই না। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের একস্থানে অবশ্য এই স্বরূপলীলার অতি অস্পষ্ট একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে পরম ব্যোমরূপ যে বিষ্ণুর স্বধাম তাহাই হইল বিষ্ণুর 'ভোগার্থ', আর অখিল জগৎ হইল লীলার জন্য। এই ভোগ এবং লীলা দ্বারাই বিষ্ণুর বিভূতিদ্বয়ের সংস্থিতি। ভোগেই তাঁহার নিত্যস্থিতি, তখন তিনি আপন জগদ্ব্যাপাররূপ লীলা সংহরণ করিয়া লন ; এই ভোগ এবং লীলা উভয়ই তাঁহার শক্তিমত্তা হেতু বিধৃত হইয়া আছে। এখানে স্বধামে নিত্য স্বরূপ-লীলাই তাঁহার ভোগ এবং বিশ্বসৃষ্টিই তাঁহার বহির্লীলা।[১] এই লক্ষ্মীকে অবলম্বন করিয়া লীলার ধারণাটি শ্রী-সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও অনেকখানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। যামুনাচার্য তাঁহার 'শ্রীস্তোত্ররত্নে'র একটি স্তোত্রে বলিয়াছেন,

অপূর্বনানারসভাবনির্ভর-
প্রবুদ্ধয়া মুগ্ধবিদগ্ধলীলয়া।
ক্ষণাণুবৎক্ষিপ্তপরাদিকালয়া
প্রহর্ষয়ন্তং মহিষীং মহাভুজম্॥ ৪৪॥

অপূর্ব নানা রস এবং ভাবদ্বারা গভীরভাবে প্রবুদ্ধ যে লীলা—যে লীলা শুধু মুগ্ধলীলা নয়, বিদগ্ধলীলাও বটে—যে লীলা নিত্যলীলা—পরাদি কাল (অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল) যেখানে ক্ষণের অণুমাত্ররূপে পরিত্যক্ত হয়—সেই লীলা দ্বারাই মহাভুজ পুরুষোত্তম-দেবতা নিজের প্রিয়তমাকে প্রকৃষ্টরূপে হর্ষযুক্ত করিতেছেন। এই জাতীয় বর্ণনাই পরবর্তী কালের রসনির্ভর স্বরূপলীলার আভাস প্রদান করে।

১ ভোগার্থং পরমং ব্যোম লীলার্থমখিলং জগৎ।
ভোগেন ক্রীড়য়া বিষ্ণোর্বিভূতিদ্বয়সংস্থিতিঃ॥
ভোগে নিত্যস্থিতিস্তস্য লীলাং সংহরতে কদা।
ভোগো লীলা উভৌ তস্য ধার্যতে শক্তিমত্তয়া। ২২৭।৯-১০

শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারি নামে প্রসিদ্ধ চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্বাচার্য প্রচারিত মতটিই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের মত বলিয়া গৃহীত। মধ্বাচার্য রামানুজাচার্যের কিছু পরবর্তী কালের লোক। এই মধ্ব-সম্প্রদায়ও শ্রী-সম্প্রদায়ের ন্যায় লক্ষ্মীবাদকে মোটামুটি মানিয়া লইয়াছেনএবং লক্ষ্মী-নারায়ণকেই উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতে ব্রহ্মের 'অঘটিত-ঘটন-পটীয়সী' অচিন্ত্যশক্তি রহিয়াছে, পরমাত্মার মধ্যে এই শক্তিই লক্ষ্মী নামে খ্যাত এবং ব্রহ্মাদিদেবতা হইতে ইনি নিরবধিকা।[১] শক্তি চতুর্বিধা—অচিন্ত্যশক্তি, আধেয়শক্তি, সহজশক্তি ও পদশক্তি; ইহার ভিতরে অচিন্ত্যশক্তিই হইল 'পরমেশ্বরে সম্পূর্ণা'। পরমাত্মার ভিতরে অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা ঘটনীয় কোন কার্য থাকিতে পারে না এ-রূপ মনে করা উচিত নহে; কারণ শ্রুতিতেই আছে, তিনি আসীন থাকিয়াও দূরে গমন করেন, অণু হইয়াও মহৎ—এইরূপে সমস্ত বিরুদ্ধধর্মই তাঁহাতে সম্ভব। অচিন্ত্য-শক্তি দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়া থাকে। এই রমা বা লক্ষ্মীই হইলেন অচিন্ত্যশক্তি। রমা বা লক্ষ্মীই কিন্তু ব্রহ্মের সমস্ত অচিন্ত্যশক্তির প্রতিমূর্তি নহেন; পরমাত্মশক্তির অপেক্ষায় অনন্তাংশ ন্যূনা হইল লক্ষ্মীশক্তি, আবার লক্ষ্মীশক্তির অপেক্ষায় কোটিগুণ ন্যূনা হইল ব্রহ্মাদি-শক্তি।[২] অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী প্রভৃতির অভিমানী দেবগণ এই অচিন্ত্যশক্তিরই অণু-পরমাণু অংশমাত্র।[৩] লক্ষ্মী আর বিষ্ণু একেবারে এক না হইলেও বিষ্ণু যেমন নিত্যমুক্ত, সেই পরমাত্মা বিষ্ণুর ন্যায় তদ্‌ভার্যা নানারূপা লক্ষ্মীও নিত্যমুক্তা।[৪] অনাদিকালে ভগবৎসম্বন্ধ-হেতুই লক্ষ্মীর এই নিত্যমুক্তত্ব।[৫] এই উভয়েই অনাদি এবং নিত্যমুক্ত, উভয়েই অমৃত এবং নিত্য, সর্বগত। জগতের সবকিছুর 'ঈশানা' যে বিষ্ণু-পত্নী শ্রী, তিনি উপাসিতা হইলেই মুক্তিদা হন। ইনি চপলা, অম্বিকা, হ্রী; অব্যক্তা এই শক্তি সৃষ্টির সহিত আবার অভিন্নরূপা হইয়া অষ্ট-মূর্তিতে বিরাজ করেন; তিনিই আবার চিদ্রূপা, অনন্তা, অনাদি-নিধনা পরা।[৬]

১ মধ্বসিদ্ধান্তসার—পদ্মনাভকৃত (বোম্বাই-নির্ণয়-সাগর প্রেসে পুঁথি আকারে ছাপা), ১৩ (খ) পৃষ্ঠা।

২ ঐ, ১৪ (ক) পৃষ্ঠা।

৩ ঐ, ১৪ (ক); এই প্রসঙ্গে ২৬ (খ) পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

৪ পরমাত্মবন্নিত্যমুক্তা তদ্ভার্যা নানারূপা। ৭১ সূত্র।

৫ অনাদিকালে ভগবৎসম্বন্ধিত্বাদ্ যুজ্যতে নিত্যমুক্তত্বং তস্যাঃ। ৭১ সূত্রের বিবৃতি।

৬ ঐ, ২৭ (ক) পৃষ্ঠা।

এখানে অবশ্য বলা যাইতে পারে, পরমাত্মা যখন নিত্যমুক্ত তখন তাঁহার পরস্পর-সম্ভোগের দ্বারা সুখাভিব্যক্তির কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া তাঁহার এই পতি-ভার্যা-রূপত্বও অযুক্ত। তাঁহার ত' স্ব-রমণেই আনন্দ। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, তিনি 'স্বরমণ' হইলেও অনুগ্রহ দ্বারা তিনি স্ত্রীরূপ নিজের ভিতরেই প্রবেশ করিয়া রূপান্তরের দ্বারা নূতন রতি লাভ করেন। পুরুষ-স্ত্রী—পতিভার্যা রূপে যে অন্যোন্যতঃ রতি আসলে তাহা নিজের ভিতরেই, অন্যতঃ কিছুই না; সুতরাং তিনি যখন রমার সহিত রমণ করিয়াছেন তখনও তিনি আত্মরূপেই বর্তমান ছিলেন, স্ত্রীরূপে নহে। সুখাত্মা বিষ্ণুর অন্য সঙ্গে রমণ নাই, অন্যে রতি নাই; সুতরাং রমার সহিত যে রমণ সেখানে রমা শুধুমাত্র রতিপাত্রতা লাভ করিয়াছেন। বিষ্ণুর কখনও অন্য হইতে রতি নাই বলিয়া রমার কখনও রতিদাতৃত্ব নাই।[১] পরমাত্মার ন্যায় লক্ষ্মীও নানারূপা। শ্রী, ভূ, দুর্গা, অম্ভৃণী, হ্রী, মহালক্ষ্মী, দক্ষিণা, সীতা, জয়ন্তী, সত্যা, রুক্মিণী ইত্যাদি ভেদে তিনি বহু-আকারা। ইহার ভিতরে আবার 'দক্ষিণা' রূপেরই শ্রেষ্ঠত্ব, কারণ, এই দক্ষিণাতেই পরমাত্মসম্ভোগের প্রথম সুখাভিব্যক্তি। আদি সুখাভিব্যক্তির স্থান বলিয়াই দক্ষিণার বিশিষ্টতা।[২] পরমাত্মার ন্যায় লক্ষ্মীও জড়দেহরহিতা।[৩] ব্রহ্মা-রুদ্রাদি সকলে শরীর রক্ষা করে বলিয়া ক্ষর, অক্ষরদেহত্বহেতু লক্ষ্মী হইলেন অক্ষর, তাঁহার হইল চিদ্দেহকায়। লক্ষ্মীও তাই অপ্রাকৃতা। পরমাত্মার ন্যায় লক্ষ্মীও সর্বশব্দবাচ্যা।[৪] প্রকৃতিসম্বন্ধে আলোচনার ভিতরে দেখিতে পাই, প্রকৃতির দুইটি রূপ রহিয়াছে, একটি জড় পরিবর্তনশীল, আর একটি হইল নিত্য এবং মুক্ত-স্বরূপ। এই নিত্য মুক্ত-স্বরূপই (শুদ্ধসত্ত্ব) হইল অপ্রাকৃত তত্ত্বের

১ তদুক্তমৈতরেয় ভাষ্যে
এবমন্যোন্যতো বিষ্ণুরতঃ স্বস্মিন্ নবান্যতঃ।
রময়া রমমাণোঽপি তত্ত্বে নৈব স্ত্রিয়াত্মনা॥
রমতে নান্যতঃ ক্বাপি রতির্বিষ্ণোঃ সুখাত্মনঃ।
রময়া রমণং তস্মাদ্রমায়া রতিপাত্রতা॥
নৈবাস্যা রতিদাতৃত্বং বিষ্ণো র্নহ্যন্যতো রতিঃ॥
ঐ, ২৭ (খ) পৃষ্ঠা।

২ ঐ, ২৩ (খ)-২৪ (ক)।

৩ ঐ, ৭২ সূত্র।

৪ ঐ, ৭৩ সূত্র।

তাৎপর্য। প্রকৃতির যেমন এই একটি নিত্যমুক্ত লক্ষ্যাত্মক স্বরূপ আছে, ত্রিগুণ এবং পঞ্চভূতেরও তেমনই বিশুদ্ধ নিত্যমুক্ত একটি লক্ষ্যাত্মক স্বরূপ আছে। এই লক্ষ্যাত্মক ত্রিগুণ এবং পঞ্চভূতের দ্বারাই বৈকুণ্ঠধাম এবং তৎস্থিত যাহা কিছু সকলেরই সৃষ্টি। বিশুদ্ধ সত্ত্ব, রজ, তমের দ্বারাই দেবতা ও মুক্ত পুরুষগণের সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশ সাধিত হইয়া থাকে। ব্যোম-আকাশাদির যেমন একটি অনিত্য রূপ রহিয়াছে তেমন একটি লক্ষ্যাত্মক (শুধু লক্ষ্যাত্মক নয়, ইহা 'ঈশ্বর-লক্ষ্যাত্মক') রূপ রহিয়াছে; বায়ুরও নিত্য-প্রাণাদিরূপ লক্ষ্যাত্মক স্বরূপ রহিয়াছে। সলিলেরও এইভাবে লক্ষ্যাত্মক রূপ রহিয়াছে। প্রকৃতি এবং পরমব্যোম এতদুভয়ের মধ্যে বিরজা নদীর কথা এবং মত্তসরোবরাদির কথা পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই লক্ষ্যাত্মক। আবার ছান্দোগ্যভাষ্য মতে লক্ষ্মী মুক্ত জীবগণের পক্ষে কামরূপা বলিয়া তাঁহার উদকাত্মকত্বই যুক্তিযুক্ত[১]। আবার ভগবল্লোক বৈকুণ্ঠাদিতেও পৃথিবী রহিয়াছে (নতুবা সেখানে পুরী, গৃহদ্বারাদি সম্ভব হইত কিরূপে?); সেই পৃথিবীও মুক্তস্বভাবা এবং লক্ষ্যাত্মিকা। ঈশ্বর এবং লক্ষ্মীর মধ্যে নিত্য মধুর রসের অবস্থিতি[২]। এই ঈশ-লক্ষ্মীরও জ্ঞান আছে, তাহা সর্বদাই প্রত্যক্ষ, কখনও অনুমিত বা শাব্দ নহে। মোটের উপরে দেখিতে পাই, প্রাকৃত সৃষ্টির ভিতরে যাহা কিছু আছে তাহার সকলই নিত্যশুদ্ধমুক্ত রূপে বৈকুণ্ঠে ঈশ-লক্ষ্মীর ভিতরে রহিয়াছে।

চতুর্বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে রুদ্র ও সনক সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা লক্ষ্মীর স্থলে শ্রীরাধিকার আবির্ভাব দেখিতে পাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এই রাধাতত্ত্বের সম্যক্ স্ফুরণ। এখন আমরা এই রাধাতত্ত্বেরই অনুসরণ করিব।

১ মুক্তানাং কামরূপাদুদকাত্মকত্বং যুক্তম্। ঐ, ৫০ (খ) পৃষ্ঠা।

২ ঈশলক্ষ্ম্যোমধুররসঃ ঐ, ২১৫ সূত্র।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীরাধার আবির্ভাব

শ্রীরাধা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা আলোচনার দুইটি দিক্ দেখিতে পাইতেছি, একটি তত্ত্বের দিক্, আর একটি হইল ইতিহাসের দিক্। ধর্মমতের সহিত ঈষৎ তত্ত্বাশ্রিত ভাবে শ্রীরাধার সংমিশ্রণ দেখিতে পাই খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে; তত্ত্বরূপে শ্রীরাধার পরিপূর্ণতা বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধ্যানে ও মননে। কিন্তু কাব্যাদিতে শ্রীরাধার উল্লেখ বহুপূর্ব হইতেই পাওয়া যায়।

পুরাণাদির ভিতরে আজকাল নানাভাবে রাধার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিব, বিশেষ কোন দার্শনিক মত বা তত্ত্বমতের অবলম্বনে রাধাবাদের উৎপত্তি হয় নাই; রাধাবাদ মুখ্যতঃ পুরাণমূলকও নহে। আমাদের বিশ্বাস, পুরাণে রাধার যত উল্লেখ আধুনিক কালে দেখিতে পাই তাহা অধিকাংশই অর্বাচীন কালের যোজনা; এ-সম্বন্ধে তথ্য ও যুক্তির অবতারণা আমরা বিস্তারিত ভাবে যথাস্থানে করিব। রাধা সম্বন্ধে আমাদের নিকট যাহা কিছু প্রাচীন তথ্য রহিয়াছে তাহাতে মনে হয় সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই রাধার আবির্ভাব ও ক্রমপ্রসার; সাহিত্যাদি হইতে উজ্জ্বলরসের মাধ্যমে রাধার ধর্মমতের ভিতরে প্রবেশ। ধর্মমতে একবার প্রবেশের পর রাধার তত্ত্বরূপটি একটু একটু করিয়া বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। এই তত্ত্বের বিকাশে রাধা সত্যই 'কমলিনী'; অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বিষ্ণু-শক্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু বিশ্বাস, চিন্তা ও মতামত, সেই উর্বর ভূমির উপরে যেন উপ্ত হইয়াছিল এই অনন্ত বিচিত্রমধুর রাধার বীজ, সেই বীজ পুরাতন ভূমি হইতে উপজীব্য সংগ্রহ করিয়া আপনার নবধর্মে নিত্যনব সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে প্রকাশ লাভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। আমরা এই রাধা-বাদের আলোচনায় তাই প্রথমে সাহিত্যাদিতে রাধার প্রাচীন উৎসের সন্ধান করিব; তারপরে মুখ্যতঃ বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের মত অবলম্বন করিয়া রাধা-তত্ত্ব কিভাবে কতখানি পূর্বালোচিত শক্তিতত্ত্বের উপরে গ্রথিত এবং এ বিষয়ে

গৌড়ীয় গোস্বামিগণ এবং বৈষ্ণব কবিগণই বা কোথায় কিভাবে কতটুকু অভিনবত্বের সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন তাহার আলোচনা করিব।

(ক) রাধা-কৃষ্ণের জ্যোতিষ-তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যা

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে মূলতঃ কোনও ধর্মতত্ত্ব ছিল না, ইহা মূলতঃ একটি জ্যোতিষতত্ত্ব। বিষ্ণু হইলেন সূর্য ; বেদে সূর্য অর্থে 'বিষ্ণু' শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ। এই সূর্যরূপ বিষ্ণুই প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা এই ত্রিপাদে পরিক্রমণ করেন। ইহা হইতেই ত্রিপাৎ বামন অবতার এবং স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোকে তাঁহার তিন পাদক্ষেপের কল্পনা উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। কৃষ্ণ হইলেন এই বিষ্ণুর অবতার, অর্থাৎ সূর্যের রশ্মিস্থানীয়, বা প্রতিবিম্ব। পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় একটি প্রবন্ধে[১] দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পুরাণাদিতে গর্গমুনির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে বেশ বোঝা যায়, আসলে তিনি ছিলেন একজন জ্যোতিষে বিশেষজ্ঞ, এই জন্যই আদিত্য-অবতার কৃষ্ণকে তিনি প্রথমে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন ; তিনিই কৃষ্ণের নামকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ হইল সূর্য-প্রতিবিম্ব, গোপী তারকা।[২] ব্রজের কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যাহাকিছু অলৌকিক লীলা সকলই হইল সূর্যপ্রতিবিম্ব এবং তারকাগণকে লইয়া। কৃষ্ণের রাসলীলাকে জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা দিয়া যোগেশ বাবু বলিয়াছেন,—"রাধানাম পুরাতন এবং বিশাখা নক্ষত্রের নামান্তর ছিল। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে বিশাখা, অনুরাধা ইত্যাদি নক্ষত্রের নাম আছে। রাধার পর অনুরাধা। অতএব বিশাখার নাম রাধা। অথর্ব বেদে "রাধো বিশাখে" এই স্পষ্ট উক্তি আছে। বিশাখা নাম হইবার হেতু এই। এই নক্ষত্রে শারদ বিষুব হইত, বৎসর দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া যাইত। ইহা খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দের কথা। বোধহয় ইহার পূর্বে নক্ষত্রের নাম রাধা ছিল। রাধা অর্থে সিদ্ধি। এই নাম কেন হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। আরও অনেক নক্ষত্র-নামের সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় না। কালক্রমে রাধা ও বিশাখা একত্র হইয়া গিয়াছে। মহাভারতে কর্ণের ধাত্রী-মাতার নাম রাধা, এবং কর্ণ রাধেয় নামে সম্বোধিত হইতেন।"

১ ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩৪০।

২ 'গো' শব্দের এক অর্থ 'রশ্মি' ; সুতরাং সূর্যই 'গোপ', আর তারকা হইল 'গোপী'।

"কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সূর্য বিশাখার দিকে, বিশাখায় থাকে, রাধার সহিত সূর্যের মিলন হয়, কিন্তু অদৃশ্য। একদা তারা ও সূর্য দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। প্রাচীনেরা মনে করিতেন সূর্যের রশ্মিতেই তারার তারাত্ব, চন্দ্রের চন্দ্রিকা। গো রশ্মি, গোপ কৃষ্ণ, গো-পী তারা। কবি কৃষ্ণ-রবিকে রাস-মধ্যস্থ ও গোপী-তারাকে মণ্ডলাকারে সাজাইয়াছেন। চন্দ্র পুংলিঙ্গ না হইলে তিনি এই নামেই রাধার প্রতি-নায়িকা হইতে পারিতেন। কারণ পূর্ণিমাতে চন্দ্র রবির বিপরীত দিকে থাকে। প্রতিনায়িকার নিমিত্ত ইদানীং বঙ্গীয় কবিকে চন্দ্রাবলী নাম নির্মাণ করিতে হইয়াছিল। অমাবস্যার রাত্রে চন্দ্র-সূর্যের মিলন হয়, কৃষ্ণ গোপনে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করেন।" যোগেশ বাবু এ সম্বন্ধে আরও দেখাইয়াছেন, রাধা বৃষভানুর (অপভ্রংশে বৃখভানু, বৃক-ভানু) কন্যা। বৃষভানু হইল বৃষ-রাশিস্থ ভানু, রশ্মি। কৃত্তিকা বৃষরাশিতে অবস্থিত। রাধার জননীর নাম কৃত্তিকা হইবার কথা, পদ্মপুরাণে নামটি আছে 'কীর্তিদা'। রাধার স্বামীর নাম আয়ন (পরে আয়ান) ঘোষ। 'অয়নে ভবঃ আয়নঃ' ; অয়নে, উত্তরায়ণ দিনে জন্মহেতু আয়ন। তখন উত্তরায়ণ ফলশূন্য নপুংসক হইল। এই সকল নানা ভাবে বিচার করিয়া যোগেশবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কতকগুলি জ্যোতিষতত্ত্বই কবিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রূপকধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী কালের লোকেরা পৌরাণিক যুগের এই জ্যোতিষতত্ত্বটি আস্তে আস্তে ভুলিয়া গিয়া রূপকটাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইভাবেই রূপকাশ্রয়ে বহু-পল্লবিত রাধাকৃষ্ণ লীলোপাখ্যানের উদ্ভব হইয়াছে। যোগেশবাবুর বিচারে আমরা পুরাণাদিতে যে ব্রজের কৃষ্ণের উল্লেখ পাই তাঁহার কাল হইল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক এবং রাধার কাল হইল খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতক।

রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় যোগেশবাবুর মত প্রণিধানযোগ্য বটে। বৈদিকযুগের বিষ্ণুর সূর্যের সহিত সম্পর্ক অনস্বীকার্য। পরবর্তী কালে দেখিতে পাই, রাধার সখীগণের মধ্যে 'বিশাখা' একজন প্রধান। তাহা ছাড়া সখীগণের ভিতরে 'অনুরাধা' (ললিতা),জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ভদ্রা প্রভৃতির নাম পাইতেছি। ব্রজদেবীগণের মধ্যে একজনের নাম তারকা (ভবিষ্যোত্তর ও স্কান্দসংহিতা মতে, জীবগোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ধৃত)। চন্দ্রাবলীর (চন্দ্র ?) অন্য নাম পাইতেছি সোমাভা ; চন্দ্রের সহিত সোমাভা নামের সম্বন্ধও লক্ষণীয়। এই রাধা এবং সখীগণ ছাড়াও দেখিতে পাই, কৃষ্ণের পরিবারের কয়েকজন স্ত্রীও কয়েকটি প্রসিদ্ধ নক্ষত্রের নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যেমন বসুদেব-পত্নী রোহিণী, বলদেব-পত্নী রেবতী, কৃষ্ণ-

ভগিনী চিত্রা (সুভদ্রা) প্রভৃতি। এই সকল দৃষ্টে মনে হয়, পৌরাণিক যুগে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার মূলেও উপরি-উক্ত বিবিধ প্রকারের জ্যোতিষতত্ত্বের অনেক প্রভাব থাকা সম্ভব; কিন্তু এ-বিষয়ে আরও অনেক স্পষ্ট তথ্য না পাইলে গোপীগণ ও রাধাকে লইয়া কৃষ্ণ-প্রেমের যে সমৃদ্ধ উপাখ্যানাবলী তাহা সবই কতগুলি জ্যোতিষতত্ত্বের রূপকাশ্রয়ী রূপমাত্র এ-কথা এখন সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়া শক্ত। তবে শ্রীরূপ গোস্বামীর নাটকাদি পাঠ করিলে বেশ বোঝা যায়, রাধার যে এই একটা তারকারূপ রহিয়াছে তাহার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁহার কবিজনোচিত সালঙ্কৃত বর্ণনার ভিতরে ইহার বহু সন্ধান মেলে। ললিতমাধবে (১ম অঙ্ক) দেখিতে পাই, রাধার অপর নাম তারা,—'তারা নাম লোওত্তরা কণ্ণআ'। অন্যত্রও রাধাকে লইয়া একটি চমৎকার শ্লেষ দেখিতে পাই—

দনুজদমনবক্ষঃপুষ্করে চারুতারা
জয়তি জগদপূর্বা কাপি রাধাভিধানা।

"দনুজদমন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ-রূপ আকাশে যে রাধা নামে একটি জগদপূর্বা চারুতারা—তাহারই জয়।" বিদগ্ধমাধব নাটকে সূত্রধার-শ্লোকে দেখিতে পাই—

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ় নবানুরাগম্।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী॥

এখানে দেখিতেছি বৈশাখপূর্ণিমায় রাধা বা বিশাখা নক্ষত্রের সহিত পূর্ণিমার আবির্ভাব;[১] পক্ষান্তরে কৃষ্ণমিলনের জন্য দেবী পৌর্ণমাসীর সহিত রাধিকার আবির্ভাব। এরূপ দৃষ্টান্ত রূপ গোস্বামীর রচনায় আরও অনেক আছে।[২] ইহা

১ প্রতি বৈশাখপূর্ণিমায়াং প্রায়ো বিশাখানক্ষত্রস্য সম্ভবাৎ।—বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা।

২ তুলনীয়— বৃন্দে রাধামনুরুধ্যমানেন বিধুনৈব মধুরীকৃতেয়ং
মাধবীয়া পৌর্ণমাসী। —দানকেলীকৌমুদী।

আবার:—

ললিতা। মহু ব্বাহরেহি বুন্দে পহেলিঅং দিব্বপ্পহেলি বিণ্ণাণে।
পিঅসহি কিমহিক্‌খাএ লক্‌খিজ্জই মাহবো ভুঅণে।

বৃন্দা। সহি রাধাভিখ্যয়া।

কৃষ্ণ। যুক্তমিদং যদ্বৈশাখপর্যায়ৌ মাধবরাধৌ।—বিদগ্ধমাধব, ৭ম অঙ্ক।

ব্যতীত এই সকল নাটকাদিতে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, রাধা বহুস্থানেই সূর্যোপাসিকা। শ্রদ্ধেয় বিদ্যানিধি মহাশয় 'চন্দ্রাবলী' সম্বন্ধে উপরে যে কথা বলিয়াছেন তাহার সহিত রূপ গোস্বামীর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে—

পদ্মা। হলা সচ্চং ভণাসি। তথাহি—

বিজ্জোদন্তী রাহা পেক্‌খিজ্জই তাব তারআলীহিং।
গঅণে তমালসামে ণ জাব চন্দাঅলী প্‌ফুরই॥

ললিতা। (বিহস্য সংস্কৃতেন)

সহচরি বৃষভানুজায়াঃ প্রাদুর্ভাবে বরত্বিযোপগতে।
চন্দ্রাবলীশতান্যপি ভবন্তি নির্ধূতকান্তীনি॥[১]

(খ) বিবিধ পুরাণাদিতে রাধার উল্লেখ

বিবিধ পুরাণে বিবিধ প্রসঙ্গে আমরা রাধার উল্লেখ পাই; কিন্তু ইহার ভিতরে বিশেষভাবে লক্ষণীয় জিনিস এই যে, যে পুরাণখানিতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত এবং মধুরভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং যে পুরাণখানি রাধাতত্ত্ব এবং কৃষ্ণরসতত্ত্ব-স্থাপনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান অবলম্বন, সেই ভাগবত-পুরাণে রাধার স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও গৌড়ীয় গোস্বামিগণ ভাগবতের ভিতরেই রাধাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাস-লীলার বর্ণনার ভিতরে দেখিতে পাই, রাসমণ্ডল হইতে কৃষ্ণ তাঁহার একজন প্রিয়তমা গোপীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য গোপীগণের অন্তরালে সেই প্রিয়তমা গোপীকে লইয়া বিবিধভাবে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিতে করিতে বিরহাতুরা গোপীগণ বৃন্দাবনের এক বন-প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি-যুক্ত পদচিহ্নের সহিত আর একটি ব্রজবধূর পদচিহ্ন দেখিতে পাইল এবং সেই পরম সৌভাগ্যবতী কৃষ্ণপ্রিয়তমার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিল—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ (১০।৩০।২৪)

১ বিদগ্ধমাধব, ৭ম অঙ্ক।

"ইহা কর্তৃক (এই রমণী কর্তৃক) নিশ্চয়ই ভগবান্ ঈশ্বর হরি আরাধিত হইয়াছেন, যে জন্য গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীত হইয়া ইহাকে এই নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।" এই 'অনয়ারাধিতঃ' কথাটির ভিতরেই রাধার সন্ধান মিলিয়াছে।[১] সনাতন গোস্বামী এবং জীব গোস্বামীকে অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ও চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

> কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তিরূপ করে আরাধনে।
> অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥ আদি, ৪

রাধ্ ধাতু এখানে 'পরিচরণ' বা 'সেবন' অর্থে গৃহীত হইয়াছে। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, পরিচরণ বা সেবন অর্থে 'শ্রি' ধাতু হইতেই শ্রী-শব্দেরও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হইয়াছে। অবশ্য ভাগবতকার এখানে কৃষ্ণ-প্রিয়তমা এক প্রধানা গোপীর উল্লেখ করিলেন এবং আকারে-ইঙ্গিতে তাহার রাধা নামের আভাষ দিলেন, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া রাধা নামটির এই প্রসঙ্গে কেন উল্লেখ করিলেন না সে বিষয়ে সংশয় হইতে পারে এবং এ সংশয়ও স্বাভাবিক যে কৃষ্ণপ্রিয়া প্রধানা গোপীর রাধা নামটি হয়ত ভাগবতকারের পরিচিত ছিল না।[২] কিন্তু রাধা নাম ভাগবতকার ব্যবহার করুন আর না করুন, গোপীগণের মধ্যে একজন গোপী যে কৃষ্ণের প্রিয়তমা ছিল এই সত্যটি ভাগবতের রাস-বর্ণনায় খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণের গোপীগণসহ বৃন্দাবনলীলার অবতারণা প্রথম পাওয়া যায় খিল-হরিবংশে। এই হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের বিংশ অধ্যায়ে সংক্ষেপে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা বর্ণিত হইয়াছে ; সেখানে কোন প্রিয়তমা প্রধানা গোপীর

১ এখানে 'অনয়া আরাধিতঃ' বা 'অনয়া রাধিতঃ' এই দুই রকম পাঠই গ্রহণ করা যাইতে পারে ; উভয় পাঠেই অবশ্য অর্থ একই ; শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টীকায় কিছুই বলেন নাই ; কিন্তু সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলিয়াছেন,—"অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ ন ত্বস্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকারণঞ্চ দর্শিতং।" বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন,—"নূনং হরিরয়ং রাধিতঃ। রাধাং ইতঃ প্রাপ্তঃ" ইত্যাদি।

২ কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন, গোপীগণ পদচিহ্ন দ্বারাই এই কৃষ্ণ-প্রিয়া বিশেষ গোপীকে বৃষভানুনন্দিনী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল ; কিন্তু চিনিয়াও বাহিরে যেন চেনে নাই এইরূপ অভিনয়চ্ছলেই যেন রাধার সুহৃদ্গণ তাহার নামটি চাপিয়া গিয়াছে এবং এই নামনিরুক্তিদ্বারা রাধার সৌভাগ্যই ব্যঞ্জিত করিয়া তাহারা 'অনয়া রাধিতঃ' প্রভৃতি কথা বলিয়াছে।—পদচিহ্নৈরেব তাং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং পরিচিত্যাপ্যন্তরাখ্যস্তা বহুবিধ-গোপীজনসঙ্ঘট্টে তত্র বহিরপরিচয়মিবাভিনয়ন্ত্যস্তস্যাঃ সুহৃদস্তন্নামনিরুক্তিদ্বারা তস্যাঃ সৌভাগ্যং সর্বশ্লাঘ্যমাহুরনয়েব।

উল্লেখ বা আভাষ নাই। কিন্তু প্রাচীন পুরাণগুলির অন্যতম বিষ্ণুপুরাণে বিষয়বস্তু ও বর্ণনার দিক হইতে ভাগবতপুরাণের একেবারে অনুরূপ রাস-বর্ণনা রহিয়াছে এবং এখানেও সেই প্রিয়তমা 'কৃতপুণ্যা মদালসা' গোপীর উল্লেখ পাইতেছি। এখানে 'অনয়ারাধিতঃ' প্রভৃতি শ্লোকের পরিবর্তে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাইতেছি—

অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্যজন্মনি সর্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চিতো যয়া ॥ ৩।১৩।৩৪

"এইখানে বসিয়া সেই রমণী সেই কৃষ্ণ কর্তৃক কোনও পুষ্পের দ্বারা অলঙ্কৃতা হইয়াছে, যে রমণী কর্তৃক অন্যজন্মে সর্বাত্মা বিষ্ণু অভ্যর্চিত হইয়াছেন।" এখানে 'রাধিত' বা 'আরাধিত' শব্দটির পরিবর্তে 'অভ্যর্চিত' কথাটি পাইতেছি। অন্য পুরাণাদিতে রাসের এইজাতীয় বর্ণনা বা কোনও কৃষ্ণপ্রিয়া বিশেষ গোপীর উল্লেখ পাই না।

পদ্মপুরাণের একাধিক স্থানে রাধার নাম রহিয়াছে। রূপ গোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃতে পদ্মপুরাণ হইতে রাধার উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১] কিন্তু পদ্মপুরাণ হইতে গোস্বামিগণ একটি আধটি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন, আর অধুনা-প্রচলিত পদ্মপুরাণের বিভিন্নাংশে রাধা-নামের প্রায় ছড়াছড়ি দেখিতে পাইতেছি; ইহাতেই আমাদের সংশয়াচ্ছন্ন মনে বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করে। আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি। পদ্মপুরাণে গোপীগণ-সহ বৃন্দাবনলীলার কোন বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই রাধার উল্লেখ পাইতেছি না; প্রায় উল্লেখই এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে পাইতেছি। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে জয়ন্তী-ব্রতমাহাত্ম্য-খ্যাপন প্রসঙ্গে একবার রাধাষ্টমী-ব্রতের উল্লেখ পাই।[২] তৎপরে চত্বারিংশ-সর্গে রাধাষ্টমী-ব্রতের মাহাত্ম্যই আখ্যাত হইয়াছে। এই রাধাষ্টমীর সহিত প্রেমানুষঙ্গ কিছুই নাই, এই ব্রত করিলে গো-হত্যা, ব্রাহ্মণ-হত্যা, স্ত্রীহরণ প্রভৃতি জাতীয় পাপ হইতেও যে অক্লেশে মুক্তি লাভ করা যায় এবং অশেষ পুণ্য লাভ করা যায় তাহাই বলা হইয়াছে। লীলাবতী নামে এক বারনারীও রাধাষ্টমী-ব্রত করিয়া কি করিয়া বিষ্ণুপুর গোলক

১ ইঁহারা পদ্মপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন :—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

২ ৩৭।২৮,৪৪ (বঙ্গবাসী)

বাসের অধিকারী হইয়াছিল তাহারও বর্ণনা আছে। এই বর্ণনায় আরও জানিতে পারি, বিষ্ণু যখন ভূভার-হরণের নিমিত্ত কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন রাধাও তখন বিষ্ণুর আদেশে ভূভারহরণ নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইলেন। ভাদ্রমাসে সিত পক্ষে অষ্টমী তিথিতে বৃষভানুর যজ্ঞভূমিতে দিবাভাগে এই রাধিকা জাতা হইয়াছিল।[১] কার্ত্তিক মাসে রাধা-দামোদরের অর্চনা[২] এবং কার্ত্তিক মাসের শেষ পঞ্চ দিবসে বিষ্ণু-পঞ্চক ব্রতে রাধাসহ শ্রীহরির পূজার উল্লেখ দেখিতে পাই।[৩] পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বিষ্ণুধাম গোলকের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, এই গোলকের মধ্যেই গোকুল, আর গোকুলের মধ্যে হরির অধিকৃত প্রোদ্ভাসিত ভাস্কর ভবন বিদ্যমান, ঐ ভবন-মধ্যে নন্দগৃহেশ্বরী রাধা কর্তৃক আরাধিতা হইয়া সমুদিতা হন।[৪] পদ্মপুরাণের পাতাল-খণ্ডে রাধার বহুভাবে বহু উল্লেখ পাই। এই খণ্ডের ৩৮শ অধ্যায়ে সহস্রপত্রকমল গোকুলাখ্য মহদ্ধাম ও সেই পদ্মের কোন্ দলে কৃষ্ণের কোন্ লীলাভূমি তাহার বিশদ বর্ণনার পর বলা হইয়াছে,—সেই কৃষ্ণের প্রিয়া আদ্যা প্রকৃতি রাধিকা, রাধিকাই কৃষ্ণবল্লভা। সেই রাধিকার কলার কোটিকোট্যংশ হইল দুর্গাদি ত্রিগুণাত্মিকা দেবীগণ ; এই রাধিকার পাদরজঃস্পর্শ হইতেই কোটি বিষ্ণু জন্ম গ্রহণ করে।[৫] এই রাধাসহ গোবিন্দ স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন। ললিতাদি সখী হইল প্রকৃতির অংশ, রাধিকা হইল মূল-প্রকৃতি। অষ্ট প্রকৃতি হইল অষ্ট সখী, আর প্রধানা কৃষ্ণবল্লভা হইল রাধিকা।[৬] ইহারই পরবর্তী

১ ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞকে তিথৌ।
বৃষভানোর্যজ্ঞভূমৌ জাতা সা রাধিকা দিবা ॥ ৪০।৪১

২ ৪৬।৮৯, ৪৭।৭-৮

৩ ৪৮।৩

৪ ১৯৭।১১২

৫ তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্ত্বাদ্যা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা।
তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ ॥
তস্যাঃ পাদরজঃস্পর্শাৎ কোটিবিষ্ণুঃ প্রজায়তে ॥
—(কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত) ॥

৬ রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বর্ণসিংহাসনে স্থিতম্।
... ...
ললিতাদ্যাঃ প্রকৃত্যংশা মূলপ্রকৃতী রাধিকা ॥
... ...
অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ পুণ্যাঃ প্রধানা কৃষ্ণবল্লভা।
—পাতালখণ্ড, ৩৯শ অধ্যায়।

অধ্যায়ে দেখিতে পাই, একদিন নারদ বৃন্দাবনে বাল-কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বুঝিতে পারিলেন এবং মনে করিলেন, লক্ষ্মী দেবীও নিশ্চয়ই কোন গোপগৃহে অবতীর্ণা হইয়াছেন। খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি ভানু নামক গোপবর্ষের গৃহে সুলক্ষণা গৌরী কন্যা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইনিই কৃষ্ণবল্লভা লক্ষ্মীর অবতার, ইনি মাহেশ্বরী, রমা, আদ্যাশক্তি, মূলপ্রকৃতি, ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি। অন্যত্র দেখিতেছি, কৃষ্ণ নারদের নিকটে নিজেকে পুংরূপা রাধা দেবী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।[১] আবার অন্যত্র দেখি, এই রাধা "গোপীগণের মধ্যে তপ্তস্বর্ণপ্রভা, দিক্‌সকলকে স্বীয় প্রভায় বিদ্যুদুজ্জ্বলা করিয়া দ্যোতমানা; ইনি প্রধানরূপা ভগবতী—যাঁহাদ্বারা এই সকল ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইনি সৃষ্টিস্থিতি-অন্তরূপা, বিদ্যাবিদ্যা, ত্রয়ী, পরা, স্বরূপা, শক্তিরূপা, মায়ারূপা, চিন্ময়ী। ইনিই ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদির দেহ-কারণ-কারণ। ইনিই সেই বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা—সকলের ধারণাধাররূপা বলিযা রাধা। এই রাধা-বৃন্দাবনেশ্বরই হইলেন পুরুষ-প্রকৃতি।[২]

রাধা-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণের এই সকল উল্লেখ এবং বর্ণনা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, ইহা রাধার কোনও আদিম রূপের পরিচয় নহে। রাধার উৎপত্তি বৃন্দাবনের প্রেমলীলায়, ইহাতে কোন সংশয় নাই; কিন্তু পদ্ম-পুরাণান্তর্গত এইসকল উল্লেখ পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, রাধাবাদের যথেষ্ট প্রসার ও প্রসিদ্ধিকে অবলম্বন করিয়াই যেন এই সকল বর্ণনা গড়িয়া উঠিয়াছে। পদ্ম-পুরাণের রচনা-কাল নির্ণয় করা শক্ত, আনুমানিক ভাবে ষষ্ঠ শতক—এমন কি অষ্টম শতকের

১ পাতালখণ্ড, ৪৪ অধ্যায়।

২ তাসাং তু মধ্যে যা দেবী তপ্তচামীকরপ্রভা॥
দ্যোতমানা দিশঃ সর্বাঃ কুর্বতী বিদ্যুদুজ্জ্বলাঃ।
প্রধানং যা ভগবতী যয়া সর্বমিদং ততম্॥
সৃষ্টি-স্থিত্যন্তরূপা যা বিদ্যাবিদ্যা ত্রয়ী পরা।
স্বরূপা শক্তিরূপা চ মায়ারূপা চ চিন্ময়ী॥
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদীনং দেহকারণকারণম্।
চরাচরং জগৎ সর্বং যন্মায়াপরিরঞ্জিতম্॥
বৃন্দাবনেশ্বরী নাম্না রাধা ধাত্রানুকারণাৎ।
তামালিঙ্গ্য বসন্তং তং মুদা বৃন্দাবনেশ্বরম্।
... ...
পুরুষ-প্রকৃতী চাদ্যৌ রাধা-বৃন্দাবনেশ্বরৌ॥

কাছাকাছি—ধরিয়া লইলেও তৎকালে অন্ততঃ বৈষ্ণবধর্ম-মতে রাধার এতখানি প্রসার এবং প্রসিদ্ধি লাভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং রাধা সম্বন্ধে এইসকল উল্লেখ পরবর্তী কালের যোজনা এইরূপ সংশয়কে একেবারে অযৌক্তিক বলা যাইতে পারে না। কোন্ অংশ কোন্ সময়কার প্রক্ষেপ তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে রূপগোস্বামী যে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন তাহা অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই পদ্মপুরাণে স্থান পাইয়াছে এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

যে কারণে পদ্মপুরাণে বর্ণিত উপরি-উক্ত বর্ণনাসমূহের খাঁটিত্ব ও প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সংশয় জন্মে সেইসব কারণ আরও বড় হইয়া বৃহত্তর সংশয়ের সৃষ্টি করে 'নারদ-পঞ্চরাত্র' গ্রন্থের রাধা বর্ণনায়। আমরা এই গ্রন্থখানিকে মুদ্রিত রূপে যে ভাবে পাইতেছি[১] তাহাকে কোনক্রমেই একখানি প্রাচীন পাঞ্চরাত্র-গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই ; এই জন্য পাঞ্চরাত্র মতের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ করি নাই। এই গ্রন্থের নমস্কার শ্লোকে দেখিতে পাইতেছি,—

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা পরা ॥ ১।২[২]

'রাধা' শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

রাশব্দোচ্চারণাদ্ ভক্তো ভক্তিং মুক্তিঞ্চ রাতি সঃ।
ধাশব্দোচ্চারণেনৈব ধাবত্যেব হরেঃ পদম্ ॥ ২।৩।৩৮

অর্থাৎ "'রা' শব্দ উচ্চারণের দ্বারাই ভক্ত হয়, এবং সে ভক্তি ও মুক্তি প্রাপ্ত হয় ; আর 'ধা' শব্দ উচ্চারণের দ্বারায় হরির পদে ধাবিত হয়।" রাধা শব্দের এইজাতীয় ব্যুৎপত্তি ও তাৎপর্য পরবর্তী কালে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে, প্রাচীন কালেও ছিল কিনা সে-বিষয়ে আমরা সংশয়ান্বিত। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোনও একটি বাদ ধর্মের কোঠায় আসিয়া অনেকদিন ভক্তি-বিশ্বাসের দ্বারা পরিপুষ্ট হইবার পরই এইজাতীয় শব্দ-ব্যুৎপত্তি গড়িয়া উঠিতে থাকে। অন্যান্য স্থানে রাধিকার যে-সকল সুদীর্ঘ প্রশস্তি পাওয়া যায় তাহাতে মোটামুটি দেখিতে পাই, রাধিকা হইলেন পরাশক্তি, তিনিই বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম-

১ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

২ তুলনীয় :—

ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতা সর্বসিদ্ধিদা।
প্রণবাদ্যা মহামায়া রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥ ২।৩।৭২

লক্ষণে বিভিন্ন দেবীরূপে আবির্ভূতা হন; মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীতে উক্ত 'দ্বিতীয়া কা মমাপরা' দেবীর সহিত এই পরা-শক্তি রাধিকাকে মোটামুটিভাবে অভিন্না বলিয়া গ্রহণ করা চলে।[১] পুরাণাদিতে আমরা লক্ষ্মীর যে বিমিশ্র বর্ণনা দেখিয়া আসিয়াছি, নারদ-পঞ্চরাত্রে রাধা-বর্ণনায় সেই বিমিশ্রতা আরও জটিলতা লাভ করিয়াছে মাত্র।[২] এ-সকল বর্ণনা পড়িয়া সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, ইহা প্রেমো-

১ প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী রাধারূপা চ সা মুনে।
রসনাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী স্বয়মেব সরস্বতী॥
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী যা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা নাম্না চ পার্বতী॥
সর্বেষামপি দেবানাং তেজঃসু সমধিষ্ঠিতা।
সংহন্ত্রী সর্বদৈত্যানাং দেববৈরীবিমর্দিনী॥
স্থানদাত্রী চ তেষাঞ্চ ধাত্রী ত্রিজগতামপি।
ক্ষুৎ-পিপাসা দয়া নিদ্রা তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা তথা॥
লজ্জা ভ্রান্তিশ্চ সর্বেষামধিদেবী প্রকীর্তিতা।
মনোঽধিষ্ঠাত্রী দেবী সা সাবিত্রী বিপ্রজাতিষু॥
রাধা বামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্তিতা॥
ঐশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব হি নারদ।
তদংশা সিন্ধুকন্যা চ ক্ষীরোদমথনোদ্ভবা।
মর্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ॥
তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে॥
স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ। (২।৩।৫৫-৬২)

২ যেমন:—

শ্রীকৃষ্ণোরসি যা রাধা যদ্বামাংশেন সম্ভবা।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে সা চ নারায়ণোরসি॥
সরস্বতী সা চ দেবী বিদুষাং জননী পরা।
ক্ষীরোদসিন্ধুকন্যা সা বিষ্ণুরসি চ মায়য়া॥
সাবিত্রী ব্রহ্মণো লোকে ব্রহ্মবক্ষঃস্থলস্থিতা।
পুরা সুরাণাং তেজঃসু আবির্ভূতা দয়া হরেঃ॥
স্বয়ং মূর্তিমতী ভূত্বা জঘান দৈত্যসঙ্ঘকান্।
দদৌ রাজ্যং মহেন্দ্রায় কৃত্বা নিষ্কণ্টকং পদম্॥
কালেন সা ভগবতী বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
বভূব দক্ষকন্যা চ পরং কৃষ্ণাজ্ঞয়া মুনে॥

পাখ্যান-সম্ভূতা গোপী রাধিকাকে ভারতবর্ষের সর্বস্বরূপা শক্তিমূর্তির সহিত এক করিয়া দিবার একটু পরবর্তী কালের অনিপুণ চেষ্টা মাত্র।

মৎস্য-পুরাণের একটি শ্লোকার্ধেও রাধার উল্লেখ পাই; সেখানে বলা হইয়াছে, 'রুক্মিণী হইল দ্বারাবতীতে, আর রাধা হইল 'বৃন্দাবনের বনে'।[১] এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই, সমস্ত মৎস্য-পুরাণে কোথাও বিষ্ণুর কৃষ্ণাবতারে ব্রজলীলার বর্ণনা নাই। এমন কি, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বিষ্ণু-শক্তি লক্ষ্মীর বর্ণনাও মৎস্য-পুরাণে অত্যল্প; যেখানে লক্ষ্মীর উল্লেখ রহিয়াছে সেখানেও ভারতবর্ষের আরও অনেক শক্তিদেবীর সঙ্গে একজন শক্তিদেবী-রূপে, সেখানেও বিষ্ণুর সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগ কম। সে-অবস্থায় মাঝখানে হঠাৎ একটি শ্লোকার্ধে রাধার উল্লেখ আমরা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত। আরও দেখিতে পাই, পদ্ম-পুরাণের সৃষ্টি-খণ্ডে এই শ্লোকার্ধটিকে পাওয়া যাইতেছে। সেখানে বিষ্ণু-কর্তৃক সর্বব্যাপিনী সাবিত্রীর স্তবে বলা হইয়াছে যে শক্তিরূপা এই সাবিত্রী ভারতবর্ষের তাবৎ তীর্থ-ভূমিতে বিভিন্ন দেবীমূর্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন; এবং সেই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে যে তিনি দ্বারকায় রুক্মিণী

ত্যক্ত্বা দেহং পিতুর্যজ্ঞে মমৈব নিন্দয়া মুনে।
পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনা কন্যা বভূব সা॥
আবির্ভূতা পর্বতে সা তেনেয়ং পার্বতী সতী।
সর্বশক্তিস্বরূপা সা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী॥
বুদ্ধিস্বরূপা পরমা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
সম্পদ্রূপেন্দ্রগেহে সা স্বর্গলক্ষ্মীস্বরূপিণী॥
মর্ত্যে লক্ষ্মী রাজগেহে গৃহলক্ষ্মীর্গৃহে গৃহে।
পৃথক্ পৃথক্ চ সর্বত্র গ্রামেষু গ্রামদেবতা॥
জলে সত্য (শৈত্য ?) স্বরূপা সা গন্ধরূপা চ ভূমিষু।
শব্দরূপা চ নভসি শোভারূপা নিশাকরে॥
প্রভারূপা ভাস্করে সা নৃপেন্দ্রেষু চ সর্বতঃ।
বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ সর্বশক্তিশ্চ জন্তুষু॥
সৃষ্টিকালে চ সা দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
মাতা ভবেন্মহাবিষ্ণোঃ স এব চ মহান্ বিরাট্॥ ইত্যাদি। ২।৬।১৪-২৫

[১] রুক্মিণী দ্বারাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।—আনন্দাশ্রম সং, ১৩।৩৮

বৃন্দাবনে রাধা। বৃন্দাবনের রাধা এখানে পুরাণ-তন্ত্রাদি-বর্ণিত বহুদেবদেবীর ভিতরে এক দেবী।[১] এইরূপে বায়ু-পুরাণ,[২] বরাহ-পুরাণ,[৩] নারদীয়-পুরাণ[৪] আদি-পুরাণ[৫] প্রভৃতি পুরাণে একটি আধটি করিয়া শ্লোকে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়; এইরূপ একটি আধটি শ্লোকের উল্লেখকে অবলম্বন করিয়া কোন কথা বলা শক্ত, ইহার কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত কোন্‌টি খাঁটি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার কোনও উপায় নাই।

রাধাকে অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণলীলা রীতিমত জমকালো হইয়া উঠিয়াছে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সংশয় এবং অবিশ্বাসও আমাদের অধুনা-প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের সম্বন্ধেই সর্বাপেক্ষা অধিক। পণ্ডিতেরা অনেকেই অধুনা-প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।[৬] এই সংশয়ের প্রথম কারণ এই, মৎস্য-পুরাণের দুইটি

১ সাবিত্রী-পুষ্করে সাবিত্রী, বারাণসীতে বিশালাক্ষী, নৈমিষে লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে ললিতা দেবী, গন্ধমাদনে কামুকা, মানসে কুমুদা, অম্বরে বিশ্বকায়া, গোমন্তে গোমতী, মন্দরে কামচারিণী, চৈত্ররথবনে মদোৎকটা, হস্তিনাপুরে জয়ন্তী, কান্যকুব্জে গৌরী, মলয়াচলে রম্ভা, একাম্রকাননে কীর্তিমতী, বিশ্বেশ্বরে বিশ্বা, কর্ণিকে পুরুহস্তা, কেদারে মার্গদায়িকা, হিমালয়ে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকালিকা, স্থাণীশ্বরে ভবানী, বিল্বকে বিল্বপত্রিকা, শ্রীশৈলে মাধবী দেবী, ভদ্রেশ্বরে ভদ্রা, বরাহগিরিতে জয়া, কমলালয়ে কমলা, রুদ্রকোটীতে রুদ্রাণী, কালঞ্জরে কালী, মহালিঙ্গে কপিলা, কর্কোটে মঙ্গলেশ্বরী; এইরূপ আরও বিশ স্থানে বিশ দেবীর উল্লেখ করিয়া সাবিত্রী দেবীকে দ্বারবতীতে রুক্মিণী এবং বৃন্দাবনে রাধা বলা হইয়াছে।

—(বঙ্গবাসী), ১৭।১৮২-১৯৬

২ রাধা-বিলাস-রসিকং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্‌।
শ্রুতবানস্মি বেদেভ্যঃ যতস্তদ্‌গোচরোঽ ভবৎ ॥—আনন্দাশ্রম সং, ১০৪।৫২

৩ তত্র রাধা সমাশ্লিষ্য কৃষ্ণমক্লিষ্টকারণম্‌।
স্বনাম্না বিদিতং কুণ্ডং কৃতং তীর্থমদূরতঃ ॥
রাধাকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্বপাপহরং শুভম্‌।—(বঙ্গবাসী), ১৬৪।৩৩-৩৪

৪ (বঙ্গবাসী), ১।৪৩-৪৪

৫ রূপগোস্বামীর 'লঘুভাগবতামৃতে' ধৃত শ্লোক :—
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ তত্র রাধাভিধা মম ॥

৬ শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার ভট্টাচার্যদিগের রচনার মত। ইহাতে ষষ্ঠী-মনসারও কথা আছে।" (কৃষ্ণ-চরিত্র)

শ্লোকে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের যে পরিচয় দেওয়া আছে, অধুনা-প্রচলিত ব্রহ্ম-বৈবর্ত-পুরাণের সহিত তাহার আকার বা প্রকার কোন দিক্ হইতেই মিল নাই। দ্বিতীয় কথা হইল, সমস্ত ব্রহ্মবৈবর্ত ভরিয়া রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার এত ছড়াছড়ি, অথচ গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণ এই পুরাণখানির রাধালীলার কোনও উল্লেখ-মাত্র করিলেন না কেন? ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণকারের আর একটি অভিনবত্ব আছে, তিনি রাধাকৃষ্ণকে বিধিপূর্বক মহা ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা এই বিবাহের কন্যাকর্তা।[১] রাধাকে অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় বহুবিধ উপাখ্যান ও বর্ণনা অনেক সময় এমন লৌকিক নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছে যে প্রাচীন পুরাণকারগণের পক্ষে তাহা সব সময় শোভন বা স্বাভাবিক মনে হয় নাই।

ব্রহ্মবৈবর্তকার কতগুলি উপাখ্যানকে যেন অতিশয় ফলাও করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই আতিশয্যও অনেক সময় সংশয়ের কারণ হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রথম শ্লোকটি পাঠ করিলেই বেশ বোঝা যায়, কবি রাধাকৃষ্ণ-লীলার একটি বিশেষ উপাখ্যানকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন। এই শ্লোকটিতে বর্ণিত উপাখ্যানটির একটু বিস্তৃততর প্রাচীন রূপ পাইবার জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা জন্মে; কিন্তু ব্রহ্ম-বৈবর্ত-পুরাণে এই উপাখ্যানটির যেরূপে বর্ণনা দেওয়া আছে তাহা পাঠ করিলেই মনে হয়, পরবর্তী কালের কোনও লোক আমাদের আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়া অনেকখানি স্থূলভাবেই যেন সেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা নারদ-পঞ্চরাত্রে 'রাধা' শব্দের পুরাণকার-প্রদত্ত যে স্বকপোলকল্পিত ব্যুৎপত্তি দেখিয়া আসিয়াছি, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণেও রাধা-শব্দের সেই ব্যুৎপত্তি-শ্লোকটিই দেখিতে পাই।[২] এই সব নানা কারণে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে রাধা-উপাখ্যানের প্রাচুর্য এবং রাধামাহাত্ম্য-খ্যাপনের সকল আতিশয্য থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ-বর্ণিত রাধার তথ্য বা তত্ত্ব কোনটাকে অবলম্বন করিয়াই বিশেষ কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহী হইলাম না।

আমরা দেখিতে পাই, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রসিদ্ধ পুরাণগুলির ভিতরে একমাত্র পদ্ম-পুরাণে এবং মৎস্য-পুরাণে[৩] রাধার উল্লেখ আছে বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৫ অধ্যায় (বঙ্গবাসী)।

২ রাশব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো ইত্যাদি।—ব্রহ্মবৈবর্ত, প্রকৃতিখণ্ড, ৪৮।৪০ (বঙ্গবাসী)

৩ রাধা-বৃন্দাবনে বনে ইতি মৎস্যপুরাণাৎ।—জীবগোস্বামিকৃত 'ব্রহ্মসংহিতা'র টীকা।

অন্যান্য পুরাণগুলির ভিতরে রাধার প্রবেশ হয়ত তখনও পর্যন্ত ঘটে নাই। এই জন্য রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী এবং কবিরাজ গোস্বামী বিভিন্ন শ্রুতি স্মৃতি, তন্ত্র এবং উপপুরাণ হইতে রাধার প্রাচীনতার প্রমাণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণির রাধা-প্রকরণে বলিয়াছেন যে, " 'গোপালোত্তরতাপনী'তে রাধা গান্ধর্বীনামে বিশ্রুতা, 'ঋক্-পরিশিষ্টে' রাধা মাধবের সহিত উদিতা।"[১] তন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া রূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—"হ্লাদিনী যে মহাশক্তি—যিনি সর্বশক্তিবরীয়সী—সেই রাধা হইলেন তৎসারভাব-রূপা, তন্ত্রে এই কথাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"[২] জীবগোস্বামী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র' হইতেও রাধা সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।[৩] জীবগোস্বামী 'ব্রহ্ম-সংহিতা'র টীকায় 'সম্মোহন-তন্ত্র' হইতেও রাধা-সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।[৪] বঙ্গবাসী সংস্করণ দেবীভাগবতের বহুস্থানে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মহাভাগবত' উপপুরাণেও রাধার উল্লেখ দেখিতে পাই।[৫] ইহা ব্যতীত 'রাধা-তন্ত্র' জাতীয় যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ না করাই ভাল।

১ গোপালোত্তরতাপন্যাং যদ্ গান্ধর্বীতি বিশ্রুতা।
রাধেত্যৃক্‌পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদিতা॥

জীবগোস্বামী এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'উজ্জ্বলনীলমণি'র টীকায় এবং জীবগোস্বামী 'ব্রহ্মসংহিতা'র টীকায় 'ঋক্‌পরিশিষ্টে'র এই শ্লোকার্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন—'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা'।

২ উজ্জ্বলনীলমণি, রাধাপ্রকরণ।

৩ দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

জীবগোস্বামীর 'লঘুভাগবতামৃত', 'ব্রহ্মসংহিতা'র টীকা, এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত', আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪ যন্নাম্না নাম্নি দুর্গাহং গুণৈর্গুণবতী হ্যহম্।
যদ্বৈভবান্মহালক্ষ্মী রাধা নিত্যা পরাদ্বয়া॥

৫ এখানে বিষ্ণু-লক্ষ্মী, কৃষ্ণ-রাধা, ব্রহ্মা-সরস্বতী, শিব-গৌরী সব অভেদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

কদাচিদ্ বিষ্ণুরূপা চ বামে চ কমলালয়া।
রাধয়া সহিতাকস্মাৎ কদাচিৎ কৃষ্ণরূপিণী॥
বামাঙ্গাধিগতা বাণী কদাচিদ্ ব্রহ্মরূপিণী।
কদাচিচ্ছিবরূপা চ গৌরী বামাঙ্গসংস্থিতা॥ ইত্যাদি।

(গ) প্রাচীন সাহিত্যে রাধার উল্লেখ

পুরাণ-উপপুরাণে, শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রাদিতে রাধার যে সকল উল্লেখ রহিয়াছে তাহার প্রাচীনতা এবং প্রামাণিকতা আমরা একেবারেই উড়াইয়া দিতে সাহসী না হইলেও এই সকল তথ্য-প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া বিশেষ কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতেও অক্ষম। কৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী হইতেই রাধার উদ্ভব,—এই মৌলিক সত্যটিকে মানিয়া লইলে ভাগবত-পুরাণে যেখানে রাস-বর্ণনা উপলক্ষ্যে প্রধানা গোপীর উল্লেখ রহিয়াছে সেখানে রাধার উল্লেখ পাইলে আমরা অতি সহজভাবে তাহাকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম। অন্যান্য যে সকল শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রাদি হইতে রাধার উল্লেখ করা হইয়াছে- সে সকল গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার কোন উপায় নাই।

সমস্ত জিনিস পর্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে শ্রীরাধার আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ মূলতঃ ভারতবর্ষের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া। মনে হয়, ব্রজের রাখাল-কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেম-লীলা তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতগুলি রাখালিয়া-গান রূপে ছড়াইয়া ছিল। চপল আভীর বধূগণ[১] এবং নবযৌবনে অনিন্দ্যসুন্দর গোপযুবক কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। গান-ছড়ার মাধ্যমেই হয়ত এগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রচারলাভ করিতেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করার পরে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-লীলা আস্তে আস্তে পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়া কবি-কল্পনায় আরও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই বিচিত্র গোপী-লীলার কাহিনীর ভিতরে একটি বিশেষ গোপী রাধার সহিত কৃষ্ণের বিশেষ প্রেমলীলার কিছু কিছু কাহিনী একটি ফল্গুধারার ন্যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রেম-সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়া মনে হয়। বিষ্ণু-পুরাণ এবং ভাগবতের রাসবর্ণনার ভিতরে তাহারই সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে। আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু সাক্ষ্য মিলিতেছে প্রাচীন ভারতের কতগুলি প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্কলনে—কিছু কিছু লিপিতে—কিছু অন্যান্য সাহিত্যে।

১ তুঃ—দ্বাদশ শতকে সংগৃহীত সদুক্তিকর্ণামৃতে 'বর্দ্ধমান' কবির পদ :—বৎস ত্বং নব-যৌবনোঽসি চপলাঃ প্রায়েণ গোপস্ত্রিয়ঃ ইত্যাদি।—সদুক্তিকর্ণামৃত, কৃষ্ণযৌবনম্, ৩

কৃষ্ণ-প্রিয়তমা প্রধানা গোপীর প্রসঙ্গে আমরা দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় আলবারগণের গানগুলিও স্মরণ করিতে পারি। এই আলবারগণ কখন আবির্ভূত হইয়াছেন এবিষয়ে নানা মতানৈক্য রহিয়াছে ;[১] কিন্তু মোটা-মুটিভাবে এই রাগমার্গে ভজনশীল বৈষ্ণবগণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে নবম শতকের ভিতরে বিভিন্নকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই আলবারগণ নিজদিগকে নায়িকা এবং বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে নায়ক মনে করিয়া রাগমার্গে ভজনা করিতেন। তাঁহাদের এই ভজন-সঙ্গীতগুলির চারি সহস্র সঙ্গীত 'দিব্য-প্রবন্ধম্' নামে প্রসিদ্ধ। এখানে আলবারগণ দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার ভিতরে বহু স্থানেই বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতারে বৃন্দাবন-লীলার নানাভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। অন্যান্য বহু লীলার সহিত গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের প্রেম-লীলারও অনেক স্থানে নানা ভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। এই গানগুলির ভিতরেও বহুস্থলে কৃষ্ণ-প্রিয়তমা একটি প্রধানা গোপীর উল্লেখ পাইতেছি ; কিন্তু এখানেও 'রাধা' নামটির উল্লেখ কোথায়ও পাইতেছি না, এই প্রধানা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা গোপীর নাম তামিল গান-গুলিতে পাইতেছি 'নাপ্পিন্নাই'। 'নাপ্পিন্নাই' একটি ফুলের নাম ; এই নাপ্পিন্নাই গোপী কৃষ্ণের নিকট আত্মীয় বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে, আবার কৃষ্ণ-প্রিয়তমা সেই গোপীই যে লক্ষ্মীর অবতার এমন উল্লেখও দেখা যাইতেছে।

যেমন :—Daughter of Nandagopal, who is like
A lusty elephant, who fleeth not,
With shoulders strong : Nappinnai, thou with hair
Diffusing fragrance, open thou the door !
Come see how everywhere the cocks are crowing,
And in the *mathavi* bower the Kuil sweet
Repeats its song.—Thou with a bell in hand,
Come, gaily open, with the lotus hands

১ এ বিষয়ে গোবিন্দাচার্য কৃত The Divine Wisdom of the Dravida Saints, The Holy Lives of the Azhvars গ্রন্থ দুইখানি, গোপীনাথ রাউ কৃত Sir Subrahmanya Ayyar Lectures (1923) এবং এস কে আয়েঙ্গার কৃত Early History of Vaisnavism in South India গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।

And tinkling bangles fair, that we may sing
Thy cousin's name ! Ah, Elorembavay !

Thou who art strange to make them brave in fight,
Going before the three and thirty gods ;
Awake from out thy sleep ! Thou who art just,
Thou who art mighty, thou, O faultless one
O Lady Nappinnai, with tender breasts
Like unto little cups, with lips of red
And slender waist, Lakshmi, awake from sleep !
Proffer thy bridegroom fans and mirrors now,
And let us bathe ! Ah, Elorembavay ![১]

নাপ্পিন্নাই রাধার মতনই গজগামিনী, গৌরী,—সৌন্দর্যের প্রতিমা। সমস্ত বর্ণনা দেখিলে এই নাপ্পিন্নাই-ই যে গোপীগণ-মধ্যে প্রধানা এবং কৃষ্ণের প্রিয়তমা সে বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না। পুরাণ-বর্ণিত কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা গ্রহণ করিবার সময় এই প্রিয়তমা বিশেষ গোপিকার পরিকল্পনাটিও এই ভক্ত কবিগণ পুরাণাদি হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তবে এই পৌরাণিক পরিকল্পনাকে তাঁহারা আবার স্থানীয় উপাখ্যানাদির দ্বারা ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছিলেন। এই কৃষ্ণপ্রিয়া নাপ্পিন্নাই-এর প্রসঙ্গেই দেখিতে পাই, দক্ষিণ দেশের একটি প্রসিদ্ধ সামাজিক প্রথা তাঁহার সঙ্গে গৃহীত হইয়াছে। তামিল ভাষাভাষিগণের মধ্যে পূর্বকালে একটি সামাজিক প্রথা ছিল, প্রথাটিকে অবলম্বন করিয়া যে অনুষ্ঠানটি হয় তাহাকে বলা হয়, 'বৃষ-বশীকরণ'। পূর্বে কুমারী কন্যাগণ নিজেরা ইচ্ছামত বীর যুবকগণকে বিবাহের জন্য গ্রহণ করিত। এই বীরত্ব পরীক্ষার একটি প্রথা ছিল। একটি বেষ্টনীর ভিতরে কতগুলি বলবান্ বৃষকে আবদ্ধ করিয়া, ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাজনা এবং অন্যান্য নানা উপায়ে সেইগুলিকে ক্ষেপাইয়া দেওয়া হইত; তারপরে সেই ক্ষিপ্ত বৃষগুলিকে বাহিরে আসিতে দেওয়া হইত। পথে থাকিত বীর যুবকগণ, সেই ক্ষিপ্ত বৃষকে বাহুর জোরে বশ করিতে। যাহারা

১ J. S. M. Hooper কৃত Hymns of the Alvars গ্রন্থখানিতে মহিলা কবি অণ্ডালের কবিতা দ্রষ্টব্য।

বীর বলিয়া গৃহীত হইত তাহাদেরই কণ্ঠে কুমারীগণ তাহাদের মাল্য দান করিয়া নিজের নিজের বর বাছিয়া লইত।[১] এই গানগুলির ভিতরেও আমরা বহুস্থানে উল্লেখ পাই, বলিষ্ঠ বাহুর বলে শ্রীকৃষ্ণ বৃষকে বশীভূত করিয়াই গোপবালা নাপ্পিন্নাইকে প্রিয়া রূপে লাভ করিয়াছেন। পরবর্তী সাহিত্যের রাধাই যে তামিল সাহিত্যে এই নাপ্পিন্নাই রূপ গ্রহণ করিয়াছে, এইরূপ মত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করিতে পারি, দক্ষিণ দেশে 'কুরবইকূট্টু' নামে একপ্রকার নৃত্যের প্রচলন আছে; ইহাতে রাস-নৃত্যের ন্যায়ই স্ত্রীলোকগণ পরস্পরের হাত ধরিয়া নৃত্য করে। প্রসিদ্ধি আছে যে, কৃষ্ণ একবার তাঁহার অগ্রজ বলরাম এবং প্রেয়সী নাপ্পিন্নাইকে লইয়া এই 'কুরবইকূট্টু' নৃত্য করিয়াছিলেন।

আমরা প্রাচীন সাহিত্যে রাধার প্রথম উল্লেখ পাই হালের প্রাকৃত গানের সঙ্কলন গ্রন্থ 'গাহা-সত্তসঈ'তে। হাল সাতবাহন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে প্রতিষ্ঠান-পুরে রাজত্ব করিতেন। হাল তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত কবিগণের প্রেম-কবিতা বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই মধুররসাত্মক গাথাগুলিতে ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রচনা কিনা এ-বিষয়ে পণ্ডিতগণ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন; কেহ কেহ এই গাথা-গুলিকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইহার রচনাকালকে কেহই ষষ্ঠ শতকের পরবর্তী বলিয়া মনে করেন না। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের কবি বাণভট্ট তাঁহার 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে কয়েকজন প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম করিয়াছেন; সেখানে সাতবাহন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, "লোকে যেমন বিশুদ্ধজাতি রত্নের দ্বারা কোশ (ধন-কোশ) নির্মাণ করে সাতবাহন রাজাও সেইরূপ সুভাষিতের দ্বারা অবিনাশী এবং অগ্রাম্য কোশ নির্মাণ করিয়াছিলেন।" সুতরাং হাল সঙ্কলিত এই গাথাগুলি এবং তৎসহ রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

হালের 'গাহা-সত্তসঈ'তে কৃষ্ণের ব্রজলীলা সম্বন্ধীয় কয়েকটি পদ রহিয়াছে, শুধু একটি মাত্র পদে স্পষ্টভাবে রাধারও উল্লেখ রহিয়াছে। একটি কবিতায়

১ অদ্যাবধি তামিলনাদের কোনও কোনও জাতির ভিতরে এই প্রথা প্রচলিত আছে। এই তথ্যটি মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক শ্রীযুত এ, শ্রীনিবাস রাঘবন্-এর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

আছে, "আজও দামোদর বালক, যশোদা যখন এইরূপ বলিতেছিল, তখন কৃষ্ণের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ব্রজবধূগণ নিভৃতে হাসিতেছিল"।[১] আর একটি পদে পাইতেছি, "নৃত্যপ্রশংসার ছলে পার্শ্বগতা কোন নিপুণা গোপী সদৃশ-গোপীগণের কপোলপ্রতিমাগত কৃষ্ণকে চুম্বন করিতেছে"।[২] অন্য একটি পদে আছে, "হে কৃষ্ণ, যদি ভ্রমণ কর ত এই রকমই ভ্রমণ কর সৌভাগ্যগর্বিত হইয়া এই গোষ্ঠে; মহিলাগণের দোষগুণ যদি বিচার করিতে সমর্থ হও!"[৩] আর একটি চমৎকার পদে রাধা-কৃষ্ণকেই মধুর করিয়া পাইতেছি,—

মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণ বলবীণং অণ্ণাণ বি গোরঅং হরসি ॥ ১।৮৯

"হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমারুতের দ্বারা রাধিকার (মুখলগ্ন) গোরজ (ধূলিকণা) অপনয়ন করিয়া এই বল্লবীগণের ও অন্য সকল নারীগণেরও গৌরব হরণ করিতেছ।"

খ্রীষ্টীয় অষ্টম-শতাব্দীর পূর্বেই রাধাবাদের প্রচলন ছিল এই কথার প্রমাণস্বরূপে পাহাড়পুরের মন্দির-গাত্রে দণ্ডায়মান যুগল মূর্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার বহু দৃশ্যের সহিত এই যুগল মূর্তিটি পাওয়া যায়। পুরুষ-মূর্তিটি যে কৃষ্ণমূর্তি এবিষয়ে আর সংশয়ের কোন অবকাশ নাই; তবে নারী-মূর্তিটি রাধা-মূর্তি কি রুক্মিণী বা সত্যভামার মূর্তি এ-বিষয়ে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

কবি ভট্টনারায়ণ কৃত (ইনি বাঙ্গালী বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে) 'বেণী-সংহার' নাটকের নান্দী শ্লোকে কালিন্দী-পুলিনে রাসের সময়ে কেলিকুপিতা অশ্রুকলুষা রাধিকা এবং তাহার উদ্দেশে কৃষ্ণের অনুনয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।[৪] আলঙ্কারিক

---

১ অজ্জবি বালো দামোঅরো ত্তি ইঅ জম্পিএ জসোআএ।
কহ্নমুহপেসিঅচ্ছং ণিহুঅং হসিঅং বঅবহূহিং ॥ ২।১২
বম্বে নির্ণয়সাগর সংস্করণ

২ ণচ্চণ-সলাহণণিহেণ পাসপরিসংঠিআ ণিউণগোবী।
সরিসগোবিআণ চুম্বই কবোলপড়িমাগঅং কহ্নম্ ॥ ২।১৪

৩ জই ভমসি ভমসু এমেঅ কহ্ন সোহগ্‌গগব্বিরো গোট্‌ঠে।
মহিলাণং দোসগুণে বিচারইউং জই খমো সি ॥ ৫।৪৭

৪ কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছতোঽশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্।
তৎপাদপ্রতিমানিবেশিতপদস্যোদ্ভূতরোমোদ্গতে-
রক্ষুণ্ণোঽনুনয়ঃ প্রসন্নদয়িতাদৃষ্টস্য পুষ্ণাতু বঃ ॥

বামন কর্তৃক তাঁহার অলঙ্কার-গ্রন্থে ভট্টনারায়ণের কবিতা উদ্ধৃত করা হইয়াছে; অতএব ভট্টনারায়ণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বের কবি ছিলেন মনে করা যাইতে পারে। ইহার পর খ্রীষ্টীয় নবম শতকে আনন্দবর্ধন-কৃত 'ধ্বন্যালোক' অলঙ্কার গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন শ্লোকের উদ্ধৃতি দেখিতে পাই,—

তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ॥

প্রবাসী-কৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে আগত সখাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"হে ভদ্র, সেই গোপবধূগণের বিলাস-সুহৃৎ এবং রাধার গোপন সাক্ষী কালিন্দীতীরবর্তী লতা-গৃহগুলির কুশল ত? স্মরশয্যা কল্পনবিধির জন্য ছেদনের প্রয়োজন না থাকায় মনে হয়, এখন সেই পল্লবগুলি শুকাইয়া জীর্ণ এবং বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে"।[১]

অজ্ঞাত লেখক কর্তৃক লিখিত আর একটি রাধা-বিরহের পদ এই ধ্বন্যালোকে উদ্ধৃত হইয়াছে। মধুরিপু কৃষ্ণ দ্বারবতী চলিয়া গেলে তাঁহারই বস্ত্র দেহে জড়াইয়া এবং কালিন্দী-তটকুঞ্জের বঞ্জুল লতাগুলিকে জড়াইয়া ধরিয়া সোৎকণ্ঠা রাধা এমন গুরুবাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বিগলিত তারস্বরে গান গাহিয়াছিল যে তাহাতে যমুনাবক্ষের জলচরগণও উৎকণ্ঠিত হইয়া কূজন আরম্ভ করিয়াছিল।

যাতে দ্বারবতীং পুরং মধুরিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়া
কালিন্দীতটকুঞ্জবঞ্জুললতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া।
উদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদ্গলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভি র্জলচরৈরুৎকণ্ঠমাকূজিতম্॥

এই পদটি খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক কুন্তকের 'বক্রোক্তি-জীবিত' অলঙ্কার-গ্রন্থেও উদ্ধৃত দেখিতে পাই।[২]

'নলচম্পূ'-রচয়িতা ত্রিবিক্রম ভট্ট ৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূট-নৃপতি তৃতীয় ইন্দ্রের

১ কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের ভিতরেও শ্লোকটি স্থান পাইয়াছে (৫০১)।

২ 'পদ্যাবলী'র ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখিত কবি-পরিচিতি (অপরাজিত) দ্রষ্টব্য।

পদটি সদুক্তিকর্ণামৃতে অজ্ঞাত লেখকের নামে এবং পদ্যাবলীতে অপরাজিত কবির নামে পাওয়া যায়। পদটি কিছু পাঠান্তরে হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনেও উদ্ধৃত আছে। (ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহার 'প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীরাধার উল্লেখ' নামক প্রবন্ধ, 'সুবর্ণবণিক্ সমাচার', ৩৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

নৌসরি লিপি রচনা করেন। 'নলচম্পূ'তে নল-দময়ন্তীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে রচিত কয়েকটি দ্ব্যর্থক শ্লোকে কৃষ্ণ ও তাঁহার জীবনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'নলচম্পূ'র একটি শ্লোকের একটি অর্থ এইভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে :— "কলা-কৌশলে চতুরা রাধা পরম পুরুষ মায়াময় কেশিহন্তার প্রতি অনুরক্ত"।[১] বিভিন্ন কাব্যের টীকাকার বল্লভদেব ১০ম শতকের পূর্বার্ধে কাশ্মীরে বর্তমান ছিলেন। তিনি মাঘকৃত 'শিশুপাল-বধের' ৪।৩৫ শ্লোকের টীকায় 'লোচক' (ওড়না-জাতীয় শিরোবস্ত্র) শব্দের ব্যাখ্যায় কোনও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে রাধা-কৃষ্ণের নামযুক্ত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকে কৃষ্ণকে না দেখিয়া রাধা দুঃখ করিতেছে,—"নিশ্চিত কোন হতভাগিনী আজ আমার কৃষ্ণকে হরণ করিয়াছে।" রাধার উক্তি শুনিয়া কোনও সখী বলিল, "রাধা, তুমি কি মধুসূদনের কথা বলিতেছ ?" রাধা কথা ঘুরাইয়া উত্তর দিল, "না না, আমার প্রাণপ্রিয় ওড়নাখানির কথা বলিতেছিলাম"।[২] দশম শতকের আর একজন চম্পূলেখক সোমদেব সূরির 'যশস্তিলক' চম্পূতে অমৃতমতি নাম্নী একজন নারী স্বীয় আচরণের সমর্থনে বলিতেছে, "রাধা কি নারায়ণে অনুরাগিণী ছিলেন না" ?[৩]

"কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়" একখানি চমৎকার সংস্কৃত-কবিতার সংগ্রহ-গ্রন্থ, ইহার সঙ্কলয়িতার নাম জানা যায় নাই। এই সঙ্কলনটি দশম শতকের বলিয়া গৃহীত হইয়াছে ; কবিগণের প্রাচীনতর হইবারই সম্ভাবনা। এই সঙ্কলনের ভিতরে রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে চারিটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলিতে যে শুধু রাধার উল্লেখ রহিয়াছে তাহা নহে, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, ইহার ভিতরে ভাব, রস ও প্রকাশভঙ্গি সমস্ত দিক্ হইতেই পরবর্তী কালের বৈষ্ণব কবিতার সকল বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। একটি পদে রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তিচ্ছলে প্রণয়চপল রহস্যালাপ পাইতেছি ; " 'দ্বারে ও কে ?' 'হরি' (কৃষ্ণ, বানর) ; 'উপবনে যাও, শাখামৃগের এখানে কি ?' 'হে দয়িতে, আমি

১ শিক্ষিতবৈদগ্ধ্যকলাপ-রাধাত্মিকা পরপুরুষে
মায়াবিনি কৃতকেশিবধে রাগং বধ্নাতি।

এই তথ্যটি এবং এইজাতীয় আরও কয়েকটি তথ্য আমি অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, পরে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার একটি প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ পাইয়াছি। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার প্রাগুক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ ঐ

৩ ঐ

কৃষ্ণ' ; 'তবেত আরও ভয় পাইতেছি ; বানর কি করিয়া কৃষ্ণ (=কালো) হয়?' 'হে মুগ্ধে, আমি মধুসূদন (=মধুকর)' ; 'তাহা হইলে পুষ্পিতা লতার কাছে যাও।' এইরূপে প্রিয়াদ্বারা নির্বচনীকৃত লজ্জিত হরি আমাদিগকে রক্ষা করুন।"[১] আর একটি পদে দেখিতে পাই, কৃষ্ণের অন্বেষণে রাধা এক দূতী পাঠাইয়াছিল ; সে তন্ন তন্ন করিয়া সব খুঁজিয়াও কৃষ্ণকে না পাইয়া রাধাকে আসিয়া বলিতেছে, "সখি, আমি এই সারা রাত্রি সেই ধূর্তকে অন্বেষণ করিয়াছি,—এখানে থাকিতে পারে, ওখানে থাকিতে পারে, এইভাবে ; নিশ্চয়ই সে অন্য গোপীর নিকট অভিসার করিয়াছে। মুররিপুকে (কৃষ্ণকে) আমি ভাণ্ডীর তলে দেখি নাই, গোবর্ধন গিরির তটভূমিতে দেখি নাই, কালিন্দী-কূলে দেখি নাই, বেতসকুঞ্জেও দেখি নাই।"[২] আর একটি শ্লোকে আছে,—"গাভীদুগ্ধের কলস লইয়া গোপীগণ গৃহে যাও, যে গাভীগুলি এখনও দোহা হয় নাই সেগুলি দোহা হইলে এই রাধাও তোমাদের পরে যাইবে। অন্তব্যপদেশ হৃদয়ে গুপ্ত রাখিয়া এইরূপে ব্রজ নির্জন করিতেছেন যিনি, সেই নন্দপুত্ররূপে অবতীর্ণ দেব তোমাদের সকল অমঙ্গল হরণ করুন।"[৩] আর একটি পদে দেখিতেছি, কৃষ্ণ গোবর্ধন-গিরি করাগ্রের দ্বারা ধারণ করিয়া আছে, তাহার দিকে তাকাইয়া রাধার দৃষ্টি প্রিয়গুণহেতু প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।[৪]

১ কোঽয়ং দ্বারি হরিঃ প্রযাহ্যুপবনং শাখামৃগেণাত্র কিং
কৃষ্ণোঽহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষ্ণঃ কথং বানরঃ।
মুগ্ধেঽহং মধুসূদনো ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পাসবা-
মিত্থং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ॥

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, ২১ ; সদুক্তিকর্ণামৃতে কবিতাটি শুভাঙ্ক কবির রচিত বলিয়া উল্লিখিত আছে।

২ ময়াম্বিষ্টো ধূর্তঃ স সখি নিখিলামেব রজনীম্
ইহ স্যাদত্র স্যাদিতি নিপুণমন্যাভিসৃতঃ।
ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভুবি ন গোবর্ধনগিরে
র্ন কালিন্দ্যাঃ [কূলে] ন চ নিচুলকুঞ্জে মুররিপুঃ॥ হরিব্রজ্যা, ৩৪।

৩ [.........] ধেনুদুগ্ধকলশানাদায় গোপ্যো গৃহং
দুগ্ধে বষ্কয়িণীকুলে পুনরিয়ং রাধা শনৈর্যাস্যতি।
ইত্যন্যব্যপদেশগুপ্তহৃদয়ঃ কুর্বন্ বিবিক্তং ব্রজং
দেবঃ কারণনন্দসূনুরশিবং কৃষ্ণঃ স মুষ্ণাতু বঃ॥ ঐ, ৪১

৪ ঐ, ৪২ ; সোল্লোক বিরচিত : সদুক্তিকর্ণামৃত ও পদ্যাবলীতেও উদ্ধৃত।

আর একটি পদে রাধার প্রত্যক্ষ নাম পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পদটি পড়িলে মনে হয়, রাধাই এখানে ব্যঞ্জিত। কোনও এক সখী বলিতেছে,—'কুচযুগের বিলেপন কে মুছিয়া দিয়াছে? চোখের অঞ্জনই বা কে মুছিয়া দিল? তোমার অধরের রাগই বা কে প্রমথিত করিল? কে নষ্ট করিল কেশের মালাগুলি?' 'সখি, ইহা অশেষজনস্রোতের কল্মষনাশী নীলপদ্মভাসের দ্বারা।' '(তা হইলে) কৃষ্ণের দ্বারা?' 'না, যমুনার জলের দ্বারা।' '(বুঝিয়াছি), কৃষ্ণেই (কালোতেই) তোমার অনুরাগ'।"[১]

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' কৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক আর একটি চমৎকার পদ পাই। দিবস শিথিল হইয়া আসিতেছে, তখন গোরুগুলিকে ফিরাইয়া লইয়া মন্দ মন্দ বেণু বাজাইতে বাজাইতে কৃষ্ণ গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে, তাহার মাথায় গোধুলিধূম্রময়ূরপুচ্ছের চূড়া, গলায় দিবসম্লান বনমালা, শ্রান্ত হইয়াও সে রম্য—এই কৃষ্ণ হইল 'গোপস্ত্রীনয়নোৎসবঃ'।[২]

আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাক্‌পতি-লিপিতে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি চমৎকার শ্লোক পাইতেছি; শ্লোকটির ভিতরে কৃষ্ণের নিকটে রাধা-প্রেমই যে শ্রেষ্ঠ এইরূপ একটি ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে,—"লক্ষ্মীর বদনেন্দু দ্বারা যাহা সুখিত হইতেছে না, বারিধির বারিদ্বারা যাহা প্রশমিত নয়, নিজের নাভিসরসীপদ্মদ্বারাও যাহা শান্তি প্রাপ্ত হয় নাই, যাহা শেষসর্পের ফণাসহস্রের মধুর শ্বাসের দ্বারাও আশ্বাসিত হয় নাই, এমন যে মুররিপুর রাধা-বিরহাতুর কম্পিত বপু তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক।"[৩] 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' উদ্ধৃত রাধার উল্লেখযুক্ত বৈদ্দোক-লিখিত একটি শ্লোক

১ ধ্বস্তং কেন বিলেপনং কুচযুগে কেনাঞ্জনং নেত্রয়ো
রাগঃ কেন তবাধরে প্রমথিতঃ কেশেষু কেন স্রজঃ।
তেনা[শেষজ]নৌঘকল্মষমুষা নীলাব্জভাসা সখি
কিং কৃষ্ণেন ন যামুনেন পয়সা কৃষ্ণানুরাগস্তব॥ ঐ, ৫১২

২ ঐ, ২২; কবির নাম নাই।

৩ যল্লক্ষ্মীবদনেন্দুনা ন সুখিতং যন্নার্দ্দিতম্বারিধে
র্বারা যন্ন নিজেন নাভিসরসীপদ্মেন শান্তিঙ্গতম্।
যচ্ছেষাহিফণাসহস্রমধুরশ্বাসৈ র্ন চাশ্বাসিতং
তদ্রাধাবিরহাতুরং মুররিপোর্ব্বেল্লদ্বপুঃ পাতু বঃ॥
The Indian Antiquary, 1877, ৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

একাদশ শতকে ভোজরাজ তাঁহার 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে'ও উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১] জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্র তাঁহার দ্বাদশ শতকে রচিত 'কাব্যানুশাসন' গ্রন্থেও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। হেমচন্দ্র তাঁহার 'কাব্যানুশাসনে' রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম সম্বলিত আরও একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, শ্লোকটি শ্রীধরদাসের 'সদুক্তি-কর্ণামৃতে'ও স্থান পাইয়াছে।[২] এই হেমচন্দ্রের শিষ্য রামচন্দ্র (১১০০—১১৭৫ খ্রীঃ অঃ) গুণচন্দ্র নামক অপর এক লেখকের সহযোগে 'নাট্য-দর্পণ' নামে একখানি নাট্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন; এই 'নাট্য-দর্পণে' ভেজ্জল কবি লিখিত 'রাধা-বিপ্রলম্ভ' নামে একখানি নাটকের উল্লেখ আছে, এই ভেজ্জল কবি আর অভিনব গুপ্ত কর্তৃক ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকায় উল্লেখিত ভেজ্জল কবি যদি একই হন, তবে 'রাধা-বিপ্রলম্ভ' নাটক দশম শতকের পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।[৩] দ্বাদশ শতকে রচিত শারদা-তনয়ের 'ভাবপ্রকাশনে' 'রামারাধা' নামে রাধা-সম্বন্ধীয় আর একখানি নাটক এবং তাহা হইতে শ্লোকার্ধের উদ্ধৃতি রহিয়াছে।[৪] কবিকর্ণপূরের 'অলঙ্কারকৌস্তভে'র একাধিকস্থলে আমরা 'কন্দর্প-মঞ্জরী' নামক রাধিকা-অবলম্বনে একখানি নাটিকা এবং তাহা হইতে উদ্ধৃতি পাইতেছি। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বা পরবর্তী কালের কবিগণের মধ্যে 'কন্দর্প-মঞ্জরী' নামে কেহ কোন নাটিকা লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই; এই নাটিকাখানিও চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কোন কালে রচিত হইয়াছিল কি? ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগের সর্বয়-প্রস্তরলিপিতেও কৃষ্ণকে 'রাধাধব'-রূপে বর্ণিত হইতে দেখি।[৫] 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত নাথোক কবি রচিত একটি পদেও কৃষ্ণকে 'রাধাধব'-রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই।[৬] ত্রয়োদশ শতকের সাগরনন্দীর 'নাটকলক্ষণরত্নকোশ' গ্রন্থেও 'রাধা' নামক একখানি 'বীথি' জাতীয় নাটকের উল্লেখ রহিয়াছে। 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' নামক

১ কনকনিকষস্বচ্ছে রা[ধা]পয়োধরমণ্ডলে ইত্যাদি। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, ৪৯।
এই শ্লোকটি 'সূক্তিমুক্তাবলী' এবং সুভাষিতরত্নকোশে'ও উদ্ধৃত আছে।

২ ডক্টর লাহার প্রাগুক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩ ঐ

৪ কিমেষা কৌমুদী কিংবা লাবণ্যসরসী সখে।
ইত্যাদি রামারাধায়াং সংশয়ঃ কৃষ্ণভাষিতে॥—ঐ

৫ The Indian Antiquary, 1893, ৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৬ বেণুনাদঃ, ৫

প্রাকৃতছন্দের গ্রন্থখানিতে ধৃত একটি প্রাকৃত শ্লোকে কৃষ্ণ কর্তৃক 'রাধামুখ-মধুপান' করিবার কথা দেখিতে পাই।[১] অপর একটি শ্লোকে রাধার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ইহা নৌকা-বিলাস লীলায় রাধার উক্তি বলিয়াই মনে হয়। সেখানে বলা হইয়াছে,—"ওহে কৃষ্ণ, নাও বাও—চঞ্চল ডগমগির কুগতি আমাকে দিও না। তুমি এই নদীতে পাড়ি দাও, তারপরে তুমি যাহা চাহ তাহা নাও।"[২] রামশর্মার 'প্রাকৃতকল্পতরু'র অপভ্রংশস্তবকে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে দুইটি অপভ্রংশ কবিতা ধৃত হইয়াছে।[৩]

দ্বাদশ শতকে আসিয়া আমরা রাধা অবলম্বনে পূর্ণবিকশিত কাব্য জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' পাইলাম। লীলা-শুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থও দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে রচিত গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সঙ্কলিত শ্রীধরদাসের 'সদুক্তি-কর্ণামৃতে' কৃষ্ণের ব্রজলীলা এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমসম্বন্ধে অনেকগুলি কবিতা সংগৃহীত আছে। সুতরাং পরবর্তী কালের সাহিত্যে রাধাবাদের বিকাশের ধারা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে দ্বাদশ শতকে প্রাপ্ত রাধা-কৃষ্ণ-সাহিত্যকে ভাল করিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার।

লীলা-শুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'[৪] গ্রন্থখানি পরবর্তী বৈষ্ণবধর্ম এবং সাহিত্য—বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং সাহিত্যের উপরে গভীর

১ চাণূর বিহংডিঅ নিঅকুল মংডিঅ
রাহা মুহ মহু পাণ করে জিমি ভমরবরে। মাত্রাবৃত্ত, ২০৭

২ অরেরে বাহহি কাণ্হ ণাব
ছোড়ি ডগমগ কুগতি ণ দেহি।
তই ইথি ণইহি সংতার দেই
জো চাহহি সো লেহি॥ মাত্রাবৃত্ত, ৯

৩ Indian Antiquary পত্রিকায় (১৯২২) গ্রীয়ার্সনের প্রবন্ধ 'The Apabhramsa Stabakas of Rama-sarman' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪ গ্রন্থখানির দুইটি পাঠ পাওয়া যায়; বঙ্গদেশের পাঠকে অবলম্বন করিয়া ডক্টর সুশীল কুমার দে ইহার একটি প্রামাণ্য সংস্করণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সংস্করণে ১১২টি মাত্র শ্লোক পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে যে পুঁথি পাওয়া যায় তাহাতে তিনটি 'আশ্বাস' এবং প্রথম আশ্বাসে ১০৭, দ্বিতীয়ে ১১০ এবং তৃতীয়ে ১০২টি শ্লোক পাওয়া যায়। শ্রীবাণীবিলাস প্রেস হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। বিবিধ কারণে বাঙলা দেশের পাঠটিই প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে ডক্টর দের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাঁহার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে দুইখানি গ্রন্থ 'মহারত্ন'সম মনে করিয়া লিখাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন ; গ্রন্থ দুইখানি হইল 'ব্রহ্ম-সংহিতা' এবং 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'। দাক্ষিণাত্যে-প্রচলিত এই গ্রন্থের পাঠের ভিতরে বহুস্থানে রাধিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙলাদেশে প্রচলিত পাঠে দুইটি শ্লোকে রাধার উল্লেখ পাইতেছি।[১] একটি শ্লোক হইল,—

তেজসে হস্তু নমো ধেনুপালিনে লোকপালিনে।
রাধাপয়োধরৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে ॥ ৭৬

"সেই তেজোরূপকে নমস্কার—যিনি ধেনুর পালক এবং লোকপালক ; যিনি রাধার পয়োধরোৎসঙ্গে শায়িত আছেন—যিনি শেষনাগের উপরে শায়িত।"

দ্বিতীয় শ্লোকটি হইল,—

যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ।
যে বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীলা মুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকয়া বহন্ত হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥ ১০৬

"তোমার যে সকল চরিতামৃত ধন্যাত্মা (সৌভাগ্যবান্ পুণ্যাত্মা)-গণের রসনাদ্বারা লেহনযোগ্য, রাধার অবরোধে (রাধাকে নানাভাবে অবরুদ্ধ করিতে) উন্মুখ তোমার যে-সকল শৈশব-চাপল্য-প্রসূত চেষ্টা, যে সকল বা তোমার মুখপদ্মে ভাবশবল বেণুগীতগতি-সমূহের লীলা—সেই সকল ধারাবাহিকরূপে আমার হৃদয়ে বহিতে থাকুক।"

এই দুইটি মাত্র পদে রাধার স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও মনে হয়, এই কাব্যের মধুররসাশ্রিত ব্রজলীলার পদগুলির রাধাই লক্ষ্য ; কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার টীকায় এই সকল স্থলেই রাধার উল্লেখ করিয়া পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষ্ণকর্ণামৃতে এই রাধার উল্লেখ নানা দিক্ দিয়াই তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য গ্রন্থের রচনাকাল লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, খ্রীষ্টীয় দশম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত গ্রন্থরচনার সময় নির্দেশ করা হইয়াছে। আমরা যদি বিতর্কের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র রচনা-কাল নানাদিক্ হইতে এই গ্রন্থের সধর্মা গ্রন্থ 'গীতগোবিন্দে'র রচনা-কালে দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থির করি

১ জহ্লন কবির সংগৃহীত 'সূক্তিমুক্তাবলী'তে (বরদা সংস্করণ) 'রাধা' নামাঙ্কিত একটি লীলা-শুকের পদ পাওয়া যায়। (১০০নং)

তাহা হইলে বোধহয় সত্য হইতে বেশী বিচ্যুত হইব না। এই গ্রন্থের রচনা-কাল সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত একটি তথ্য এই পাই যে, শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র পূর্বোদ্ধৃত ১০৬ সংখ্যক পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে (১।৫৮।৫); ইহা হইতে 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র রচনা-কাল অন্ততঃ দ্বাদশ শতকে ধরিয়া লইতে কোনই বাধা দেখি না। এই গ্রন্থের রচনা-স্থান দক্ষিণ-ভারত এ বিষয়ে আর কোন মতানৈক্য নাই। কবি দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীরবর্তী দেশের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া প্রবাদ রহিয়াছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও কৃষ্ণবেণ্বা (কৃষ্ণবেণ্ণা ?) নদীতীরবর্তী তীর্থসমূহের বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতেই গ্রন্থখানি সাগ্রহে লিখাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।[১] তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে রাধা-বাদকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম দক্ষিণদেশেও যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। আলবারগণের মধুররসাশ্রিত সাধনাদির কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই সময়ে দক্ষিণদেশে রাধাবাদের প্রসারের আর একটি প্রণিধানযোগ্য প্রমাণ আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের ভিতরেই পাই। এই দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী নদীর তীরেই মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের নিকটে রাধা-প্রেমের নিগূঢ়-তত্ত্ব সকল শুনিয়াছিলেন। অনেকদিনের প্রচার ও প্রসিদ্ধি না থাকিলে রামানন্দ রায়ের পক্ষে রাধাপ্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হইত না। এই আলোচনার কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন তাহা সর্বাংশে ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গৃহীত না হইলেও অন্ততঃ মোটা-

১ তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্ণা তীরে।
নানাতীর্থ দেখি তাহা দেবতা মন্দিরে॥
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণবচরিত।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণ-কর্ণামৃত॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লইল॥
কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥

চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য, ৯ম।

স্ফুটভাবে রাধাপ্রেমের তত্ত্ব-সকল রায় রামানন্দের জানা ছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

আমরা 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' হইতে রাধার উল্লেখ-সহ যে দ্বিতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার ভিতরে 'রাধাবরোধোন্মুখ' শৈশব-চাপল্যহেতু চেষ্টা-সমূহের দ্বারা পরবর্তী কালে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি জাতীয় লীলারই আভাস পাইতেছি।[১] প্রথম যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার ভিতরে দেখি, রাধা এখানে লক্ষ্মীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। শেষ-শয়নে শায়িত কৃষ্ণ যে-রাধার পয়োধরোৎসঙ্গে শায়িত, সে-রাধা যে লক্ষ্মীরই রূপান্তর তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভিতরেও আমরা রাধার এই-জাতীয় বর্ণনা দেখিতে পাই।[২] দেখা যাইতেছে যে লক্ষ্মীতত্ত্ব এবং রাধাতত্ত্বের মধ্যে পরবর্তী কালে যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা গিয়াছে, সেই পার্থক্য এখনও তেমন করিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। অর্থাৎ রাধা যখন বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে প্রথম গৃহীতা হইলেন তখন কিছুদিন পর্যন্ত প্রাচীন লক্ষ্মীবাদের সহিত যুক্ত হইয়াই তাঁহার প্রকাশ হইয়াছে, সেই বর্ণনার ভিতরে লক্ষ্মীর বর্ণনা এবং রাধার বর্ণনা মিলিয়া মিশিয়া অনেকস্থানে এক হইয়া গিয়াছে। 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে' এবং 'গীতগোবিন্দে' লক্ষ্মী, কমলা বা রমার বর্ণনা এবং রাধার বর্ণনা পাশাপাশিই দেখিতে পাই, উভয়েই সমভাবে কৃষ্ণপ্রিয়া। এই সময়কার কবিতায় রাধাকৃষ্ণ যে সীতারামেরই পরবর্তী অবতার এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত থাকিবারও প্রমাণ আছে।[৩] কিন্তু এইভাবে প্রাচীন লক্ষ্মী-উপাখ্যানের সহিত বহুস্থানে রাধার মিশ্রিত

১ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার 'সারঙ্গরঙ্গদা' টীকায় বলিয়াছেন,—"দান-পুষ্পাহরণ-বর্ত্মস্থাদৌ রাধায়া যোঽবরোধ স্তত্রোন্মুখাঃ।" গোপাল ভট্ট অবশ্য তাঁহার 'কৃষ্ণবল্লভা' টীকায় বলিয়াছেন—"রাধায়া অবরোধোঽবরোধনং গ্রহণরূপং তত্র তদর্থং বোন্মুখাঃ। যদ্বা, রাধৈবাবরোধঃ প্রিয়া তস্যামুন্মুখাঃ।"

২ ত্বামপ্রাপ্য ময়ি স্বয়ম্বরপরাং ক্ষীরোদনীরোদরে
শঙ্কে সুন্দরি কালকূটমপিবন্মূঢ়ো মৃড়ানীপতিঃ।
ইত্থং পূর্বকথাভিরন্যমনসো নিক্ষিপ্য বক্ষোঽঞ্চলং
রাধায়াস্তনকোরকোপরি মিলন্নেত্রো হরিঃ পাতু বঃ॥ ১২।২০

৩ দ্রঃ—এতে লক্ষ্মণ জানকীবিরহিণং মাং খেদয়ন্ত্যম্বুদা
মর্মাণীব চ খণ্ডয়ন্ত্যলমমী ক্রূরাঃ কদম্বানিলাঃ।
ইত্থং ব্যাহৃতপূর্বজন্মবিরহো যো রাধয়া বীক্ষিতঃ
সের্ষং শঙ্কিতয়া স বঃ সুখয়তু স্বপ্নায়মানো হরিঃ॥

বর্ণনা পাইলেও প্রেমময়ী রাধিকার সৌন্দর্য মাধুর্য যে লক্ষ্মীর সৌন্দর্য মাধুর্য অপেক্ষা অধিক এবং রাধাই যে কৃষ্ণের প্রিয়তমা এ-রকম একটি অন্তঃসলিল ফল্গুস্রোতও প্রবাহিত ছিল। আমরা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের যে বাক্‌পতি-লিপির উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি তাহাতেই স্পষ্টরূপে লক্ষ্মী অপেক্ষা রাধার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দ্বাদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ও কয়েকজন কবির কবিতায় লক্ষ্মীপ্রেম হইতে রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত বা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণস্বপ্নায়িতম্'-এর ভিতরে দেখি, রাধার অহেতুক রোষ প্রশমিত করিবার জন্য শার্ঙ্গধর স্বপ্নের ভিতরে যখন কথা বলিতেছিলেন তখন কমলা তাহা শুনিতে পাইয়া সব্যাজে শার্ঙ্গধরের কণ্ঠ হইতে তাহার বাহুযুগল শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন।[১] অন্য পদে দেখিতেছি, শ্রীকে রমণ করিবার সময়েও হরি স্মরণ করিতেছেন রাধাকে; অথচ এত ইচ্ছা সত্ত্বেও রাধার সহিত তিনি মিলিত হইতে পারিতেছেন না, ইহাই তাঁহার খেদ।[২] আর একটি পদে দেখি, শেষ-শয়নে রমার সহিত বিষ্ণু যখন শায়িত আছেন তখনও কৃষ্ণ-অবতারে গোপবধূগণের সহিত (অথবা গোপবধূ রাধার সহিত) কত সহস্র-সঙ্গের স্মৃতিরই জয় দেওয়া হইয়াছে।[৩] জয়দেবের সমসাময়িক কবি উমাপতি ধরের একটি পদে পাইতেছি, লক্ষ্মীর অবতার রুক্মিণীকে লইয়া কৃষ্ণ দ্বারকায় আছেন; যে মন্দিরের রত্নচ্ছায়া সমুদ্রের জলে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এমন মন্দিরে রুক্মিণীর সহিত গাঢ় আলিঙ্গনে পুলকিত মুরারি যমুনাতীরের বানীরকুঞ্জে আভীর স্ত্রীগণের যে নিভৃত চরিত তাহারই ধ্যানে মূর্ছিত হইলেন।[৪] জয়দেবের সমসাময়িক শরণ কবিরও একটি পদ পাইতেছি, দ্বারাবতীপতি দামোদর কালিন্দী-

শুভাঙ্ক-কবিকৃত সদুক্তিকর্ণামৃত, কৃষ্ণস্বপ্নায়িতম্, ৩

বিরিঞ্চি-কবিকৃত পরবর্তী (৪নং) পদটিও দ্রষ্টব্য।

১ সদুক্তিকর্ণামৃত, কৃষ্ণস্বপ্নায়িতম্, ৫। কবির নাম দেওয়া নাই। 'পদ্যাবলী'তে উমাপতি ধরের নামে উদ্ধৃত। সেখানে 'কমলা'র স্থলে রুক্মিণী পাঠ পাই।

২ রাধাং সংস্মরতঃ শ্রিয়ং রময়তঃ খেদো হরেঃ পাতু বঃ ॥

ঐ, উৎকণ্ঠা, ৪। কবির নাম নাই।

৩ কৃষ্ণাবতারকৃতগোপবধূসহস্রসঙ্গস্মৃতির্জয়িত ইত্যাদি।

ঐ, ৫। কবির নাম নাই।

৪ বিম্বং পায়ান্ স্মরণযমুনাতীরবানীরকুঞ্জে-

ষাভীরস্ত্রীনিভৃতচরিতধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ ॥ ঐ, ১; পদ্যাবলীতে ধৃত।

কূলবর্তী শৈলোপান্তভূমির কদম্বকুসুমে আমোদিত কন্দরে প্রথম-অভিসার-মধুরা রাধার কথা স্মরণ করিয়া তপ্ত হইতেছেন।[১] অবশ্য লক্ষ্মী-আদির প্রেম অপেক্ষা যে গোপীপ্রেম শ্রেষ্ঠ এ সত্যের আভাস ভাগবতাদি পুরাণের মধ্যেও রহিয়াছে। সুতরাং প্রেমধনে যে শ্রীমতী রাধিকাই সর্বাপেক্ষা ধনী পরবর্তী কালের এই তত্ত্বেরও একটি পূর্বধারা বেশ অনুসরণ করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষণীয়। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি যে প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রে লক্ষ্মীকে অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুর তেমন লীলা-স্ফূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায় না। শ্রীবৈষ্ণবগণের ভিতরে লক্ষ্মীসহ মধুর লীলার আভাস আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। দশম হইতে দ্বাদশ শতকের সাহিত্যের ভিতরে লক্ষ্মীর যে উল্লেখ পাই তাহার ভিতরে মধুর রসের স্ফূর্তি দেখিতে পাই। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' লক্ষ্মী সম্বন্ধে কতকগুলি কবিতা উদ্ধৃত দেখিতে পাই, সেখানে লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের নানাবিধ প্রেমলীলা, শৃঙ্গার-বর্ণনা বা নিধুবনান্তে লক্ষ্মীর বর্ণনা দেখিতে পাই।[২] মোটের উপরে দেখিতেছি, লক্ষ্মী একটি দার্শনিক শক্তিরূপ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমেই মধুর-রসাশ্রিতা হইয়া উঠিতেছেন; এবং এই মধুর রসের আশ্রয়েই পূর্ববর্তী লক্ষ্মী পরবর্তী রাধার সহিত আসিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন। উপরে আবার যে একটি পার্থক্যের ধারা লক্ষ্য করিলাম তাহাই প্রবলরূপ ধারণ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে লক্ষ্মী এবং রাধাকে তত্ত্বের দিক হইতে একেবারে পৃথক্ করিয়া দিল, এবং এই তত্ত্বপ্রভাবিত বৈষ্ণব-সাহিত্যে লক্ষ্মী ও রাধার আর কখনও মিলন ঘটিয়া ওঠে নাই। কিন্তু লক্ষ্মী ও রাধার আর মিলন না হইলেও পূর্ব-মিলনহেতুই লক্ষ্মী তাঁহার কিছু কিছু জন্ম-ইতিহাস পরবর্তীকালের রাধার ভিতরে রাখিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদির মতে রাধার পিতা হইলেন বৃষভানু গোপ এবং মাতার নাম কলাবতী বা কীর্তিদা। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে'র ভিতরে রাধার জন্ম-পরিচয়ে পাইতেছি,—

তে কারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে॥

১ ঐ, ২।

২ কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, ২০, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪৪; সদুক্তিকর্ণামৃতে লক্ষ্মীশৃঙ্গারের শ্লোকগুলি (কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের কয়েকটি শ্লোকও এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে)।

এখানে দেখিতেছি 'পদুমা' (পদ্মা) হইল রাধার মা এবং সাগর হইল তাহার পিতা। লক্ষ্মী সাগর-সম্ভূতা, অতএব রাধার সাগর পিতা ঠিকই হইয়াছে; আর লক্ষ্মী পদ্মজাতা বটেন, সুতরাং রাধার মাতাও পদুমা। 'কৃষ্ণ-কীর্তনে'র বহু স্থানেই রাধা নিজেও 'পদুমিনী' অর্থাৎ 'পদ্মিনী'; লক্ষ্মীও পদ্মা বা পদ্মিনী। পরবর্তী কালের পদাবলী-সাহিত্যে রাধা 'কমলা' না হইতে পারেন, কিন্তু 'কমলিনী' বটেন।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে রাধাকে আর এখানে সেখানে 'ছিটা-ফোঁটা' রূপে পাইলাম না, সমগ্র কাব্যের কৃষ্ণ নায়ক, রাধাই নায়িকা, সখীগণ লীলা-সহচরী। বৈষ্ণব ধর্মে ও সাহিত্যে রাধা এখানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিতা। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যেই যে রাধার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এমন কথা বলা উচিত হইবে না; জয়দেবের যুগ-সাহিত্যেই রাধার প্রতিষ্ঠা। জয়দেবের সময়ে বাঙলা দেশে বা বৃহত্তর বঙ্গে সত্যই একটা সাহিত্যের যুগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। জয়দেব নিজেই তাঁহার কাব্যে উমাপতি ধর,শরণ, গোবর্ধনাচার্য এবং ধোয়ী কবির উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই কবি-গোষ্ঠী বাঙলার সেন-রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেনরাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন; সেই কারণেই হয়ত এই যুগের কাব্যে বৈষ্ণবতাই প্রাধান্য লাভ করিল। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' জয়দেবের, তাঁহার পূর্ববর্তী এবং তাঁহার সমসাময়িক বহু কবির রচিত—এমন কি রাজা লক্ষ্মণসেন এবং তৎপুত্র কেশবসেন রচিত বৈষ্ণব কবিতাও সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার ভিতরে 'গীতগোবিন্দে' নাই এমন রাধা-কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক জয়দেব রচিত পদও পাওয়া যায়।[1] তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে জয়দেব যে শুধু 'গীতগোবিন্দ' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে অন্যপ্রকার কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন।[2]

'সদুক্তিকর্ণামৃতে' যে সকল বৈষ্ণব-কবিতা উদ্ধৃত আছে তাহার ভিতরে বিবিধ কবির শান্ত,দাস্য, বাৎসল্য এবং মধুর প্রায় সকল রসের কবিতাই পাওয়া যায়। ইহার ভিতরে মধুর রসের কবিতাগুলির সহিত বাৎসল্য রসের কবিতাগুলিও ভাব এবং প্রকাশভঙ্গির চমৎকারিত্বের জন্য উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণের

১ সদুক্তিকর্ণামৃত, গোবর্ধনোদ্ধার, ৫।

২ রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-বিষয়ক ছাড়া জয়দেব-রচিত অন্য প্রকীর্ণ কবিতাও সংগ্রহগ্রন্থে পাওয়া যায়; অবশ্য ই'হারা যদি একই কবি হন।

কৌমারলীলার দুই একটি পদের সহিত পরবর্তী কালের গোষ্ঠ কবিতার সাদৃশ্য বেশ লক্ষ্য করিতে পারি।[১]

জয়দেবের সমসাময়িক কবি উমাপতি ধরের কৃষ্ণের কৌমার-লীলা-বিষয়ক পদে দেখিতে পাই, কৃষ্ণ কুমার অবস্থায় কালিন্দীপুলিনে অথবা শৈলে বা উপশল্যে (গ্রামের প্রান্তে) অথবা বটবৃক্ষের তলে যেমন ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তেমনি রাধার পিতার বাড়ীর প্রাঙ্গণেও আনাগোনা করিয়া বেড়াইতেন।[২] উমাপতি ধরের হরিক্রীড়ার আর একটি মধুর পদ পাইতেছি। কৃষ্ণ যখন পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন কোন গোপরমণী তাঁহাকে ভ্রূবল্লীচলনের দ্বারা, কোন গোপী নয়নোন্মেষের দ্বারা, কোনও গোপী ঈষৎ হাসির জ্যোৎস্না বিচ্ছুরণের দ্বারা গোপনে কৃষ্ণকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছিল; রাধা হয়ত দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়াছে, ইহাতে গর্বজনিত অবহেলায় রাধার আনন বিনয়শ্রী ধারণ করিয়াছিল; ওদিকে আবার এই বিনয়শোভাধারী রাধার মুখে যে কংসারি কৃষ্ণের দৃষ্টিপাত তাহার ভিতরেও আসিয়াছে আতঙ্ক এবং অনুনয়!—

ভ্রূবল্লীচলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি।

১ নমুনাস্বরূপে দুইটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।—

বৎস স্থাবরকন্দরেষু বিচরংশ্চারপ্রচারে গবাং
হিংস্রান্ বীক্ষ্য পুরঃ পুরাণপুরুষং নারায়ণং ধ্যাস্যসি।
ইত্যুক্তস্য যশোদয়া মুররিপোরব্যাজ্জগন্তি স্ফুর-
দ্বিম্বোষ্ঠদ্বয়গাঢ়পীড়নবশাদব্যক্তভাবং স্মিতম্॥ অভিনন্দ।

হে বৎস, পর্বতকন্দরে গোচারণভূমিতে যখন বিচরণ করিবে তখন যদি সম্মুখে কোন হিংস্র পশু দেখ তবে পুরাণপুরুষ নারায়ণের ধ্যান করিবে। যশোদা এই বলিলে, মুরারি কৃষ্ণের স্মিতহাস্য স্ফুরৎ-বিম্বোষ্ঠদ্বয়ের গাঢ়পীড়নবশে একটি অব্যক্ত ভাব ব্যঞ্জিত করিয়াছিল, তাহা সকল জগৎকে রক্ষা করুক।" কিঞ্চিৎ পাঠান্তর সহ পদটি কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়েও উদ্ধৃত আছে।

মা দূরং ব্রজ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি পুরস্তে লূনকর্ণো বৃকঃ
পোতানত্তি ইতি প্রপঞ্চচতুরোদারা যশোদাগিরঃ। ইত্যাদি, কস্যচিৎ।

বাৎসল্য রসের দৃষ্টান্তস্বরূপ ময়ূর কবির পদটিও (কৃষ্ণস্বপ্নায়িতম্, ১) দ্রষ্টব্য। পরবর্তী কালের হিন্দী কবি সুরদাসের বাৎসল্য রসের পদে এই শ্লোকটির আশ্চর্য ছায়া লক্ষ্য করিতে পারি।

২ কালিন্দীপুলিনে ময়া ন ন ময়া শৈলোপশল্যে ন ন
ন্যগ্রোধস্য তলে ময়া ন ন ময়া রাধাপিতুঃ প্রাঙ্গণে।
দৃষ্টঃ কৃষ্ণ ইতি। ইত্যাদি।

গর্বোদ্ভেদকৃতাবহেলবিনয়শ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কাহুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥[১]

এই কবির আর একটি পদে দেখি, আভীরবধূ রাধাকে লইয়া নির্জনে কৃষ্ণের বিহারের ইচ্ছা ; অথচ গোপকুমারগণকেও সঙ্গছাড়া করা যাইতেছে না ; এ অবস্থায় কৃষ্ণ গোপকুমারগণকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তমাল-লতাগুলি সাপে ভরা, বৃন্দাবনও বানরে ভরিয়া গিয়াছে, যমুনার জলে আছে কুমীর, আর গিরির সন্ধিতে আছে ঘোরবদন সব ব্যাঘ্র ; গোপবালকগণের প্রতি এই কথা বলিয়া নয়নের আকুঞ্চনরূপ ইঙ্গিতের দ্বারা তিনি মিলনতৃষিত আভীরবধূ রাধাকে নিষেধ জানাইতেছেন।[২] রুক্মিণী-আদির প্রেম হইতে রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক উমাপতি ধরের সুন্দর পদ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।[৩] এই কবির আর একটি পদে কৃষ্ণের যে বেণুরবে গোষ্ঠ হইতে গাভীসকল গৃহে ফিরিয়া আসে, যে বেণুরব গোপনারীগণের চিত্তহরণে সিদ্ধ-মন্ত্রস্বরূপ, যে বেণুরবে বৃন্দাবনের রসিকমৃগগণের মন সানন্দে আকৃষ্ট হয়, সেই বেণুরবের জয়গান করা হইয়াছে।[৪]

অভিনন্দ কবির একটি পদে নবযৌবনে উপনীত কৃষ্ণের রাধার সহিত নর্মক্রীড়ায় লুব্ধচিত্ত—অথচ যশোদাভয়ে ভীত হইয়া—যমুনাকূলের অতিনির্জন লতাগৃহে প্রবেশের ইঙ্গিত পাই।[৫] লক্ষ্মণসেনের নামেও চমৎকার হরি-ক্রীড়ার পদ পাই।[৬] লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনেরও যখন একটি পদ পাওয়া যাইতেছে, তখন এই লক্ষ্মণসেন রাজা লক্ষ্মণসেন বলিয়াই মনে হয়। পদটি এই :—

কৃষ্ণ ত্বদ্বনমালয়া সহ কৃতং কেনাপি কুঞ্জান্তরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহ্যতাম্।

১ এই পদটি 'পদ্যাবলী'তে ধৃত হইয়াছে।

২ ব্যালাঃ সন্তি তমালবল্লিষু বৃতং বৃন্দাবনং বানরৈ-
রুদ্রক্রং যমুনাম্বু ঘোরবদনব্যাঘ্রা গিরেঃ সন্ধয়ঃ।
ইত্থং গোপকুমারকেষু বদতঃ কৃষ্ণস্য তৃষ্ণোত্তর-
স্মেরাভীরবধূনিষেধি নয়নস্যাকুঞ্চনং পাতু বঃ ॥ হরিক্রীড়া, ৪

৩ এই গ্রন্থের ১২৪ পৃষ্ঠা।

৪ বেণুনাদঃ, ৩ ; পদটি 'পদ্যাবলী'তেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫ রাধায়ামনুবন্ধনর্মনিভৃতাকারং যশোদাভয়া-
দভ্যর্ণৈঘতিনির্জনেষু যমুনারোধোলতাবেশ্মসু। ইত্যাদি। কৃষ্ণযৌবনম্, ২

৬ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবস্য।

ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে ত্রপানম্রয়ো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিতস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥

"কৃষ্ণ, অন্য একটি কুঞ্জে তোমার বনমালার সঙ্গে কেহ আসিয়া গোপীকুন্তলের সহিত ময়ূরপুচ্ছ একসঙ্গে করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, আমি ইহা পাইয়াছি, ইহা নাও। একটি দুগ্ধমুখ গোপশিশু এইরূপ বলিলে রাধামাধবের যে বলিতস্মেরালস এবং লজ্জানম্র দৃষ্টিসমূহ তাহাদের জয় হোক।" লক্ষ্মণসেন-কৃত বেণুনাদের আর একটি পদ পাওয়া যাইতেছে, সেখানে তির্যক্স্কন্ধ কৃষ্ণ তাঁহার আমীলিতদৃষ্টি গভীর আকূতির সহিত রাধার প্রতি ন্যস্ত করিয়া বেণু বাজাইতেছেন।[১]

লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনের রচিত একটি পদের সহিত জয়দেবের গীত-গোবিন্দের 'মেঘৈর্মেদুর'-ইত্যাদি প্রথম শ্লোকটির মিল অতি ঘনিষ্ঠ।

আহূতাদ্য ময়োৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রৈষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়মিতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥[২]

"আমি আজ রাত্রিতে ইহাকে উৎসবে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, এ ঘর শূন্য রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ভৃত্যগুলিও মাতাল; এখন এ একাকিনী কুলবধূ কি করিয়া যাইবে? বাছা, তুমিই তাহা হইলে ইহাকে ইহার ঘরে লইয়া যাও। যশোদার এই কথা শুনিয়া রাধামাধবের যে মধুরস্মেরালস দৃষ্টিসমূহ—তাহাদের জয় হোক।" এই প্রসঙ্গে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' ধৃত পূর্বলিখিত ৪১ সংখ্যক পদটিও তুলনা করা যাইতে পারে। রূপদেবের একটি পদে দেখি, "বৃন্দা সখী অন্যান্য গোপরমণীগণের নিকটে বলিতেছে,—এখানে এই নিচুল-নিকুঞ্জের একেবারে অভ্যন্তর দেশে কচিঘাসের এই বিজন শয্যা কোন্ রমণের? এই কথা শুনিয়া রাধা-মাধবের যে বিচিত্র মৃদুহাস্যসমন্বিত চাহনিসমূহ তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক।"[৩]

আচার্য গোপীকের একটি পদে কৃষ্ণের অভিসারের একটি চাতুর্যপূর্ণ বর্ণনা পাইতেছি। গভীর রাত্রিতে কৃষ্ণ রাধার গৃহের কাছে আসিয়া কোকিলাদির নাদের দ্বারা রাধাকে সঙ্কেত করিতেছেন, এদিকে সেই সঙ্কেত শুনিয়া রাধাও

১ বেণুনাদ, ২; এই পদটি 'পদ্যাবলী'তেও ধৃত হইয়াছে।

২ এই পদটি 'পদ্যাবলী'তেও ধৃত হইয়াছে।

৩ হরিক্রীড়া, ১; পদটি 'পদ্যাবলী'তেও গৃহীত হইয়াছে।

দ্বারমোচন করিয়া বাহিরে আসিতেছে, রাধার চঞ্চল শঙ্খবলয় এবং মেখলাধ্বনি শুনিয়াই কৃষ্ণ রাধার বহির্গমনের কথা বুঝিতে পারিলেন। এদিকে শব্দ পাইয়া বৃদ্ধা (জটিলা কুটিলা) কে কে করিয়া বার বার চিৎকার করিতেছে এবং তাহাতেও কৃষ্ণের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে; এইরূপ অবস্থায়ই কৃষ্ণের সেই রাত্রি রাধাগৃহের প্রাঙ্গণের কোণে যে কেলিবিটপ—তাহারই ক্রোড়ে গত হইল।

সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্বতো
দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়শ্রেণিস্বনং শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতীনাদেন দূনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণকোণকেলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্বরী ॥[১]

আমরা প্রশ্নোত্তর-ছলে রাধা-কৃষ্ণের শ্লেষপূর্ণ রহস্যালাপ এবং রসিকতার নমুনা 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'র একটি কবিতায় দেখিতে পাইয়াছি।[২] সদুক্তিকর্ণামৃতে আরও কয়েকটি নমুনা পাইতেছি। একটি পদে রাধা কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "এই রাত্রে তুমি কে?" কৃষ্ণ জবাব দিলেন, "আমি কেশব" (শ্লেষার্থ—কেশবহন করে যে); "মাথার কেশের দ্বারা আর কি গর্ব করিতেছ?" "ভদ্রে, আমি শৌরি" (শ্লেষার্থ—শূরের পুত্র); "এখানে পিতৃগত গুণের দ্বারা পুত্রের কি হইবে?" "হে চন্দ্রমুখি, আমি চক্রী"; (শ্লেষার্থ—কুম্ভকার); "বেশত, তাহা হইলে আমাকে কলসী, ঘটী, দুধ দুহিবার ভাঁড় কিছুই দিতেছ না কেন?" এইরূপে গোপবধূর লজ্জাজনক উত্তরের দ্বারা দুঃস্থ হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।[৩] এই জাতীয় শ্লেষাত্মক প্রশ্নোত্তর আরও আছে।[৪]

১ এই পদটি 'পদ্যাবলী'তেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

২ এই গ্রন্থের ১১৬-১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পদটি 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'ও ধৃত।

৩ কস্ত্বং ভো নিশি কেশবঃ শিরসিজৈঃ কিং নাম গর্বায়সে
ভদ্রে শৌরিরহং গুণৈঃ পিতৃগতৈঃ পুত্রস্য কিং স্যাদিহ।
চক্রী চন্দ্রমুখি প্রযচ্ছসি ন মে কুণ্ডীং ঘটীং দোহিনী-
মিত্থং গোপবধূহ্রিতোত্তরতয়া দুঃস্থো হরিঃ পাতু বঃ ॥
প্রশ্নোত্তরম্, ৩; পদটি 'পদ্যাবলী'তেও উদ্ধৃত আছে।

৪ একটি পদ আছে:—
বাসঃ সম্প্রতি কেশব ক্ব ভবতো মুগ্ধেক্ষণে নম্বিদং
বাসং ব্রূহি শঠ প্রকামসুভগে ত্বদ্গাত্রসংশ্লেষতঃ।

শতানন্দ কবির একটি পদে দেখি, গোবর্ধন-বহনে কৃষ্ণের কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া রাধিকা ব্যথিত হইতেছে এবং কৃষ্ণকে সাহায্য করিবার আগ্রহাতিশয্যে সে শূন্য গগনেই গোবর্ধন-ধারণের অনুকার করিয়া বৃথা হাত নাড়িতেছে।[১] অজ্ঞাতনামা আর এক কবির পদে আছে, কৃষ্ণ গোবর্ধন-ধারণ করিয়া আছেন, সব গোপিনীদের সহ রাধাও কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া আছে। অন্য সব গোপারা রাধাকে বলিল, রাধে, তুমি কৃষ্ণের দৃষ্টিপথ হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাও; তোমার প্রতি আসক্ত-দৃষ্টি হইয়া কৃষ্ণের হাত শিথিল না হইয়া পড়ে; কিন্তু গোপীদের মুখে রাধাকে দৃষ্টির সম্মুখ হইতে দূরে সরাইয়া দিবার এই কথা মনে চিন্তা করিয়া গিরিধারণের শ্রমে কৃষ্ণের যেন ঘন শ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল।—

দূরং দৃষ্টিপথাত্তিরোভব হরের্গোবর্ধনং বিভ্রত-
স্ত্বয্যাসক্তদৃশঃ কৃশোদরি করঃ স্রস্তোঽস্য মা ভূদিতি।
গোপীনামিতিজল্পিতং কলয়তো রাধা-নিরোধাশ্রয়ং
শ্বাসাঃ শৈলভরশ্রমভ্রমকরাঃ কৃষ্ণস্য পুষ্ণন্তু বঃ॥[২]

'গোপীসন্দেশ' নামে 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' যে পদগুলি উদ্ধৃত আছে তাহা চমৎকারিত্বের জন্যও যেরূপ লক্ষণীয়, তেমনই পরবর্তী কালের 'বিরহে'র পদাবলীর সহিত ইহাদের নিবিড় যোগের জন্যও লক্ষণীয়। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া দ্বারবতী চলিয়া গিয়াছেন, রাধা এবং অন্যান্য গোপীগণ সেখানে দূতের দ্বারা নানাভাবে বিরহবেদনা নিবেদন করিয়াছে। একটি পদে বলা হইয়াছে,—"গোবর্ধনগিরির সেই সকল কন্দর, সেই যমুনার কূল, সেই চেষ্টারস, সেই ভাণ্ডীর বনস্পতি, সেই তোমার সহচরগণ—সেই তোমার গোষ্ঠের অঙ্গন—হে দ্বারবতীভুজঙ্গ

যামিন্যামুষিতঃ ক ধূর্ত বিতনুর্মুষ্ণাতি কিং যামিনী
শৌরির্গোপবধূং ছলৈঃ পরিহসন্নেবংবিধৈঃ পাতু বঃ॥

"হে কেশব, সম্প্রতি তোমার বাস কোথায়? (অর্থাৎ সম্প্রতি থাকা হয় কোথায়?); "মুগ্ধেক্ষণে, এই আমার বাস (বস্ত্র)।" "বাসের (থাক কোথায়) কথা বল হে শঠ;" "হে প্রকামসুভগে, এ বাস (গন্ধ) তোমার গাত্রালিঙ্গন হইতে।" "যামিনীতে কোথায় ছিলে;" "যাহার তনু নাই এমন যামিনী কি চুরি করে?" এইরূপ ছলে গোপবধূকে পরিহাস করিতেছিলেন যে কৃষ্ণ তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।" পদটি 'পদ্যাবলী'তে কবি চক্রপাণির নামে ধৃত।

১ শৈলোদ্ধারসহায়তাং জিগমিষোরপ্রাপ্তগোবর্ধনা
রাধায়াঃ সুচিরং জয়ন্তি গগনে বন্ধ্যাঃ করভ্রান্তয়ঃ॥
গোবর্ধনোদ্ধারঃ, ৩

২ 'পদ্যাবলী'তে পদটি শুভাঙ্কের বলিয়া উল্লেখিত।

(সর্পের ন্যায় ক্রূর), সে সকল কি ভুলেও একবার মনে আসে না? হরির হৃদয়ে, ব্রজবধূসন্দেশ রূপ এই দুঃসহ শল্য তোমাদিগকে রক্ষা করুক।"[১] আর একটি পদে বিরহখিন্না গোপীগণ দ্বারকাগামী পথিককে ডাকিয়া বলিতেছে,—"হে পথিক, তুমি যদি দ্বারবতী যাও তবে দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে এই কথাটি একবার বলিও,—'স্মরমোহমন্ত্রবিবশা গোপিনীদের তুমি ত্যাগই করিয়াছ; কিন্তু এই যে শূন্য দিক্গুলি কেতকগর্ভধূলিসমূহের দ্বারা (ভরিয়া গিয়াছে, ইহাদের) দিকে তাকাইয়াও কি সেই সব কালিন্দীতটভূমি এবং তথাকার তরুগুলির কথা কখনও তোমার চিন্তায় আসে না?''—

পান্থ দ্বারবতীং প্রয়াসি যদি হে তদ্দেবকীনন্দনো
বক্তব্যঃ স্মরমোহমন্ত্রবিবশা গোপ্যোঽপি নামোজ্ঝিতাঃ॥
এতাঃ কেতকগর্ভধূলিপটলৈরালোক্য শূন্যা দিশঃ
কালিন্দীতটভূময়োঽপি তরবো নায়ান্তি চিন্তাস্পদম্॥ ৬২।২ [২]

বীরসরস্বতী-কৃত একটি অপূর্ব বিরহের কবিতা রহিয়াছে। এখানেও গোপিনীরা বলিতেছে,—"হে মথুরাপথিক, মুরারির দ্বারে তুমি এই গোপীবচনটি অবশ্যই গাহিয়া শুনাইও,—'পুনরায় সেই যমুনার জলে কালিয়গরলানল (কালিয়গরলের ন্যায় বিরহানল) জ্বলিতেছে'।"

মথুরাপথিক মুরারেরুদ্গেয়ং দ্বারি বল্লবীবচনম্।
পুনরপি যমুনাসলিলে কালিয়গরলানলো জ্বলতি॥ ৬২।৫

আচার্য গোপীকের একটি দিবাভিসারের পদে আছে,—

মধ্যাহ্নদ্বিগুণার্কদীধিতিদলৎসম্ভোগবীথীপথ-
প্রস্থানব্যথিতারুণাঙ্গুলিদলং রাধাপদং মাধবঃ।
মৌরৌ প্রকৃশবলে মুহুঃ সমুদিতস্বেদে মুহুর্বক্ষসি
ন্যস্য প্রাণয়তি প্রকম্পবিধুরৈঃ শ্বাসোর্মিবাতৈর্মুহুঃ॥
[সদুক্তিকর্ণামৃত, ৩।৬৩।৪]

পুষ্পদলের মতন অরুণাঙ্গুলিদলে কমনীয় হইল রাধার পদ, সেই পদ আজ

[১] তে গোবর্ধন-কন্দরাঃ স যমুনাকচ্ছঃ স চেষ্টারসো
ভাণ্ডীরঃ স বনস্পতিঃ সহচরাস্তে তচ্চ গোষ্ঠাঙ্গনম্।
কিং তে দ্বারবতীভুজঙ্গ হৃদয়ং নায়ান্তি দোষৈরপী-
ত্যব্যাদ্বো হৃদি দুঃসহং ব্রজবধূসন্দেশশল্যং হরেঃ॥ ৬২।১
'পদ্যাবলী'তে পদটি নীলের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে।

[২] 'পদ্যাবলী'তে পদটি গোবর্ধনাচার্যের নামে উল্লেখিত আছে।

সম্ভোগবীথীপথ-প্রস্থানে ব্যথিত, কারণ সে পথ মধ্যাহ্নের দ্বিগুণসূর্যতাপে তপ্ত; এই জন্য কৃষ্ণ রাধার পদের তাপ দূর করিবার নিমিত্ত বারবার তাহা মাল্যযুক্ত মস্তকে রাখিতেছেন, ঘর্মশীতল বক্ষে রাখিতেছেন, প্রকম্পবিধুর শ্বাসোর্মিবাতের দ্বারা বার বার উপশমিত করিতেছেন।[১]

আমরা কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় হইতে কতগুলি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-বিষয়ক কবিতা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি; সদুক্তিকর্ণামৃত হইতেও অনেকগুলি এই জাতীয় কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিলাম। এ-জাতীয় কবিতাগুলিকে লইয়া একটু বিশদ আলোচনার তাৎপর্য এই যে, ইহার ভিতর দিয়া জয়দেব কবির যুগ এবং তাঁহার দুই তিন শতাব্দী পূর্ববর্তী যুগের রাধাকৃষ্ণলীলা-সম্বলিত সাহিত্যের ধারাটির সন্ধান এবং পরিচয় মিলিবে। সাধারণতঃ কবি জয়দেব সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যে একটা বিস্ময় রহিয়া গিয়াছে, কি করিয়া তিনি ঐ যুগে রচনা করিয়াছিলেন গীতগোবিন্দের ন্যায় রাধাকৃষ্ণ-লীলারস-সমৃদ্ধ এবং নিপুণকাব্যকলামণ্ডিত কাব্য। আমরা আশা করি, জয়দেবের সমসাময়িক এবং পূর্বের যে সকল কবির কবিতা লইয়া এতক্ষণ আলোচনা করিলাম তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে, দ্বাদশ শতকের জয়দেব কবির গীতগোবিন্দ কাব্য—কি লীলারসের দিক হইতে, কি কাব্যরসের দিক হইতে—কোনও দিক হইতেই আকস্মিক নয়, বরঞ্চ বেশ স্বাভাবিক। জয়দেবের যুগে এবং তাহার দুই এক শতাব্দীর পূর্ব হইতেই রাধাকৃষ্ণপ্রেমসম্বলিত বৈষ্ণব-কবিতার কিরূপ প্রসার ঘটিয়াছিল তাহার আরও পরিচয় পাওয়া যায় রূপগোস্বামীর সংগৃহীত 'পদ্যাবলী' সঙ্কলন-গ্রন্থে। এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে রূপগোস্বামীর সমসাময়িক কবিগণ, তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিগণ, জয়দেবের সমসাময়িক কবিগণ এবং বহু প্রাচীনতর কবিগণের বহু কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙলা-দেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জয়দেব, চণ্ডীদাসই শুধু বৈষ্ণব-কবিতা রচনা করেন নাই, আরও অনেক খ্যাত-অখ্যাত কবিও যে বৈষ্ণব-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 'পদ্যাবলী'র সঙ্কলনের ভিতরে আরও লক্ষ্য করিতে পারি, শুধু বাঙলা দেশে রচিত কবিতাই রূপগোস্বামী সংগ্রহ

---

১ তুঃ— মাথহিঁ তপন তপত পথ বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননিক পুতুলি তনু চরণ কমল জনু
দিনহিঁ কয়ল অভিসার॥ ইত্যাদি, গোবিন্দ দাস।

করেন নাই, দাক্ষিণাত্য, উৎকল, তিরভুক্তি (ত্রিহুত) প্রভৃতি অন্যান্য অঞ্চল হইতেও এই সকল কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং বোঝা যাইতেছে, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার একটা ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া রাধা-কৃষ্ণের প্রেমগান রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, জয়দেবের পর চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিকে ছুঁইয়া আসিয়াই বৈষ্ণব কবিতার জন্য যে আমাদিগকে একেবারে ষোড়শ শতাব্দীতে উপস্থিত হইতে হয়, এই জাতীয় আমাদের একটা প্রচলিত বিশ্বাস অনেকখানি ভ্রান্ত।

এই প্রসঙ্গে আরও কতগুলি কথা প্রণিধানযোগ্য। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতকের ভিতরে দেবতাবিষয়ক যত শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতা লিখিত হইয়াছে, তাহাও সবই রাধাকৃষ্ণকে লইয়া—এরূপ মনে করা উচিত হইবে না। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, লক্ষ্মী-নারায়ণকে লইয়াও এইযুগে এই জাতীয় শৃঙ্গার-রসাত্মক বহু কবিতা রচিত হইয়াছে। হরগৌরী সম্বন্ধে শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতা রাধাকৃষ্ণ-অবলম্বনে শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতা হইতে কিছু কম হইবে না। কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি পর্যন্ত হরগৌরীর শৃঙ্গার লীলা ভারতীয় সাহিত্যের রসসম্পদে কম উপজীব্য দান করে নাই। জয়দেবের সমকালেও হরগৌরীর শৃঙ্গার-রসাত্মক বহু কবিতা রচিত হইয়াছে। তবে মনে হয়, শৃঙ্গার-রসাত্মক কবিতায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলোপাখ্যানেরই ক্রমপ্রাধান্য-লাভ ঘটিতে লাগিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে মধুর-রসাত্মক কবিতায় রাধাকৃষ্ণেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে এই যে প্রেমকবিতার ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা তাহাও হয়ত দুই কারণে ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ সেন রাজ-গণের পারিবারিক ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে; আর দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙলা এবং বৃহত্তর বাঙলার কবি-গোষ্ঠীর ভিতরে সেন রাজ-গণের প্রভাব অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়তঃ রাধাকৃষ্ণের রাখালিয়া প্রেম কবিতার পক্ষে অধিকতর উপযোগী ছিল এবং লীলাবৈচিত্র্যেও সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল। এই লীলা অবলম্বনে রচিত প্রেমকবিতার ভিতর দিয়া কবিগণ একদিকে দেবলীলা বর্ণনার একটা আত্মপ্রসাদও লাভ করিতে পারিতেন, অথচ ইহার ভিতর দিয়া মনুষ্যপ্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রসবিচিত্র লীলাকে রূপ দিতেও তাঁহারা সম্পূর্ণ সুযোগ পাইতেন। এই ভাবেই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকবিতার ক্রম-প্রাধান্য। প্রেমকবিতায় এইরূপে একবার রাধাকৃষ্ণের প্রাধান্য যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহার পর হইতেই প্রেমকবিতা লিখিতে গেলে 'কানু ছাড়া গীত নাই'। বাঙলার প্রাচীন

যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাই গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে এই রাধা-কৃষ্ণ-কবিতারই প্রায় একটানা আধিপত্য দেখিতে পাই।

(ঘ) সংস্কৃতে রাধা-প্রেম-গীতিকা ও পার্থিব প্রেমগীতিকার সংমিশ্রণ

ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্তের ভারতীয় সাহিত্যে[১] রাধা কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং কি ভাবে এই সাহিত্যের ভিতরে তাহার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে এ-বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে একটা মৌলিক বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। বৈষ্ণব-কবিতা সম্বন্ধে আমাদের সাধারণভাবে এই একটা সংস্কার আছে যে, বৈষ্ণব-কবিতার মূল প্রেরণা ধর্মের মধ্যে; ধর্মের প্রেরণাই সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতরে রস-বৈচিত্র্য এবং রস-সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। চৈতন্য-যুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই এইজাতীয় একটি সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক প্রাচীন কবিতাগুলি এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষের কবিগণ কর্তৃক রচিত সাধারণ পার্থিব প্রেম-কবিতাগুলি আলোচনা করি তবে দেখিতে পাই, প্রাচীন বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায় ধর্মের প্রেরণা একান্তই গৌণ ছিল, কাব্য-প্রেরণাই সেখানে আসল কথা। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম-কবিতায় আমরা প্রাচীন যত কবির উল্লেখ পাইতেছি, তাঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এরূপ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার মতন কোন তথ্যই আমরা লাভ করি না; বরঞ্চ দেখিতে পাই, তাঁহারা কবি ছিলেন, নর-নারীর প্রেম সম্বন্ধে তাঁহারা বিবিধ কবিতা রচনা করিয়াছেন; সেই একই দৃষ্টি—একই প্রেরণা অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে প্রেম-কবিতার আলম্বন-বিভাব মাত্র, তাহার অধিক আর তেমন কিছুই নহে। ষষ্ঠ শতাব্দীর ভিতরে রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যান প্রেমের গান ও ছড়া রূপে আভীর-

১ আমরা এই কালের উল্লেখ কোনও প্রমাণীকৃত ঐতিহাসিক বিশুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া করিতেছি না, সাধারণ ভাবে এবং মোটামুটি ভাবে একটা সম্ভাব্য কালরূপেই গ্রহণ করিতেছি। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম বিষয়ক কবিতা ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে একথা বলা যায় না; ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব হইতেও এই জাতীয় প্রেম-কবিতার উল্লেখ আমরা হয়ত পাইতে পারি।

জাতির ক্ষুদ্র-পরিধি অতিক্রম করিয়া বৃহৎ ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রসজ্ঞ কবিগণ সেই নবলব্ধ বিষয়বস্তুকেই তাঁহাদের কাব্যসৃষ্টির ভিতরে একটু আধটু স্থান দিয়াছেন। তবে দেবতাবিষয়ক বলিয়া সহজাত সংস্কার বশতঃ রাধা-কৃষ্ণের প্রতি স্থানে স্থানে (তাহাও সর্বত্র নহে) তাঁহাদের একটা সম্ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীনতর কবিগণের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, বৈষ্ণব-কবিতার সমৃদ্ধ যুগ দ্বাদশ শতকের কাব্য-কবিতা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই যুগের কোন কবিই শুধুমাত্র বৈষ্ণব-কবিতা রচনা করেন নাই। 'গীত-গোবিন্দে'র প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব শুধু রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতা রচনা করেন নাই, তিনি অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে, পার্থিব প্রেম বিষয়ে প্রকীর্ণ কবিতাও রচনা করিয়াছেন, 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'ই তাহা উদ্ধৃত রহিয়াছে।[১] উমাপতি ধর, গোবর্ধনাচার্য, শরণ, ধোয়ী—এমন কি লক্ষ্মণসেন রচিত আমরা রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-বিষয়ক বৈষ্ণব-কবিতাও বিভিন্ন সংগ্রহগ্রন্থে পাইতেছি, আবার তাঁহাদের রচিত মানবীয় বহু প্রকীর্ণ প্রেম-কবিতাও নানা গ্রন্থে পাইতেছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইঁহারা তৎকালে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, কাব্যের বিষয়-বস্তু রূপে রাধা-কৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়কার কবিগণের ভিতরে একমাত্র লীলা-শুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থখানি পড়িলে মনে হয়, এখানে একটা প্রবল ধর্মানুরাগ স্পষ্ট প্রতীয়মান। গ্রন্থখানি যিনিই রচনা করুন, তাঁহার সম্বন্ধেই একথা মনে হয়, তিনি মনেপ্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন, সেই বৈষ্ণব দৃষ্টিতে লীলা-প্রসার এবং লীলা-আস্বাদনের জন্যই তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম শ্রদ্ধার্হ শ্রীজয়দেব কবি সম্বন্ধে আমাদের এই বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস নাই। 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা অধ্যাত্ম আকাঙ্ক্ষা যেভাবে প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্য সব স্থানে সেই অধ্যাত্ম-সুরের উচ্চগ্রামে পৌঁছিতে পারিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নয়। কাব্যারম্ভে তাঁহার কাব্যের ফলশ্রুতি কি জয়দেব সে বিষয়ে একটি শ্লোক দিয়াছেন।—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥ ১।৩

১ অবশ্য এ-বিষয়ে যদি একাধিক জয়দেবের মতবাদকে দাঁড় করান না হয়।

"যদি হরি-স্মরণে মনকে সরস করিতে চাও, আর যদি বিলাসকলাসমূহে কুতূহল থাকে, তবে এই জয়দেব-ভারতী মধুর কোমল এবং কান্ত পদাবলী শোন।" 'গীতগোবিন্দ' কাব্য-খানির ভিতরে 'হরিস্মরণে সরসং মনঃ' অপেক্ষা 'বিলাস-কলাসু কুতূহলম্'-এর দিকটাই স্থানে স্থানে বড় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই যুগের এবং ইহার পূর্ববর্তী যুগের রসবিদগ্ধ কবিগণ নরনারীর বিলাসকলাসমূহের বর্ণনায় যে কৌতূহল এবং নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, জয়দেবের কাব্যের মধ্যেও রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া ঠিক সেই একই বিলাস-কলার কৌতূহল এবং নৈপুণ্য তাঁহার বর্ণনায় আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। ধর্মের সুর লইয়াও জয়দেব যেখানে কথা বলিয়াছেন সেখানেও তাঁহার জ্ঞাতে অজ্ঞাতে যুবতী-কেলিবিলাসের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। যেমন,—

হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী॥ ৭।১০

"হরিচরণই যাহার শরণ এমন জয়দেব কবির এই ভারতী (কবিতা), কোমলকলাবতী যুবতীর ন্যায় সকলের হৃদয়ে বাস করুক।"। 'কোমলকলাবতী' বিশেষণটি অবশ্য যুবতী এবং ভারতী উভয়ের প্রতিই তুল্যভাবে প্রযোজ্য।) পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নর-নারীর বিলাসকলা-বর্ণনে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে জয়দেবের রচিত এমন প্রকীর্ণ কবিতাও পাওয়া যাইতেছে।

আমাদের বক্তব্য হইল এই যে, ভারতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া রাধা-প্রেমের যে প্রথম প্রকাশ তাহা রসবিদগ্ধ কবিগণের প্রেম-কবিতার ভিতরেই। সেই প্রেম-কবিতার ভিতরে প্রাকৃত প্রেম এবং অপ্রাকৃত প্রেম লৌহ এবং স্বর্ণের ন্যায় স্বরূপবিলক্ষণ ছিল না। এই স্বরূপবৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে অনেক পরবর্তী কালে, বিশেষ করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বে। সাহিত্যের দিক্ হইতে বিচার করিলে আমরা বলিব, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম-কবিতা ভাব রস এবং প্রকাশভঙ্গি সকল দিক্ হইতেই ভারতীয় সাধারণ প্রেম-কবিতার ধারা এবং পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছে। এমন কি চৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্তী কালে যে সকল বৈষ্ণব-কবিতা রচিত হইয়াছে, আমরা একটু পরে আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, তাহাও কাব্য-রস এবং প্রকাশ-শৈলীর দিক হইতে মূলতঃ ভারতীয় প্রেম-কবিতার চিরাচরিত ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছে। সুতরাং এই সাহিত্যের দৃষ্টি হইতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কবিতাকে আমরা ভারতীয় সাধারণ প্রেম-কবিতার ধারারই একটি বিশেষ রসসমৃদ্ধ পরিণতি বলিয়া গ্রহণ

করিতে পারি। এমনও দেখা যায়, পরবর্তী কালে যখন 'কানুছাড়া গীত নাই', অর্থাৎ প্রেম-কবিতা হইতে হইলে রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন না করিয়া হয় না এই বিশ্বাস যখন একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তখন পূর্ববর্তী কালে রচিত একান্ত ভাবে মানবীয় প্রেমের কবিতাও রাধাকৃষ্ণের নামেই চলিয়া যাইতে লাগিল। একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দিতেছি। রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী' গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি নির্জনে সখীর প্রতি রাধার বচন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ ৩৮৬

কবিতাটির সরলার্থ হইল এই, "যে আমার কৌমারহর (অর্থাৎ যে আমার কুমারীত্ব হরণ করিয়াছিল) সেই (আজ) আমার বর; (আজও) সেই চৈত্র-নিশি, সেই বিকশিত মালতীর সুরভি, সেই কদম্ববনের পরিণত বা বর্ধিত বায়ু; আমিও সেই আছি, তথাপি সেই রেবানদী-তটের বেতসীতরুতলে (অশোক তরুতলে ?) যে সব সুরতব্যাপারের লীলাবিধি তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।" রূপগোস্বামী এই শ্লোকটিকে যে অর্থে রাধার উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন 'পদ্যাবলী'তে এই শ্লোকটির ঠিক পরে উদ্ধৃত রূপগোস্বামীর একটি নিজের কৃত শ্লোকেই তাহার ভাবটি পাওয়া যাইবে :—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥ ৩৮৭॥

"হে সহচরি, সেই প্রিয় কৃষ্ণ—কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে; আমিও সে-ই রাধা; সে-ই এই আমাদের উভয়ের সঙ্গমসুখ, কিন্তু তথাপি যে বনমধ্যে মধুর মুরলীর পঞ্চমস্বরের খেলা হইত সেই কালিন্দীপুলিনবিপিনের জন্য আমার মন স্পৃহা করিতেছে।"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের দুই স্থানে[১] দেখিতে পাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও এই 'যঃ কৌমারহরঃ' প্রভৃতি শ্লোকটিকে অতি গূঢ়ার্থ-

মধ্য, ১ম পরিচ্ছেদ; মধ্য, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

ব্যঞ্জক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথক্ষেত্রের ঐশ্বর্য-কোলাহলাদিতে অতৃপ্ত হইয়া যখন বৃন্দাবনের জন্য মনে মনে স্পৃহা করিতেছিলেন, তখন এই শ্লোকটি ভাবাবেশে আবৃত্তি করিয়াছিলেন।[১] শ্রীজীবগোস্বামীর 'গোপালচম্পু' নামক চম্পূকাব্যখানির উত্তর চম্পুতে আমরা দেখিতে পাই কৃষ্ণের সহিত রাধার বিবাহের পরে বিশাখা সখী রাধার চিত্ত উদ্‌ঘাটন করিবার নিমিত্ত বহুরূপ চেষ্টা করিয়া রাধার মুখেই 'যঃ কৌমারহরঃ' প্রভৃতি শ্লোকটি উচ্চারণ করাইয়াছিল, এবং কৃষ্ণও নির্জনে রাধামুখে শ্লোকটি শুনিতে পাইয়া শ্লোকটির চতুর্থ চরণের পাঠ পরিশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—'কৃষ্ণারোধসি তত্র কুঞ্জসদনে' এই পাঠই

নাচিতে নাচিতে প্রভুর হইল ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর॥

॥ শ্লোক ॥

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার।
স্বরূপ বিনে কেহ অর্থ না বুঝে ইহার॥
এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে ব্যাখ্যান॥
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পায়া আনন্দিত মন॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া ধুয়া গাওয়াইল॥
অবশেষে রাধাকৃষ্ণে কৈলা নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সেই নব-সঙ্গম॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ॥
ইহাঁ লোকারণ্য হাতি-ঘোড়া-রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পবন ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥
ইহাঁ রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে সেই সুখ-আস্বাদন।
সে-সুখ সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এককণ॥
আমা লইয়া পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে॥

চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৩শ।

এখন সঙ্গত। আসলে কিন্তু এই শ্লোকটির সহিত রাধা-কৃষ্ণের কোনও সম্পর্ক নাই; এ-শ্লোকটি কিছু কিছু পাঠান্তর-সহ কোন কোন সংস্কৃত সংগ্রহ-গ্রন্থে মহিলা কবি শীলা ভট্টারিকার নামে পাওয়া যায়। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' কবিতাটি অজ্ঞাতনামা কবির কবিতা রূপে 'অসতীব্রজ্যা'র ভিতরে আরও অসতীপ্রেমের অন্যান্য-কবিতার ভিতরে পাওয়া যাইতেছে।[১]

একদিকে যেমন এই অসতীব্রজ্যার কবিতা বৈষ্ণবগণ কর্তৃক রাধার উক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে দেখি, তেমনি অন্যদিকে আবার রাধার কৃষ্ণের সহিত কালিন্দীতীরবর্তী লতাগৃহে যে গোপন প্রেম তাহা লইয়া রচিত কবিতাকে প্রাচীন কাব্য-সঙ্কলয়িতৃগণ এই অসতীব্রজ্যার ভিতরেই স্থান দিয়াছেন,[২] রাধা সেখানে অন্যান্য মানবী অসতীগণের সহিতই সাহিত্যে এক পংক্তিতে স্থান পাইয়াছে। 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটির ঠিক পূর্বেই 'পদ্যাবলী'তে 'কস্যচিৎ' বলিয়া আর একটি পদ তোলা হইয়াছে।—

✓কিং পাদান্তে লুঠসি বিমনাঃ স্বামিনো হি স্বতন্ত্রাঃ
কঞ্চিৎ কালং ক্বচিদভিরতস্তত্র কস্তেঽপরাধঃ।
আগস্কারিণ্যহমিহ ময়া জীবিতং ত্বদ্বিয়োগে
ভর্তৃপ্রাণাঃ স্ত্রিয় ইতি নন্থ ত্বং মমৈবানুনেয়ঃ ॥ ৩৮৫ ॥

"বিমনা হইয়া কেন আমার পাদান্তে পতিত হইতেছ? স্বামীরা হইলেন স্বতন্ত্র; কিছু কালের জন্য কোথাও তাঁহারা অভিরত হইয়া থাকিতেও পারেন,—এ-ব্যাপারে আর তোমার অপরাধ কি? এখানে আমিই হইলাম অপরাধিনী, কারণ তোমার বিয়োগেও আমি বাঁচিয়া আছি; স্ত্রীগণ হইল ভর্তৃপ্রাণ, সুতরাং তুমিই হইলে আমার অনুনেয়।"

এই পদটিও রূপগোস্বামী 'অথ রহস্যমনুনয়ন্তং কৃষ্ণং প্রতি রাধাবাক্যং'

১ কবিতাটির বহুস্থানে বহু পাঠান্তর পাওয়া যায় (টমাস্ কৃত টীকা দ্রষ্টব্য); 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'-ধৃত পাঠ হইল এই:—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তাশ্চন্দ্রগর্ভা নিশাঃ
প্রোন্মীলন্নবমাধবীসুরভয়স্তে তে চ বিন্ধ্যানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি চৌর্যসুরতব্যাপারলীলাভৃতাং
কিং মে রোধসি বেতসীবনভুবাং চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

২ ধ্বন্যালোকধৃত এবং পরে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' (৫০১) উদ্ধৃত। (এই গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।[১] কিন্তু শ্লোকটি 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' বাকুট-কবির নামে 'মানিনী-ব্রজ্যা'র ভিতরে এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ভাবদেবীর রচিত বলিয়া 'নায়কে মানিনীবচনম্' রূপে পাওয়া যাইতেছে। 'পদ্যাবলী'তে কুরুক্ষেত্রে রাধার কৃষ্ণের সহিত মিলন হইলে রাধা-চেষ্টিত (অথ কুরুক্ষেত্রে শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরী-চেষ্টিতং) বলিয়া শুভ্র কবির এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

আনন্দোদ্‌গতবাষ্পপুরপিহিতং চক্ষুঃ ক্ষমং নেক্ষিতুং
বাহু সীদত এব কম্পবিধুরৌ শক্তৌ ন কণ্ঠগ্রহে।
বাণী সম্ভ্রমগদ্‌গদাক্ষরপদা সংক্ষোভলোলং মনঃ
সত্যং বল্লভসঙ্গমোঽপি সুচিরাজ্জাতো বিয়োগায়তে ॥ ৩৮৪ ॥

"আনন্দোদ্‌গত বাষ্পের দ্বারা চক্ষু আচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, কম্পবিধুর বিকল বাহুদুইটি কণ্ঠগ্রহণে সক্ষম হইতেছে না, বাণী সম্ভ্রমহেতু গদ্‌গদাক্ষরপদা, সংক্ষোভহেতু মন চঞ্চল; সত্য সত্যই বহুদিন পরে জাত বল্লভ-সঙ্গমও বিয়োগের ন্যায়ই হইল।"

এই পদের অনুরূপ পদ দেখিতে পাই গোবিন্দদাসের নবোঢ়রসোদ্‌গারের একটি পদে,—

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাঁপ।
করইতে কোর দুহুঁ ভুজ কাঁপ ॥
দূর কর এ সখি সো পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ ॥
চেতন না রহ চুম্বন বেরি।
কো জানে কৈছে রভস-রস-কেলি ॥ ইত্যাদি।

পদটি কিন্তু আমরা 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' পাইতেছি সাধারণ নবোঢ়া নায়িকার দেহমনের অবস্থান্তরের দৃষ্টান্ত রূপে। 'পদ্যাবলী'তে রুদ্রের নামে রাধাবিরহের "অচ্ছিন্নং নয়নাম্বু বন্ধুষু" প্রভৃতি যে পদটি (৩৬৮) উদ্ধৃত আছে 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' কিঞ্চিৎ পাঠান্তর সহ ঐ পদটি সাধারণ নায়িকার 'বিরহিণী-চেষ্টা' রূপে উদ্ধৃত রহিয়াছে। 'পদ্যাবলী'র ভিতরে ভবভূতির 'মালতী-মাধব' এবং 'উত্তররাম-চরিত'

১ পরবর্তী কালের টীকাকার বীরচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার 'রসিক-রঙ্গদা' টীকায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"চিরবিয়োগানন্তরং সাক্ষাত্ত্বতেঽপি প্রেয়সি সঙ্গমায় সতৃষ্ণামপি চিরব্রজ-ত্যাগাৎ স্বাভাবিকবাম্যোদয়েন মানিনীং তাং বিলক্ষ্য তৎপ্রেমবশ্যো রসিকশেখরঃ স্বস্য তদধীনতাং প্রকাশয়িতুং পাদগ্রহণাদিকং চকার, ততঃ শ্রীরাধা সাক্ষেপং যদাহ তদর্শয়তি অথেতি।"

নাটকের বিরহবিলাপের কবিতা রাধাবিলাপের ভিতরেই স্থান পাইয়াছে। 'অমরু-শতকে'র অমরু একজন প্রাচীন কবি। 'ধ্বন্যালোক'-কার আনন্দবর্ধন অমরুর প্রেমকবিতার সুখ্যাতি করিয়াছেন; সুতরাং অমরুর প্রেম-কবিরূপে খ্যাতি নবম শতকের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই 'অমরু-শতক' হইতে বিরহ-মানের কবিতা 'পদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে। অমরু হইতে উদ্ধৃত এই কবিতাগুলি দেখিলে বোঝা যায়, প্রেমের তীব্রতা এবং সূক্ষ্ম-সৌকুমার্য প্রকাশে এই-জাতীয় প্রেমের কবিতাই পরবর্তী কালের রাধা-প্রেম-কবিতার শুধু প্রাক্‌রূপ নয়, অনেকস্থলে আদর্শ-রূপ। অমরুর একটি কবিতাকে এইজাতীয় 'ক্ষুভিতরাধিকোক্তি' বলা হইয়াছে।—

নিশ্বাসা বদনং দহন্তি হৃদয়ং নির্মূলমুন্মথ্যতে
নিদ্রা নৈতি ন দৃশ্যতে প্রিয়মুখং রাত্রিন্দিবং রুদ্যতে।
অঙ্গং শোষমুপৈতি পাদপতিতঃ প্রেয়াংস্তথোপেক্ষিতঃ
সখ্যঃ কং গুণমাকলয্য দয়িতে মানং বয়ং কারিতাঃ॥ ২৩৮॥

"নিশ্বাসগুলি আমার বদন দহন করিতেছে; হৃদয় নির্মূল ভাবে উন্মথিত হইতেছে; নিদ্রা আসিতেছে না, প্রিয়মুখ দেখা যাইতেছে না, রাত্রিদিন শুধু রোদন করিতেছি। আমার দেহ শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতেছে, পাদপতিত প্রিয়কেও উপেক্ষা করিয়া দিয়াছি। সখীরা আমাতে কি গুণ দেখিয়া দয়িতের প্রতি এমন মান করাইয়াছিল!" অমরুর আরও একটি কবিতা রাধাবাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে।—

প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং প্রিয়সখৈরস্রৈরজস্রং গতং
ধৃত্যা ন ক্ষণমাসিতং ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তুং পুরঃ।
গন্তুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে সর্বে সমং প্রস্থিতা
গন্তব্যে সতি জীবিত-প্রিয়সুহৃৎসার্থঃ কথং ত্যজ্যত॥ ৩১৮॥

"বলয়গুলি প্রস্থান করিয়াছে, অজস্র অশ্রুর সহিত প্রিয়সখীরাও গিয়াছে, ক্ষণকালের জন্যও ধৈর্য নাই, চিত্তও পূর্বেই যাইবার জন্য উদ্যত। প্রিয়তম যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলে সকলেই সাথে সাথে চলিল; তাঁহার যাওয়া যদি ঠিকই হয়, তবে প্রাণপ্রিয় সুহৃদের সঙ্গ আর কেন ত্যাগ করা?"

ভাব এবং বাচন-ভঙ্গির দিক্ হইতে এই সব কবিতা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী কালের সমজাতীয় বৈষ্ণব কবিতার স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট স্মরণ হইতে থাকে। এই কাব্য-ধারাই যে পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-সাহিত্যে কিভাবে প্রবাহিত হইয়াছে

তাহা পূর্বরচিত পদ ও পরকালে রচিত পদের তুলনা করিলেই বোঝা যায়। অমরু ব্যতীত ক্ষেমেন্দ্র, 'নলচম্পূ'র ত্রিবিক্রম, দীপক প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবির পার্থিব প্রেমের কবিতা 'পদ্যাবলী'তে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের কবিতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রহণের ভিতরে সমাহর্তা রূপগোস্বামীর যে কিছু কিছু লঘু হস্তাবলেপ ছিল না তাহা বলা যায় না। পদগুলি যাহাতে যেখানে যে প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে সেই স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে যথাসম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া রূপগোস্বামী পদগুলির ভিতরে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অদল-বদল করিয়া দিয়াছেন।[১] সুতরাং মোটামুটিভাবে দেখা যাইতেছে, প্রেমের স্থূলসূক্ষ্ম যতরকমের বর্ণনাই পূর্ববর্তী কবিরা করিয়া গিয়াছেন তাহার কোন কবিতারই পরবর্তী কালে গোপীপ্রেম বা রাধাপ্রেমের বর্ণনারূপে-গৃহীত হইতে কোনওরূপ বাধা ছিল না।

রাধাপ্রেমের যত বিচিত্র এবং বিশদ বর্ণনা তাহা যে মূলতঃ ভারতীয় প্রেম-কবিতার প্রবহমান ধারা হইতে গৃহীত এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার অন্য উপায় রহিয়াছে। পূর্ববর্তী কালের সংস্কৃত ও প্রাকৃতে লিখিত ভারতীয় সকল প্রেম-কবিতাগুলির সহিত আমরা পরবর্তী কালের রাধা-প্রেমের অসংখ্য কবিতার যদি তুলনা করি তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, ভারতীয় সাধারণ কাব্যধারা এবং কবিরীতি ও কবি-প্রসিদ্ধিকেই বৈষ্ণব কবিগণ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কবিকর্তৃক লিখিত এইজাতীয় বহু প্রকীর্ণ কবিতা ভারতীয় সংগ্রহগ্রন্থগুলিতে সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা ইহার ভিতরে কয়েকখানিমাত্র প্রসিদ্ধ সংগ্রহগ্রন্থের কিছু কিছু কবিতার সহিত রাধাপ্রেম-অবলম্বনে রচিত কিছু বৈষ্ণব-কবিতার তুলনা করিয়া আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিব।

(ঙ) বৈষ্ণব-প্রেম-কবিতা ও প্রাচীন ভারতীয় প্রেম-কবিতা ধারা

প্রাচীন-ভারতীয় প্রেম-কবিতার ধারাটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে—বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশে—রাধাপ্রেমকে অবলম্বন

১ ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখিত 'পদ্যাবলী'র ভূমিকা (৬২ পৃষ্ঠা) ও পদকারগণ সম্বন্ধে টীকা (১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

করিয়া যে বৈষ্ণব কবিতা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ভিতরে বিবর্তন-জনিত বৈচিত্র্য সুস্পষ্ট এবং স্থানে স্থানে সুরগ্রামের উচ্চতা অবশ্যই লক্ষণীয়, কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষের সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার অভিনবত্ব একান্তভাবে স্বীকার্য নহে। রাধাপ্রেমের মোটামুটি কাঠামটি পূর্ববর্তী প্রেম-কবিতার ভিতর হইতেই গৃহীত হইয়াছে; প্রকাশ-ভঙ্গির ভিতরেও আমরা একই ভারতীয় ধারার অনুসরণ দেখিতে পাই; তবে পূর্ব-রচিত পটভূমির উপরে অধ্যাত্ম-তত্ত্বদৃষ্টির একটা জ্যোতির্ময় দীপ্তি এবং কবি-কল্পনার বর্ণ-শাবল্য তাহাকে আরও স্বচ্ছ করিয়াছে, মহিমান্বিতও করিয়াছে। রাধিকার বয়ঃসন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া তরুণীর প্রেম-চাঞ্চল্য, প্রেমের নিবিড়তা ও গভীরতা, মিলন-বিরহ, মান-অভিমান প্রভৃতি যাহা কিছু বর্ণনা আমরা বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে পাই, পার্থিব নায়িকাকে অবলম্বন করিয়া এইজাতীয় প্রেমের বর্ণনা—এমন কি সেই প্রেমবর্ণনার কলা-কৌশল পর্যন্ত প্রায় সবই আমরা পূর্ববর্তী কাব্য-কবিতার ভিতরে পাই। তবে পূর্ববর্তীরা সম্ভোগকেই প্রধান করিয়া প্রেমকে অনেকস্থানে স্থূল করিয়া ফেলিয়াছেন; আর বৈষ্ণব-কবিগণ বিরহকে প্রধান করিয়া প্রেমের ভিতরে সূক্ষ্মতার ও অতলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বিরহ-অবলম্বনে প্রেমের এই যে সূক্ষ্ম এবং গভীর সুর তাহাই রাধাপ্রেমকে আধ্যাত্মিক লোকে উত্তরণ করাইতে সহায়ক হইয়াছে। বৈষ্ণব-কবিতাকে সাহিত্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাই, পূর্ববর্তী কবিদের বর্ণিত প্রেম হইতে রাধা-প্রেমের যে পার্থক্য তাহা দুইটি কারণে ঘটিয়াছে, প্রথমতঃ একটি তত্ত্ব-দৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রভাব, অপরটি হইল বিরহকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের রূপ হইতে অরূপে—প্রাকৃত মর্ত্যভূমি হইতে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে যাত্রা।

এই প্রাকৃত ভূমি হইতে অপ্রাকৃত ধামে যাত্রা কি ভাবে সুরু হইয়াছে এবং কি ভাবে সাধিত হইয়াছে—অর্থাৎ প্রাকৃত নায়িকাই আসিয়া কি করিয়া রাধা-ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে পূর্ববর্তীদের প্রাকৃত নায়িকার সহিত পরবর্তীদের রাধিকাব যোগ কতখানি সেই কথাটি নানা দিক্ হইতে দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইহা করিতে হইলে প্রাচীন ভারতীয় প্রেম-কবিতার সহিত পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-কবিতার খানিকটা তুলনামূলক আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-ধর্মে ও সাহিত্যে পূর্ববর্তী কালের মানবীয় কবিতা কিভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া রাধিকার সহিত ভারতীয় চিরন্তনী নায়িকার কি যোগ

তাহার খানিকটা আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহাই এ-বিষয়ে আমাদের গাঢ় প্রত্যয় জন্মাইবার পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ নহে। বর্ত্তমান আলোচনায় আমরা পূর্ববর্ত্তী কবিদের প্রেম-কবিতার সহিত ভাবে ও ভাষায় পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিতার কিভাবে যোগ রহিয়াছে তাহারই একটা ধারণা দিবার চেষ্টা করিব।

হালের 'গাহা-সত্তসঈ'র প্রাচীনতা স্বীকৃত বলিয়া সেইখান হইতেই আরম্ভ করা যাক। দীর্ঘবিরহিণী নায়িকাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,

> ণইউরসচ্ছহে জোব্বণম্মি অইপবসিএসু দিঅসেসু।
> অণিঅত্তাসু অ রাঈসু পুত্তি কিং দড্ঢমাণেণ॥ ১।৪৫

নদী-জলের উদ্বেলতার মত হইল নারীর যৌবন; দিনগুলি চিরকালের জন্য চলিয়া যাইতেছে, রাত্রিও আর ফিরিবে না, এই অবস্থায় এই পোড়া মান দিয়া আর কি হইবে? এই পদটির সহিত তুলনা করুন চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ পদ—

> কাল বলি কালা গেল মধুপুরে
> সে কালের কত বাকি।
> যৌবন-সায়রে সরিতেছে ভাটা
> তাহারে কেমনে রাখি॥
> জোয়ারের পানী নারীর যৌবন
> গেলে না ফিরিবে আর।
> জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
> যৌবন মিলন ভার॥

দূরপ্রবাসী প্রিয় বহুদিন পরে ফিরিয়া আসিলে তাহার প্রেয়সী তাহাকে কিভাবে মঙ্গলানুষ্ঠানের দ্বারা অভ্যর্থনা জানাইবে তাহার বর্ণনায় দেখি—

> রথাপইণ্ণণঅণুপ্পলা তুমং সা পড়িচ্ছএ এন্তম্।
> দারণিহিএহিঁ দোহিঁ বি মঙ্গলকলসেহিঁ ব থণেহিঁ॥ ২।৪০

তোমাকে আসিতে দেখিয়া সে সকল মঙ্গল আয়োজন করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে; তাহার নয়নোৎপলের দ্বারা সে তোমার আগমন-পথ প্রকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, আর তাহার দুইটি স্তনকে দ্বারনিহিত দুইটি মঙ্গল-কলস করিয়া রাখিয়াছে। ঠিক অনুরূপ একটি শ্লোক ত্রিবিক্রমভট্ট রচিত বলিয়া শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে ধৃত হইয়াছে—

> কিঞ্চিৎকম্পিতপাণিকঙ্কণরবৈঃ পৃষ্টং নমু স্বাগতং
> ব্রীড়ানম্রমুখাজয়া চরণয়োর্ন্যস্তে চ নেত্রোৎপলে।

দ্বারস্থস্তনযুগ্মমঙ্গলঘটে দত্তঃ প্রবেশো হৃদি
স্বামিন্ কিং ন তবাতিথেঃ সমুচিতং সখ্যানয়ানুষ্ঠিতম্॥ (৩৫৩০)[1]

'অমরুশতকে'ও রহিয়াছে—

দীর্ঘা চন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ
পুষ্পানাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ।
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরযুগেনার্ঘ্যো ন কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্॥

ইহার সহিত তুলনা করিতে পারি বিদ্যাপতির পদ,—

পিয়া জব আওব ই মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহু করব নিজ দেহে॥
কনআ কুম্ভ করি কুচজুগ রাখি।
দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি॥ ইত্যাদি [2]

প্রবাসী প্রিয়ের জন্য নায়িকা দিন গণিবে; কিন্তু প্রেমের আতিশয্যে প্রিয় আজ গিয়াছে, আজ গিয়াছে এইরূপ গণনা করিতে গিয়া দিবসের প্রথমার্ধেই বিরহিণী রেখায় রেখায় দেয়ালটিকে চিত্রিত করিয়া দিয়াছে।—

অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি গণরীএ।
পঢম ব্বিঅ দিঅহদ্ধে কুড্ডো রেহাহিঁ চিত্তলিও॥ ৩।৮

ইহার সহিত তুলনীয় বিদ্যাপতির পদ—

কালিক অবধি করিঅ পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল॥
ভেল প্রভাত কহত সবহিঁ।
কহ কহ সজনি কালি কবহিঁ॥[3]

১ ..

যৌবনশিল্পি-সুকল্পিত-নূতন-তনুবেশ্ম বিশতি রতিনাথে।
লাবণ্যপল্লবাঙ্কৌ মঙ্গলকলসৌ স্তনাবস্যাঃ॥—কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ঃ, ১৫৪

২ ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত সংস্করণ।

৩ তুলনীয়ঃ

অবনত বয়নে হেরত গীম।
খিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন॥

আবার, পদ-অঙ্গুলি দেই খিতিপর লেখই
পাণি কপল-অবলম্ব॥

বিরহে দিবসগণনার আর একটি পদে পাইতেছি,—

হত্থেসু অ পাএসু অ অঙ্গুলিগণণাই অইগআ দিঅহা।
এণ্হিং উণ কেণ গণিজ্জউ ত্তি ভণিউ রুঅই মুদ্ধা ॥ ৪।৭

হাতের এবং পায়ের আঙুল দিবস গণিতে গণিতে শেষ হইয়াছে, এখন আর কিভাবে দিবস গণিবে এই কথা বলিয়া মুগ্ধা কাঁদিতেছে। এই প্রিয়-বিরহের দিবস-গণনা প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণব কবির পদেই নানাভাবে পাই। বিদ্যাপতির রাধা বলিয়াছে—

কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়াওল
বিছুরল গোকুল নাম ॥

আবার – এখন-তখন করি দিবস গমাওল
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গমাওল
ছোঁড়লু জীবন আশা ॥ ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের পদে আছে—

আসিবার আশে লিখিনু দিবসে
খোয়াইনু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু' আঁখি হইল অন্ধ ॥

এই ভাবটি জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির বহু পদেও পাওয়া যায়।

জ্ঞানদাসের একটি প্রসিদ্ধ পদে দেখিতে পাই, প্রেমের এক প্রকারের দেহবিকার ঢাকিতে গেলে অন্য বিকার আসিয়া বিপদ ঘটায়।—

গুরু গরবিত মাঝে থাকি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি অনেকেরই এই জাতীয় পদ আছে। যথা—

চণ্ডীদাস— গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥

পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ভরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল।

বিদ্যাপতি— ধসমস করএ রহওঁ হিয় জাতি।
সাগর সরীর ধরএ কত ভাঁতি ॥
গোপহি ন পারিঅ হৃদয়-উলাস।
মুনলাহু বদন বেকত হো হাস ॥ ইত্যাদি। (৩৩১)।

'গাহা-সত্তসঈ'র নায়িকাও বলিতেছে—

অচ্ছীইঁ তা থইস্সং দোহিঁ বি হত্থেহিঁ বি তস্সিং দিট্‌ঠে।
অঙ্গং কলম্বকুসুমং ব পুলইঅং কহঁ ণু ঢক্কিস্সম্ ॥ ৪।১৪

তাহাকে দেখিলে চক্ষু দুইটি না হয় দুইহাতে ঢাকিয়া রাখিব, কিন্তু কদম্ব-কুসুমের স্তায় পুলকিত অঙ্গকে কি করিয়া ঢাকিয়া রাখিব ?

অমরুশতকেও দেখি—

ভ্রূভঙ্গে রচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে
কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনূরোমাঞ্চমালম্বতে।
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্ জনে ॥

আমরা জানি—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করু পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥

প্রভৃতি গোবিন্দদাসের একটি প্রসিদ্ধ অভিসারের পদ। এখানে দেখি অভিসারের জন্ম রাধার সারারাত জাগিয়া সাধনা।

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর-পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥

ইহার প্রাকৃরূপ প্রথম দেখি—

অজ্জ মএ গন্তব্বং ঘণন্ধআরে বি তস্স সুহঅস্স।
অজ্জা ণিমীলিঅচ্ছী পঅপরিবাডিং ঘরে কুণই ॥ ৩।৪৯

"আজ আমাকে ঘন অন্ধকারে সেই কান্তের অভিসারে যাইতে হইবে, এই

ভাবিয়া সেই বয়নাগরী নিমীলিতাক্ষী হইয়া নিজের ঘরেই পদপরিপাটি করিতেছে।" ইহার দ্বিতীয় রূপ দেখিতে পাই 'কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ে' উদ্ধৃত একটি কবিতার ভিতরে।[১]—

মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দসংচারকং
গন্তব্যা দয়িতস্য মেঽস্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।
আজানূদ্ধৃতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছ্রাল্লব্ধপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি ॥ ৫১৯

"পঙ্কিল পথে মেঘান্ধতমসার ভিতরে নিঃশব্দ-সঞ্চরণে আজ আমাকে দয়িতের বাসস্থানে যাইতে হইবে ; এইরূপ মতি করিয়া এক মুগ্ধা রমণী নূপুরকে জানু পর্যন্ত উঠাইয়া লইয়া, নয়নযুগল করতলে ভাল করিয়া আচ্ছাদিত করিয়া অতিকষ্টে পদস্থিতি লাভ করিয়া নিজের ঘরেই পথের অভ্যাস করিতেছে।"

আর একটি শ্লোকে দেখি—

পেচ্ছই অলদ্ধলকৃখং দীহং ণীসসই সুণ্ণঅং হসই
জহ জম্পই অফুডত্থং তহ সে হিঅঅট্ঠিঅং কিং পি ॥ ৩।৯৬

"শূন্য দৃষ্টিতে বা লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে বার বার চাহিতেছে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, শূন্যের দিকে তাকাইয়া হাসিতেছে; অস্ফুটার্থ কথা বলিতেছে ; এই সকল দেখিয়া মনে হয়, নিশ্চয়ই উহার হৃদয়ে কিছু রহিয়াছে।" এই কবিতার সহিত নব অনুরাগে অনুরাগিণী বিকলা রাধার প্রতি সখীদের উক্তির যে সকল কবিতা রহিয়াছে তাহার মিল আর তুলিয়া দেখাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। পদটি রাধাপ্রেমের একটি উচ্চভাবের কবিতা বলিয়া প্রকাশ করিলে এ বিষয়ে অন্যথা চিন্তা করিবার আর কোন অবকাশ থাকে না।

একটি পদে আছে,—

পত্তনিঅম্বপ্ফংসা ণ্হাণুত্তিণ্ণাএ সামলঙ্গীএ।
জলবিন্দুএহিঁ চিহুরা রুঅন্তি বন্ধস্স ব ভএণ ॥ ৬।৫৫

"স্নানোত্তীর্ণা শ্যামলাঙ্গীর প্রাপ্তনিতম্বস্পর্শ চিকুরগুলি পুনরায় বন্ধন-ভয়ের জন্যই যেন জলবিন্দু দ্বারা রোদন করিতেছে।" এই পদের সহিত বিদ্যাপতির 'জাইত পেখল নহাএলি গোরী' বা 'কামিনি পেখল সনানক বেলা' প্রভৃতি পদ স্মরণ করা যাইতে পারে।

১ পদটি পরবর্তী বহু সংগ্রহগ্রন্থেও স্থান পাইয়াছে

মগ্‌গং চ্চিঅ অলহস্তো হারো পীণুগ্ধআণঁ থণআণম্‌।
উব্বিগ্‌গো ভমই উরে জমুণাণইফেণপুঞ্জো ব্ব ॥ ৭।৬৯

"পীনোন্নত স্তনযুগলের পথ লাভ করিতে না পারিয়া হার যমুনা নদীর ফেন-পুঞ্জের ন্যায় বুকের উপর যেন উদ্বিগ্ন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।" ইহার সহিত বিদ্যাপতির—

পীন পয়োধর অপরূপ সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার ॥

অথবা বড়ু চণ্ডীদাসের—

গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচ যুগল উপরে।
হঞাঁ সমান আকারে সুরেশ্বরী দুঈঁ ধারে
পড়ে যেন সুমেরু শিখরে ॥

প্রভৃতি স্মরণ করা যাইতে পারে।

দুর্জয়মানহেতু নায়ককে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অথচ পশ্চাত্তাপ ভোগ করিতেছে এমন নায়িকার প্রতি সখীর উক্তি পাইতেছি,—

পাঅপডিও ণ গণিও পিঅং ভণন্তো বি অপ্পিঅং ভণিও।
বচ্চন্তো বি ণ রুদ্ধো ভণ কস্‌স কএ কও মাণো ॥ ৫।৩২

"পাদপতিত হইলেও তাহাকে গণনা কর নাই, সে প্রিয় বলিলে তুমি তাহাকে অপ্রিয় বলিয়াছ; সে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেও তাহাকে রোধ কর নাই; বল কাহার জন্য তুমি মান করিয়াছিলে?"

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'ও এই ভাবের অক্ষর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।[১]

কর্ণে যন্ন কৃতং সখীজনবচো যন্নাদৃতা বন্ধুবাগ্‌
যৎপাদে নিপতন্নপি প্রিয়তমঃ কর্ণোৎপলেনাহতঃ।
তেনেন্দুর্দহনায়তে মলয়জালেপঃ স্ফুলিঙ্গায়তে
রাত্রিঃ কল্পশতায়তে বিসলতাহারো ঽপি ভারায়তে ॥ ৪১৫

১ শ্লোকটি 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত।

"(দুর্জয়মানহেতু) সখীজনের বচন কানে করিলে না, বান্ধবগণকে অবজ্ঞা করিলে, প্রিয়তম পদে নিপতিত হইলে কর্ণোৎপলের দ্বারা তাহাকে আহত করিলে ; সেই জন্যই এখন চন্দ্র দহনের কারণ হইতেছে, চন্দনের প্রলেপ স্ফুলিঙ্গের মত লাগিতেছে, রাত্রি শতকল্পের মত লাগিতেছে এবং মৃণালহারও ভারী বোধ হইতেছে।" ইহার সহিত আমরা তুলনা করিতে পারি রূপগোস্বামীর কবিতা—

কর্ণান্তে ন কৃতা প্রিয়োক্তিরচনা ক্ষিপ্তং ময়া দূরতো
মল্লীদাম নিকামপথ্যবচসে সখ্যৈ রুষঃ কল্পিতাঃ।
ক্ষৌণীলগ্নশিখণ্ডিশেখরমসৌ নাভ্যর্থয়ন্নীক্ষিতঃ
স্বান্তং হন্ত মমাদ্য তেন খদিরাঙ্গারেণ দন্দহ্যতে॥

বিদগ্ধ-মাধব নাটক, ৫ম অঙ্ক।

দুর্জয়মানে যে রাধা পদানত অনুনয়ী কৃষ্ণকে বক্র ভ্রূক্ষেপে ভৎ'সনাদ্বারা প্রত্যাখ্যাত করিয়াছে, অথচ প্রত্যাখ্যাত প্রিয়ের জন্য সখীগণের নিকটে পশ্চাত্তাপ প্রকাশ করিতেছে, তাহার প্রতি এইজাতীয় উক্তি বৈষ্ণব-কবিতার ভিতরে বহু ভাবেই পাওয়া যায়। অমরু-কবি রচিত ঠিক এই জাতীয় একটি কবিতাকেই 'পদ্যাবলী'তে রূপগোস্বামী 'কলহান্তরিতা রাধার প্রতি দক্ষিণসখী-বাক্য' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পদটি এই—

অনালোচ্য প্রেম্নঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ-
স্ত্বয়া কান্তে মানঃ কিমিতিসরলে প্রেয়সি কৃতঃ।
সমাশ্লিষ্টা হ্যেতে বিরহদহনোদ্ভাসুরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ॥ ২৩০

"হে সরলে, প্রেমের পরিণতি আলোচনা না করিয়া, সুহৃদ্‌গণকে অনাদর করিয়া প্রিয় কান্তের উপরে কেন মান করিয়াছিলে? তুমি স্বহস্তে এই বিরহাগ্নিতে-উদ্দীপ্তশিখ অঙ্গারকে আলিঙ্গন করিয়াছ, এখন অরণ্যরোদন করিয়া কি ফল হইবে?" পদটি 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়,' 'সদুক্তিকর্ণামৃত,' 'সুভাষিতাবলী,' 'সূক্তি-মুক্তাবলী' প্রভৃতি বহু সংগ্রহগ্রন্থে 'মানিনী' সম্বন্ধে পদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর সহ স্থান পাইয়াছে।

উপরে যে গাথাগুলি লইয়া আলোচনা করিলাম ইহা ব্যতীতও এই 'গাহা-সত্তসঈ'-তে এমন অনেক গাথা পাওয়া যায় যাহাকে স্পষ্টভাবে কোন বিশেষ বৈষ্ণব কবিতার সহিত যুক্ত করিতে না পারিলেও তাহাদের দ্বারা অস্পষ্টভাবে

অনেক বৈষ্ণব কবিতার স্মরণ হয় এবং এই কবিতাগুলির সহিত বৈষ্ণব কবিতার একটা সাজাত্য বেশ লক্ষ্য করা যায়। একটি গাথায় আছে—

ণ মুঅন্তি দীহসাসং ণ রুঅন্তি চিরং ণ হোন্তি কিসিআও।
ধন্নাও তাওঁ জাণং বহুবল্লহ বল্লহো ণ তুমম্॥ ২।৪৭

"দীর্ঘশ্বাসও ফেলে না, দীর্ঘকাল কাঁদেও না, কৃশাও হয় না, সেই সব ধন্যা (নারী)—যাহাদের, হে বহুবল্লভ, তুমি বল্লভ নও।" এ পদটি বিরহিণী গোপীদের মুখে বহুবল্লভ কৃষ্ণের প্রতি অতি চমৎকার মানায়। বসন্তকাল অপেক্ষা বর্ষাকালই বিরহিণীর বেদনাকে তীব্রতর করিয়া দেয়; তাই এই প্রোষিতভর্তৃকা নারী বলিতেছে,—

সহি দুম্মেন্তি কলম্বাইং জহ মং তহ ণ সেসকুসুমাইং। ২।৭৭

"হে সখি, (এই বর্ষাকালের) কদম্বফুলগুলি আমাকে যেমন করিয়া বেদনা দেয় অন্য (বসন্তপ্রভৃতিতে প্রস্ফুটিত) কোন ফুলই তেমন করিয়া ব্যথিত করে না।"

আর একটি গাথায় এক দূতী নায়িকার পক্ষ হইতে নায়কের নিকটেই গিয়াছে, অথচ নায়কের সহিত তেমন যেন কোন প্রয়োজন নাই, প্রসঙ্গচ্ছলেই যেন একটা সংবাদমাত্র দিয়া যাইতেছে, এমনই ভান করিয়া বলিতেছে—

ণাহং দুঈ ণ তুমং পিও ত্তি কো অহ্ম এথ বাবারো।
সা মরই তুজ্ঝ অঅসো তেণ অ ধম্মকৃখরং ভণিমো॥ ২।৭৮

"আমি দূতী নই, তুমিও কোন প্রিয় নও, সুতরাং তোমার সঙ্গে এখানে আমার কি ব্যাপার? তবে সে মরিতেছে, তোমার নিন্দা হইবে, সুতরাং ধর্মের জন্য কথা বলিতেছি।" এই দূতী চাতুর্যে এবং মাধুর্যে পরবর্তী কালের বৃন্দাবন-লীলার রসিকা এবং চতুরা বৃন্দা, ললিতা প্রভৃতি দূতীগণকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। অপর একটি চতুরা দূতীকে বলিতে দেখি—

মহিলাসহস্সভরিএ তুহ হিঅএ সুহঅ সা অমাঅন্তী।
দিঅহং অণন্নকম্মা অঙ্গং তণুঅং পি তনুএই॥ ২।৮২

"ওগো ভাগ্যবান্, সহস্র মহিলাদ্বারা পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে তোমার হৃদয়; সে (তোমার প্রেয়সী নায়িকা) আর সেখানে স্থান লাভ করিতে না পারিয়া সমস্ত দিবসে অনন্যকর্মা হইয়া তনু অঙ্গকে আরও তনু করিতেছে।"

আর একটি গাথায় আবার নায়ক বলিতেছে—

আঅম্বন্তকবোলং খলিঅকৃখরজম্পিরিং ফুরন্তোট্‌ঠিম্।
মা ছিবসু ত্তি সরোসং সমোসরন্তিং পিঅং ভরিমো॥ ২॥৯২

"আতাম্রাস্তঃকপোলা স্খলিতাক্ষরজল্পনশীলা স্ফুরদোষ্ঠ—'আমাকে ছুঁইও না' বলিয়া সরোষে সরিয়া যাইতেছে—এমন প্রিয়াকে আমি স্মরণ করিতেছি।" এই স্মরণের সহিত পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে বর্ণিত খণ্ডিতা রাধার মূর্তিখানিও একবার স্মরণ করুন।

দুঃসহ বিরহ-বেদনায় ক্লিষ্টা এক নায়িকা বলিতেছে—

জম্মন্তরে বি চলণং জীএণ খু মঅণ তুজ্ঝ অচ্চিসৃসম্।
জই তং পি তেণ বাণেণ বিজ্ঝসে জেণ হং বিদ্ধা ॥ ৫।৪১

"হে মদন, জন্মান্তরেও আমি আমার জীবন দিয়া তোমার অর্চনা করিতে প্রস্তুত আছি, যদি তোমার যে বাণের দ্বারা আমি বিদ্ধ হইয়াছি তুমি তাহাকেও (আমার প্রিয়কেও) সেই বাণ দিয়া বিদ্ধ কর।" আমরা পরবর্তী কালের চণ্ডীদাসের রাধার একটা আভাস ইহার ভিতরেই লাভ করিতে পারি। চণ্ডীদাসসুলভ সুর আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে আর দু'একটি গাথায়—

বিরহেণ মন্দরেণ ব হিঅঅং দুদ্ধোঅহিং ব মহিউণ।
উম্মুলিআই অব্বো অহ্মং রঅণাই ব সুহাইং ॥৫।৭৫

"মন্দর যেমন ক্ষীরাব্ধি মন্থন করিয়া রত্নসকল নিষ্কাশিত করিয়াছিল, হায়! তেমনই বিরহও হৃদয় মন্থন করিয়া আমার সমস্ত সুখ উৎপাটিত করিয়াছে।"

কিং রুবসি কিং অ সোঅসি কিং কুপ্পসি সুঅণু একমেক্কস্স।
পেম্মং বিসং ব বিসমং সাহসু কো রুন্ধিউং তরই ॥৬।১৬

"কেন কাঁদিতেছ, কেন শোক করিতেছ, কেনই বা হে সুতনু, সকলের উপরে করিতেছ কোপ? বিষের মত বিষম প্রেম, বল কে তাহা রোধ করিতে সমর্থ হয়।"

আমরা পূর্বে 'গাহা-সত্তসঈ' হইতে রাধা ও গোপীগণ লইয়া কৃষ্ণপ্রেমের যে কয়েকটি পদ উদ্ধার করিয়াছি সেই পদগুলি উপরে আলোচিত প্রেম-গাথাগুলির সহিত একসঙ্গেই স্থান পাইয়াছে। উপরের গাথাগুলির প্রকৃতি বিচার করিলে মনে হয়, জিনিসটি সঙ্গতই হইয়াছে। অধিকাংশ গাথাই এমন এক ধর্মের এবং এক ধরণের যে রাধা-কৃষ্ণের উল্লেখ থাকা-না-থাকা লইয়া তাহাদের ভিতরে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা ছাড়া আকারে-প্রকারে আর কোনও মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা সর্বত্র সহজ নয়। পরবর্তী কালের সংগৃহীত 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' ছন্দোগ্রন্থে যে প্রাকৃত গাথার উদ্ধৃতি দেখি তাহার বহুশ্লোকের সহিতও পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-কবিতার বর্ণনার মিল এবং সুরের মিল আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। যেমন :—

ফুল্লা ণীবা ভম ভমরা দিট্‌ঠা মেহা জলে সমলা।
ণচ্চে বিজ্জু পিঅ সহিআ আবে কংতা কহু কহিআ॥

"নীপগুলি পুষ্পিতা, জলশ্যামল মেঘগুলি ঘুরিয়া-বেড়ানো ভ্রমরের মত দেখা যাইতেছে, বিজলী নৃত্য করিতেছে; হে প্রিয়সখি, আমার কান্ত কবে আসিবে?"[১]

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' হইতে আরম্ভ করিয়া, 'সুভাষিতাবলী', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'সূক্তিমুক্তাবলী' বা 'সুভাষিত-মুক্তাবলী,' 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি', 'সূক্তিরত্নহার' প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থগুলিতে আমরা বয়ঃসন্ধি-বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমের প্রায় সব অবস্থার বিবিধ বর্ণনা পাইয়া থাকি। এক 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'ই আমরা নারীসৌন্দর্য এবং নারীপ্রেমকে অবলম্বন করিয়া 'শৃঙ্গারপ্রবাহের যে বীচিসমূহ' প্রাপ্ত হই তাহা লক্ষণীয়। এখানে আমরা এই বয়ঃসন্ধি, কিঞ্চিদুপারূঢ়-যৌবনা, মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, নবোঢ়া, বিস্রব্ধনবোঢ়া, কুলস্ত্রী (স্বকীয়া), অসতী(পরকীয়া), খণ্ডিতা, অন্যরতিচিহ্নদুঃখিতা, বিরহিণী, দূতীবচন, তদ্দূতাখ্যান, উদ্বেগকথন, বাসকসজ্জা, স্বাধীনভর্তৃকা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, গোত্রস্খলিতা, মানিনী (উদাত্ত মানিনী, অনুরক্ত মানিনী) প্রবসদ্ভর্তৃকা, প্রোষিতভর্তৃকা, অভিসারিকা (দিবাভিসারিকা, তিমিরাভিসারিকা, জ্যোৎস্নাভিসারিকা, দুর্দিনাভিসারিকা) প্রভৃতি সম্বন্ধে রচিত বহু শ্লোক পাইতেছি। এই শ্লোকগুলির সহিত বৈষ্ণব কবিতাগুলি মিলাইয়া পড়িলেই আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য পরিলক্ষিত হইবে। সমস্ত বিষয় লইয়া বিস্তারিত তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ এবং প্রয়োজনও আমাদের নাই; সুতরাং বাছিয়া বাছিয়া কিছু কিছু বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

'সদুক্তিকর্ণামৃতে' রাজশেখর-কৃত[২] একটি শ্লোকে উদ্ভিন্নযৌবনা নারীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে,—

১ বর্ণবৃত্তম্, ৮১। তুলনীয়:—

গজ্জে মেহা ণীলা কারউ
সদ্দে মোরউ উচ্চা রাবা।
ঠামা ঠামা বিজ্জু রেহউ
পিংগা দেহউ কিজ্জে হারা॥

ফুল্লা ণীবা পীবে ভমরু দকৃখা মারুঅ বীঅংতাএ।
হংহো হংজে কাহা কিজ্জউ আও পাউস কীলংতাএ॥ ঐ—১৮১

আরও তুলনীয়, ঐ, ৮৯; ১৪৪ ইত্যাদি।

২ শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে (পিটার পিটারসন্ সম্পাদিত) কবির নাম নাই (৩২৮২)।

পদ্ভ্যাং মুক্তাস্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাং
শ্রোণীবিম্বং ত্যজতি তনুতাং সেবতে মধ্যভাগঃ।
ধত্তে বক্ষঃ কুচসচিবতামদ্বিতীয়ং চ বক্ত্রং
তদ্গাত্রাণাং গুণ-বিনিময়ঃ কল্পিতো যৌবনেন॥ ২।২।৪

"পদযুগল চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়াছে, লোচনদ্বয় তাহার আশ্রয় লইয়াছে; শ্রোণীবিম্ব তনুতা ত্যাগ করিয়াছে, মধ্যভাগ (কটিদেশ) এখন তাহাকে সেবা করিতেছে; বুক এখন (মুখকে ত্যাগ করিয়া) কুচযুগের সচিবতা গ্রহণ করিয়াছে, ফলে মুখ এখন অদ্বিতীয় (পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়, আবার স্ব-মহিমায়ই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দ্বিতীয়বিরহিতভাবেও অদ্বিতীয়)। এইভাবে যৌবন আসিয়া তাহার গাত্রসকলের গুণবিনিময় করিয়া দিয়াছে।" শতানন্দের আর একটি শ্লোক দেখি—

গতে বাল্যে চেতঃ কুসুমধনুষা সায়কহতং
ভয়াদ্বীক্ষ্যেবাস্যাঃ স্তনযুগমভূন্নির্জিগমিষু।
সকম্পা ভ্রূবল্লী চলতি নয়নং কর্ণকুহরং
কৃশং মধ্যং ভুগ্না বলিরলসিতঃ শ্রোণিফলকঃ॥ ২।২।৫

"বাল্য গত হইলে চিত্ত কুসুমধনু (মদনের) দ্বারা সায়কহত হইয়াছে; ইহা দেখিয়া ইহার স্তনযুগ ভয়েই যেন নির্গত বা নিক্রান্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে, ভয়ে ভ্রূবল্লী কম্পিত হইতেছে, নয়ন কর্ণকুহরের দিকে চলিতেছে, মধ্যভাগ কৃশ হইয়া গিয়াছে, বলি বক্রতা লাভ করিয়াছে, নিতম্বযুগল অবসন্ন হইয়াছে।"

এই পদগুলির সহিত বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির কবিতা—

সৈসব জৌবন দরসন ভেল।
দুহু পথ হেরইত মনসিজ গেল॥
মদনক ভাব পহিল পরচার।
ভিন জন দেল ভীন অধিকার॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একক খীন অওক অবলম্ব॥
চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতল জাব॥

অথবা— দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন॥

আবে মদন বঢ়াওল দীঠ।
সৈসব সকলি চমকি দেল পীঠ॥
সৈসব ছোড়ল সসিমুখি দেহ।
খত দেই ভেজল ত্রিবলি তিন রেহ॥

অথবা,— সৈসব জোবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবনক পথ দুহু লোচন লেল॥

প্রভৃতির তুলনা করিয়া দেখুন। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির কবিতায় রাধার শৈশবের পর যৌবনের প্রথম আগমনে যত শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনের বর্ণনা রহিয়াছে তাহার অনেক জিনিসই টুকরা টুকরা হইয়া ছড়াইয়া আছে সংগ্রহ-গ্রন্থগুলির বয়ঃসন্ধি এবং 'তরুণী' বর্ণনার শ্লোকগুলির ভিতরে।[১]

১ তুঃ ভ্রুবোঃ কাচিল্লীলা পরিণতিরপূর্বা নয়নযোঃ
স্তনাভোগো ঽব্যক্তস্তরুণিমসমারম্ভসময়ে।
বীযমিত্র (কবীন্দ্রবঃ), সদুক্তিকঃ (রাজোক)।
... ... ভ্রূ লাস্যযোগ্যাগ্রহঃ।
তির্যগ্ লোচনচেষ্টিতানি বচসি চ্ছেকোক্তিসংক্রান্তয়ঃ ইত্যাদি।
কবীন্দ্রবঃ।
তথাপি প্রাগল্ভ্যং কিমপি চতুরং লোচনযুগে। কবীন্দ্রবঃ
লীলাস্খলচ্চরণচারুগতাগতানি
তির্যগ্বিবর্তিতবিলোচনবীক্ষিতানি।
বামভ্রুবাং মৃদু চ মঞ্জু চ ভাষিতানি
নির্মায়মায়ুধমিদং মকরধ্বজস্য॥ কবীন্দ্রব°
অপ্রকটবর্তিতস্তনমণ্ডলিকানিভৃতচক্রদশিন্যঃ।
আবেশয়ন্তি হৃদয়ং স্মরচর্যাগুপ্তযোগিন্যঃ॥
গোসোক (সদুক্তিকঃ)।
অহমহমিকাবদ্ধোৎসাহং রতোৎসবশংসিনি
প্রসরতি-মুহুঃ প্রৌঢ়স্ত্রীণাং কথামৃতদুর্দিনে।
কলিতপুলকা সদ্যঃ স্তোকোদ্গতস্তনকোরকে
বলয়তি শনৈর্বালা বক্ষস্থলে তরলাং দৃশম্॥
ধর্মাশোক দত্ত (সদুক্তিকঃ)
এই প্রসঙ্গে 'সূক্তিমুক্তাবলী'-ধৃত 'বয়ঃসন্ধি-পদ্ধতি' ও 'তারুণ্য-পদ্ধতি' দ্রষ্টব্য।

তরুণী নারীর একটি চমৎকার বর্ণনা পাইতেছি একটি পদে,—

> দৃষ্টা কাঞ্চনযষ্টিরদ্য নগরোপান্তে ভ্রমন্তী ময়া
> তস্যামদ্ভুতমেকপদ্মমনিশং প্রোৎফুল্লমালোকিতম্।
> তত্রোভৌ মধুপৌ তথোপরি তয়োরেকো হ্যষ্টমীচন্দ্রমা-
> স্তস্যাগ্রে পরিপুঞ্জিতেন তমসা নক্তংদিবং স্থীয়তে ॥ ২।৪।২

কাঞ্চনবর্ণা নবযৌবনা তরুণী কাঞ্চনযষ্টির ন্যায় নগরোপান্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আজ দেখিয়া আসিলাম। তাহার একটি অদ্ভুত পদ্ম (মুখপদ্ম) রহিয়াছে, তাহা কখনও নিমীলিত হয় না, সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত। তাহাতে রহিয়াছে দুইটি ভ্রমর (দুইটি চক্ষু), তাহার উপরে রহিয়াছে পরিপুঞ্জিত অন্ধকার (কাল কেশজাল)—সে অন্ধকার দিনরাত্রিই অবস্থিত আছে। নায়িকার এই বর্ণনার সহিত আমরা বৈষ্ণব কবিতার শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ অবলম্বনে রাধার বর্ণনাগুলি বেশ মিলাইয়া লইতে পারি।[1]

মুগ্ধা নায়িকার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

> বারংবারমনেকধা সখি ময়া চূতদ্রুমাণাং বনে
> পীতঃ কর্ণদরীপ্রণালবলিতঃ পুংস্কোকিলানাং ধ্বনিঃ।
> তস্মিন্নদ্য পুনঃ শ্রুতিপ্রণয়িনি প্রত্যঙ্গমুৎকম্পিতং
> তাপশ্চেতসি নেত্রয়োস্তরলতা কস্মাদকস্মান্মম ॥[2]

"বারংবার আমি সখি, বহুভাবে আম্রতরুর বনে কর্ণগহ্বর পথে কোকিলের ধ্বনি পান করিয়াছি; আজ সেই ধ্বনি কানে পৌঁছিতেই কেন অকস্মাৎ আমার প্রত্যঙ্গ উৎকম্পিত হইতেছে, চিত্তে তাপ জন্মিতেছে, নেত্রযুগলের তরলতা দেখা দিয়াছে?"

১ এই প্রসঙ্গে রাধিকার রূপবর্ণনায় যে সকল উপমাদি দেওয়া হয় তাহার সহিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির তুলনা করা যাইতে পারে।

> লাবণ্যসিন্ধুরপরৈব হি কেয়মত্র
> যত্রোৎপলানি শশিনা সহ সংপ্লবন্তে।
> উন্মজ্জতি দ্বিরদকুম্ভতটী চ যত্র
> যত্রাপরে কদলকাণ্ডমৃণালদণ্ডাঃ ॥ সদুক্তিক: (বিকটনিতম্বায়াঃ) ২।৪।৪

২ সদুক্তিক:, ২।৫।১

ইহারই যেন আবার প্রত্যুক্তি দেখিতে পাই অমরুর একটি শ্লোকে সখী-বচনের ভিতরে।—

অলসবলিতৈঃ প্রেমার্দ্রার্দ্রৈর্মুহুর্মুকুলীকৃতৈঃ
ক্ষণমভিমুখৈর্লজ্জালোলৈর্নিমেষপরাঙ্মুখৈঃ।
হৃদয়নিহিতং ভাবাকূতং বমদ্ভিরিবেক্ষণৈঃ
কথয় সুকৃতী কোঽয়ং মুগ্ধে ত্বয়াদ্য বিলোক্যতে॥[১]

"তোমার এই চাহনির দ্বারা—যে চাহনি আলস্য মাখা, প্রেমনীরে সিঞ্চিত, পলে পলে মুকুলীকৃত, ক্ষণে ক্ষণে অভিমুখে লজ্জাচঞ্চলভাবে প্রসারিত, পলকবিহীন, এবং যে চাহনি তোমার হৃদয়নিহিত ভাবাকূতি উদ্‌গিরণ করিতেছে—এই চাহনিতে, বল কোন্ সে সুকৃতী যাহাকে আজ তুমি বার বার দেখিতেছ।"

অমরসিংহের নামে ধৃত একটি শ্লোকে আছে,—

কুচৌ ধত্তঃ কম্পং নিপততি কপোলঃ করতলে
নিকামং নিঃশ্বাসঃ সরলমলকং তাণ্ডবয়তি।
দৃশঃ সামর্থ্যানি স্থগয়তি মুহুর্বাষ্পসলিলং
প্রপঞ্চোঽয়ং কিঞ্চিত্তব সখি হৃদিস্থং কথয়তি॥[২]

"তোমার কুচযুগ কম্পিত হইতেছে, কপোল করতলে নিপতিত হইতেছে, নিঃশ্বাস বায়ু সরল অলককে প্রবলভাবে সঞ্চালিত করিতেছে, মুহুর্মুহুঃ বাষ্পসলিল তোমার দৃষ্টিশক্তিকে নিরুদ্ধ করিতেছে, এই সকল প্রপঞ্চ, হে সখি, তোমার হৃদয়স্থিত (ভাবকেই) বলিয়া দিতেছে।"

ইহার সহিত আমরা আরও তুলনা করিতে পারি,—

শ্বাসেষু প্রথিমা মুখং করতলে গণ্ডস্থলে পাণ্ডিমা
মুদ্রা বাচি বিলোচনে হশ্রুপটলং দেহে চ দাহোদয়ঃ।
এতাবৎকথিতং যদস্তি হৃদয়ে তস্যাঃ কৃশাঙ্গ্যাঃ পুনঃ
তজ্জানাসি নমু ত্বমেব সুভগ শ্লাঘ্যা স্থিতিস্তত্র যা॥[৩]

"তাহার শ্বাসসমূহে দীর্ঘ বিস্তৃতি, মুখ করতলে, গণ্ডস্থলে পাণ্ডিমা, বাক্যে মুদ্রা (অর্থাৎ বাক্য যেন অবরুদ্ধ), চক্ষুতে অশ্রুরাশি, দেহে দাহের উদয়; এই পর্যন্ত ত

১ সূক্তিমুক্তাবলী, সখীপ্রশ্নপদ্ধতি, ৪; শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, ৩৪১৬

২ সদুক্তিক:, ২।২৫।১

৩ সূক্তিমুক্তাবলী, ৪৪।৮

(মুখে) বলিলাম,—সেই কৃশাঙ্গীর হৃদয়ে যাহা আছে, হে সুভগ, তাহা একমাত্র তুমিই জান ; সেখানে (তাহার হৃদয়ে) যাহা আছে তাহাই শ্লাঘ্য।"

'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি'তে উদ্ধৃত একটি শ্লোকে দেখি—

গোপায়ন্তী বিরহজনিতং দুঃখমগ্রে গুরূণাং
কিং ত্বং মুগ্ধে নয়নবিসৃতং বাষ্পপূরং রুণৎসি।
নক্তং নক্তং নয়নসলিলৈরেষ আর্দ্রীকৃতস্তে
শয্যোকান্তঃ কথয়তি দশামাতপে দীয়মানঃ॥[১]

"গুরুগণের অগ্রে বিরহজনিত দুঃখ গোপন করিতে করিতে, হে মুগ্ধে, কেন তুমি নয়নবিগলিত বাষ্পপ্রবাহকে রুদ্ধ করিতেছ? রাত্রিতে রাত্রিতে নয়নসলিলের দ্বারা আর্দ্রীকৃত এই যে তোমার শয্যাপ্রান্ত—যাহা তুমি রৌদ্রে দিয়াছ—তাহাই তোমার দশার কথা বলিয়া দিতেছে।"

এই সকলের সহিত আমরা পূর্বরাগে বিধুরা রাধিকার চিত্রও স্মরণ করিতে পারি।—

নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে সঘন বয়ন অবলম্ব॥
খেনে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক-মুকুলে ভরু অঙ্গ॥

* * *

ভাব কি গোপসি গোপত না রহই।
মরমক বেদন বদন সব কহই॥
যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদগদ শবদে কহসি আধ বোল॥
আন ছলে অঙ্গন আন ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত।
দূরে রহু গৌরব গুরুজন লাজ।
গোবিন্দ দাস কহ পড়ল অকাজ॥

আবার— কি তুহুঁ ভাবসি রহসি একান্ত।
ঝর ঝর লোচনে হেরসি পন্থ॥

১ শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, ১০৯৫

কহ কহ চম্পক-গোরী।
কাঁপসি কাহে সঘন তনু মোড়ি॥
ঘাম কিরণ বিনু ঝামরি অঙ্গ।
না জানিয়ে কাহুক প্রেম-তরঙ্গ॥
জলধর দেখি বহয়ে ঘন শ্বাসে।
বিশোয়াস করু রাধামোহন দাসে॥

অথবা চণ্ডীদাসের পদ :—

এ সখি সুন্দরী কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয়॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়ে উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি॥
মৌন করিয়া তুমি কিবা ভাব মনে।
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে॥ ইত্যাদি।

বলরাম দাসের একটি পদে দেখি :—

শুনইতে কাণহি আনহি শুনত
বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদগদ উত্তর না নিকসই
কহইতে সজল নয়ান॥
সখি হে, কি ভেল এ বরনারী।
করহুঁ কপোল থকিত বহু ঝামরি
জনু ধনহারি জুয়ারি॥
বিছুরল হাস রভস রস-চাতুরী
বাউরি জনু ভেল গোরি।
খনে খনে দীঘ নিশসি তনু মোড়ই
সঘন ভরমে ভেলি ভোরি॥
কাতর-কাতর নয়নে নেহারই
কাতর-কাতর বাণী।
না জানিয়ে কোন দুখে দারুণ বেদন
ঝরঝর এ দুই নয়ানি॥

ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত
ঘন ঘন অধরহিঁ কাঁপ।
বলরাম দাস কহ জানলু জগ মাহ
প্রেমক বিষম সন্তাপ॥

এই পূর্বরাগের বিরহের ভিতরে দেখিতে পাই—

ত্বাং চিন্তাপরিকল্পিতং সুভগ সা সম্ভাব্য রোমাঞ্চিতা
শূন্যালিঙ্গনসঞ্চলদ্ভুজযুগেনাত্মানমালিঙ্গতি।
কিঞ্চান্তর্বিরহব্যথাপ্রশমনীং সংপ্রাপ্য মূর্ছাং চিরাৎ
প্রত্যুজ্জীবতি কর্ণমূলপতিতৈস্তন্নামমন্ত্রাক্ষরৈঃ॥[১]

"হে সুভগ, চিন্তাপরিকল্পিত তোমাকে [উপস্থিত] মনে করিয়া সেই রোমাঞ্চিতা [বালা] শূন্যালিঙ্গনে প্রসারিত হস্ত দ্বারা নিজেকে আলিঙ্গন করে; আরও কি বলিব, অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিরহব্যথাপ্রশমনী মূর্ছা প্রাপ্ত হইয়া আবার কর্ণমূলে তোমার নাম-মন্ত্রাক্ষর পতিত হইলেই পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে।"

প্রিয়ের নাম-মন্ত্রাক্ষর কানে গিয়া যে বিরহিণীর সকল ব্যাধি—মূর্ছা অপনীত হয় ইহা শুধু পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যাইতেছে না, ইহার ধারা অনেক পূর্ব হইতেই প্রবাহিত। এই ধারারই পরিণতি পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সাহিত্যে, যেখানে দেখি--

গুরুজন অবুধ মুগধমতি পরিজন
অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনি মণি মন্ত্র-মহৌষধি
লোচনে লাগল সমাধি॥
খেনে খেনে অঙ্গ ভঙ্গ তনু মোড়ই
কহত ভরমময় বাণী॥
শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই
গোবিন্দ দাস কিয়ে জানি॥

অথবা— তহিঁ এক সুচতুরি তাক শ্রবণ ভরি
পুন পুন কহে তুয়া নাম।
বহুখণে সুন্দরী পাই পরাণ ফিরি
গদগদ কহে শ্যাম শ্যাম॥

১ সূক্তিমুক্তাবলী, ৪৪।২৩

নামক অছু গুণ না শুনিয়ে ত্রিভুবন
মৃতজন পুন কহে বাত।
গোবিন্দ দাস কহ ইহ সব আন নহ
যাই দেখহ মঝু সাথ॥

আমরা জানি, বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরহিণী রাধার
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥

আর একটি পদে বিরহিণী রাধার বর্ণনায় দেখি—
বিরহে ব্যাকুল ধনি কিছুই না জানে।
আন-আন বরণ হইল দিনে দিনে॥
কম্প পুলক স্বেদ নয়নহি ধারা।
প্রণয়-জড়িমা বহু ভাব বিথারা॥
যোগিনি যৈছন ধ্যানি-আকার।
ডাকিলে সমতি না দেই দশ বার॥
উনমত ভাতি ধনি আছয়ে নিচলে।
জড়িমা ভরল হাত পদ নাহি চলে॥[১]

রাজশেখরের বর্ণিত বিরহিণীও এইরূপ যোগিনী।—
আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনং চেদমিদং চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভো কিংবা বিয়োগিন্যসি॥[২]

"তোমার আহারে বিবতি, সমস্ত বিষয়গ্রামে পরা নিবৃত্তি; আর তোমার নাসাগ্রে নয়ন, মন একতান; এই তোমার মৌন, এই যে অখিল বিশ্ব তোমার নিকট শূন্য বলিয়া আভাত হইতেছে; হে সখি আমাদিগকে বল, তুমি কি তাহা হইলে যোগিনী হইলে, না বিয়োগিনী (বিরহিণী) হইলে।"

১ পদকল্পতরু, ১৮৬৪

২ 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' (৪১৬) কবির নাম নাই; অন্য বহু সংগ্রহগ্রন্থে রাজশেখরের নামে।

লক্ষ্মীধর কবিরও অনুরূপ একটি কবিতা দেখিতে পাই,—

যদ্দৌর্বল্যং বপুষি মহতী সর্বতশ্চাস্পৃহা য-
ন্নাসালক্ষ্যং যদপি নয়নং মৌনমেকান্ততো যৎ।
একাধীনং কথয়তি মনস্তাবদেষা দশা তে
কো হ্যসাবেকঃ কথয় সুমুখি ব্রহ্ম বা বল্লভো বা॥[১]

"দেহে তোমার দৌর্বল্য, সবদিকেই মহতী অস্পৃহা, তোমার নয়ন নাসালক্ষ্য, তোমার একান্ত মৌনভাব ; তোমার এই দশা বলিয়া দিতেছে, 'একাধীন' হইল তোমার মন। কে সেই এক, সেই কথা বল, হে সুমুখি : সে কি ব্রহ্ম না বল্লভ ?"

বিরহে 'দশমী দশা'-প্রাপ্ত নায়িকার পক্ষ হইয়া দূতী গিয়া নায়ককে বলিতেছে

নীরসং কাষ্ঠমেবেদং সত্যং তে হৃদয়ং যদি।
তথাপি দীয়তাং তস্যৈ গতা সা দশমীং দশাম্॥[২]

"তোমার এই হৃদয় সত্যই যদি নীরস কাষ্ঠ হয়, তথাপি ইহাকে (এই তরুণীকে) তাহা দাও, কারণ এ দশমী দশা (অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য অবস্থা) প্রাপ্ত হইয়াছে।"

নায়িকার তানব-দশার বর্ণনায় রাজশেখর বলিয়াছেন,—

দোলালোলাঃ শ্বসনমরুতশ্চক্ষুষী নির্ঝরাভে
তস্যাঃ শুষ্যত্তগরসুমনঃপাণ্ডুরা গণ্ডভিত্তিঃ।
তদ্‌গাত্রাণাং কিমিব হি বহু ব্রূমহে দুর্বলত্বং
যেষামগ্রে প্রতিপদুদিতা চন্দ্রলেখাপ্যতন্বী॥[৩]

"তাহার শ্বাসবায়ু দোলার মত চঞ্চল, চক্ষু দুইটি যেন দুইটি নির্ঝর, তাহার গণ্ডভিত্তি শুকাইয়া-যাওয়া টগর ফুলের মত পাণ্ডুর, আর তাহার গাত্রাদির দুর্বলতার কথা আর বেশী কি বলিব, তাহাদের সম্মুখে প্রতিপদে উদিতা চন্দ্রলেখাও[৪] অতন্বী বলিয়া মনে হয়।"

প্রেমোদ্বেগের অনেকগুলি চমৎকার বর্ণনা পাই প্রাচীন প্রেম-কবিতার ভিতরে। একটি শ্লোকে দেখি,—

১ কবীন্দ্রবঃ, ৪২৮ ; সদুক্তিকঃ, ২।২৫।৫
২ সদুক্তিকঃ, ২।৩১।২
৩ সদুক্তিকঃ, ২।৩৪।১
৪ তুঃ—'প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী' ইত্যাদি, বিদ্যাপতি।

চির চন্দন উরে হার না দেল।
সো অব নদি গিরি আঁতর ভেল॥

ইহা একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকের ছায়া মাত্র।

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ॥[১]

বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত—

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনা সলিলে সব ডার রে॥

প্রভৃতির সহিত 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি'-ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটির তুলনা করিতে পারি—

অপসারয় ঘনসারং কুরু হারং দূর এব কিং কমলৈঃ।
অলমলমালি মৃণালৈরিতি বদতি দিবানিশং বালা॥[২]

বিদ্যাপতি যে সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার অনেক পদই যে বিবিধ সংস্কৃত কবিতার ছায়ায় রচিত তাহা বিদ্যাপতির পদগুলি লইয়া একটু বিচার করিতে বসিলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। বিদ্যাপতির পদ—

কত ন বেদন মোহি দেসি মদনা।
হর নহি বলা মোহি জুবতি জনা॥
বিভূতি-ভূষণ নহি চান্দনক রেনু।
বাঘ ছাল নহি মোরা নেতক বসনু॥
নহি মোরা জটাভার চিকুরক বেণী।
সুরসরি নহি মোরা কুসুমক সেনী॥
চান্দনক বিন্দু মোরা নহি ইন্দু ছোটা।
ললাট পাবক নহি সিন্দুরক ফোটা॥

১ শ্লোকটি দামোদর মিশ্র রচিত (?) 'মহানাটকে' পাওয়া যায়; 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' শ্লোকটি ধর্মপালের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি'তে বাল্মীকির রচিত বলিয়া কিঞ্চিৎ পাঠভেদে ধৃত।

২ ১০৭১ দামোদর গুপ্তের। মম্মট ভট্টের 'কাব্যপ্রকাশে'র অষ্টম উল্লাসেও ধৃত।

নহি মোরা কালকূট মৃগমদ চারু।
ফনিপতি নহি মোরা মুকুতা-হারু॥

প্রভৃতি যে নিম্নোদ্ধৃত জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রসিদ্ধ শ্লোকটির ছায়া বহন করে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।—

হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যাঽনঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি॥[১]

জয়দেবের এই শ্লোক নিশ্চয়ালঙ্কারের প্রাচীন সংস্কৃত প্রসিদ্ধিকে অনুসরণ করিয়া লিখিত। ইহাকে একটি কাব্য রীতিই বলা যাইতে পারে।[২]

বিদ্যাপতির পদে আছে—

অব সখি ভমরা ভেল পরবস
কেহো ন করএ বিচার।
ভলে ভলে বুঝল অলপে চীহ্নল
হিয়া তনু কুলিসক সার॥
কমলিনী এড়ি কেতকী
গেলা বহু সৌরভ হেরি।
কণ্টকে পিড়ল কলেবর
মুখ মাখল ধূরি॥[৩]

ইহার সহিত 'ভ্রমরাষ্টকে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির বেশ তুলনা করা যাইতে পারে।—

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।

---

১ গীতগোবিন্দ ৩।১১

২ যেমন কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকে :—

নবজলধরঃ সন্নদ্ধোঽয়ং ন দৃপ্তনিশাচরঃ
সুরধনুরিদং দূরাকৃষ্টং ন তস্য শরাসনম্।
অয়মপি পটুর্ধারাসারো ন বাণপরম্পরা
কনকনিকষস্নিগ্ধা বিদ্যুৎপ্রিয়া ন মমোর্বশী॥

৩ শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের সংস্করণ, ৪২৬

দূতী হইয়া রাধা-কৃষ্ণের লীলারসকে সর্বদা হাস্যে পরিহাসে, বিদ্রূপে সহানুভূতিতে পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে। এই যে দূতী বা সখীবাদ ইহাও বৈষ্ণব-সাহিত্যে কিছু নূতন নহে, ইহাই শাশ্বত ভারতীয় রীতি; সমস্ত প্রেম-কবিতার ভিতরে দেখিতে পাই, প্রেমতরুর অঙ্কুরকে ইহারাই নিরন্তর সলিল-সিঞ্চনে মধুর হইতে মধুরতম রূপে বাড়াইয়া তুলিয়াছে; শুধু বৈষ্ণব কবিতায় নহে, সর্বত্রই দেখিতে পাই, এই সখীগণ প্রেমের অংশীদার নহে, তাহারা প্রেমকে গড়িয়া ভাঙিতে এবং ভাঙিয়া গড়িতে এবং ইহার ভিতর দিয়া অনন্ত প্রেমরসকে দূর হইতে আস্বাদ করিতেই লালায়িত। ভারতীয় সাহিত্যের সেই সখীদের লইয়া সৃষ্ট হইয়াছে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের লীলা-সহচরী যত সখীগণের এবং এই সখীভাবের সাধনার। প্রেমের খেলায় সখীরা যে কৃষ্ণকে দিয়া রাধার পা ধরাইয়াছে তাহাও কিছু নূতন নহে; 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'ও ভারতীয় নায়কের চিরন্তন অনুনয়। অমরু কবির নামে একটি পদে দেখি—

> সুতনু জহিহি মৌনং পশ্য পাদানতং মাং
> ন খলু তব কদাচিৎ কোপ এবংবিধোহভূৎ।
> ইতি নিগদতি নাথে তির্যগামীলিতাক্ষ্যা
> নয়নজলমনল্পং মুক্তমুক্তং ন কিংচিৎ॥[১]

"হে সুতনু, তোমার মৌন ত্যাগ কর, পাদানত আমার দিকে চাহিয়া দেখ; তোমার ত কোনও দিন এইরকম কোপ ছিল না! নাথ এই কথা বলিলে তির্যক ভাবে ঈষৎ আমীলিতাক্ষী প্রচুর অশ্রু মোচন করিল,—কিছুই বলিতে পারিল না।" এখানে নায়ক-নায়িকা উভয়েরই কমনীয় প্রেম-দুর্বলতা মধুর হইয়া উঠিয়াছে। মানিনী রাধার যত মর্মস্পর্শী খেদোক্তি তাহাও অনুরূপ ভাষা পাইয়াছে পূর্বতন কবিতায়। অমরুর একটি শ্লোকে দেখি, অভিমানিনী নায়িকা নায়ককে বলিতেছে,

> তথা হভূদস্মাকং প্রথমবিভিন্না তনুরিয়ং
> ততো নু ত্বং প্রেয়ানহমপি হতাশা প্রিয়তমা।
> ইদানীং নাথস্ত্বং বয়মপি কলত্রং কিমপরং
> ময়াপ্তং প্রাণানাং কুলিশকঠিনানাং ফলমিদম্॥[২]

---

১ কবীন্দ্রবঃ (কবির নাম নাই), ৩৯১; সদুক্তিকঃ ·।৫০।৫, সুভাষিতাবলী ১৬০০; আরও বহু গ্রন্থে শ্লোকটি পাওয়া যায়।

২ সদুক্তিকঃ ২।৪৭।২

"আমাদের প্রথমে এমন হইয়াছিল, এই তনু (তোমার তনুর সহিত) অভিন্ন ছিল। তাহার পরে তুমি হইলে প্রেয়, আমি হইলাম হতাশা প্রিয়তমা; এখন আবার তুমি হইলে নাথ, আমরা সকলে হইলাম তোমার বনিতা। প্রাণটা কুলিশকঠিন হওয়ায় এই ফলই আমি লাভ করিলাম!"

অচল কবির মানিনী বলিয়াছে,—

> যদা ত্বং চন্দ্রোভূরবিকলকলাপেশলবপু-
> স্তদার্দ্রা জাতাহং শশধরমণীনাং প্রকৃতিভিঃ।
> ইদানীমর্কস্ত্বং খররুচিসমুৎসারিতরসঃ
> কিরন্তী কোপাগ্নীনহমপি রবিগ্রাবঘটিতা ॥[১]

"তুমি যখন চন্দ্র ছিলে—(চন্দ্রকলার ন্যায়) অবিকলকলা দ্বারা পেশল ছিল তোমার বপু—আমি ছিলাম তখন চন্দ্রকান্তমণি—চন্দ্রকান্তমণির স্বভাববশতঃ আমি তখন দ্রবীভূত হইয়া যাইতাম; এখন তুমি হইলে সূর্য, খরকিরণের দ্বারাই এখন সমুৎসারিত হয় তোমার রস; আমিও তাই এখন কোপাগ্নিবর্ষণকারিণী সূর্যকান্তমণির রূপে রূপান্তরিত হইয়াছি।"

এই মানিনীকে সখীরা প্রবোধ দিতে গিয়া বলিয়াছে,—

> পাণৌ শোণতলে তনূদরি দরক্ষামা কপোলস্থলী
> বিন্যস্তাঞ্জনদিগ্ধলোচনজলৈঃ কিং ম্লানিমানীয়তে।
> মুগ্ধে চুম্বতু নাম চঞ্চলতয়া ভৃঙ্গঃ কচিৎকন্দলী-
> মুন্মীলন্নবমালতীপরিমলঃ কিং তেন বিস্মার্যতে ॥[২]

"হে ক্ষীণমধ্যা সুন্দরি, রক্তবর্ণ করতলে রক্ষিত তোমার ঈষৎকৃশ গণ্ডস্থল অঞ্জনে মিশ্রিত নয়নজলে মলিন করিতেছ কেন? হে মুগ্ধে, ভৃঙ্গ চপলতা হেতু কখনও হয়তো কদলী পুষ্প চুম্বন করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহাতে কি প্রস্ফুট নবমালতীর সুগন্ধ বিস্মৃত হইতে পারে?"

অভিসারের দুই একটি পদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সারা রাত্রি জাগিয়া নিজের ঘরে বসিয়া অভিসারের সাধনার সুন্দর বর্ণনা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি। অভিসারের বিবিধ এবং বিচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায় এই সংগ্রহ-গ্রন্থগুলির ভিতরে। বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে যেমন দেখিতে পাই, রজনীর ঘন

১ সদুক্তিকর্ণামৃত: ২।৪৭।৫
২ ঐ, ২।৪৮।৫

তমসার ভিতরে বিঘ্নবহুল দুর্গম পথে একমাত্র মদন-সহায়ে রাধা 'একলি কয়ল অভিসার', এখানেও তেমন সেই মদন-সহায়েএকেলা অভিসারের বর্ণনা পাইতেছি। একটি শ্লোকে অভিসারিণীকে প্রশ্ন করা হইতেছে, "এই ঘন নিশীথে, হে করভোরু, তুমি কোথায় যাইতেছ?" অভিসারিণী জবাব করিল, "প্রাণেরও অধিক প্রিয় যে জন, সে যেখানে থাকে সেইখানে যাইতেছি (প্রাণেরও অধিক প্রিয় বলিয়া প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াই যাইতেছি)।" প্রশ্ন হইল, "হে বালা, একাকিনী তুমি ভয় পাইতেছ না কেন?" উত্তর হইল, "কেন, পুষ্পিতশর মদনই ত আমার সহায় রহিয়াছে।"[১] তারপরে দেখিতে পাই, জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবকবির ভিতরেই অভিসারের কতগুলি সাধারণ কৌশল, আবার বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অভিসারের কতগুলি বিশেষ বিশেষ কৌশল বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেবে যেমন সংক্ষেপে দেখিতে পাই—

মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্॥

ইহারই অতিবিস্তৃত সকল বর্ণনা দেখিতে পাই পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে। পূর্ববর্তী কবিতাসমূহেও এই একই কৌশলরীতির বর্ণনা রহিয়াছে।[২] লক্ষ্মণ-সেনেরও চমৎকার একটি অভিসারের পদ রহিয়াছে।[৩]

---

১ ক্ব প্রস্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে
প্রাণাধিকো বসতি যত্র জনঃ প্রিয়ো মে।
একাকিনী বদ কথং ন বিভেষি বালে
নম্বস্তি পুষ্পিতশরো মদনঃ সহায়ঃ॥

কবীন্দ্রবঃ ৫০৯ ; শ্লোকটি আরও বহু সংগ্রহগ্রন্থে (কোথাও কোথাও অমরুর নামে) উদ্ধৃত আছে।

২ বস্ত্রপ্রোতদুরন্তনূপুরমুখাঃ সংযম্য নীবীমণী
মুদ্গাঢাংশুকপল্লবেন নিভৃতং দত্তাভিসারক্রমাঃ।
কবীন্দ্রবঃ ৫২২ ; সদুক্তিকর্ণামৃতেও ধৃত হইয়াছে।

তুঃ মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং
বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন। ইত্যাদি।
নালের, সদুক্তিক: ২।৬১।২

উৎক্ষিপ্তং সখি বর্তিপূরিতমুখং মূকীকৃতং নূপুরং
কাঞ্চীদাম নিবৃত্তঘর্ঘররবং ক্ষিপ্তং দুকূলান্তরে।
যোগেশ্বরের, সদুক্তিক: ২।৬১।৩

৩ মুক্তাভরণানি দীপ্তমুখরাণ্যুত্তংসমিন্দীবরৈঃ ইত্যাদি —সদুক্তিক: ২।৬১।৫

বৈষ্ণব কবিতায় যেমন অভিসারের বহুবিধ বর্ণনা রহিয়াছে তেমনি 'সদুক্তি-কর্ণামৃতে'র মধ্যে দিবাভিসার, তিমিরাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, দুর্দিনাভিসার, প্রভৃতির পাঁচটি করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত রহিয়াছে। গোবিন্দ দাসের দিবাভিসারে যেমন দেখিতে পাই,—

গগনহিঁ নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥
ঐছন জলদ করল আঁধিয়ার।
নিয়ড়হিঁ কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥

তেমনই সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত সুভট কবির একটি শ্লোকে দেখি—

অবলোক্য নর্তিতশিখণ্ডিমণ্ডলৈ-
র্নবনীরদৈর্নিচুলিতং নভস্তলম্।
দিবসেঽপি বঞ্জুলনিকুঞ্জমিত্বরী
বিশতিস্ম বল্লভবতংসিতং রসাৎ॥[১]

"ময়ূরমণ্ডলের নৃত্য-প্রবর্তক নবীন মেঘেরদ্বারা নভস্তল আবৃত দেখিয়া অভিসারিকা দিবসেই রসবশে বল্লভভূষিত বঞ্জুলকুঞ্জে প্রবেশ করিল।"[২]

তিমিরাভিসারে যেমন দেখিতেপাই, রাধা সর্বভাবে নীলবেশে সজ্জিতা হইয়া অন্ধকারের সহিত নিজেকে মিলাইয়া দিতে চাহিয়াছে,[৩] তেমনি জ্যোৎস্নাভিসারের সময় দেখিতে পাই, রাধা অমল ধবলবেশে জ্যোৎস্নার সহিত নিজেকে মিলাইয়া লইয়া অভিসার করিয়াছে।

সমুচিত বেশ করহ বর চন্দন
কপূর খচিত করি অঙ্গ।
দুগ্ধ-ফেন-সিত অম্বর পহিরহ
কুঞ্জহি চলহ নিশঙ্ক॥ (গৌরমোহন)

---

১ সদুক্তিক: ২।৬৩।১

২ তু:— দিবাপি জলদোদয়াদুপচিতান্ধকারচ্ছটা—ইত্যাদি।—ঐ, ২।৬৩।৩

৩ তু:— মৌলৌ শ্যামসরোজদাম নয়নদ্বন্দ্বেঽঞ্জনং ইত্যাদি।—ঐ, ২।৬৪।২
বাসো বর্হিণকণ্ঠমেদুরমুরো নিষ্পিষ্টকস্তূরিকা-
পত্রালীময়মিন্দ্রনীলবলয়ং ইত্যাদি।—ঐ, ২।৬৪।৩

অথবা—

কুন্দ কুমুদ গজমোতিম হার।
পহিরল হৃদয়ে ঝাঁপি কুচ-ভার॥ (কবিশেখর)

প্রাচীন কবিতার ভিতরেও ঠিক এই প্রথা বা কলাকৌশলই দেখিতে পাই।[১]

গোবিন্দ দাসের একটি প্রসিদ্ধ পদ রহিয়াছে,—

যাহাঁ পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ॥
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥
যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি।
সো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥

সমগ্র পদটিই রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল-নীলমণি'-ধৃত পরবর্তী পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত প্রাচীন শ্লোকটির ভাবানুবাদ।—

১ তুঃ— মলয়জপঙ্কলিপ্ততনবো নবহারলতাবিভূষিতাঃ
সিততরদন্তপত্রকৃতবক্ত্ররুচো রুচিরামলাংশুকাঃ।
শশভৃতি বিততধাম্নি ধবলয়তি ধরামবিভাব্যতাং গতাঃ
প্রিয়বসতিং ব্রজন্তি সুখমেব মিথো নিরস্তভিয়োঽভিসারিকাঃ॥
কবীন্দ্রবঃ (৫২৫) কবির নাম নাই, সদুক্তিকর্ণামৃতে (২।৬৫।২) বাণের নামে।

আরও তুঃ— মৌলৌ মৌক্তিকদাম কেতকদলং কর্ণে স্ফুটৎকৈরবং
তাড়ঙ্কঃ করিদন্তজঃ স্তনতটী কর্পূররেণূৎকরা। ইত্যাদি।
সদুক্তিকঃ ২।৬৫।৩

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহ স্বাংশে বিশন্তি স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তে ঽনিলঃ ॥

রাধা-প্রেমকে অবলম্বন করিয়া দ্বাদশ শতাব্দী হইতে যে বৈষ্ণব কবিতা রচিত হইয়াছে তাহার সহিত দ্বাদশ-শতক এবং তাহার বহুপূর্বকাল হইতে রচিত পার্থিব প্রেম-কবিতার এই যে আমরা মিল দেখাইবার চেষ্টা করিলাম তাহা রাধাবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একদিক হইতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়াই আমরা এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করিয়াছি। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, দ্বাদশ শতকের জয়দেব ব্যতীত অন্যান্য কবিগণ রচিত রাধা-প্রেমের কবিতা এবং দ্বাদশ শতকের বহুপূর্ব হইতে রচিত রাধা-প্রেমের কবিতা সমসাময়িক পার্থিব প্রেমের কবিতাব সহিত সমসুরেই গ্রথিত ; জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালেব বৈষ্ণব-কবিতার সহিতও ভারতীয় চিরপ্রচলিত পার্থিব প্রেম-কবিতার ধারার গভীর মিল রহিয়াছে। সাহিত্যের দিক হইতে তাই বিচার করিলে আমরা রাধার পরিচয়ে বলিতে পারি, রাধা হইল ভারতীয় কবিমানস-ধৃত নারীরই একটি বিশেষ রসময় বিগ্রহ। বৈষ্ণব- সাহিত্যে যত শৃঙ্গার বর্ণনা রহিয়াছে, রসোদ্গার, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভৃতির বর্ণনা রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণই ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য এবং রতিশাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই প্রাকৃত রতির স্থূল সূক্ষ্ম নানা-বৈচিত্র্যময় সুনিপুণ বর্ণনা যে সর্বদা প্রাকৃত প্রেমের দৃষ্টান্তে অপ্রাকৃত প্রেমের একটা আভাস দিবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল এ কথা স্বীকার করা যায় না। প্রথমে ইহা ভারতীয় প্রেম-কবিতার ধারার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, পার্থক্য-রেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে অনেক পরে। পরবর্তী কালে গৌড়ীয় গোস্বামিগণ কর্তৃক যখন রাধাতত্ত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল তখনও সাহিত্যের ভিতরে রাধা তাহার ছায়া-সহচরী মানবী নারীকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই ; কায়া ও ছায়া অবিনাবদ্ধভাবে একটা মিশ্ররূপের সৃষ্টি করিয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বঙ্গীয় রাধার এই মিশ্ররূপের পরিচয় আর একবার দিবার চেষ্টা করিব।

অষ্টম অধ্যায়

ধর্মে ও দর্শনে রাধা

ধর্মমতের সহিত যুক্ত করিয়া দ্বাদশ শতকের সাহিত্যের ভিতরে শ্রীরাধার যে প্রতিষ্ঠা দেখিলাম, তাহার সহিত স্পষ্ট কোন দার্শনিক মতবাদের মিশ্রণ নাই, অর্থাৎ রাধা তখন পর্যন্ত কোনও বিশেষ দার্শনিক তত্ত্বের বিগ্রহ নয়। কিন্তু এই দ্বাদশ শতকের সাহিত্যে—বিশেষ করিয়া লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে আমরা একটি জিনিসের প্রাধান্য লক্ষ্য করি, ইহা হইল লীলাবাদের প্রাধান্য। আমরা পরবর্তী কালের রাধাবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিতে পাইব, এই লীলাবাদের প্রতিষ্ঠা ওপ্রাধান্যের সহিত রাধাবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। আমরা পূর্ববর্তী কালের যত প্রকারের বৈষ্ণব এবং শৈবশাক্ত শক্তিবাদের আলোচনা করিয়া আসিয়াছি তাহার ভিতরে দেখিয়া আসিয়াছি, লীলা হইল বহিঃসৃষ্টি লইয়া, স্বরূপশক্তির সহিত লীলার তেমন কোনও প্রসঙ্গ নাই। পুরাণাদিতে লক্ষ্মীর সহিত লীলা-বিলাসের স্থানে স্থানে আভাস মেলে; শ্রীসম্প্রদায়ের ভিতরে সেই লীলা-বিলাসের দিকটি আরও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, দ্বাদশ শতকে আসিয়া দেখিলাম স্বরূপ-শক্তি রাধার সহিত কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত লীলা তাহার আস্বাদনই বৈষ্ণবগণের 'চরম পাওয়া' রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। জয়দেবের সময়ে কোনও দার্শনিক মতবাদের আওতায় পরিকরবাদের প্রতিষ্ঠা এবং প্রসিদ্ধি না থাকিলেও দেখিতে পাই, রাধা-কৃষ্ণের যুগল হইতে নিজেকে একটু দূরে সরাইয়া রাখিয়া লীলা-দর্শন, লীলা-আস্বাদন এবং লীলার জয়গান—ইহাই যেন ভক্তের প্রার্থিততম বস্তুরূপে দেখা দিয়াছে। গীত-গোবিন্দের শ্লোকে যে দেখিতে পাইলাম,—

রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ।

ধর্মের দিক হইতে ইহাই যেন গীতগোবিন্দের মূল সুর। সর্বত্রই এই বিচিত্র লীলার মহিমা গান। এই লীলার বৈশিষ্ট্যই লীলাময়ের মাধুর্যে। জয়দেব কৃষ্ণের মধুরিপু, কংসদ্বিষ্ প্রভৃতি বিশেষণ বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা যেন তাঁহার ব্রজমাধুর্যকে একটা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া সমধিক প্রস্ফুটিত করিবার নিমিত্তই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মধুর রসের ঘনীভূত বিগ্রহই রাধা; সুতরাং রাধার

আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা সর্বত্রই এই মধুর রসকে আশ্রয় করিয়া। এই যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের এই যে আমরা প্রধান দুইটি লক্ষণের কথা বলিলাম—অর্থাৎ লীলা-বাদ ও মধুর রসের প্রাধান্য—বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত' গ্রন্থেও এই লক্ষণ দুইটি সুপরিস্ফুট। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের ঐ 'লীলাশুক' বিশেষণটিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাধক কবির পরিচয় হইল মধুর বৃন্দাবন-লীলাকে অদূরের কদম্ব বৃক্ষ হইতে দর্শন এবং আস্বাদন এবং শুকের ন্যায় মধুর কাব্য-কাকলীতে তাহারই মাধুর্য বর্ণন। এই মাধুর্যরূপিণী দেবীর আবির্ভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সকলই মধুর। এখানে কৃষ্ণ চিরকিশোর; এই কিশোর বয়স হইল 'কামাব-তারাঙ্কুরম্', এবং 'মধুরিমস্বারাজ্যম্'। এখানে 'কমলা'ও এই অনন্ত-মাধুর্যেরই বিষয় মাত্র। এই জন্যেই দেখি প্রার্থনা—

তরুণারুণ-করুণাময়-বিপুলায়ত-নয়নং
কমলাকুচ-কলসীভর-বিপুলীকৃতপুলকম্।
মুরলীরবতরলীকৃত-মুনিমানসনলিনং
মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতম্॥ ১৮

এই মাধুর্যরসৈকসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ ৯২

চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে আর দুইজন কবি রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ে কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহারা হইলেন বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস। ইঁহাদের কবিতায় প্রকাশিত রাধা-তত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রচারিত রাধা-তত্ত্বের আলোচনার ভিতরেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে; সুতরাং সে-সম্বন্ধে আর পৃথক ভাবে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূর্বে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ভিতরে আমরা শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্নভাবে পরম উপাস্য বলিয়া গৃহীত হইতে দেখি। নিম্বার্ক একজন তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। তিনি রামানুজাচার্যের পরবর্তী ছিলেন। প্রসিদ্ধ চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম এই নিম্বার্ক সম্প্রদায় সনকাদি-সম্প্রদায় বা হংস-সম্প্রদায় নামে খ্যাত। নিম্বার্ক দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ হইলেও বাস করিতেন

বৃন্দাবনে এবং খুব সম্ভব এই কারণেই কৃষ্ণশক্তিরূপে লক্ষ্মী, শ্রী, ভূ, নীলা প্রভৃতির পরিবর্তে গোপিনী রাধিকাকেই নিম্বার্ক কর্তৃক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই নিম্বার্ক পরমব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ শক্তি সম্বন্ধে নিম্বার্ক তাঁহার প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' গ্রন্থে যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহা মোটামুটি ভাবে রামানুজাচার্যের আলোচনারই অনুরূপ। পূর্ববর্তীদের ন্যায় নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের লেখকগণও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'রমাপতি', 'শ্রীপতি', 'রমামানসহংস' প্রভৃতিরূপে বিশেষিত করিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণের বামাঙ্গ-বিহারিণী প্রেম-প্রদায়িনী রাধিকারই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। নিম্বার্ক-রচিত 'দশশ্লোকী'র পঞ্চমশ্লোকে দেখিতে পাই—

অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা
বিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্।
সখীসহস্রৈঃ পরিষেবিতাং সদা
স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্॥

"বৃষভানুনন্দিনী (রাধিকা) দেবীকে স্মরণ করিতেছি,—যিনি অনুরূপ-সৌভগা রূপে (কৃষ্ণের) বাম অঙ্গে আনন্দে বিরাজ করিতেছেন; যিনি সখী-সহস্রের দ্বারা সর্বদা পরিষেবিতা, এবং যিনি সকল ইষ্টকাম দান করেন।" পুরুষোত্তমাচার্য এই 'দশশ্লোকী'র উপরে 'বেদান্তরত্নমঞ্জুষা' নামে যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি বৃষভানুসুতা রাধিকার 'অনুরূপসৌভগা', 'দেবী', 'সকলেষ্টকামদা' প্রভৃতি বিশেষণের যেভাবে শ্রুতি-পুরাণাদির উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা যামুনাচার্যের 'চতুঃশ্লোকী' বা রামানুজাচার্যের 'গদ্যত্রয়ে' লক্ষ্মী সম্বন্ধে প্রযুক্ত এইজাতীয় বিশেষণগুলির বেঙ্কটনাথকৃত ব্যাখ্যারই একান্ত অনুরূপ।[১] এক্ষেত্রে বৃষভানুনন্দিনী রাধা পঞ্চরাত্র বা পুরাণাদিতে বর্ণিত বিষ্ণুর 'অনপায়িনী' শক্তিমাত্র। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি যে সখীসহস্রের দ্বারা সর্বদা পরিষেবিতা এ কথার ব্যাখ্যায় পুরুষোত্তমাচার্য একটি লক্ষণীয় কথা বলিয়াছেন। এই স্বপরিচারিকা সখীগণ হইল ভক্তস্থানীয়; এই ভক্তগণ 'সকলেষ্টকাম' পূরণের প্রয়োজনে এই যুগলের সর্বদা সেবা করিয়া থাকেন। শ্লোকোক্ত 'মুদা' পদটি রাধিকার 'নিরতিশয় প্রেমানন্দমূর্তি'র দ্যোতক। 'বিরাজমানা' পদের তাৎপর্য হইল, স্বরূপে এবং বিগ্রহে রাধিকা প্রেমকারুণ্যাদিগুণে শোভমানা বা দীপ্যমানা।

১ এই গ্রন্থের ৮২-৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাধিকার এই নিত্যপ্রেমানন্দ-স্বরূপতা কৃষ্ণের সহিত 'অন্যোহন্যসাহিত্যবিধানপর' নিত্যসম্বন্ধ এবং প্রেমোৎকর্ষকে লক্ষ্য করিয়াই 'ঋক্‌পরিশিষ্টে'র বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে—'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেন চ রাধিকা।' এই প্রসঙ্গে রাধাতত্ত্ব এবং লক্ষ্মীতত্ত্বের ভিতরেও একটি স্পষ্ট ভেদের উল্লেখ পাই। লক্ষ্মীর হইল ঐশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রীত্ব, ব্রজস্ত্রীর হইল প্রেমাধিষ্ঠাত্রীত্ব ; ব্রজস্ত্রীর প্রেমাধিষ্ঠাত্রীত্ব এবং তচ্চরণস্মরণেরই প্রেমদাত্রীত্ব, এই হেতু লক্ষ্মী অপেক্ষা এই ব্রজবধূরই প্রাধান্য।

নিম্বার্কাচার্য তাঁহার 'প্রাতঃস্মরণস্তোত্রে' রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ; ইহা ব্যতীত তিনি 'কৃষ্ণাষ্টক', 'রাধাষ্টক' প্রভৃতি অষ্টকও রচনা করিয়াছিলেন।

রাধাতত্ত্বের পূর্ণবিকাশ ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগোস্বামি-গণের আলোচনায়। অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগোস্বামী বলিতে শুধু গৌড়দেশীয় বৈষ্ণবগোস্বামী বুঝায় না, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতবাদ-অবলম্বী বৈষ্ণবগোস্বামী বুঝিতে হইবে ; কারণ ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে প্রসিদ্ধ গোস্বামী গোপাল ভট্ট দক্ষিণ দেশবাসীই ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের সহিত গোদাবরীর তীরে দক্ষিণদেশীয় ভক্ত রায় রামানন্দের সহিত রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে গুহ্য এবং বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছিল তাহা দেখিয়া মনে হয়, গৌড়ীয় গোস্বামিগণ প্রচারিত এই রাধা-তত্ত্ব রায় রামানন্দের—অর্থাৎ দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণবগণের ভিতরে প্রচলিত ছিল। লীলাশুকের 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত'-গ্রন্থও এই বিশ্বাসে কিছু ইন্ধন যোগাইতে পারে। কিন্তু ভক্তচূড়ামণি কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রদত্ত এই বিবরণকে কতখানি সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা বিচারসাপেক্ষ। তবে এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শ্রীমন্-মহাপ্রভুর রাধা-ভাব বলিয়া যে অবস্থা আমরা জানি তাহার মধুরতম পরিচয় পাই আমরা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেই। এই চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত মহাপ্রভুর সকল দিব্যভাব এবং ভাবান্তর লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাইব, মহাপ্রভুর রাধা-ভাবের সম্যক্ বিকাশ এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণেরই পরে। এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে মহাপ্রভুর বহু দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণবগণের সহিত সাক্ষাৎ এবং নিভৃতে 'ইষ্টগোষ্ঠী' হইয়াছে, রায় রামানন্দের সহিতই এই নিভৃত তত্ত্বালোচনা এবং রসাস্বাদনের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। ইহার পর হইতেই মহাপ্রভুর ভাবান্তর লক্ষণীয়, ইহার পর হইতে তাঁহাকে আমরা সর্বদা রাধাভাবেই ভাবিত দেখিতে পাই। সুতরাং মহাপ্রভুর এই রাধাভাবের বিকাশে রায় রামানন্দাদি দাক্ষিণাত্য

বৈষ্ণবগণের কিছু প্রভাব থাকা অসম্ভব নহে। অবশ্য রায় রামানন্দের মুখে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' কবিরাজ গোস্বামী যত সব সাধ্য-সাধনতত্ত্ব, পঞ্চরসতত্ত্ব এবং রাধাতত্ত্বের আলোচনা দিয়াছেন, তাহা দেখিলে সংশয় হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রসিদ্ধ তত্ত্বগুলিই হয়ত কবিরাজ গোস্বামী রায় রামানন্দের মুখে বসাইয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমরা শুধু এইটুকুই বলিতে পারি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্তৃক প্রচারিত রাধাতত্ত্বের অনুরূপ তত্ত্ব অস্ফুটাকারে দক্ষিণদেশেও প্রচারিত ছিল; আলোচনার সময়ে তাই চৈতন্যপ্রভু এবংরামানন্দ রায়ের ভিতর নিবিড় ঐকমত্য ঘটিয়াছিল।

মুখ্যত: সনাতন, রূপ এবং জীবগোস্বামীর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিবিধ রচনাকে অবলম্বন করিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দার্শনিক মতটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার ভিতরে আবার জীবগোস্বামীরলেখার ভিতরেই শ্রীরাধার দার্শনিক প্রতিষ্ঠা; এই জন্য জীবগোস্বামী সনাতন এবং রূপ এই জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের অনুসারী হইলেও প্রথমে জীবগোস্বামীর অনুসরণেই আমরা রাধাতত্ত্বকেপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইব। রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে 'শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে' এবং 'প্রীতি-সন্দর্ভে' জীবগোস্বামীর যে আলোচনা তাহা অনেকাংশে রূপ গোস্বামীর 'সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত' এবং 'উজ্জ্বল-নীলমণি' গ্রন্থকে অনুসরণ করিয়া রচিত; কিন্তু রূপ গোস্বামীর গ্রন্থে যে-সকল কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে জীবগোস্বামী তাহা একটা বিস্তৃততর দার্শনিক মতবাদের ভিতরে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এই কারণে তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে আমরা জীবগোস্বামীর 'ষট্-সন্দর্ভ'কেই প্রধানতঃ গ্রহণ করিতেছি। এই দার্শনিক তত্ত্ব সাহিত্য এবং রসশাস্ত্রের ভিতর দিয়া কিরূপে সমধিক পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে সে প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করিব।

জীবগোস্বামী কৃত 'তত্ত্ব-সন্দর্ভ', 'ভগবৎ-সন্দর্ভ', 'পরমাত্ম-সন্দর্ভ', 'কৃষ্ণ-সন্দর্ভ', 'ভক্তি-সন্দর্ভ' ও 'প্রীতি-সন্দর্ভ' এই ছয়খানি সন্দর্ভের ভিতর দিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সকল মতবাদ—তথা রাধাবাদের দার্শনিক প্রতিষ্ঠা। এই 'ষট্-সন্দর্ভে' আলোচিত মতামতও কতখানি জীবগোস্বামীর নিজের তাহা নির্ধারণ করা শক্ত। প্রত্যেক সন্দর্ভের আলোচনা আরম্ভের পূর্বে জীবগোস্বামী গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটুকু করিয়াছেন, তাহা পাঠে বোঝা যায়, এই গ্রন্থে আলোচিত তথ্যাদি গোস্বামী গোপালভট্টই প্রথমে সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে ইহার আর তেমন সদ্ব্যবহার করেন নাই। এই এলোমেলো ভাবে

ছড়ান তথ্যগুলিকে ভালভাবে সঙ্কলন করিয়া একটি দার্শনিক তত্ত্বালোচনার রূপে দাঁড় করাইবার প্রেরণা এবং উপদেশ জীবগোস্বামী লাভ করিয়াছিলেন জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় রূপ-সনাতনের নিকট হইতে। সুতরাং এখানে গোপালভট্টের দান বা কতটুকু—আর জীবগোস্বামীর দানই বা কতটুকু তাহা স্পষ্ট নির্ধারণ করা সম্ভব নহে।[১]

এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। 'ষট্-সন্দর্ভ' গ্রন্থ মধ্যে জীবগোস্বামীর (গোপালভট্টেরই হোক অথবা জীবগোস্বামীরই হোক) নিজস্ব বলিষ্ঠ মতামত খুব বেশী নহে; মোটামুটি ভাবে আমরা এখানে পুরাণাদির মতের একটি সার-সঙ্কলন এবং তাহার স্থানবিশেষে কিছু কিছু নূতন ব্যাখ্যামাত্র দেখিতে পাই। জীবগোস্বামী এইজন্য তাঁহার আলোচনার আরম্ভেই শাস্ত্ররূপে পুরাণের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এইপুরাণগুলির মধ্যে আবার শ্রীভাগবত-পুরাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীবগোস্বামীর আলোচনা সকলই মুখ্যত: এই ভাগবত-পুরাণকে অবলম্বন করিয়া। ভাগবত-পুরাণের ব্যাখ্যা বিষয়ে আবার জীবগোস্বামী পূর্বসূরী শ্রীধর-স্বামীকেই সর্বত্র অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য দেখিতে পাইব, জীবগোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভগুলির ভিতরে যে-সকল তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহা প্রায় সবই মোটামুটিভাবে পূর্ববর্তিগণের আলোচনার ভিতরে পাওয়া যায়। নিজে তিনি যেখানে যেটুকু আলোচনা তুলিয়াছেন তাহাও পুবাণগুলির প্রামাণিকতার দ্বারাই সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কবিয়াছেন। সুতরাং শক্তি-তত্ত্বাদির ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের পূর্ববর্ণিত পুবাণাদির মতই আবাব ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন আলোকে নূতন প্রসঙ্গে দেখা দিতেছে। পূর্ববর্তী মতামতের সহিত এই মতসাম্য বা মতসাদৃশ্যের কথা পরে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রাখি।

গৌড়ীয় গোস্বামিগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত রাধা-তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে

[১] জয়তাং মথুরাভুমৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ।
যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বজ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাম্॥
কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ।
বিবিচ্য ব্যলিখদ্ গ্রন্থং লিখিতাদ্‌বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্যালোচ্যাথ পর্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥

প্রথমে আমাদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের শক্তিতত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এই শক্তিতত্ত্বকে আবার বুঝিতে হইলে তাহার পূর্বে গোস্বামিগণ ব্যাখ্যাত ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্বকে বুঝিয়া লইতে হইবে। শ্রীমদ্‌ভাগবতেই আমরা এই পরমতত্ত্বের এই তিন রূপ বা স্তরের আভাস পাই।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

যাহা অদ্বয়জ্ঞান তাহাকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন ; সেই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ রূপে কথিত হন। ইহার ভিতরে প্রথম ব্রহ্মতত্ত্ব হইল পরমতত্ত্বের সর্ববিধ শক্ত্যাদির বিকাশরহিত নির্বিশেষ অবস্থা ; ব্রহ্মের ভিতরে শক্ত্যাদিব হইল ন্যূনতম বিকাশ ; শক্ত্যাদির সর্বোত্তম প্রকাশ-সমন্বিত যে তত্ত্ব তাহাই হইল পূর্ণভগবত্তত্ত্ব। যে তত্ত্বের ভিতরে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ তাহা যে তত্ত্বেব ভিতরে শক্তির ন্যূনতম বিকাশ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইজন্য গৌড়ীয় মতে ব্রহ্ম এবং ভগবান্ অংশ এবং অংশী রূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মতত্ত্ব ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গতই একটি তত্ত্ব ; এই কারণে উপনিষদাদিতে বর্ণিত ব্রহ্ম পুরুষোত্তম ভগবানের 'তনুভা'—পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্ছটা রূপেই বর্ণিত হইয়া থাকেন।[১] এই জন্যই গীতায় পুরুষোত্তম ভগবান্ বলিয়াছেন,—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'—'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'। এই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, মুনিঋষিগণ তাঁহাদের সাধনার দ্বারা 'তৎ-স্বরূপতা'কে প্রাপ্ত হইলেও সেই 'তৎ-স্বরূপে'র ভিতরে যে স্বরূপ-শক্তির বিচিত্রলীলা রহিয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই ; সুতরাং তাঁহারা সামান্যভাবে লক্ষিত পরম-তত্ত্বকে 'অবিবিক্ত-শক্তি-শক্তিমত্তা-ভেদতয়া'—অর্থাৎ শক্তি এবং শক্তিমান্‌কে পৃথক্ রূপে গ্রহণ না করিয়া সম্পূর্ণ অভেদরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন ; এই সামান্য ভাবে লক্ষিত অভেদরূপে প্রতিপাদ্যমান তত্ত্বই হইল ব্রহ্মতত্ত্ব। সেই একই তত্ত্ব আবার তাঁহার স্বরূপভূতা বিচিত্রশক্তিবলে যখন একটি 'বিশেষ' রূপ ধারণ

১ যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা ইত্যাদি।
ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্বিশেষে প্রকাশে।
সূর্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে॥ চরিতামৃত, (মধ্য ২০ অ)
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্মল॥
চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ। ইত্যাদি, ঐ, (আদি, ২য়)

করেন এবং অন্যান্য শক্তিসমূহেরও (অর্থাৎ স্বরূপভূতা নয় এমন জীবশক্তি ও মায়াশক্তি প্রভৃতির) মূলাশ্রয় রূপে অবস্থান করেন—শুধু তাহাই নহে, তাঁহার স্বরূপভূতা আনন্দশক্তি ভক্তিরূপ ধারণ করিয়া পরিভাবিত করিয়াছে যে-সকল ভাগবত পরমহংসগণকে—তাঁহাদের অন্তরিন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয়ে যিনি আনন্দময়-রূপে পরিস্ফূর্ত হন—যিনি তাঁহার বিবিধ বিচিত্র শক্তি ও শক্তিমান্ এই দুই ভেদরূপে প্রতিপাদ্যমান—তিনিই ভগবান্ শব্দের বাচ্য।[১] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আনন্দমাত্ররূপে তিনিই একমাত্র বিশেষ্য এবং সমস্তশক্তি হইল তাঁহার বিশেষণ; এই অনন্তশক্তি-বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট যিনি তিনিই ভগবান্। এইরূপ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হওয়াতে পূর্ণাবির্ভাবহেতু এই ভগবান্ই অখণ্ড-তত্ত্ব; আর ব্রহ্ম 'অপ্রকটিত-বৈশিষ্ট্যাকার'হেতু সেই ভগবানেরই 'অসম্যগাবির্ভাব'। জীবগোস্বামী তাঁহার 'ভগবৎ-সন্দর্ভে'র সকল আলোচনার শেষে ভগবানের একটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন; তাহাতে বলা হইয়াছে, "যিনি সচ্চিদানন্দৈকরূপ, স্বরূপভূত-অচিন্ত্য-বিচিত্র-অনন্তশক্তিযুক্ত, যিনি ধর্ম হইয়াও ধর্মী, নির্ভেদ হইযাও ভেদবিশিষ্ট, অরূপী হইয়াও রূপী, ব্যাপক হইযাও পরিচ্ছিন্ন, যিনি পরস্পরবিরুদ্ধ অনন্তগুণের নিধি; যিনি স্থূলসূক্ষ্মবিলক্ষণ স্বপ্রকাশাখণ্ড স্বরূপভূতশ্রীবিগ্রহ, স্বানুরূপা স্বশক্তির আবির্ভাবলক্ষণা লক্ষ্মীর দ্বারা রঞ্জিত যাঁহার বামাংশ, যিনি স্বপ্রভাবিশেষাকার-রূপ পরিচ্ছদ এবং পরিকরসহ নিজধামে বিরাজমান, যিনি স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ অদ্ভুতগুণলীলাদির দ্বারা আত্মারাম মুনিগণের চিত্তও লীলারসে চমৎকৃত করেন, যিনি নিজে সামান্যপ্রকাশাকারে ব্রহ্মতত্ত্বরূপে অবস্থিত, যিনি জীবাখ্য-তটস্থাশক্তির এবং জগৎপ্রপঞ্চের মূলীভূত মায়াশক্তির আশ্রয়—তিনিই হইলেন ভগবান্।" "ভগ" শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য; বিবিধবিচিত্র শক্তিই দান করে সকল ঐশ্বর্য; এইজন্য পূর্ণবিকশিত শক্তিমান্ পুরুষই হইলেন ভগবান্।

এই ভগবান্ই আবার জীব ও জড়জগৎ রূপ প্রকৃতি-সংশ্রবে পরমাত্মা রূপে

১ তদেকমেবাখণ্ডানন্দস্বরূপং তত্ত্বং থূৎকৃতপারমেষ্ঠ্যাদিকানন্দসমুদয়ানাং পরমহংসানাং সাধনবশাৎ তাদাত্ম্যাপন্নে সত্যামপি তদীয়স্বরূপশক্তি-বৈচিত্র্যাং তদ্গ্রহণাসমর্থে চেতসি যথা সামান্যতো লক্ষিতং তথৈব স্ফুরদ্ বা তদ্বদেবাবিবিক্তশক্তিশক্তিমত্তাভেদতয়া প্রতিপাদ্যমানং বা ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। অথ তদেকং তত্ত্বং স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা কমপি বিশেষং ধর্তুং পরাসামপি শক্তীনাং মূলাশ্রয়রূপং তদনুভবানন্দসন্দোহান্তর্ভাবিততাদৃশব্রহ্মানন্দানাং ভাগবতপরমহংসানাং তথানুভবৈকসাধকতম তদীয়স্বরূপানন্দশক্তিবিশেষাত্মক-ভক্তিভাবিতেষন্তর্বহিরপীন্দ্রিয়েষু পরিস্ফুরদ বা তদ্বদেব বিবিক্ততাদৃশশক্তিশক্তিমত্তাভেদেন প্রতিপাদ্যমানং বা ভগবানিতি শব্দ্যতে। —ভগবৎ-সন্দর্ভ।

প্রতিভাত হন। চিৎ-অচিতের অন্তর্যামী রূপে তিনিই পুরুষ—তিনিই কর্তা। যিনি ভগবান্ তাঁহার শুধু স্বরূপ-শক্তিতেই বিলাস, তিনি 'স্বরূপশক্ত্যেকবিলাসময়', সুতরাং বিশ্বপ্রপঞ্চাদি ব্যাপারে তিনি স্বয়ং অহেতু; কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চবিষয়ে তিনি স্বয়ং উদাসীন হইলেও তাঁহার অংশলক্ষণ পরমাত্ম-পুরুষই আবার প্রকৃতি-জীব-প্রবর্তকরূপে সর্গস্থিত্যাদির হেতু হইয়া থাকেন। ভগবানের পরমাত্মা-রূপ অংশপুরুষেই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড স্থিত; গীতাতেও তাই বলা হইয়াছে, 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ'। সুতরাং পরমাত্মা হইলেন জীব ও জগতের হেতু-কর্তা—যিনি আত্মাংশভূতজীবের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেহাদি এবং দেহাদি-উপলক্ষিত তত্ত্ব-সকল সঞ্জীবিত করিয়াছেন, এবং যাঁহার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া জীব এবং প্রধানাদি সকল তত্ত্ব স্বস্ব কার্যে প্রবর্তিত হইতেছে। এই পরমাত্মা সর্বজীবনিয়ন্তা; জীবের হইল আত্মত্ব, তাহারই অপেক্ষায় তন্নিয়ন্তার হইল পরমাত্মত্ব; তাই পরমাত্মা শব্দের দ্বারা বোঝা যায়, তিনি জীবেরই সহযোগী। সংক্ষেপে এই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বিবরণ দিতে গিয়া জীবগোস্বামী বলিয়াছেন যে, শক্তিবর্গের দ্বারা লক্ষিত ধর্মের অতিরিক্ত যে কেবল জ্ঞান তাহাই হইল ব্রহ্ম, প্রচুর-চিৎ-শক্তির অংশস্বরূপ যে জীবশক্তি এবং অপর যে মায়াশক্তি—এই দুই শক্তিদ্বারা বিশিষ্ট যে পুরুষ তিনিই হইলেন পরমাত্মা, আর পরিপূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট যিনি তিনি হইলেন ভগবান্।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই তিন তত্ত্ব লইয়া আমরা উপরে সংক্ষেপে যেটুকু আলোচনা করিলাম তাহাতে দেখিতে পাইলাম, শক্তি-প্রকাশের প্রকার-ভেদ এবং তারতম্য লইয়া একই অদ্বয়-অখণ্ড পরমতত্ত্বের তিন বিভিন্নাবস্থা। এই পরমতত্ত্বের ভিতরে যে অচিন্ত্য অনন্তশক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহা উপনিষদাদি হইতে আরম্ভ করিয়া (তু—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' ইত্যাদি) সর্বশাস্ত্রেই স্বীকৃত। যে অবস্থার ভিতরে এই শক্তিসমূহের অস্তিত্ব এবং লীলাবৈচিত্র্য কিছুই অনুভবে আসে না তাহা হইল ব্রহ্মাবস্থা; আব যিনি স্বরূপশক্তির সহিত সাক্ষাৎভাবে লীলামগ্ন, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে স্পৃষ্ট না হইলেও সেই সকল শক্তির মূলাশ্রয়-স্বরূপ শক্তিসমূহের পূর্ণতম বিকাশে লীলা-নন্দময় ষড়ৈশ্বর্যশালী পুরুষোত্তম, তিনিই হইলেন ভগবান্; আর স্বরূপশক্তির সহিত যুক্ত না থাকিয়া জীবশক্তি এবং মায়াশক্তির সহিত প্রত্যক্ষসম্বন্ধযুক্ত তত্ত্বই হইলেন পরমাত্মা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে প্রথমে তাহা হইলে দেখিতেছি, লীলাময় ভগবানের

যে অচিন্ত্য অনন্তশক্তি রহিয়াছে এই শ্রুতি-পুরাণাদিতে ব্যাখ্যাত এবং প্রখ্যাত সত্যটিকেই খুব বেশী প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ভগবানের এই অচিন্ত্য অনন্ত-শক্তিকে সাধারণ-ভাবে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে, তাহা হইল অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, তটস্থা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। শক্তির এই ত্রিধাভেদ মুখ্যতঃ বিষ্ণু-পুরাণের একটি বচনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত—যেখানে শক্তিকে পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[১] স্বরূপ-শক্তির অবস্থান প্রকৃতির পরপারে, সুতরাং ইহা হইল অপ্রাকৃত নিত্য গোলকধামের বস্তু। জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি উভয়েই প্রকৃতির বশ—উভয়েই তাই প্রাকৃতশক্তি। ভগবান্ স্বয়ংই সর্বপ্রকারের শক্তির মূল আশ্রয়; সেই অর্থে তটস্থা জীবশক্তিও তাঁহারই শক্তি। কিন্তু স্বরূপশক্তিই একমাত্র তাঁহার স্বরূপভূতা, ইহা তাঁহার আত্মমায়া। জীবমায়া ও গুণমায়া রূপা জীবশক্তি ও মায়াশক্তির সংশ্রব হইল ভগবদংশপুরুষ পরমাত্মার সহিত; সুতরাং ভগবানের সহিত এই শক্তিদ্বয়ের সম্বন্ধ একান্ত ভাবেই পরোক্ষ।

ভগবানের এই অনন্ত শক্তিকে ত্রিবিধা না বলিয়া চতুর্বিধাও বলা যাইতে পারে। একই পরতত্ত্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা চতুর্ধা অবস্থান করেন; প্রথমতঃ সর্বদাই স্বরূপে অবস্থান, দ্বিতীয়তঃ তদ্রূপ বৈভব, তৃতীয়তঃ জীব এবং চতুর্থতঃ প্রধান বা প্রকৃতিতে। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে হইল পরম-তত্ত্বের প্রথম অবস্থান, পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত বিভিন্ন অবতারাদি বৈভব এবং শুদ্ধসত্ত্বময় বৈকুণ্ঠাদি ধাম ও সেই ধামে ভগবানের নিত্যপরিকরগণ, ইঁহারাই হইলেন পরমতত্ত্বের দ্বিতীয়রূপে অবস্থান। নিজের অচিন্ত্যশক্তিবলে যেমন তিনি তাঁহার নিত্যস্বরূপে বর্তমান থাকেন, তেমনই আবার সেই স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিবলেই নিজকে বিভিন্ন প্রকারের অবতার রূপে প্রকাশ করেন, নিজের স্বরূপকেই ধাম ও পরিকরাদিরূপে বিস্তীর্ণ করেন। এই উভয়রূপে অবস্থানই তাঁহার স্বরূপ-শক্তি দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। তাঁহার তটস্থা শক্তি দ্বারা জীবরূপে তাঁহার পরিণতি, বহিরঙ্গা মায়া শক্তি দ্বারা তাঁহার জগৎ-রূপে পরিণতি। এই যে এক পরমতত্ত্বের নিত্যস্বরূপে অবস্থান, অবতারাদি এবং ধাম ও পরিকরাদি আত্মবৈভবরূপে দ্বিতীয় অবস্থান এবং জীব ও জগৎরূপে পরিণতি এই তত্ত্বটি সূর্যের বিভিন্ন অবস্থান বা পরিণতির দৃষ্টান্তে বুঝাইবার

১ এই গ্রন্থের ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

চেষ্টা হইয়াছে। সূর্য যেমন প্রথমে তাহার অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজ রূপে অবস্থান করে, দ্বিতীয়তঃ সেই অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজেরই ঐশ্বর্যে বা বিস্তারে তৎ-সংলগ্ন তেজোমণ্ডল রূপে অবস্থান করে, তৃতীয়তঃ সেই মণ্ডলের বহির্গত রশ্মিরূপে এবং চতুর্থতঃ তৎপ্রতিচ্ছবিরূপে অবস্থান। এখানে সূর্যের অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজের অনুরূপ হইল পরমতত্ত্বের স্বরূপে অবস্থান, মণ্ডল হইল তদ্রূপবৈভব রূপে অবস্থান, জীব হইল মণ্ডলবহির্গত রশ্মিস্থানীয় এবং জগৎ হইল প্রতিচ্ছবিস্থানীয়।[১] আমরা বিষ্ণুপুরাণে দেখিয়া আসিয়াছি, ইহাকেই একদেশস্থিত অগ্নির বিস্তারিণী জ্যোৎস্নার মত বলা হইয়াছে। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, এক তাঁহারই ভাসের দ্বারা সকলই প্রকাশ পায়। যদি বলা হয় ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, সর্বব্যাপক ব্রহ্মের আবার এইরূপে চতুর্ধা অবস্থানের সম্ভাবনা নাই, তাহার জবাবে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মের 'অচিন্ত্য' শক্তি দ্বারা সকল কিছুই সম্ভব হইতে পারে ; যাহা কিছু দুর্ঘট তাহাকে ঘটাইয়া তুলিবার সামর্থ্যই ত শক্তির 'অচিন্ত্য'ত্ব ; 'দুর্ঘট-ঘটকত্বং চাচিন্ত্যত্বম্'। 'অচিন্ত্য' বলিয়া ব্রহ্মের এই শক্তি কল্পনামাত্র নহে। এই সকল শক্তিই যে 'স্বাভাবিকী' পূর্ববর্তী সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় এই কথার উপরেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও জোর দিয়াছেন। একদিক্ হইতে বিচার করিলে শক্তিমাত্রই 'অচিন্ত্য', কারণ শক্তির স্বরূপ কখনই মানুষের জ্ঞানগোচর নহে ; সংসারে 'মণিমন্ত্রাদি'র যে শক্তি—তাহাও ত 'অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর'। 'অচিন্ত্য' শব্দের তাৎপর্য হইল, যাহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তর্কসহ নহে, শুধু কার্যফলের প্রমাণেই যাহা গোচরীভূত হয় ; এইজন্যই বলা হইয়াছে,—"অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ সন্তি।" ভিন্ন অভিন্ন ইত্যাদি বিকল্পের দ্বারা যাহার চিন্তা করা যায় না, কেবল অর্থাপত্তির দ্বারাই যাহা জ্ঞানগোচর হয়, তাহাই হইল 'অচিন্ত্য'।

পরমতত্ত্বের এই চতুর্ধা অবস্থানের ভিতর দিয়া তাহা হইলে আমরা পরমতত্ত্বের ত্রিবিধা শক্তির কথা জানিতে পারিলাম। স্বরূপ-শক্ত্যাখ্যা অন্তরঙ্গা শক্তি-দ্বারা তিনি পূর্ণভগবৎ-স্বরূপে এবং বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব-রূপে অবস্থান করেন ; রশ্মিস্থানীয়া তটস্থা শক্তিদ্বারা 'চিদেকাত্মশুদ্ধ-জীবরূপে' এবং মায়াখ্যা বহিরঙ্গা শক্তিদ্বারা প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় বহিরঙ্গবৈভব জড়াত্ম প্রধান (প্রকৃতি) রূপে অবস্থান করেন।

১ একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্যান্তর্মণ্ডলস্থতেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ।

—ভগবৎ-সন্দর্ভ।

ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি সম্বন্ধে আমরা ষট্‌-সন্দর্ভে যে আলোচনা পাই তাহা মোটামুটি-ভাবে পুরাণাদি-বর্ণিত মায়া-তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি। আমরা পুরাণাদিতে মায়াকে ভগবানের 'অপরা' শক্তি বলিয়া বর্ণিত দেখিয়া আসিয়াছি। মায়ার এই 'অপরা' রূপকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নানাভাবে আরও বর্ধিত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মতে মায়া হইল 'তদপাশ্রয়া' শক্তি; 'অপ' অর্থ অপকৃষ্ট, সুতরাং 'অপাশ্রয়া' অর্থ হইল অতি অপকৃষ্টরূপে আশ্রয় যাহার; তাৎপর্য এই যে, তাঁহার অপকৃষ্ট স্থিতির জন্য মায়া কখনও ভগবানের সাক্ষাৎ স্পর্শে—এমন কি সাক্ষাৎ দৃষ্টির সম্মুখেও আসে না, তাহাকে নিলীয় ভাবে, অর্থাৎ আড়ালে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হয়। এই কথাই বলা হইয়াছে ভাগবত-পুরাণে, যেখানে বলা হইয়াছে, ভগবানের অভিমুখে অবস্থান করিতে বিশেষরূপে লজ্জিত হইয়া এই মায়া অনেক দূরে সরিয়া যায়।[১] এই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইল শ্রীভগবানের বহির্দ্বারসেবিকা দাসীর ন্যায়; আর অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি হইল শ্রীভগবানের পট্টমহিষীর ন্যায়। দাসী যেমন গৃহস্বামীরই আশ্রিতা বটে, তদাশ্রিতা হইয়াই সে যেন প্রভু হইতে অনেক দূরে দূরে সরিয়া থাকিয়া প্রভুরই তৃপ্তিবিধানের নিমিত্ত বহিরঙ্গনে সর্বপ্রকার সেবাকার্যে নিযুক্তা থাকে, মায়াশক্তিও ঠিক তদ্রূপ; ভগবানের আশ্রিতা হইয়া সে ভগবানেরই বহির্দ্বারিকা সেবিকার ন্যায় সৃষ্ট্যাদি কার্যে ব্যাপৃতা থাকে। মায়ার ভগবানের সঙ্গে কোন সাক্ষাৎসম্বন্ধ ত' নাই-ই, তদংশভূত-পুরুষের অর্থাৎ পরমাত্মারও 'বিদূরবর্তিতয়ৈবাশ্রিতত্বাৎ'—অনেক দূরবর্তী থাকিয়া আশ্রিত হইবার নিমিত্ত মায়ার হইল একান্ত 'বহিরঙ্গসেবিত্ব'। বাড়ির দাসী যেমন গৃহকর্ত্রীর দ্বারা বশীভূতা থাকে, গৃহস্বামীর সে যেরূপ কোনও ভাবেই শান্তিভঙ্গের কারণ হইতে পারে না, ভগবান্‌ও সেইরূপ তাঁহার চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তিদ্বারা মায়াকে বশীভূত রাখিয়া সর্বপ্রকারের প্রাকৃত-গুণ-স্পর্শহীন ভাবে আপনার মধ্যে আপনি কেবলরূপে অবস্থিত আছেন।[২] পূর্বে আমরা ভাগবত-পুরাণে 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত' ইত্যাদি শ্লোকে[৩] মায়ার যে সংজ্ঞা দেখিয়া আসিয়াছি জীবগোস্বামী তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, অর্থ—অর্থাৎ পরমার্থ-স্বরূপ আমাকে ব্যতীতই যাহা প্রতীত হয়, আমার প্রতীতিতে যাহার প্রতীতির অভাব, আমার বাহিরেই হইল যাহার

১ মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা ইত্যাদি। ২।৭।৪৭ (বঙ্গবাসী)

২ মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥—ভাগবত, ১।৭।২৩

৩ ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রতীতি,—অথচ নিজে নিজে যে প্রতীত হইতে পারে না—অর্থাৎ মদাশ্রয়ত্ব বিনা যাহার কোন স্বতঃ প্রতীতি নাই—তাহাই হইল আমার মায়া—জীবমায়া এবং গুণমায়া। 'যথা ভাসঃ' আর 'যথা তমঃ' এই দুইটি দৃষ্টান্তের দ্বারা মায়ার জীবমায়া ও গুণমায়া এই দ্বিধাত্বই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। আয়ুর্বেদবিদ্‌গণও এই জগদ্‌যোনিরূপা নিত্যপ্রকৃতি মায়াকে অচিন্ত্যচিদানন্দৈকরূপী ভাস্বর পুরুষের প্রতিচ্ছায়ারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা মায়ার দুইটি স্বতন্ত্র বৃত্তিরও উল্লেখ পাইলাম, এই দুই প্রকারের মায়াকে বলা হয় 'গুণমায়া' এবং 'জীবমায়া'। সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই হইল গুণমায়া; এই গুণমায়াই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের গৌণ-উপাদানরূপে স্বীকৃত। জীবমায়া জীবকে ভগবদ্‌বিমুখ করিয়া তাহার স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া ফেলে এবং জাগতিক বস্তুতেই তাহাকে আসক্ত করিয়া তোলে। সৃষ্টিকার্যে মুখ্য নিমিত্ত-কারণ হইলেন ঈশ্বর; কিন্তু জীববিমোহনকারিণী এই জীবমায়া সৃষ্টিকার্যে গৌণ নিমিত্তকারণরূপে স্বীকৃত।

পূর্বেই দেখিয়াছি, বৈষ্ণবগণ পরিণামবাদী; জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম, বিবর্ত নহে। সত্যসঙ্কল্প, সত্যপরায়ণ ঈশ্বরের পরিণাম বলিয়া সৃষ্ট্যাদি লীলাত্রয়েরও সত্যত্ব রহিয়াছে, তাহারা ভ্রমমাত্ররূপে মিথ্যা নহে।[১] এখানে মায়াসৃষ্টি কথা দ্বারা ইন্দ্রজালবিদ্যার দ্বারা নির্মিত মিথ্যাসৃষ্টি বুঝায় না; 'মীয়তে' অর্থাৎ 'বিচিত্রং নির্মীয়তে অনয়া' এই অর্থে মায়া; মায়ার এখানে বিচিত্রার্থকর-শক্তিবাচিত্ব। সৃষ্টি পরমাত্মারই পরিণাম; তবে ঈশ্বর নিজে অপরিণামী; সেই অপরিণত ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিদ্বারাই যে পরিণাম তাহা 'সন্মাত্রভাব-ভাসমান-রূপ' যে স্বরূপব্যূহ—সেই স্বরূপব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্যশক্তি দ্বারাই ঘটিয়া থাকে, স্বরূপের দ্বারাই পরিণাম বোঝায় না।[২]

সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে যে চিৎ ও অচিৎ, জীব এবং জড় জগৎ উভয়ই ব্রহ্মের এক মায়াশক্তির সৃষ্টি; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ জীবসৃষ্টি অবলম্বন করিয়া ভগবানের যে শক্তি তাহাকে ভগবানের একটি পৃথগ্‌ভূতা বিশেষ শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 'বিষ্ণু-পুরাণে' এই জীবভূতা বিষ্ণু-শক্তিকে ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা অপরা শক্তি বলা হইয়াছে। গীতাতে দেখিতে পাই শ্রীভগবান্ তাঁহার

---

১ পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ৭১।

২ তত্র চ অপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া তয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমান-স্বরূপব্যূহরূপদ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেণৈব পরিণমতে, ন তু স্বরূপেণেতি গম্যতে। ঐ, ৭৩।

প্রকৃতিকে আবার পরা ও অপরা এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; জড়-জগদাত্মিকা প্রকৃতিই হইল অপরা প্রকৃতি, আর জীবভূতা প্রকৃতিই হইল পরা প্রকৃতি।[১] এই জীব-শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলিবার একটি গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে। সমুদ্রের তটভূমি একদিকে যেমন ঠিক সমুদ্রের ভিতরেও না, আবার অন্যদিকে একেবারে ঠিক বাহিরেও নয়, জীবও ঠিক এইরূপে সম্পূর্ণভাবে স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গতও নয়, সম্পূর্ণভাবে স্বরূপশক্তি-বহির্ভূত মায়াশক্তির অধীনও নয়; একদিকে স্বরূপ-শক্তি, অন্যদিকে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, ইহার মধ্যবর্তিনী বলিয়াই জীবশক্তি তটস্থা শক্তি রূপে খ্যাতা। মায়াশক্তিরও অতীত, আবার অবিদ্যাপরাভবাদি দোষের দ্বারা পরমাত্মারও লেপাভাব—সুতরাং উভয়-কোটিতেই জীবের প্রবেশের অভাব; অন্যদিকে জীবের আবার উভয়কোটিতেই প্রবেশের সামর্থ্য রখিয়াছে, এইজন্যই জীবশক্তি হইল তটস্থা-শক্তি। এ সম্বন্ধে ভাগবতে একটি চমৎকার শ্লোক দেখা যায়; সেখানে বলা হইয়াছে, সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করে তখন সে মায়ার গুণসমূহকেই সেবা করিয়া তদ্ধর্মযুক্ত হইয়া যায় এবং স্বরূপবিস্মৃত হইয়া জন্মমরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে আবার যখন সে ত্বগ্‌বিনির্মুক্ত সর্পের ন্যায় সেই মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাপ্তৈশ্বর্য হয় তখন অণিমাদি অষ্টগুণিত পরমৈশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান্‌ হইয়া অপরিচ্ছন্নরূপে পূজনীয় হয়।[২] এই ভাবেই জীবশক্তির উভয়কোটিতে অপ্রবেশও বটে—উভয়কোটিতে প্রবেশও বটে।

জীবনাম্নী তটস্থা শক্তি অসংখ্য। এই জীবশক্তির দুইটি বর্গ রহিয়াছে, এক বর্গ হইল অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-উন্মুখ, অন্য হইল অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-পরাঙ্মুখ; এই দুই বর্গের কারণ, স্বভাবতঃ ভগবদ্-জ্ঞান-ভাব এবং ভগবদ্-জ্ঞানের অভাব। ইহার ভিতরে প্রথম বর্গের জীব অন্তরঙ্গা শক্তির বিলাসের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে নিত্য-ভগবৎ-পরিকরত্ব লাভ করে; আর দ্বিতীয় বর্গের জীব ভগবৎ-পরাঙ্মুখত্ব দোষহেতু লব্ধছিদ্র মায়াদ্বারা পরিভূত

---

১ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ৭।৫

২ স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ॥ ১০।৮৭।৩৮ (বঙ্গবাসী)

হইয়া সংসারী হয়। কেবল জড়তম অজ প্রকৃতি হইতে অথবা কেবল অজ পুরুষ হইতে জীবের জন্ম হইতে পারে না; বায়ুবিক্ষুব্ধ জল হইতে যেরূপ অসংখ্য বুদ্বুদের উৎপত্তি হয় সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষ উভয়ের সংযোগেই সোপাধিক জীবের উৎপত্তি। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিও অজ, শুদ্ধ জীবরূপ পুরুষও অজ; এই দুই অজ হইতে কোন উৎপত্তি সম্ভবে না; আসলে এতদুভয়ের ভিতর দিয়া পরমাত্মাই হইল সকল জন্মের কারণ। প্রকৃতির সকল বিকার মহাপ্রলয়ে যখন লীন হয় তখন সুপ্তবাসনাহেতু জীবাখ্যা শক্তিসমূহ পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকে; সৃষ্টিকালে আবার এই পরমাত্মলীন শক্তিসমূহ বিকারিণী প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়া ক্ষুভিতবাসনা হইয়া সোপাধিকাবস্থা লাভ করে এবং জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ইতস্তত: ভ্রমণ করে।

মায়ার কার্য হইল শুধু জীববিমোহন—জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটান। গীতায়ও বলা হইয়াছে, অজ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞান আবৃত হয়, তাহাতেই জীবসকল মোহ প্রাপ্ত হয়। এই জীববিমোহন কার্যের জন্য মায়া নিজেই বিলজ্জমানা; তাহার এই জীববিমোহন কার্য ভগবানের ভাল লাগে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া এবং মায়ার সকল কপটাচারই ভগবান্ জানেন ইহা মনে করিয়াই যেন এই মায়া ভগবানের দৃষ্টির সম্মুখে থাকিতে লজ্জিতা হয়; শুধু মাত্র অবিবেকী জনই এই মায়ার অধীন হইয়া দুঃখভোগ করে।[১] জীবের ঈশ্বরপ্রপত্তিই এইজন্য এই মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়।

এই জীবশক্তি মায়াশক্তির সংস্পর্শে আসিয়া মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি স্বরূপে বিলক্ষণ; কারণ জীবশক্তি চৈতন্য-স্বভাবা, মায়াশক্তি হইল জড়স্বভাবা। নিত্য অণুস্বভাব জীব হইল চিন্ময় পরমাত্মার একটি রশ্মিস্থানীয় চিৎ-কণা। এইজন্য জীবশক্তিকে অনেক সময় চিচ্ছক্তি বলিয়াও অভিহিত করা হয়। এই চিচ্ছক্তি কিন্তু ভগবানের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি নয়, এই শক্তি জড়শক্তি নয়—চেতন শক্তি—এই সাধারণ অর্থেই ইহাকে চিচ্ছক্তি নামে অভিহিত করা হয়। আসলে অণুস্বভাব জীব ভগবানেরই অংশ বটে, কিন্তু শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত স্বরূপশক্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অংশ নহে, জীবশক্তি-

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥ ভাগবত, ২।৫।১৩

বিশিষ্ট কৃষ্ণেরই অংশ।[১] প্রশ্ন হইতে পারে, যে পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ শুধুমাত্র স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট হইয়া শুদ্ধরূপে অবস্থান করেন তাঁহার সহিত জীবশক্তির সংস্পর্শ আদৌ কি করিয়া ঘটে? ইহার উত্তরে পরমাত্মসন্দর্ভে দেখিতে পাই, সকল তত্ত্বের ভিতরেই একটা 'পরস্পর অনুপ্রবেশ' রহিয়াছে; শক্তিমান্ পরমাত্মার ভিতরেও জীবশক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং এই অনুপ্রবেশবশতঃই ভগবান্ও জীবশক্তিতে যুক্ত হন।[২]

এইবারে আমরা ভগবানের স্বরূপ-শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই স্বরূপ-শক্তির সহিত বিচিত্র লীলাবিলাসেই ভগবানের ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে পূর্ণত্ব। ভগবান্ শব্দের অর্থে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ প্রভৃতি যে ষাড়্গুণ্য বুঝায় এই ষড়্গুণ-সকলই স্বরূপ-শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। স্বরূপ-শক্তির বিকাশ বলিয়া এই ষড়্গুণ ভগবানে কোনও প্রকারে আরোপিত গুণ নহে, ইহাদের সহিত ভগবানের নিত্য সমবায়-সম্বন্ধ। এক অর্থে শক্তি মাত্রেই মায়া। যাহা দ্বারা পরিমাণ করা হয় (মীয়তে অনয়া ইতি মায়া)—অর্থাৎ যাহা দ্বারা ভগবান্ ভগবদ্রূপে পরিমিত, অনুভূত বা লক্ষিত হন তাহাই তাঁহার মায়া; সুতরাং সেই অর্থে স্বরূপ-শক্তিও ভগবানের মায়া। এইজন্যই বলা হইয়াছে, "মায়াখ্যা স্বরূপ-ভূতা নিত্যশক্তিদ্বারা যুক্ত বলিয়া সনাতন বিষ্ণুকে সকলে মায়াময় বলে।"[৩] স্বরূপ-শক্তি হইল তাঁহার আত্মমায়া। ভগবানের আত্মমায়ার তাৎপর্য হইল ভগবদিচ্ছা; এই ইচ্ছার ভিতরে জ্ঞান ও ক্রিয়া এই দুই বৃত্তিই রহিয়াছে বলিয়া আত্মমায়াও জ্ঞান এবং ক্রিয়া এই দুই বৃত্তি দ্বারাই উপলক্ষিত। এই আত্মমায়া বা স্বরূপ-শক্তিই হইল ভগবানের 'চিচ্ছক্তি'।

গুণময়ী মায়া-প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত বিশুদ্ধ ভগবত্তত্ত্বে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ব্যতীত আর কোনও শক্তি-বৃত্তি নাই। এই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি গণনা করিতে গিয়া প্রথমতঃ দেখিতে পাই, পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ; তাহা হইলে ভগবানের পূর্ণ-স্বরূপে এই তিনটি ধর্ম পাওয়া গেল—সৎ, চিৎ ও

১ জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব জীবোঽংশঃ, ন তু শুদ্ধস্যেতি গময়তি। জীবস্য তচ্ছক্তি-রূপত্বেনৈবাংশত্বমিত্যেতব্যঞ্জয়তি ॥ —পরমাত্ম সন্দর্ভ, ৩৯

২ সর্বেষামেব তত্ত্বানাং পরস্পরানুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈক্যং প্রতীয়ত' ইত্যেবং শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্ত্যনুপ্রবেশবিবক্ষয়ৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিপ্রেতি। —পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ৩৪

৩ ভগবৎ-সন্দর্ভধৃত 'চতুর্বেদশিখা' নাম্নী শ্রুতি। 'মহাসংহিতায়'ও বলা হইয়াছে,—'আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ'।

আনন্দ। ভগবৎ-স্বরূপের এই তিন ধর্মকে অবলম্বন করিয়া ভগবানের স্বরূপ-শক্তিও হইল ত্রিধা—সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী। আমরা পূর্বে বিষ্ণু-পুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আসিয়াছি; সেখানে বলা হইয়াছে—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদ-তাপকরী-মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥ ১।১২।৬৯

"সকলের সংস্থিতিরূপ তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ একরূপ ধারণ করিয়াছে; হ্লাদ, তাপকরী ও মিশ্রা শক্তি গুণবর্জিত তোমাতে নাই।" এখানে হ্লাদকরী শক্তি অর্থে মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী—অর্থাৎ সত্ত্বগুণাত্মিকা শক্তি, তাপকরী অর্থে 'বিষয়বিয়োগাদিষু তাপকরী', অর্থাৎ তামসী শক্তি, আর মিশ্রা অর্থে তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী। গুণবর্জিত ভগবানে এই সকল গুণময়ী শক্তির কোনও স্পর্শ নাই, আছে শুধু তাঁহার স্বরূপের সৎ, চিৎ ও আনন্দাংশকে অবলম্বন করিয়া সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি। সন্ধিনী শক্তি হইল 'সততা' —অর্থাৎ সত্তাকারী, সংবিৎ হইল 'বিদ্যাশক্তি', আর হ্লাদিনী হইল আহ্লাদকরী। ইহার ভিতরে 'হ্লাদিনী' হইল সেই শক্তি যাহা দ্বারা ভগবান্ স্বয়ং হ্লাদকরূপ হইয়াও আহ্লাদিত হন এবং অপর সকলকে আহ্লাদিত করেন। সেইরূপ স্বয়ং সত্তারূপ হইয়াও ভগবান্ যাহা দ্বারা সত্তা ধারণ করেন এবং ধারণ করান, তাহাই হইল 'সর্বদেশকালদ্রব্যাদিপ্রাপ্তিকরী' সন্ধিনী; আর স্বয়ং জ্ঞানরূপ হইয়াও ভগবান্ যাহা দ্বারা নিজে জানেন ও অপরকে জানান—তাহাই হইল সংবিৎ-শক্তি। ইহার ভিতরে আবার উত্তরোত্তর গুণোৎকর্ষের দ্বারা সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী—এই ক্রমেই শক্তিসমূহকে জানিতে হইবে; অর্থাৎ তিন শক্তির ভিতরে সন্ধিনী অপেক্ষা গুণোৎকর্ষে সংবিৎ প্রধানা—কারণ, সত্তার একটি পরম উৎকর্ষের দ্বারাই সংবিৎকে পাওয়া যায়। আবার এই সংবিতের চরম উৎকর্ষ দ্বারাই হয় বিশুদ্ধ আনন্দানুভূতি; সুতরাং গুণোৎকর্ষে হ্লাদিনী শক্তিই হইল তিন শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তি।

ভগবানের এই স্বরূপভূতা মূল শক্তির ভিতরে একটি স্বপ্রকাশতালক্ষণ বৃত্তি-বিশেষ রহিয়াছে; সেই স্বপ্রকাশতালক্ষণ বৃত্তিবিশেষের দ্বারা যখন ভগবানের স্বরূপের বা স্বরূপশক্তির বিশিষ্ট আবির্ভাব ঘটে তাহাকেই বলা হয় 'বিশুদ্ধসত্ত্ব'। স্বপ্রকাশতালক্ষণস্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকেই 'সত্ত্ব' বলে (অত্র সত্ত্বশব্দেন স্বপ্রকাশতালক্ষণস্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ উচ্যতে), ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার স্পর্শাভাব হেতুই (অর্থাৎ প্রাকৃত সত্ত্ব রজ তমের স্পর্শাভাব হেতু) ইহা হইল বিশুদ্ধসত্ত্ব।

এই বিশুদ্ধসত্ত্ব সত্তামাত্র নহে, বিশুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে অন্যনিরপেক্ষ; সুতরাং ভগবানের স্বপ্রকাশ জ্ঞাপন-জ্ঞানবৃত্তিপ্রযুক্ত ইহা সংবিৎ। এই বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন সন্ধিনী-অংশ প্রধান হয় তখন ইহা 'আধার-শক্তি' নাম গ্রহণ করে; সংবিদংশ প্রধান হইলে ইহা হয় 'আত্মবিদ্যা', আর হ্লাদিনীসারাংশ প্রধান হইলে 'গুহ্যবিদ্যা'; আর বিশুদ্ধসত্ত্বে এককালীনই যদি তিনটি শক্তির প্রাধান্য ঘটে তাহা হইলেই হয় ভগবানের 'মূর্তি'। পূর্বোল্লিখিত 'আধার-শক্তি' দ্বারাই ভগবানের ধাম প্রকাশ পায়; আর পূর্বোক্ত মূর্তি দ্বারাই (অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বে যুগপৎ শক্তিত্রয়ের প্রাধান্য দ্বারা) শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ পায়। বিশুদ্ধসত্ত্বই হইল 'বসুদেব', এই বসুদেব হইতে উদ্ভূত শ্রীবিগ্রহই হইল 'বাসুদেব'। 'মূর্তি' শ্রীভগবানেরই শক্ত্যংশের প্রকাশ বলিয়া পুরাণে 'মূর্তি' ধর্মপত্নীরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এই বিশুদ্ধসত্ত্বের ভিতরে হ্লাদিন্যাদির প্রাধান্যের দ্বারাই শ্রী প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব জানিতে হইবে। এই শ্রী প্রভৃতি ভগবানের সম্পদ্-রূপিণী। অমূর্ত শক্তি-মাত্ররূপে তাঁহাদের ভগবদ্‌বিগ্রহাদির সহিত ঐকাত্ম্যে স্থিতি, আর সম্পৎ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত এই দেবীগণ ভগবানের আবরণ রূপে অবস্থান করেন। এবংভূতা অনন্তবৃত্তিকায়া স্বরূপশক্তিই হইল ভগবদ্ধামাংশবর্তিনী মূর্তিমতী লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর বিষ্ণুর সহিত স্বরূপে অভেদত্বের কথা সকল পুরাণাদিতেই বলা হইয়াছে; লক্ষ্মী ও পরমেশ্বরের যে পতি-পত্নীত্ব রূপে বর্ণনা উহা উপচারতঃ ভেদকথনেচ্ছাযই বলা হইয়াছে। আসলে একই স্বরূপশক্তিত্ব এবং শক্তিমত্ত্ব এই দুই রূপে বিরাজ করে; ইহার ভিতরে শক্তি যাঁহার স্বরূপভূত তিনিই হইলেন• শক্তিমত্ত্ব-প্রাধান্যের দ্বারা ভগবান্, সেই স্বরূপই শক্তিত্ব-প্রাধান্যে বিরাজমান হইলে লক্ষ্মী-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।[1] লক্ষ্মী হইতেছেন তাহা হইলে ভগবানের সমগ্র শক্তিরই বিগ্রহ। এই লক্ষ্মী অনন্ত-স্ববৃত্তিভেদে অনন্তা; পুরাণাদিতে শ্রী, পুষ্টি, গির্, কান্তি, কীর্তি, তুষ্টি প্রভৃতি যে বিবিধ বিষ্ণু-শক্তির উল্লেখ পাই তাঁহারা এই একই স্বরূপশক্তির ভেদ মাত্র। প্রথম প্রবৃত্তি-আশ্রয়রূপা ভগবানের স্বরূপভূতা অন্তরঙ্গা মহাশক্তিই হইল মহালক্ষ্মী। শ্রী-আদি সেই মহালক্ষ্মীরই বিভিন্ন বৃত্তিরূপা। ভগবানের শক্তি যেমন সাধারণভাবে অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত ভেদে দ্বিবিধা—শ্রী-

১ অথৈকমেব স্বরূপং শক্তিত্বেন শক্তিমত্ত্বেন চ বিরাজতীতি যস্য শক্তেঃ স্বরূপভূতত্বং নিরূপিতং তচ্ছক্তিমত্ত্ব-প্রাধান্যেন বিরাজমানং ভগবৎ-সংজ্ঞামাপ্নোতি। তচ্চ ব্যাখ্যাতং তদেব চ শক্তিত্ব-প্রাধান্যেন বিরাজমানং লক্ষ্মী-সংজ্ঞামাপ্নোতীতি। —ভগবৎ-সন্দর্ভ।

আদি শক্তিরও সেইরূপ অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত ভেদ দুইটি রূপ আছে। যেমন শ্রী মহালক্ষ্মীর অংশরূপে হইলেন ভাগবতী সম্পৎ, অন্যদিকে তিনি হইলেন প্রাকৃত-রূপে 'জগতী সম্পৎ'। এইরূপে 'ইলা' 'লীলা'-রূপিণীও বটেন, আবার 'ভূ'-রূপিণীও বটেন। এইরূপে মহালক্ষ্মীর অন্তর্গতা যে ভেদশক্তি তাহা বিদ্যারূপিণী—ইহা 'বোধ-কারণ', ইহা সংবিৎ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। অপ্রাকৃত মাতৃভাবাদি যে প্রেমানন্দ-বৃত্তি তাহার ভিতরে ভগবানের বিভুত্বাদির বিস্মৃতির দ্বারা একটা ভেদবোধের প্রতীতি আছে—ইহা সেই 'বিদ্যারূপিণী' ভেদ ; আর প্রাকৃতে এই ভেদশক্তিই অবিদ্যারূপে প্রকাশিত, ইহাই সংসারিগণের স্ব-স্বরূপ-বিস্মৃতি-আদির হেতুরূপ আবরণাত্মক বৃত্তিবিশেষ। এই মহালক্ষ্মীরই তিনটি ভেদ হইল সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী। ভক্তির আধার-শক্তিরূপা মূর্তি, বিমলা, জয়া, যোগা, প্রহ্বী, ঈশানা প্রভৃতিকেও সেই মহালক্ষ্মীরই অংশবিশেষ জানিতে হইবে। ইহার ভিতর 'সন্ধিনী' হইলেন সত্তা, 'জয়া' হইলেন উৎকর্ষিণী শক্তি, 'যোগা' যোগমায়া, সংবিৎ জ্ঞানাজ্ঞান-শক্তি, 'প্রহ্বী' বিচিত্রানন্দ সামর্থ্যহেতু, 'ঈশানা' হইলেন সর্বাধিকারিতা-শক্তির হেতু। ইঁহাদের সকলেরই যেমন অপ্রাকৃত রূপ এবং বৃত্তি রহিয়াছে তেমনই আবার প্রাকৃত রূপ এবং বৃত্তিও রহিয়াছে।

শ্রীভগবানের এই স্বরূপ-শক্তির প্রকাশ দুইভাবে, এক তাঁহার স্বরূপ, আর তাঁহার স্বরূপ-বিভবে। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, ভগবানের স্বরূপশক্তির ভিতরে স্বপ্রকাশতালক্ষণ বৃত্তিবিশেষ রহিয়াছে, তাহাই হইল বিশুদ্ধসত্ত্ব ; এই বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতেই পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধাম, পরিকর, সেবকাদিরূপ বৈভবের বিস্তার। লীলা-পার্ষদগণও তাঁহার এই স্বরূপবৈভবের অন্তর্গত ; সেই নিজ বৈভবের সহিতই আবার রসময় শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য। এই বৈভবের ভিতরে প্রথমে হইল ধামতত্ত্ব। ভগবান্ ও তাঁহার ধাম একই ; কারণ, বৈকুণ্ঠাদি ধাম তাঁহার স্বরূপেরই শুদ্ধসত্ত্বময় বিস্তৃতি। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরে বিরজা নামে একটি নদী প্রবাহিতা। সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি প্রাকৃতগুণের মধ্যে রজ বা তম এখানে বিগত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহা বিরজা নদী। এই বিরজার পরপারে হইল পরব্যোম, এই পরব্যোমেই হইল বিশুদ্ধসত্ত্বময় বৈকুণ্ঠাদি ধামের অবস্থিতি। এই ধামে গৃহ-প্রাসাদ, নদীগিরি, বন-উপবন, তরুলতা, ফলফুল, পশুপাখী—সবই রহিয়াছে ; তাহারা সবই অপ্রাকৃত দিব্যরূপে অবস্থান করিতেছে। ভগবানের আবির্ভাবমাত্রই যেমন তাঁহার জন্ম, সেইরূপ বৈকুণ্ঠের কল্পনাও বৈকুণ্ঠের আবির্ভাব মাত্র, প্রাকৃতবৎ কৃত্রিম নহে। এইজন্য ভগবান্‌ও যেমন নিত্য, তেমনই ভগবৎ-

ধামও নিত্য ; সেখানকার পার্ষদ, পরিকর, সেবক-ভক্ত—সবই নিত্য, সেখানকার লীলাও তাই নিত্য। এই নিত্যভক্ত পার্ষদগণ তাই ভগবৎ-সদৃশ এবং কালাতীত। এই ধাম ও সেবক পার্ষদাদি সকলই স্বরূপান্তঃপাতী হইলেও একটি ভেদলক্ষণা বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্নরূপে তাহাদের প্রকাশ ; এই বিভিন্ন প্রকাশ শ্রীভগবানেরই প্রকাশ-বিশেষ-বৈচিত্র্য প্রকট করিবার জন্য।

এই ধাম সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের অনেক বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে ; আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি, বৈকুণ্ঠাদি ধামের ভিতরেও সর্বোচ্চ ধাম হইল গোলক ; এই গোলকই হইল গোকুল, এই সর্বোচ্চ গোলক ধামেই দ্বিভুজমুরলীধারী গোপ-বেশে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা। শ্রীকৃষ্ণের দেহের এবং লীলার যেরূপ অপ্রকটত্ব এবং প্রকটত্ব রহিয়াছে, তাঁহার ধামেরও সেইরূপ অপ্রকটত্ব এবং প্রকটত্ব রহিয়াছে। অপ্রকট গোলক বা গোকুল এবং প্রকট গোলক বা গোকুল স্বরূপতঃ একই ; শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা যুগপৎ এই প্রকট এবং অপ্রকট ধাম ও লীলা বিস্তারিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য অনুসারে এই কৃষ্ণলোক গোলকেরও আবার ত্রিধা প্রকাশ—দ্বারকা, মথুরা এবং বৃন্দাবন ; তিন ধামে শ্রীভগবানের লীলাও তিন প্রকারের, পরিকরাদিও তিন প্রকারের। প্রকট ধামে যেরূপ যমুনাদি নদী, কুঞ্জ-নিকুঞ্জ, কদম্ব-অশোক, গোপ-গোপী, ধেনু-বৎস, শুকসারী প্রভৃতি রহিযাছে, অপ্রকট ধামেও অনুরূপ সবই রহিয়াছে ; একটি হইল অপর-টির 'প্রকাশ-বিশেষ' মাত্র। দ্বারকা-মথুরায় যাদবগণই হইল কৃষ্ণের লীলা-পরিকর, আর সর্বোত্তম বৃন্দাবন-লীলায় গোপ-গোপীগণই হইল কৃষ্ণের নিত্য-পরিকর।* শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এই গোপ গোপীগণেরও প্রকট-অপ্রকট বপু রহিয়াছে।

স্বরূপে ভগবান্ হইলেন 'রসময়'; তাঁহার এই রসময়ত্ব শ্রুত্যাদিতে পরিগীত। ভগবানের এই রসময়ত্বের কারণ তাঁহার স্বরূপশক্তির ভিতরে শ্রেষ্ঠ হ্লাদিনী-শক্তি। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, এই হ্লাদিনী-শক্তির দুইটি কাজ, এক হইল হ্লাদস্বরূপ ভগবান্‌কেই আহ্লাদিত করা, অন্য হইল, অপরকেও হ্লাদ দান করা। এই হ্লাদিনী-শক্তির তাহা হইলে জীবকোটি এবং ভগবৎ-কোটি এই উভয়কোটিতেই প্রবেশ রহিয়াছে। ভগবৎ-কোটিতে অবস্থিত হ্লাদিনী ভগবান্‌কে বিচিত্র লীলারস দানের দ্বারা রসময় করিয়া তুলিতেছে, আবার জীবকোটিতে প্রবেশ করিয়া এই হ্লাদিনী পূত ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া বিশুদ্ধতম আনন্দ বিধান করিতেছে। এই ভগবন্মুখী জীবগত বিশুদ্ধ আনন্দই ভক্তি। ভক্তের যে ভক্তি-জনিত আনন্দ এবং ভগবানের লীলাজনিত আনন্দ—এই দুইটিই একই হ্লাদিনী-

শক্তিরই দুইকোটিতে দুইটি ব্যাপার। ভগবানের ভিতরে হ্লাদিনী হইল রস-রূপিণী—ভক্ত-হৃদয়ে হ্লাদিনী হইল ভক্তি-রূপিণী। এই যে স্বরূপশক্তির সারভূতা হ্লাদিনী-শক্তি—তাহারই সারঘন মূর্তি হইলেন শ্রীরাধা—নিত্যপ্রেমস্বরূপেরই নিত্য প্রেমস্বরূপিণী। রাধা তাই শুধু মাত্র প্রেমরূপিণী নহেন, রাধাই আবার নিত্য প্রেমদাত্রী। পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভিতরে এই রাধার অবস্থান অনন্ত হ্লাদিনী-শক্তিরূপে; কিন্তু সেই অনন্তহ্লাদিনী-শক্তিরই কণামাত্র নিত্য অণুস্বভাব চিৎকণ জীবের ভিতরে পতিত হইয়া তাহাকে প্রেম-ভক্তিতে আপ্লুত করিয়া রাখে। এইজন্য রাধা ভগবানেরও প্রেমকল্পলতা—আবার ভক্তেরও প্রেমকল্পতরু।[১]

আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, শ্রীভগবানের সমগ্র স্বরূপশক্তির সাধারণ নাম হইল লক্ষ্মী বা মহালক্ষ্মী। এই লক্ষ্মী ভগবানের ঐশ্বর্য, কারুণ্য, মাধুর্য প্রভৃতি সর্বশক্তিরই আধারভূতা। কিন্তু আমরা পূর্বেই ভগবানের সর্বশক্তির ভিতরে হ্লাদিনী-শক্তিরই শ্রেষ্ঠতা দেখিযা আসিয়াছি; সেইজন্য হ্লাদিনীর ঘনীভূত বিগ্রহ রাধিকারই হইল কৃষ্ণশক্তিরূপে শ্রেষ্ঠত্ব। এক দৃষ্টিতে রাধিকা এবং অন্যান্য ব্রজবধূগণ সকলেই লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীর অংশ। বৃন্দাবনে লক্ষ্মীর পরিণতি রাধিকা এবং অন্যান্য ব্রজগোপিকা রূপে। কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে লক্ষ্মী অপেক্ষা ব্রজবধূগণের—বিশেষ করিয়া রাধিকারই হইল শ্রেষ্ঠত্ব। হ্লাদিনী-শক্তিই হইল কৃষ্ণের সর্বশক্তির সারভূতা শক্তি, সর্বশক্তির সারভূতা বলিয়া ইহার ভিতরে ঐশ্বর্য, কারুণ্য প্রভৃতি সকলই রহিয়াছে, কিন্তু মাধুর্যেই ইহাব চরম স্ফূর্তি। যে অর্থে ক্ষীরাদি দুগ্ধজাত হইলেও দুগ্ধ হইতে তাহাদের শ্রেষ্ঠতা—ঠিক সেই অর্থেই রাধিকা লক্ষ্মী-শক্তিরই সারাংশের ঘনীভূত বিগ্রহ বলিযা লক্ষ্মী হইতে তাহার শ্রেষ্ঠতা। এইজন্য কৃষ্ণধাম গোলকে লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি রুক্মিণীর শুধুমাত্র দ্বারকা-মথুরাতেই অবস্থিতি, সর্বোত্তম ধাম ব্রজভূমে বা বৃন্দাবনে শুধু রাধা সহ গোপীগণেবই বাস।

কৃষ্ণের অষ্ট মহিষীরও স্বরূপশক্তিত্ব। তাঁহারা স্বরূপভূত বিভিন্ন শক্তিরই বিগ্রহ। ইহার ভিতরে রুক্মিণী ভগবানের একান্ত অনুরূপত্ব হেতু স্বয়ং লক্ষ্মী।

১ তুলনীয়—কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥ চরিতামৃত (মধ্য, ৮ম)

আরও— হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥ ঐ (আদি, ৪র্থ)

সত্যভামা ভূশক্তি, মতান্তরে তাঁহার 'প্রেমশক্তিপ্রচুরভূশক্তিত্ব'। শ্রীযমুনার কৃপাশক্তি-রূপত্ব, ইত্যাদি। বৃন্দাবনে ভগবানের স্বরূপশক্তিপ্রাদুর্ভাব-রূপা হইলেন সকল ব্রজদেবীগণ; সুতরাং তাঁহারা সকলেই হইলেন 'বৃন্দাবন-লক্ষ্মী'।[১] 'গোপালতাপনী'তে গোপীগণকে 'আবিদ্যাকলাপ্রেরক' বলা হইয়াছে। আ অর্থে সম্যক্, বিদ্যা হইল পরমপ্রেমরূপা, তাহার কলা হইল তাহার বৃত্তিরূপা; তাহার প্রেরক অর্থে তৎতৎ ক্রিয়ায় প্রবর্তক। হ্লাদিনীই হইল গুহ্যবিদ্যা; সেই হ্লাদিনীর রহস্য-লীলায় প্রবর্তকই হইলেন ব্রজবধূগণ। ইঁহারা সকলেই হইলেন নিত্যসিদ্ধা। হ্লাদিনীর সারবৃত্তিবিশেষ হইল প্রেম; সেই প্রেমরসেরই সার-বিশেষ এই ব্রজদেবীগণের ভিতরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া এই ব্রজদেবী-গণের মহত্ত্ব।[২] এই ব্রজদেবীগণ হইলেন 'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা'। ইঁহাদের ভিতরে এই প্রেমপ্রাচুর্যের প্রকাশহেতু শ্রীভগবানেরও ইঁহাদের মধ্যে পরমোল্লাসের প্রকাশ হয়, সেই পরমোল্লাসের দ্বারাই শ্রীভগবানের রমণেচ্ছা জন্মে।

এইরূপ 'পরমমধুরপ্রেমবৃত্তিময়ী' ব্রজগোপীগণের মধ্যে আবার প্রেম-সারাংশোদ্রেকময়ী হইলেন শ্রীরাধিকা; সুতরাং এই রাধিকাতেই হইল 'প্রেমোৎকর্ষপরাকাষ্ঠা'। ঐশ্বর্যাদি অন্যান্য শক্তিসমূহ এই প্রেমবৈশিষ্ট্যকেই অনুগমন করে; এইজন্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকারই হইল স্বয়ং লক্ষ্মীত্ব। ধামের মধ্যে যেমন বৃন্দাবনধামই সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম, ভগবদ্-রূপেরও যেমন কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনেই সর্বপূর্ণত্ব এবং সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—ভগবৎ-শক্তিরূপেও তেমন শ্রীরাধারই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণও যেমন একটি পরমতত্ত্বমাত্র নহেন, তাঁহার দিব্যবপু সৌন্দর্য-মাধুর্যাদিগুণ যেমন সত্য এবং নিত্য, শ্রীরাধাও তেমনি একটি শক্তিতত্ত্ব মাত্র নহেন, তিনিও সত্যা এবং নিত্য-বিগ্রহবতী। প্রেম-পরাকাষ্ঠায় মিলিত যে এই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামের যুগলরূপ ইহাই ভক্তের আরাধ্যতম বস্তু। এই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা নিত্য-কিশোর-কিশোরী, এই নিত্য-কিশোর-কিশোরীর নিত্য-প্রেমলীলাই একমাত্র আস্বাদ্য। বলা যাইতে পারে যে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব হেতু রাধা ও কৃষ্ণ ত স্বরূপতঃ একই; স্বরূপতঃ যাহা এক তাহার আবার যুগলমূর্তির কল্পনা কেন? ইহার জবাব এই যে, উভয়েই এক হইয়াও লীলাচ্ছলে আবার দুই,—অভেদের ভিতরেই ভেদ।

১ শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ।

২ আসাং মহত্ত্বন্ত হ্লাদিনীসারবৃত্তিবিশেষপ্রেমরসসারবিশেষ-প্রাধান্যাৎ। ঐ

অচিন্ত্য শক্তিবলেই এই অভেদে লীলাবিলাসে ভেদ, ইহাই হইল অচিন্ত্য-ভেদাভেদ।

আমরা দেখিয়াছি,কৃষ্ণের যে পূর্ণরসস্বরূপতা তাহাই তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া অপরের ভিতরে প্রেম-ভক্তিরূপে সঞ্চারিত হয়। যাঁহার ভিতরে এই হ্লাদিনীর যতখানি সঞ্চরণ তিনিই ততখানি ভক্ত। রাধিকা স্বয়ং পূর্ণ-হ্লাদিনীরূপা, সুতরাং রাধিকার ভিতরেই প্রেমভক্তির প্রকাশ-পরাকাষ্ঠা, এবং এইজন্য রাধিকা হইলেন কৃষ্ণের ভক্তশ্রেষ্ঠ। আমরা পূর্বে আরও দেখিয়াছি, হ্লাদিনী-শক্তি সংবিৎ-শক্তিরই চরমোৎকর্ষ। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম চিদ্‌বস্তু—ইহা চিদানন্দ-স্বরূপ। কৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের ভিতরে প্রেম তাহার মধ্যে বিভিন্ন ভেদ বা তারতম্য রহিয়াছে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই প্রেম। এই প্রীতি ভক্ত-চিত্তে নানা ক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করে; চিত্তকে উল্লসিত করায়, মমতাবোধের দ্বারা যুক্ত করায়,আশ্বস্ত করায়, প্রিয়ত্বের অতিশয়ত্বহেতু অভিমান করায়,দ্রবকরায়,স্ববিষয়ের প্রতি প্রত্যভিলাষাতিশয়ের দ্বারা যুক্ত করে,প্রতিক্ষণ স্ববিষয়কে নবনবত্বের দ্বারা অনুভব করায়, অসমোর্ধ্ব চমৎকারের দ্বারা উন্মাদ করায়।[১] উল্লাসের মাত্রাধিক্য-ব্যঞ্জিকা যে প্রীতি তাহারই নাম 'রতি';[২] এই রতিতে একমাত্র প্রেমাস্পদেই তাৎপর্যবোধ এবং অন্য সর্ব বিষয়েই তুচ্ছত্ববোধ জন্মে। মমতাবোধের আতিশয্যের আবির্ভাবে সমৃদ্ধ যে প্রীতি তাহাই 'প্রেম' নামে অভিহিত।[৩] এই প্রেমের আবির্ভাব ঘটিলে তৎপ্রীতিভঙ্গহেতুসমূহ আর তাহার উত্তম বা স্বরূপকে কোন বাধা দিতে পারে না; অর্থাৎ তখন সংসারে কোন বাধাবিঘ্নই আর এই প্রীতির পথকে রুদ্ধ করিতে পারে না। বিস্রম্ভাতিশয়াত্মিকা প্রেমই হইল 'প্রণয়'।[৪] এই প্রণয়ের উদয় হইলে সম্ভ্রমাদিযোগ্যতাতেও তদভাব হয়।প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানদ্বারা কৌটিল্যাভাসপূর্বক ভাববৈচিত্রী দান করে যে প্রণয় তাহাই হইল 'মান'।[৫] মানে তাহা হইলে দেখিতে পাইলাম প্রিয়তার

১ প্রীতিঃ খলু ভক্তচিত্তমুল্লাসয়তি, মমতয়া যোজয়তি, বিস্রম্ভয়তি, প্রিয়ত্বাতিশয়েনাভিমানয়তি, দ্রাবয়তি, স্ববিষয়ং প্রত্যভিলাষাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়তি, অসমোর্ধ্বচমৎকারেণোন্মাদয়তি। —প্রীতি-সন্দর্ভ।

২ তত্রোল্লাসমাত্রাধিক্যব্যঞ্জিকা প্রীতিঃ রতিঃ। ঐ

৩ মমতাতিশয়াবির্ভাবেন সমৃদ্ধা প্রীতিঃ প্রেমা। ঐ

৪ বিস্রম্ভাতিশয়াত্মকঃ প্রেমা প্রণয়ঃ। ঐ

৫ প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানেন কৌটিল্যাভাসপূর্বকভাববৈচিত্রীং দদৎ প্রণয়ো মানঃ।—ঐ

অতিশয়তাহেতু অভিমান আসিয়াছে, এই অভিমানের দ্বারা আসিয়াছে প্রণয়ে কৌটিল্য বা বক্রতা (বাম্যতা); এই কৌটিল্যই দান করে ভাববৈচিত্রী। মান জাত হইলে স্বয়ং ভগবান্‌ও তৎপ্রণয়কোপ হইতে ভয় প্রাপ্ত হন। যে প্রেম চিত্তকে অতিশয় দ্রব করে তাহাই হইল স্নেহ।[১] এই স্নেহ সঞ্জাত হইলে প্রিয়ের সম্বন্ধ-আভাসেই মহাবাষ্পাদি-বিকার, প্রিয়দর্শনাদিতে অতৃপ্তি, প্রিয়ের পরমসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাহার কোন অনির্দিষ্ট অনিষ্টের আশঙ্কা প্রভৃতির উদয় হয়। অতিশয় অভিলাষাত্মক স্নেহই 'রাগে' পরিণত হয়।[২] চিত্তে এই রাগ সঞ্জাত হইলে ক্ষণিক বিরহেও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা দেখা দেয়, প্রিয়ের সহিত মিলনে পরম দুঃখও সুখরূপে প্রতিভাত হয়,—তাঁহার বিয়োগে সবই তদ্বিপরীত। এই রাগে রাগের বিষয়কে (অর্থাৎ প্রেমাস্পদকে) যাহা অনুক্ষণ নবনবভাবে অনুভূত করায়, নিজেও অনুক্ষণ নবনব ভাব ধারণ করে—তাহাই হইল অনুরাগ।[৩] এই অনুরাগ সঞ্চারিত হইলে পরস্পর বশীভাবের অতিশয়তা ঘটে, প্রেমবৈচিত্ত্য (প্রিয় নিকটে থাকিলেও বিরহানুভূতি), প্রিয়সম্বন্ধী অন্যান্য প্রাণিরূপেও জন্মলাভের আকাঙ্ক্ষা বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্তি প্রভৃতির উদয় হয়। এই অনুরাগই অসমোর্ধ্ব চমৎকারের দ্বারা উন্মাদক হইলে মহাভাবরূপে পরিণত হয়।[৪] এই মহাভাবই হইল রাধিকার স্বরূপ। ভক্তরূপে যদি আমরা বিচার করি তাহা হইলেও বলা যায় যে,এই প্রেমনির্যাসরূপে মহাভাবের পরাকাষ্ঠাওএকমাত্র রাধিকায ব্যতীত আর কাহাতেও সম্ভবে না ; এইজন্যই শ্রীরাধিকা হইল প্রেম-পরাকাষ্ঠারূপিণী। শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষীগণের মহাভাবের উন্মুখ অনুরাগ পর্যন্তই হইল প্রেমের শেষ সীমা, তাহার পরে আর মহিষীগণের কোন অধিকার নাই, তাহার পরেই হইল গোপীগণের প্রেমের বৃন্দাবন—এই প্রেমের বৃন্দাবনের বৃন্দাবনেশ্বরী হইল রাধিকা। ব্রজের গোপীগণের মহাভাবে অধিকার আছে, কিন্তু এই মহাভাবেরও যে পরাকাষ্ঠারূপ 'অধিরূঢ়-মহাভাব' তাহা একমাত্র রাধিকা ব্যতীত অন্য কাহাতেও সম্ভবে না।

গুণান্তরের উৎকর্ষের তারতম্যের দ্বারা প্রীতির যে তারতম্য ও ভেদ হয় তাহা দুই প্রকারের ; প্রথমতঃ ভক্তের চিত্ত সংস্কারের দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ ভক্তের

---

১ চেতোদ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ।—প্রীতি-সন্দর্ভ।

২ স্নেহ এবাভিলাষাতিশয়াত্মকো রাগঃ।—ঐ

৩ স এব রাগোঽনুক্ষণং স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়ন্‌ স্বয়ং চ নবনবীভবন্নমুরাগঃ।—ঐ

৪ অনুরাগ এবাসমোর্ধ্বচমৎকারেণোন্মাদকো মহাভাবঃ।—ঐ

ভগবান্-সম্বন্ধীয় অভিমানবিশেষের দ্বারা। উপরে আমরা প্রেমের গাঢ় হইতে গাঢ়তর অবস্থায় যে ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করিলাম তাহা চিত্ত-সংস্কারের দ্বারা সাধিত প্রেমোৎকর্ষের তারতম্য। তদভিমানবশে প্রীতির যে তারতম্য তাহাকে অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণবগণের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ-রসতত্ত্ব। এই পঞ্চরসের ভিতরেও 'পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়'। শান্তাদি সকল রসের সারগুণ ঘনীভূত হইয়া কান্তারসের পুষ্টি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃতে শান্তাদি রসের যে কিরূপে মধুরে গিয়া পর্যবসান হয় তাহা অতি সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন, সেখানে তিনি বলিয়াছেন,—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥

মধ্যলীলার উনবিংশ অধ্যায়ে এই তত্ত্বটি কবিরাজ গোস্বামী আরও পরিস্ফুট করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেখানে বলা হইয়াছে—

কেবল স্বরূপ-জ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বরজ্ঞানে সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসে হয় দুই গুণ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ।
কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রমহীন।
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন।
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥

বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্তের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণভক্তবশ গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী গণে॥
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥

কান্তারসেরও যে প্রীতি তাহা কামসাম্যে কামাদি-শব্দের দ্বারাই বর্ণিত হয়; কিন্তু 'স্মরাখ্য-কাম-বিশেষ' প্রাকৃত কাম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই উভয়ের ভিতরে মুখ্য ভেদ হইল এই, কাম-সামান্য-চেষ্টা হইল 'স্বীয়ানুকূল্যতাৎপর্যা'; আর শুদ্ধপ্রীতি-চেষ্টা হইল 'প্রিয়ানুকূল্যতাৎপর্যা'। এই প্রিয়ানুকূল্য-তাৎপর্যত বা 'কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যতা'ই হইল বৃন্দাবনের গোপীপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। এই যে 'কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যা' শুদ্ধা প্রীতি তাহারও পরম প্রকাশ হইল কৃষ্ণময়ী রাধিকায়। কৃষ্ণে পরা নিষ্ঠা, কৃষ্ণ-সেবা, কৃষ্ণে সম্ভ্রমমুক্ত পরম-স্বজনভাব এবং সমভাব, কৃষ্ণে মমতাধিক্য, সাঙ্গসঙ্গ-দানের দ্বারা কৃষ্ণের সুখোৎপাদন—এই সকল বৃত্তি ও চেষ্টারই অবধি বা শেষসীমা হইল রাধিকায়।

রাধিকাতেই প্রেম-প্রকাশের শেষ-সীমা—অথবা রাধিকাই হইল প্রেম-স্বরূপতার সত্য ও নিত্য বিগ্রহ—এইজন্য রসময় শ্রীকৃষ্ণের সকল রসময়ত্বের অনুভূতি ও আস্বাদনের পরম স্ফূর্তি হইল রাধিকাদ্বারে। অচিন্ত্যশক্তিবলে এই অভেদে ভেদলীলার ভিতর দিয়াই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে নিত্য পরম-প্রেমলীলা।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, রূপগোস্বামী তাঁহার লেখার ভিতরে কৃষ্ণ-শক্তিরূপে রাধা-সম্বন্ধে যেটুকু দার্শনিক আলোচনা করিয়াছেন জীবগোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভ-গুলিতে তাহারই অনুসরণ করিয়া তাহাকে বিস্তারিত করিয়াছেন। জীব-গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণকেই ব্রহ্ম-সূত্রাদির প্রকৃষ্টতম ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করায় রাধা-কৃষ্ণের-তত্ত্বালোচনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মসূত্রের আর পৃথক্ কোন উল্লেখ করেন নাই, ভাগবত পুরাণকেই তিনি তত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে একমাত্র বলদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামিগণ-প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত অনুসরণ করিয়া 'গোবিন্দভাষ্য' নামে ব্রহ্মসূত্রের একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এই ভাষ্যমধ্যে কৃষ্ণের শক্তিতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রসঙ্গ-ক্রমে যেটুকু আলোচনা রহিয়াছে, তাহা মোটামুটিভাবে পূর্বোক্ত আলোচনারই অঙ্গরূপ। ব্রহ্মের অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি—তাহারা ব্রহ্মের স্বাভাবিকী—অর্থাৎ স্বরূপসম্বন্ধিনী শক্তি। এই শক্তি ত্রিভাগে বিভক্ত—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা অপরা ও অবিদ্যারূপিণী মায়াশক্তি। ভগবানের সৃষ্ট্যাদিলীলা কোনও অভাবজাত নয়, আনন্দপ্রাচুর্যে নৃত্যের মত ; সুতরাং তাঁহার সৃষ্ট্যাদিলীলা হইল 'স্বরূপানন্দ-স্বাভাবিকী'। শ্রী ও লক্ষ্মী ভগবানের দুই পত্নী বলিয়া যজুর্বেদে খ্যাত। এখানে কেহ কেহ বলেন, শ্রী হইলেন রমা দেবী, আর লক্ষ্মী হইলেন ভাগবতী সম্পৎ ; অন্যে বলেন, শ্রী হইলেন বাগ্‌দেবী, আর লক্ষ্মী হইলেন রমা দেবী। এই শ্রী-শক্তি হইলেন নিত্য-পরাশক্তি ; প্রকৃতি কর্তৃক অস্পৃষ্ট পরব্যোমে ভগবানের সহিত বিরাজ করেন ; আবার ভগবান্ যখন নিজকে প্রপঞ্চে স্বধামে প্রকাশ করেন তখন শ্রীও স্বীয় নাথের 'কামাদি' বিস্তারার্থ অনুগতা হন।[১] কাম শব্দের অর্থ এখানে 'শৃঙ্গারাভিলাষ', আদিশব্দের দ্বারা তদনুগুণা তৎপরিচর্যা বুঝাইতেছে। শ্রীর 'আয়তন' শব্দের দ্বারা ব্যক্তি এবং ভক্তমোক্ষানন্দ-বিস্তার বুঝাইতেছে। পরমাত্মার সহিত অভেদহেতু এই পরাশক্তি শ্রীও বিভুত্বসম্পন্না। বলা যাইতে পারে যে, শ্রী যদি পরারূপে বিষ্ণুর সহিত অভিন্না বলিয়া গৃহীত হয়, তবে শ্রীর আর বিষ্ণুসম্বন্ধিনী ভক্তির সম্ভব হয় না, কারণ নিজের প্রতি আর নিজের ভক্তি-সম্ভাবনা কোথায় ? ইহার জবাবে বলা হইয়াছে যে, শ্রী ভগবান্ হইতে অভিন্না হইলেও ভগবানের বিচিত্রগুণরত্নাকরত্বহেতু এবং ভগবান্ শ্রীরও মূলতত্ত্ব বলিয়া পরতত্ত্ব ভগবানে শ্রীর আদর অবশ্যম্ভাবী—অতএব তদ্ভক্তির লোপ হইতেছে

১ কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ।

না। এমন কোনও শাখা নাই যাহা বৃক্ষকে আদর করে না—এমন চন্দ্রপ্রভা নাই যাহা চন্দ্রকে আদর করে না।[১]

এই যে শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার পরাশক্তির ভিতরে 'কাম' বা শৃঙ্গারাভিলাষের কথা বলা হইল, এই প্রসঙ্গে আরও প্রশ্ন হইতে পারে,—বিষয়-আশ্রয়-ভেদে এবং আলম্বন-উদ্দীপনাদি-বিভাবভেদেই রত্যাদি স্থায়িভাব এবং তৎফলে শৃঙ্গারাভিলাষ সম্ভব হইতে পারে ; অভেদতত্ত্বে ত ইহার কোনও সম্ভাবনা নাই। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, যদিও শক্তি এবং তাহার আশ্রয় (অর্থাৎ শক্তিমান্) এই উভয়ে অভেদ, তথাপি তিনটি কারণে তাঁহাদের ভিতরে কামাদিগুণের উদয় সিদ্ধ হইতেছে ; প্রথমতঃ অভেদ সত্ত্বেও পুরুষোত্তমই শক্তির আশ্রয় বলিয়া, দ্বিতীয়তঃ শক্তি যুবতীরত্নরূপেই উপস্থিত হয় বলিয়া, এবং তৃতীয়তঃ এই কামাদি পুরুষোত্তমের স্বারামত্ব এবং পূর্ত্যাদিরই অনুগুণ বলিয়া। অথর্বোপনিষদে বলা হইয়াছে, "যে কামের দ্বারা কামকে কামনা করে সেই সকামী হয়, আর যে অকামের দ্বারা কামকে কামনা করে সে অকামী হয়।" 'অকাম' শব্দের 'অ' এখানে সাদৃশ্যার্থে নঞ্ ; 'অকামে'র দ্বারা শব্দের তাহা হইলে অর্থ হইল, কামতুল্য প্রেমের দ্বারা। ভগবান্ ও তাঁহার শক্তির ভিতরকার এই প্রেম হইল 'আত্মানুভবলক্ষণ' ; অর্থাৎ স্বরূপানন্দের ভিতরে যে বিচিত্র ঢেউ তাহার ভিতর দিয়া বিচিত্ররূপে আত্মোপলব্ধিই হইল এই প্রেমের লক্ষণ। এই জাতীয় আত্মানুভব-লক্ষণ প্রেমের যে বিষয় (অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহা রাধাদির ন্যায় স্বরূপশক্তি) তাহাকে কামনা করিয়া ভগবান্ তাঁহার স্বারামত্ব এবং পূর্ণত্বকে কখনই অতিক্রম করেন না। স্বাত্মভূতা শ্রী প্রভৃতির স্পর্শজনিত যে উদগ্র আনন্দ তাহা নিজে নিজের সৌন্দর্যবীক্ষণের ন্যায়।[২] আসলে পরতত্ত্ব নিত্যই 'পরাখ্যস্বরূপশক্তি-বিশিষ্ট' ; এই পরতত্ত্ব যখন স্বপ্রাধান্যে স্ফূর্তি লাভ করে তখনই তাহা পুরুষোত্তম সংজ্ঞা লাভ করে ; আর যখন সেই পরতত্ত্ব পরাখ্যশক্তিপ্রাধান্যে স্ফূর্তি লাভ করে তখনই তাহা ধর্মাদি সংজ্ঞা লাভ করে। পরাশক্তিই ভগবানের জ্ঞান-সুখ-কারুণ্য-ঐশ্বর্য-মাধুর্যাদি আকারে ধর্মরূপা হইয়া স্ফুরিত হয়। সেই শক্তিই

১ সত্যপ্যভেদে বিচিত্রগুণরত্নাকরত্বেন স্বমূলত্বেন চ শ্রিয়ঃ পরস্মিন্নাদরাত্তত্ত্বক্তেরলোপঃ। ন খলু বৃক্ষমনাদ্রিয়মাণা শাখাস্তি ন চ চন্দ্রং তৎপ্রভা। (৩ অ, ৩ পা)

২ তেনাত্মানুভবলক্ষণেন বিষয়কামনা খলু স্বারামত্বং পূর্ণতাঞ্চ নাতিক্রামতীতি। স্বাত্মক-শ্রীস্পর্শাদুদগ্রানন্দস্তু স্বসৌন্দর্যবীক্ষণাদেরিব বোধ্যঃ। (৩ অ, ৩ পা)

শব্দাকারে নামরূপা, ধরাদি-আকারে ধামরূপা হইয়া প্রকাশ পায়; আর সেই একই পরা শক্তি 'হ্লাদিনীসার-সমবেত-সংবিদাত্মক' (অর্থাৎ হ্লাদিনীর সার ঘনীভূত হইয়া যে গভীর সংবিৎ-এর সৃষ্টি করে সেই সংবিদাত্মক) যুবতীরত্নরূপে শ্রীরাধাদির ভিতরে বিগ্রহবতী হয়। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান্ রূপ রাধা-কৃষ্ণের অভেদত্বই সত্য হইলেও অখণ্ড অদ্বয় স্বরূপের ভিতরে 'বিশেষবিজৃম্ভিত' ভেদকার্যদ্বারা রাধাদিরূপ বিভাবের বৈলক্ষণ্য বিভাবিত হইলেই শৃঙ্গারাভিলাষ সিদ্ধ হয়। পরাশক্তির এই যে রাধাদিরূপে ধর্মাদিরূপতা ইহা কোনও কারণ অপেক্ষা করিয়া পরে ঘটে এমন নহে, এই ধর্মাদিভেদরূপতাই অনাদিসিদ্ধ; সুতরাং এই প্রেমাভিলাষের দ্বারা শ্রীভগবানের পূর্ণস্বরূপতার কোন হানি হইল না।

নবম অধ্যায়

পূর্বালোচিত প্রাচীন ভারতীয় বিবিধ শক্তিতত্ত্ব ও গৌড়ীয় রাধাতত্ত্ব

আমরা উপরে পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিবিধশক্তি-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে রাধিকার দার্শনিক পরিচয়। এই দার্শনিক কাঠামোর ভিতরে পুরাতন উপাখ্যান ও কিংবদন্তী, কবিগণের সূক্ষ্মসুকুমার-কবিকল্পনার অজস্র দান ও ভক্ত-হৃদয়ের পরম শ্রেয়োবোধ ও বিচিত্র রম্যবোধ একত্রে সমাবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধার সৌন্দর্যময়ী ও প্রেমময়ী মূর্তিকে বহু বিচিত্রতা এবং বিস্তৃতি দান করিয়াছে। রাধার এই বহু বিচিত্র রূপের পরিচয় দিবার পূর্বে উপরে রাধা সম্বন্ধে যেটুকু দার্শনিক তত্ত্ব পাইলাম আমাদের পূর্বালোচিত শক্তিতত্ত্বের সহিত কোথায় তাহার কতটুকু মিল, কোথায় বা তাহার পরিকল্পনায় অভিনবত্ব বা বৈশিষ্ট্য সে জিনিসটি সম্বন্ধে এখানে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া লওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি। এই আলোচনার ভিতর দিয়া বিভিন্নযুগের পরিকল্পিত লক্ষ্মীতত্ত্বের যে কিভাবে রাধাতত্ত্বে ক্রম-পরিণতি তাহার ধারাটিও বুঝা যাইবে।

আমরা উপরে রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছি—এবং যে-রাধা-তত্ত্বের বৈষ্ণব সাহিত্যে ও অলঙ্কার-গ্রন্থে আমরা বহু বিচিত্র বিস্তার লক্ষ্য করিতে পারি, সেই রাধাতত্ত্বের ভিতরে এই কয়েকটি জিনিস আমরা লক্ষ্য করিতে পারি—

১। ভগবানের স্বাভাবিক অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির ভিতরে তিনটি হইল প্রধান; একটি হইল তাহার স্বরূপশক্তি, দ্বিতীয়টি জীবশক্তি এবং তৃতীয়টি মায়াশক্তি। ইহার ভিতরে প্রথমটি অপ্রাকৃত, অপর দুইটি প্রাকৃত।

২। এই অপ্রাকৃত স্বরূপশক্তির সারভূতা শক্তি হইল হ্লাদিনী-শক্তি, সেই হ্লাদিনী-শক্তিরই সারভূত বিগ্রহ হইল শ্রীরাধার তনু।

৩। হ্লাদিনী-শক্তি-বিগ্রহা শ্রীরাধার সহিতই নিত্যবৃন্দাবনে শ্রীভগবানের নিত্য-লীলা।

৪। একদিকে রস, অন্যদিকে প্রেম-ভক্তিরূপে রাধিকার ভগবৎ-কোটি ও জীবকোটি এই উভয় কোটিতেই বিস্তার। ভগবানের আনন্দবিধায়িনী যেমন

রাধা, তেমনি প্রেমভক্তিদানে জীবের প্রতি কৃপা-বিতরণেরও রাধিকাই হইল মুখ্য করণ এবং কারণ।

৫। প্রেমরূপিণী রাধার দ্বারেই কৃষ্ণের স্বরূপানুভব ; পরম বিষয়রূপ কৃষ্ণের স্বরূপোপলব্ধিস্থলে রাধিকাই হইল অনাদিসিদ্ধ মূল আশ্রয়।

আমরা পূর্বে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিলেই দেখিতে পাইব, রাধাতত্ত্বের বহু দার্শনিক উপাদান পূর্ববর্তীদের মতবাদের মধ্যেই ছড়াইয়া আছে। আমরা উপরে উল্লিখিত উপাদান সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

১। পঞ্চরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শাস্ত্রেই আমরা শক্তির প্রধানভাবে দ্বিধা ভেদ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। পঞ্চরাত্রে শক্তিকে পরাশক্তি এবং প্রাকৃত-শক্তি রূপে বর্ণিত দেখিতে পাইয়াছি ; এই পরাশক্তি হইল ভগবানের সমবায়িনী শক্তি, ইহাই গৌড়ীয়গণের স্বরূপশক্তি। পাঞ্চরাত্র মতেও এই সমবায়িনী পরাশক্তির সহিত সৃষ্টিকার্যের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, সৃষ্ট্যাদিকার্য সাধিত হইতেছে ভগবানের প্রাকৃত শক্তি দ্বারা, এই প্রাকৃত শক্তিই হইল মায়া। কাশ্মীর শৈবদর্শনেও আমরা ঠিক অনুকূল সিদ্ধান্তের কথাই দেখিয়া আসিয়াছি, সেখানেও পরম শিবের শক্তিকে সমবায়িনী-শক্তি ও পরিগ্রহা-শক্তিরূপে ভাগ করা হইয়াছে। পরিগ্রহা-শক্তিই প্রাকৃত মাযাশক্তি। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ও বিষ্ণু-পুরাণাদিতে আবার এই পরা স্বরূপশক্তি এবং জড় মায়াশক্তির মাঝখানে জীব-ভূতা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তির উল্লেখ পাইলাম, ইহা হইতেই উদ্ভব তটস্থা জীব-শক্তির।

২। পূর্বালোচিত সর্বক্ষেত্রের শক্তিতত্ত্বের ভিতরেই দেখিয়া আসিয়াছি, শক্তি আনন্দ-রূপিণী। এই আনন্দই যে সর্বশক্তির সারভূত একথা খুব স্পষ্টভাবে বর্ণিত বা ব্যাখ্যাত না হইলেও দেখিতে পাই, শক্তির আর যাহা যাহা ব্যাপার বা বৃত্তি থাকুক না কেন, তাঁহার মূলরূপে তিনি পরমানন্দরূপিণী। বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত মতবাদে সর্বত্রই ইহার আভাস মিলিবে। কাশ্মীর শৈবসিদ্ধান্তে আবার আনন্দশক্তি পরম শিবের পঞ্চশক্তির ভিতরে একটি পৃথক্ শক্তি ; পুরাণাদিতেও এই মতের প্রতিধ্বনি মিলে। কিন্তু পরম শিবের এই আনন্দশক্তিরূপে একটি পৃথক্ শক্তি স্বীকার করা অপেক্ষা শক্তির মূল বৃত্তিতে তাঁহার আনন্দময়িত্বের প্রাধান্য প্রায় সর্বত্রই স্বীকৃত। এই শক্তিবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া কৃষ্ণের চরমোৎকর্ষপ্রাপ্তা শক্তি রাধা হ্লাদিনী-রূপত্ব লাভ করিয়াছে। অবশ্য ইহার উপরে

প্রেমভক্তির আদর্শ প্রাধান্য লাভ করাতে এবং প্রেমস্বরূপতা ও হ্লাদস্বরূপতা একই হওয়াতে রাধিকার এই হ্লাদিনী রূপ উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা শৈবশাক্ততন্ত্র ও যোগ-শাস্ত্রাদিতে ব্যাখ্যাত আর একটি তত্ত্বের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা এই সকল শাস্ত্রে বহুস্থানে দেখি, শক্তি হইলেন ষোড়শকলাত্মিকা। কৃষ্ণের এই ষোড়শকলাত্মিকা শক্তি হইতে যে ষোড়শ গোপীর উদ্ভব হইয়াছে ইহার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। তন্ত্র এবং যোগ গ্রন্থে আমরা আরও দেখিতে পাই, চন্দ্রের ষোলকলা হইল বিকারাত্মিকা, অতএব পরিবর্তনশীলা ; কিন্তু এই বিকারাত্মিকা ষোল কলার অতিরিক্ত চন্দ্রের আর একটি নিজস্ব কলা আছে, তাহাকে বলা হয় চন্দ্রের 'সপ্তদশী কলা'। এই সপ্তদশী কলাই হইল চন্দ্রের অমৃত-কলা, ইহাই পরমানন্দময়ী। তন্ত্রের বা যোগ শাস্ত্রের ভাষায় বিকারাত্মিকা ষোড়শ কলা হইল 'প্রবৃত্তি-রাজ্যে'র বস্তু, আর আনন্দরূপিণী, অমৃতরূপিণী সপ্তদশী কলা হইল 'নিবৃত্তি-রাজ্যে'র বস্তু ; ইহাকেই বৈষ্ণবদের ভাষায় অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামের বস্তু বলা যাইতে পারে। যোগ-তন্ত্রাদির দৃষ্টিতে বলা যায়, অমৃতরূপিণী চন্দ্রের নিজস্ব সপ্তদশী কলাই হইল রাধিকা, ইহা অবিকারভাবে স্বরূপে অবস্থান করিযা অমৃতাত্মক আশ্রয় রূপে ইহার বিষয়কে নিত্যানন্দে নিমগ্ন রাখিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা আরও লক্ষ্য করিতে পারি, আত্মমায়া বা যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সকল প্রেমলীলা সাধন করেন। এই যোগমায়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'পৌর্ণমাসী'র রূপ ধারণ করিয়াছে। এই 'পৌর্ণমাসী' প্রেম-সঙ্ঘটনে পরমাভিজ্ঞা বর্ষীয়সী রমণীরূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধ-মাধব', 'ললিত-মাধব' নাটকে এই ভগবতী পৌর্ণমাসী সাবিত্রী সদৃশ রুচিশালিনী, সান্দীপনি মুনির জননী, দেবর্ষি নারদের শিষ্যা, বক্ষঃস্থলে কাষায়বস্ত্রধারিণী এবং মস্তকে কাশ পুষ্পের ন্যায় শুভ্র কেশধারিণী রূপে বর্ণিতা হইয়াছেন।[১] নানা কৌশলে বহু অঘটন ঘটাইয়া রাধা-কৃষ্ণের মিলন সঙ্ঘটন করানই তাঁহার কাজ, কিন্তু মিলন-লীলাতে তাঁহার আর কোন স্থান বা অধিকার নাই। যোগমায়ার এই 'পৌর্ণমাসী' নাম হইবার সার্থকতা কি? ষোলকলা পূর্ণিমার উদয় হইলে তাহার পরে হইল সপ্তদশী কলার সহিত স্বরূপলীলা। ইহাই কি 'পৌর্ণমাসী'র তাৎপর্য? শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার ভিতরে বৈশাখী পূর্ণিমা, ঝুলন পূর্ণিমা, রাস পূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমা প্রভৃতি পূর্ণিমার আবির্ভাবও এই প্রসঙ্গে

১ উভয় নাটকেরই প্রথম অঙ্ক।

লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পৌর্ণমাসী বা পূর্ণিমাই ষোলকলার পূর্তির দ্বারা যেন সপ্তদশী কলার অমৃতময়ী লীলার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেয়।

৩। রাধা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি রূপে শক্তিমান্ কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন; কিন্তু অভেদে কখনও লীলার সম্ভব নয়; সেইজন্যই আমরা দেখিয়াছি, বৈষ্ণবগণ নানা ভাবে অভেদের মধ্যেই একটা ভেদ স্বীকার করিয়া লইয়া লীলা স্থাপন করিয়াছেন। আমরা প্রথম হইতেই ভারতীয় শক্তিবাদ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি, এই অভেদে একটা ভেদ-বিশ্বাস লইয়াই ভারতীয় সমগ্র শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই অভেদে ভেদবাদ যে কোনও স্থানে কোনও দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এমন কথা বলা যায় না; ইহা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনের একটি বিশেষ প্রবণতা রূপেই বার বার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, স্বরূপ লীলাবাদের উপরে বৈষ্ণবেরা—বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা—বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন। পঞ্চরাত্রে কি কাশ্মীর-শৈব-সিদ্ধান্তে আমরা শক্তিবাদের প্রসঙ্গে যে লীলার কথা দেখিয়াছি, তাহাতে স্বরূপ-লীলার কথা কম, প্রাকৃত মায়াশক্তির দ্বারা সৃষ্ট্যাদি লীলাই সেখানে মুখ্যভাবে লীলা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের ‘লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্’ সূত্রটির ভাষ্যে প্রাচীন বৈষ্ণবগণ জগৎ-প্রপঞ্চ-লীলার কথাই বলিয়াছেন। এই স্বরূপ-লীলার উপরে কোন জোর দেওয়া হয় নাই বলিয়াই প্রাচীন বৈষ্ণবগণ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদকে স্পষ্টতঃ সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই; কোথাও এই ভেদকে ঔপচারিক সত্য, কোথাও ভেদের অবভাস মাত্র, কোথাও বা ভেদের ভান বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিযা আসিযাছি, দ্বাদশ শতকের লীলাশুক ও জয়দেবের কাব্য-রচনার ভিতরেই আমরা স্বরূপ-লীলার প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইলাম, এই স্বরূপ-লীলার প্রতিষ্ঠার উপরেই প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের সকল সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব। এইজন্যই দেখিয়াছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রাধা-কৃষ্ণের ভেদকে শুধু মাত্র ঔপচারিক, ভেদের অবভাস বা ভান বলেন নাই; তাঁহারা এই অভেদের ভেদকেও সত্য বলিয়াছেন, লীলাকেও তাই তাঁহারা সত্য এবং নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকর রূপে এই লীলা-স্মরণ ও লীলা-আস্বাদন—ইহাই হইল গৌড়ীয় ভক্তগণের পরম সাধন ও সাধ্য; শ্রীকৃষ্ণের গোপলীলার প্রসার ও প্রতিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়াই এই স্বরূপ-লীলাবাদের ক্রম-প্রসার ও ক্রম-প্রতিষ্ঠা।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা লক্ষ্য করিতে পারি। লীলাবাদের ক্রম-প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে শক্তির প্রেম-রূপিণীত্ব। তন্ত্রাদিতে এই স্বরূপ-লীলাবাদের বিশেষ কোন বিকাশ না হইবার কারণ, শক্তি সেখানে 'শক্তি' বা 'বল'ই রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু আমরা বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুশক্তির ক্রমবিকাশ যদি লক্ষ্য করি তবে দেখিতে পাইব, শক্তি প্রথমে প্রেমোন্মুখী হইয়া শেষ পর্যন্ত প্রেমমাত্রতায়ই আসিয়া পর্যবসিত হইল; শক্তি একটু একটু করিয়া যত প্রেম হইয়া উঠিতে লাগিল ততই স্বরূপ-লীলার স্ফূর্তি এবং লীলাবাদের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। তন্ত্রাদিতে বর্ণিত শক্তির ভিতরে এখানে সেখানে সৌন্দর্য-মাধুর্যের আভাস থাকিলেও তাঁহার অনন্তবলযুক্ত ক্রিয়াত্মকত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; কিন্তু বিষ্ণুশক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীর ভিতরে সৌন্দর্য-মাধুর্যের দিকই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে; রাধার ভিতরে আসিয়া শক্তি বিশুদ্ধহ্লাদিনীরূপে পর্যবসিত হইল; আবার এই হ্লাদিনীর সার হইল প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের সার মহাভাব—সেই মহাভাব-স্বরূপাই হইলেন শ্রীরাধা। প্রেমে-সৌন্দর্যে এই মহাভাব-স্বরূপিণী রাধা তন্ত্রাদির বর্ণিত শক্তি হইতে রূপে গুণে অনেকখানিই পৃথক্ হইয়া উঠিলেন; ফলে রাধাতত্ত্ব যে আসলে শক্তি-তত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে, এ-কথাটা একটু একটু করিয়া যেন যবনিকান্তরালে বিলীন হইয়া গেল। প্রেমে রাধা এমনই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যে তত্ত্বালোচনা না করিলে বৈষ্ণব-সাহিত্যাদিতে বর্ণিত রাধাকে আর শক্তি বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই। ইহাই ত' রাধার আসল 'কমলিনী' রূপ; শক্তি-তত্ত্ব হইতে যাত্রা করিয়া ক্রম-বিবর্তনের ফলে বর্ণে-গন্ধে সৌন্দর্য-প্রেমের পূর্ণশতদলে প্রস্ফুরণ! পুরাণাদিতে গোপীগণকে লইয়া ব্রজধামে এই লীলার ক্রম-প্রসার—শ্রীরাধিকার সহিত এই লীলার পরিপূর্ণতা।

৪। রাধিকার যে ভগবৎ-কোটি এবং জীবকোটি এই উভয়কোটিতে বিচরণ, এ জিনিসটি একটি প্রাচীনধারারই নবপরিণতি। জীবকে কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা অনুগৃহীত করিতে হ্লাদিনী-রূপিণী রাধিকাই হইল কারণ। আমরা আমাদের পূর্বালোচিত লক্ষ্মীতত্ত্বের ভিতরেও এই তত্ত্বটি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। বিশেষভাবে শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায় পরিগৃহীত লক্ষ্মীতত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা বিস্তারিত ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি কি করিয়া লক্ষ্মী জীব ও ভগবানের মাঝখানে করুণা-মূর্তিতে ও প্রেমমূর্তিতে বিরাজ করিয়া করুণায় বিগলিত হইয়া জীবকে ভগবন্মুখী করাইতেছেন আবার প্রেমের বলে ভগবান্‌কে জীবোন্মুখী করিয়া

তুলিতেছেন। ইহারই পরিণতি রাধিকার ভক্তিরূপে জীবানুগ্রহ—এবং রসময়ী-রূপে কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তি। এই তত্ত্বটিই পরবর্তী কালের গোবিন্দ-অধিকারীর শুক-সারীর দ্বন্দ্বে সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে,—

শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
সারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু॥

আমরা শ্রীসম্প্রদায়ের লক্ষ্মীতত্ত্ব-আলোচনা-প্রসঙ্গেই উল্লেখ করিয়াছি, শক্তির এই যে একটি অসীম করুণামূর্তিতে জীব ও ভগবানের ভিতরে 'মধ্যস্থ' রূপে অবস্থান, ইহা ভারতীয় শক্তিবাদেরই বৈশিষ্ট্য; সব-জাতীয় ভারতীয় শক্তিবাদের ভিতরেই আমরা শক্তির এই-জাতীয় একটি বিশেষ কাজ লক্ষ্য করিতে পারি।

৫। রাধা-দ্বারেই যে কৃষ্ণের স্বরূপানন্দ-অনুভবের চরম উৎকর্ষ এই তত্ত্বটিও ভারতীয় শক্তিবাদেরই একটি বিশেষ পরিণতি। শক্তির সান্নিধ্য ব্যতীত শিব যে শব হইয়া যান ভারতীয় শক্তিবাদের এই বহুপ্রচলিত কথাটির ভিতরেই রাধাবাদের এই তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। আমরা কাশ্মীর শৈবদর্শনের শক্তি-বাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখিয়া আসিয়াছি, শক্তিদ্বারে পরমশিবের আত্মো-পলব্ধির তত্ত্বটি কাশ্মীর শৈবদর্শনে সুন্দর বিকাশ লাভ করিয়াছে। সেখানে শক্তিকে পরমশিবের 'বিমল-আদর্শ-রূপিণী' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শক্তি-রূপ কুড্যেই পরমশিবের প্রতিফলন এবং সেই পরম-প্রতিফলনের ভিতর দিয়াই পরমশিবের স্বরূপানুভব। পরমশিবের সকল ইচ্ছা বা কাম পূরণ করেন বলিয়াই এই শক্তিকে বলা হইয়াছে কামেশ্বরী। এবিষয়ে পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি বলিয়া এখানে আর পুনরুক্তি করিতে চাহি না।

দশম অধ্যায়

দার্শনিক রাধাতত্ত্বের বিবিধ বিস্তার

জীবগোস্বামী শ্রীরাধাতত্ত্বকে যতটা সম্ভব একটা দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার এই তত্ত্বালোচনার প্রেরণা এবং সম্ভবতঃ অনেক তথ্য এবং যুক্তিও রূপ, সনাতন এবং গোপালভট্ট প্রভৃতির নিকট হইতে প্রাপ্ত। রূপগোস্বামীর ভিতরে কাব্য ও দর্শনের একটি অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল; তিনি তাই রাধাকে তাঁহার কাব্য ও অলঙ্কারের দৃষ্টিদ্বারা নানাভাবে প্রসারিত করিয়া লইয়াছিলেন। গৌড়ীয় গোস্বামিগণের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বৃন্দাবন—মথুরা—দ্বারকা জুড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রলীলা কাব্য-পুরাণাদির ভিতর দিয়া বহুরূপে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রাধার কাহিনীও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণকে যখন রাধা-কৃষ্ণের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে তখন শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রলীলার সহিত সংশ্লিষ্ট পল্লবিত উপাখ্যানাদিকেও তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং তাঁহাদের মূলসিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। এই চেষ্টার ফলে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার পুরুষোত্তম মূর্তির চতুর্দিকে নিত্য নূতন তত্ত্ব গড়িয়া উঠিতেছিল। শ্রীবিষ্ণুর সহিত পূর্বে আমরা বিবিধ শক্তির সংশ্রবের কথা দেখিয়া আসিয়াছি; বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলার সহিত যুক্ত হইয়া অনেক মহিষী এবং প্রেয়সীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের তারতম্য অবশ্যই ছিল; সেই প্রেমের তারতম্য লইয়াই বিবিধ তত্ত্বের উদ্ভব। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বহু প্রেমতত্ত্বই মূলতঃ দার্শনিক প্রয়োজনে বা ধর্মের প্রয়োজনে উদ্ভূত নয়; ইঁহারা লীলাকে সত্য এবং নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া এবং পুরাণবর্ণিত সকল কাহিনীকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া বহু স্ববিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন; সেই বিরোধ এবং অসঙ্গতিকে দূর করিয়া সমস্ত লীলাকে যথাসম্ভব দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া গোস্বামিগণকে ইহার বহু তত্ত্ব নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইয়াছে।

আমরা পুরাণাদিতে কৃষ্ণের বিবাহিত বহু পত্নীর উল্লেখ পাইয়াছি; ইঁহাদের

ভিতরে অষ্ট পত্নীর কাহিনীই প্রসিদ্ধ। বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী সর্বত্রই কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিতা। সত্যভামা, জাম্ববতী প্রভৃতি অন্যান্য পত্নীগণের সংখ্যা ও নামের তালিকা বিষয়ে হরিবংশ এবং পুরাণাদির মধ্যে কঠোর ঐকমত্য নাই। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, বিভিন্ন তালিকায় যে সকল কৃষ্ণপত্নীগণের নাম পাই তাহাতে মোট বাইশটি নাম পাওয়া যায়।[১] ইহা হইল কৃষ্ণের বিবাহিত পত্নী সম্বন্ধে; কিন্তু ব্রজলীলার প্রসারের সহিত অসংখ্য গোপীর সহিত কৃষ্ণের প্রেম-সম্বন্ধের উল্লেখ পাইতেছি; রাধাও ইহাদের মধ্যেই একজন গোপী। এই যে পৌরাণিক বিবরণ এবং দার্শনিক বিবরণ ইহার ভিতরে একটা সঙ্গতি স্থাপন করা দরকার; সেই জন্য গোস্বামিগণ কৃষ্ণের সর্ববিধ বল্লভাগণকে নানাভাবে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া লীলা-বিস্তারে তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্ধারণ করিয়াছেন এবং এই শ্রেণীভেদের ভিতর দিয়া শ্রীরাধারই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

রূপগোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের 'কৃষ্ণবল্লভা' অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, যে সকল বল্লভা সাধারণগুণসমূহযুক্ত এবং যাঁহারা বিস্তীর্ণ প্রেম ও সুমাধুর্য সম্পদের অগ্রভাগকে আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারাই হইলেন কৃষ্ণ-বল্লভা। এই কৃষ্ণ-বল্লভাগণকে প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, স্বকীয়া এবং পরকীয়া। রুক্মিণী, সত্যভামা আদি কৃষ্ণের বিবাহিতা, পতি-আদেশ-তৎপরা এবং পাতিব্রত্যে অবিচলা স্ত্রীগণই হইলেন স্বকীয়া, আর কৃষ্ণের গোপী-প্রেয়সীগণ সকলেই কৃষ্ণের পরকীয়া বল্লভা। রূপগোস্বামীর মতে দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া মহিষীই হইলেন ষোল হাজার আট; ইঁহাদের ভিতরে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা, কৌশল্যা এবং মাদ্রি ইঁহারাই হইলেন প্রধানা, সুতরাং ইঁহারা পট্টমহিষীরূপে খ্যাতা। ইঁহাদের মধ্যে রুক্মিণী হইলেন ঐশ্বর্যে শ্রেষ্ঠা এবং সত্যভামা সৌভাগ্যে অধিকা।

প্রকৃত দৃষ্টিতে কৃষ্ণের সকল প্রেয়সীই স্বকীয়া, ব্রজকন্যাগণও স্বকীয়া; কারণ, আসলে এই ব্রজকন্যাগণ তাহাদের দেহ-মন সর্বস্ব কৃষ্ণেই অর্পণ করিয়াছিল; কৃষ্ণার্পণই তাহাদের যথার্থ অর্পণ, প্রকট ভাবে যে তাহাদের পত্যাদি লাভ তাহা একটা ভান মাত্র—যোগমায়াদ্বারাই সেই ভানের সৃষ্টি। এই স্বকীয়া-পরকীয়া-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব

১ কৃষ্ণ-চরিত্র, তৃতীয় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বলিয়া এখানে এ-বিষয়ে আর বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। এই স্বকীয়া ও পরকীয়া ব্যতীত কৃষ্ণের অপর একটি 'সাধারণী' নায়িকা হইলেন কুব্জা। বহু-নায়ক-নিষ্ঠা নায়িকাই 'সাধারণী' নামে কথিতা; কুব্জা কিন্তু সাধারণী হইলেও বহু-নায়কনিষ্ঠা নন, একমাত্র কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি থাকাতে কুব্জাও কৃষ্ণবল্লভা-রূপেই গণ্যা।

প্রকট লীলায় গোপীগণের পরকীয়াত্ব স্বীকৃত। পরকীয়া 'কন্যা'ও 'পরোঢ়া'-ভেদে দুই প্রকার। ধন্যা প্রভৃতি যে-সকল অবিবাহিতা ব্রজ-কুমারী কৃষ্ণের প্রতি আসক্তা ছিল তাহারাই কন্যা, আর যে গোপীগণ অন্য গোপগণ-কর্তৃক বিবাহিতা হইয়াও কৃষ্ণের প্রতি আসক্তা ছিল তাহারাই পরোঢ়া। এই যে পরোঢা ব্রজসুন্দরীগণ ইহারাই কৃষ্ণ-বল্লভাগণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহারা শোভা, সাদ্‌গুণ্য ও বৈভবের দ্বারা সর্বাতিশায়িনী; রমাদেবী হইতেও ইহারা অধিক প্রেমসৌন্দর্যভর-ভূষিতা। এই পরোঢা গোপীগণ আবার তিন প্রকারেব,—'সাধনপরা', 'দেবী' ও 'নিত্যপ্রিয়া'। পূর্বজন্মের সাধনাব ফলে যে-সকল ভক্তাদিব গোপীদেহ লাভ হয় তাঁহারাই সাধনপরা গোপী। এই সাধনপরা গোপী আবার 'যৌথিকী' এবং 'অযৌথিকী' ভেদে দ্বিবিধা। যাঁহারা আপনগণ সহ সাধনে রত হন তাঁহাবাই যৌথিকী। এই যৌথিকী আবার 'মুনি' ও 'উপনিষদ্‌' এই দুই রকম। পদ্মপুরাণে আমবা দেখিতে পাই যে, গোপাল-উপাসক দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যমাধুর্য আস্বাদন করিবার বাসনা লইয়া সাধনা দ্বারা গোপীদেহ লাভ করিয়াছিলেন। উপনিষদ্‌গণ সম্বন্ধেও কথিত আছে যে অখিল মহা-উপনিষদ্‌গণ গোপীগণের অসমোর্ধ্ব সৌভাগ্য সন্দর্শন করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তপস্যা করিয়া প্রেমাঢ্যা গোপীরূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে-কোন ভক্ত যখন গোপীভাবে বদ্ধরাগ হইয়া সাধনে রত হন, এবং উৎকণ্ঠাবশতঃ গোপীদের অনুগভাবে ভজন করিতে করিতে গোপীভাব এবং গোপীদেহ লাভ করেন তখন তিনিই অযৌথিকী গোপী নামে খ্যাতা হন। এই-জাতীয় গোপীগণেব মধ্যে আবার প্রাচীনারা সুদীর্ঘ কালের সাধনার ফলে 'নিত্যপ্রিয়া' গোপীগণেরই সঙ্গে সালোক্য প্রাপ্ত হন; নবীনাগণ মর্ত্যামর্ত্য বহু যোনি ভ্রমণ করিবার পর ব্রজে আসিয়া গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, জীবের উভয়কোটিতে (অর্থাৎ জীবকোটি এবং ভগবৎ-কোটি) প্রবেশসামর্থ্য রহিয়াছে। প্রেমভক্তির বলে সাধন-ভজনের দ্বারা

জীব প্রথমে ভগবানের স্বরূপভূত ধামে প্রবেশলাভ করে এবং সেই ধামে সে তাহার সাধনার উপযোগী ভগবানের লীলাপরিকরত্ব লাভ করে। এই সাধক ভক্তগণের মধ্যে উত্তম অধিকারী যাঁহারা তাঁহারাই ধামশ্রেষ্ঠ ব্রজধামে প্রবেশ করিয়া নিজেদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী কৃষ্ণ-বল্লভারূপে গোপীদেহ লাভ করেন। সুতরাং গোপীদের ভিতরে মোটামুটিভাবে দুই জাতীয় গোপী দেখা যায়, একদল গোপী হইল নিত্যগোপী—যাহারা নিত্যকালের জন্য মধুর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী, ইহারাই হইল নিত্যপ্রিয়া গোপী ; আর একদল হইল জীবেরই সাধনলব্ধ দিব্যপ্রেমবপু্। এই সাধনপরা-গোপীতত্ত্বই জীবের সাধ্য ; নিত্যপ্রিয়া-গোপীত্ব কখনও সাধ্য বস্তু নয়, ইহা নিত্যসিদ্ধ।

এই সাধনপরা গোপী এবং নিত্যপ্রিয়া গোপীর মাঝখানে আর এক শ্রেণীর কৃষ্ণবল্লভার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে বলা হয় 'দেবী'। যখন যখন পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অংশরূপে দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁহার সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত নিত্যপ্রিয়াদের অংশসকলেরও জন্ম হয়, ইঁহারাই দেবী নামে খ্যাতা। কৃষ্ণাবতারে এই দেবীগণই গোপকন্যকারূপে নিত্যপ্রিয়াগণের প্রাণতুল্যা সখীস্থানীয় হন। নিত্যপ্রিয়া গোপীগণের মধ্যে রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, চিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা এবং পালিকা প্রভৃতি প্রধানা। রাধা প্রভৃতি প্রধানা অষ্ট গোপীকে বলা হয় যূথেশ্বরী ; কারণ, ইঁহাদের প্রত্যেকেরই একটি যূথ আছে এবং সেই যূথে আবার তদ্ভাবভাবিনী অসংখ্য গোপী রহিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে আবার রাধা এবং চন্দ্রাবলীরই প্রাধান্য ; এই দুইজনের মধ্যেও আবার সর্বাংশে রাধারই উৎকর্ষ। তাহা হইলে দেখা গেল, শ্রীরাধাই হইলেন কৃষ্ণ-বল্লভাগণের মধ্যে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠা—সর্বথাধিকা; ইনি মহাভাবস্বরূপা এবং গুণসমূহের দ্বারা 'অতিবরীয়সী'। প্রেমসৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা এই রাধার কবিত্বময় বর্ণনা দিতে গিয়া রূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—এই বৃষভানুনন্দিনী (১) 'সুষ্ঠুকান্ত-স্বরূপা', (২) ধৃত-ষোড়শশৃঙ্গারা, এবং (৩) দ্বাদশাভরণাশ্রিতা। প্রথমতঃ 'সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা'র লক্ষণ দিতে গিয়া বলা হইয়াছে, যে রাধিকার রূপোৎসবে ত্রিভুবন বিধুনিত হয়, সেই রাধিকার কেশদাম সুকুঞ্চিত, দীর্ঘ নয়নযুক্ত মুখখানি চঞ্চল, কঠোর কুচদ্বয়ে বক্ষঃস্থল সুদৃশ্য, মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্কন্ধদেশ অবনমিত, হস্তযুগল নখরত্নশোভিত। রাধিকার ষোড়শ-শৃঙ্গারের বর্ণনায় দেখি, রাধিকা স্নাতা, তাঁহার নাসাগ্রে মণিরাজ, নীলবসন-পরিহিতা, কটিতটে নীবী, মস্তকে বদ্ধবেণী, কর্ণে উত্তংস, চন্দনাদিদ্বারা চর্চিতাঙ্গী,

কুসুমিতচিকুরা, মাল্যধারিণী, পদ্মহস্তা, মুখকমলে তাম্বুল, চিকুরে কস্তুরীবিন্দু, কজ্জলিত-নয়না, সুচিত্রা (অর্থাৎ গণ্ডাদিতে সুচিত্র করা), চরণে অলক্তক রাগ এবং ললাটে তিলক। রাধিকার দ্বাদশ আভরণ হইল, চূড়ায় মণীন্দ্র, কর্ণে স্বর্ণময় কুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলদেশে স্বর্ণপদক, কর্ণোর্ধ্বে স্বর্ণশলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠভূষণ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, বক্ষে তারানুকারা হার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে রত্ননূপুর, পদাঙ্গুলিতে তুঙ্গ অঙ্গুরীয়ক।

এই বৃন্দাবনেশ্বরীর অনন্ত গুণ, তাহার ভিতরে প্রধান প্রধান কতকগুলি গুণ উল্লেখিত হইয়াছে; যেমন, মধুরা, নববয়া, চলাপাঙ্গা, উজ্জ্বলস্মিতা, চারুসৌভাগ্য-রেখাঢ্যা, গন্ধোন্মাদিতমাধবা (অর্থাৎ যাহার অঙ্গগন্ধে মাধব উন্মাদিত হন) সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা, রম্যবাক্, নর্মপণ্ডিতা, বিনীতা, করুণাপূর্ণা, বিদগ্ধা, পটবান্বিতা (চাতুর্যশালিনী), লজ্জাশীলা, সুমর্যাদা, ধৈর্যগাম্ভীর্যশালিনী, সুবিলাসা, মহাভাব-পরমোৎকর্ষতর্ষিণী, গোকুলপ্রেমবসতি (অর্থাৎ গোকুলবাসী সকলেরই স্নেহপ্রীতির বসতি-স্বরূপ), জগচ্ছ্রেণীলসদ্যশা (যাহার যশে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে), গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা (গুরুজনের অতিশয় স্নেহপাত্রী), সখীপ্রণয়িতাবশা, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা, সন্ততাশ্রবকেশবা (সর্বদাই কেশব যাহার আজ্ঞাধীন) প্রভৃতি।

আমরা দেখিয়াছি, যূথেশ্বরীগণের মধ্যে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকাই প্রধানা। এই বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকার যূথে যে সকল সখী রহিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই সর্বসদ্গুণমণ্ডিতা এবং এই সুভ্রূগণ তাহাদের অশেষবিধ বিলাস-বিভ্রমের দ্বারা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই সখীগণও পাঁচ প্রকারের,—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠ-সখী। কুসুমিকা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠা প্রভৃতি হইল সাধারণ সখী; কস্তুরিকা, মণিমঞ্জরিকা প্রভৃতি কতিপয় গোপী হইল নিত্যসখী; শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা প্রভৃতি হইল প্রাণসখী। এই প্রাণসখীগণ বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকার প্রায় স্বরূপতাই লাভ করিয়াছে। কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশিকলা প্রভৃতি রাধার প্রিয়সখী; পরমপ্রেষ্ঠ-সখীগণের মধ্যে ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী এই আটজনই হইল 'সর্বগণাগ্রিমা'।

বৃন্দাবনের রাধা-কৃষ্ণলীলায় এই সখীগণের একটি প্রধান স্থান রহিয়াছে। এই সখীগণই হইল লীলা-বিস্তারিণী। প্রেমের একমাত্র বিষয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের

প্রেম-আশ্রয় হইল রাধিকা ; এই বিষয়াশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া যে নিত্য-লীলা তাহাকে অনন্ত বৈচিত্র্য এবং মাধুর্যে অনন্ত বিস্তার দান করিয়াছে এই সখীগণ। তাহারা প্রেমকে গড়িয়া ভাঙিয়াছে—আবার ভাঙিয়া গড়িয়াছে ; আর এই ভাঙা-গড়ার চাতুর্য-চপলতার দ্বারা প্রেমলীলাকে সূক্ষ্ম-সুকুমার রম্যত্বদানে কেবলই বিস্তার করিয়াছে। ইহারা কখনও কৃষ্ণ-পক্ষাবলম্বী—কখনও রাধার পক্ষে। যেমন খণ্ডিতার অবস্থায় ইহাদের রাধার প্রতি সহানুভূতি ও অনুরাগ, কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ, আবার মানের অবস্থায় ইহারা কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিণী— রাধার প্রতি যেন বিরাগিণী। আসলে এই সখীগণের রাধিকা ব্যতীত যেন পৃথক্ অস্তিত্বই নাই,—ইহারা যেন রাধিকারই ক্রমবিস্তার ; প্রেমস্বরূপিণীরই চারিদিকে হাস্যে-লাস্যে ছলা-কলায় বিলাস-চাতুর্যে একটি প্রেমজ্যোতির পরিমণ্ডল। এই জন্যই সখীরূপা গোপীগণকে বলা হয় রাধিকারই কায়ব্যূহরূপ। আমরা পূর্বে যেরূপ বিষ্ণুর বাসুদেবাদি ব্যূহে প্রকাশ দেখিয়াছি, এখানে আবার রাধিকারও সখী-মঞ্জরী প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যূহে প্রকাশ দেখিতেছি। ইহারা যেন মূল রাধিকা-স্বরূপ প্রেমকল্পলতারই পল্লবসদৃশা। এই সখীগণের কখনও কৃষ্ণ-সঙ্গসুখস্পৃহা ছিল না ; রাধিকার সহিত কৃষ্ণের যে মিলন তাহাতেই তাহারা পরমানন্দ অনুভব করিত ; এই জন্য রাধিকার সহিত কৃষ্ণের মিলনেই ছিল সখীদের সব চেষ্টা। একটি লতার পল্লবাদিতে জল সিঞ্চন না করিয়া লতার মূলে জলসিঞ্চন করিলে সেই মূলের রসেই যেমন পল্লবাদির রসপুষ্টি, রাধিকারূপ প্রেমকল্পলতার পল্লবসদৃশা সখীগণেরও সেইভাবে রস-পরিপুষ্টি।[১] চৈতন্য-চরিতামৃতে এ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী-লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী-বিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী-ভাবে যেই তারে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥

১ তুলনীয়—ঠাকুরাণীর কথা—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
(মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত), ২২৩ পৃষ্ঠা

কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তাঁর পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

মধ্য, ৮ম।

বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকার শ্রেষ্ঠতা রূপগোস্বামী 'রতি'-বিশ্লেষণের দ্বারাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তারতম্য ভেদে রতি তিন প্রকারের,—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। ইহার ভিতরে যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, প্রায়শঃ কৃষ্ণের দর্শনের দ্বারাই যে রতি উৎপন্ন হয়, এবং যাহা সম্ভোগেচ্ছারই নিদান—সেই রতিই সাধারণী রতি। ভাগবত-পুরাণ-বর্ণিত কুব্জার প্রেমই হইল এই সাধারণী রতির দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ দর্শনেই কুব্জার কৃষ্ণ-সম্ভোগেচ্ছা উদ্রিক্ত হইয়াছিল; সেইজন্যই সে কৃষ্ণের উত্তরীয়-বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছিল,—'হে প্রেষ্ঠ, এখানে আমার সহিত কয়েকটি দিন বাস কর এবং আমার সহিত রমণ কর; হে অম্বুজেক্ষণ, তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না।'[১] কুব্জার প্রেমের এই ভাব হইল অনেকটা কৃষ্ণকে উপপতি ভাবে গ্রহণ। এই রতি দুই দিক্ হইতে হেয়; প্রথমতঃ গাঢ়তার অভাববশতঃ এই রতির সম্ভোগেচ্ছাতেই পর্যবসান; সম্ভোগেচ্ছার হ্রাস হইলেই এই রতিরও হ্রাস হয়। দ্বিতীয়তঃ সম্ভোগেচ্ছায় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা থাকে; কৃষ্ণ-সঙ্গসুখের দ্বারা নিজে প্রীতি লাভ করিব কুব্জার ইহাই ছিল বাসনা, সুতরাং এ-প্রীতি সুখৈকতাৎপর্য নয় বলিয়াও ইহার নিকৃষ্টত্ব।

সমঞ্জসা রতিতে হইল পত্নীভাবের অভিমান; গুণাদি শ্রবণের দ্বারা ইহা উৎপন্ন হয়; কখন কখন ইহাতে সম্ভোগতৃষ্ণা জন্মে। রুক্মিণী আদির কৃষ্ণের প্রতি যে রতি তাহাই হইল সমঞ্জসা রতি। সমঞ্জসা রতিতে কখনও কখনও নিজসুখস্পৃহার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সমর্থা রতিতে নিজসুখস্পৃহা থাকে না। যে রতি সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে একটা অনির্বচনীয় বিশেষত্ব লাভ করে, যে রতিদ্বারা তাদাত্ম্য লাভ হয় তাহাকেই সমর্থা রতি বলে। এই রতি উৎপন্ন হইলে তাহা দ্বারা কুল, ধর্ম, ধৈর্য, লজ্জাদি সকল বিস্মরণ হইয়া যায়; অর্থাৎ রতি-

১ ভাগবত, ১০।৪৮।৭

বিরোধী কুল, ধর্ম, ধৈর্য, লজ্জাদি বাধাসকল তখন নিঃশেষে উপেক্ষিত হয়। এই রতি হইল 'সান্দ্রতমা'—অর্থাৎ ভাবান্তরের দ্বারা কখনও ইহার ভিতরে প্রবেশ ঘটে না। এই রতি স্বরূপসিদ্ধা ব্রজবালাগণের মধ্যে কারণ-নিরপেক্ষ ভাবে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রতি হইল সকল 'অদ্ভুতবিলাসোর্মি'র 'চমৎকারকরশ্রী',—ইহার সহিত সম্ভোগেচ্ছার কোন বিশেষ বা পার্থক্য নাই; সুতরাং ইহার ভিতরে পৃথক্‌ভাবে কোনও স্ব-সম্ভোগেচ্ছা নাই—ইহার সকল উত্তমই হইল 'কৃষ্ণসৌখ্যার্থ'।

এই সমর্থা রতিই প্রৌঢ়া হইয়া অর্থাৎ সমধিক পরিণতি লাভ করিয়া মহাভাব-দশা লাভ করে। এই রতি ক্রমে দৃঢ় হইয়া প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব রূপে পরিণত হয়। যেমন বীজ (ইক্ষুবীজ বা অঙ্কুর) বপন করিলে তাহার ক্রমপরিণতিতে তাহা হইতে রস, রস হইতে গুড়, গুড় হইতে খণ্ড, খণ্ড হইতে শর্করা, শর্করা হইতে সিতা (মিশ্রী) এবং তাহা হইতে সিতাপলা হয়, সেইরূপই রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে রাগ, রাগ হইতে অনুরাগ এবং অনুরাগ হইতে মহাভাব উৎপন্ন হয়।[১] আমরা জীবগোস্বামীর প্রীতি-সন্দর্ভে প্রীতি বা রতি হইতে প্রেম, স্নেহ, মানাদির উৎপত্তি এবং এই সকল প্রেম-স্তর বিশেষের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। রূপগোস্বামী বলিয়াছেন, ধ্বংসের সর্বথা কারণ থাকা সত্ত্বেও যাহার ধ্বংস হয় না যুবক-যুবতীর ভিতরকার এইরূপ ভাব-বন্ধনকে প্রেম বলে।[২] প্রেম যখন পরমা কাষ্ঠা লাভ করিয়া 'চিদ্দীপদীপন' হয় অর্থাৎ প্রেমবিষয়োপলব্ধির প্রকাশক হয়[৩] এবং হৃদয়কে দ্রবীভূত করে, তখন

১ প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্মল ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥ চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য, ২৩অ)

২ সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ॥

৩ চিচ্ছব্দেন প্রেমবিষয়োপলব্ধিরুচ্যতে।............সা চিদেব দীপস্তং দীপয়তি উদ্দীপ্তং করোতীতি। —বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত 'আনন্দচন্দ্রিকা টীকা'।

তাহার নাম স্নেহ।[১] স্নেহ যখন উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তির দ্বারা নব নব মাধুর্য আনয়ন করে, অথচ স্বয়ং অদাক্ষিণ্য (অকৌটিল্য) ধারণ করে, তাহাকে মান বলে।[২] মান যদি বিস্রম্ভ (অর্থাৎ বিশ্বাস বা সম্ভ্রমরাহিত্য) দান করে তবে তাহাকে প্রণয় বলে।[৩] প্রণয়োৎকর্ষহেতু চিত্তে অধিক দুঃখও যখন সুখত্বরূপে অনুভূত হয় তখন সেই প্রেমকে রাগ বলে।[৪] সদানুভূত প্রিয়কেও যে রাগ নিত্য নবত্ব দান করিয়া অনুভূতিতেও নিত্য নবত্ব দান করে তাহাকেই অনুরাগ বলে।[৫] অনুরাগ যদি 'যাবদাশ্রয়বৃত্তি' হইয়া স্ব-সংবেদ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয় তবে তাহাকেই বলে ভাব।[৬] ভাবের ভিতরে প্রেমের প্রত্যেক স্তরের সর্বগুণাদিই বর্তমান ; ইহাই হইল প্রেম-প্রকাশের পরাকাষ্ঠা। এখানে অনুরাগের 'স্ব-সংবেদ্যদশা'-প্রাপ্তির তাৎপর্য হইল অনুরাগের নিজোৎকর্ষদশা-প্রাপ্তি। এই ভাবের তিনটি স্বরূপ রহিয়াছে ; প্রথমতঃ হ্লাদাংশে 'স্বসংবেদরূপত্ব', দ্বিতীয়তঃ সংবিদংশে 'শ্রীকৃষ্ণাদিকর্মকসম্বেদনরূপত্ব', তারপরে তদুভয়াংশে 'সংবেদ্যরূপত্ব' ; অর্থাৎ একটিতে বিশুদ্ধ প্রেমানন্দানুভব, অপরটিতে প্রেমানন্দের বিষয়রূপে কৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান, তৃতীয়টিতে এই প্রেমানুভূতি ও চৈতন্যের একটা অপূর্ব মিশ্রণ। ভাবে তাই ত্রিধা সুখ লাভ হয় ; প্রথমতঃ ইহাই অনুরাগের চরমোৎকর্ষ এই জাতীয় একটি শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ প্রথম সুখ ; তৎপরে প্রেমাদির দ্বারা অনুভূতচর হইয়াও সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগোৎকর্ষ দ্বারা অনুভূত হইতেছে এইরূপ দ্বিতীয় সুখ ; তৎপরে শ্রীকৃষ্ণানুভবন রূপ এই অনুরাগোৎকর্ষ অনুভূত হইতেছে এইরূপ তৃতীয় সুখ। শীতোষ্ণপদার্থের মধ্যে শৈত্যাদির উৎকর্ষসীমবস্তু চন্দ্রসূর্য যেমন তাহাদের নিকটে বা দূরে যাহা কিছু আছে সকলকেই শীতল বা উষ্ণ করে, তেমনই অনুরাগোৎকর্ষ-

---

১ আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ।
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে॥

২ স্নেহস্তূৎকৃষ্টতাবাপ্ত্যা মাধুর্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে॥

৩ মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

৪ দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে॥

৫ সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে॥

৬ অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

রূপ ভাব শ্রীরাধাহৃদয়ে সম্যক্ উদিত হইয়া শ্রীরাধাকে যেমন প্রেমানন্দময়ী করিয়া তোলে, তেমনই যাবতীয় সাধক ভক্ত এবং সিদ্ধ ভক্তগণের চিত্তকেও শ্রীরাধার প্রেমানন্দেই বিলোড়িত করিয়া তোলে। ইহাই উপরোক্ত 'যাবদাশ্রয়বৃত্তি' শব্দের তাৎপর্য। বৃত্তি শব্দের অর্থ হইল সান্নিধ্যবশতঃ হৃদ্বিলোড়ন-রূপ ব্যাপার বা ক্রিয়া।[১] এই ভাবের মধ্যে আবার যে ভাব কৃষ্ণবল্লভাগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীব্রজদেবীগণের মধ্যেই সম্ভব সেই ভাবকেই বলা হয় মহাভাব। এই মহাভাব শ্রেষ্ঠ অমৃতস্বরূপ শ্রী ধারণ করিয়া চিত্তকে নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত করায়।[২] এই মহাভাব আবার রূঢ় এবং অধিরূঢ় রূপে দ্বিবিধ। যে মহাভাবে সাত্ত্বিকভাব-সকল (স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং পুলক) উদ্দীপ্ত হয় তাহাকে রূঢ় মহাভাব বলে। আর যখন অনুভাবসকল রূঢ় মহাভাবের অনুভব-সকল হইতেও একটি বিশিষ্টতা লাভ করে তখন তাহাকে অধিরূঢ় মহাভাব বলে।

এই রূঢ় এবং অধিরূঢ় মহাভাব সম্বন্ধে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার 'উজ্জ্বল-নীলমণিকিরণে' বলিয়াছেন,—যেখানে কৃষ্ণের সুখে পীড়াশঙ্কা করিয়া নিমেষেরও অসহিষ্ণুতাদি—তাহাই হইল রূঢ় মহাভাব; আর কোটিব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত সুখও যাহার সুখের লেশমাত্র হয় না, সমস্ত বৃশ্চিকসর্পাদিদংশনকৃত-দুঃখও যাহার দুঃখের লেশমাত্র হয় না, কৃষ্ণের মিলন-বিরহে এইরূপ সুখদুঃখ যে-অবস্থায় হয় সেই অবস্থাকেই বলে অধিরূঢ় মহাভাব।[৩]

এই অধিরূঢ় মহাভাবেরও আবার 'মোদন' ও 'মাদন' এই দুইটি প্রকারভেদ রহিয়াছে। এই মোদন ও মাদনের ব্যাখ্যায় জীবগোস্বামী তাঁহার 'লোচনরোচনী' টীকায় বলিয়াছেন,—মোদন হইল হর্ষবাচক, সুতরাং মোদনাখ্য মহাভাবের হর্ষানুভূতিতেই পর্যাপ্তি; মাদন হইল 'দিব্যমধুবিশেষবন্মত্ততাকর'; দিব্যমধু বিশেষ যেরূপ মত্ততার সৃষ্টি করে মাদনাখ্য মহাভাবের ভিতরেও তেমনই একটা মত্ততা রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে যত প্রকারের আনন্দ-বৈচিত্রী জন্মিতে পারে মাদনাখ্য মহাভাবে তৎসমুদয়েরই যুগপৎ অনুভব। রূপগোস্বামী বলিয়াছেন, যাহাতে সকান্ত-কৃষ্ণেরও চিত্তক্ষোভ জন্মে এবং বিপুল প্রেমসম্পদের

১ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা দ্রষ্টব্য।

২ বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ ॥

৩ কৃষ্ণস্য সুখে পীড়াশঙ্কয়া নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র স রূঢ়ো মহাভাবঃ। কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি, সমস্ত-বৃশ্চিক-সর্পাদি-দংশন-কৃত-দুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি, সোঽধিরূঢ়ো মহাভাবঃ।

অধিকারিণী কৃষ্ণকান্তাগণের প্রেম অপেক্ষাও যাহাতে প্রেমাধিক্য ব্যক্ত হয় তাহাই হইল মোদনাখ্য মহাভাব। এই মোদনাখ্য মহাভাব কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে একমাত্র রাধাযূথেই সম্ভব হয়; ইহাই হইল হ্লাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠ সুবিলাস। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি কান্তাসহ কুরুক্ষেত্রে অবস্থান-কালেও রাধার দর্শনে কৃষ্ণের চিত্তক্ষোভ জন্মিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণের দর্শনে রাধার যে প্রেমাতিশয়তা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা দ্বারা রুক্মিণী-আদির প্রেম অপেক্ষা রাধাপ্রেমের সর্বথা আধিক্য প্রমাণিত হইয়াছিল। বিশ্লেষ-দশাতে বা বিরহে এই মোদনই মোহন নাম ধারণ করে। এই মোহন ভাবে কান্তালিঙ্গিত কৃষ্ণের মূর্ছা, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও কৃষ্ণসুখ কামনা, ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্ব, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণেরও রোদন, মৃত্যু স্বীকার পূর্বক নিজ শরীরস্থ ভূতদ্বারা কৃষ্ণ-সঙ্গ-তৃষ্ণা, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি বহু অনুভাব পণ্ডিতগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। আমরা পূর্বেও জীবগোস্বামী-কৃত প্রীতির আলোচনায় সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। মাদন হইল হ্লাদিনীর সার, ইহা 'সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী'—অর্থাৎ ইহা রতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাব পর্যন্ত সর্বপ্রকার প্রেম-বৈচিত্র্যের যে উল্লাস তাহা যুগপৎ অনুভব করায়; ইহাই হইল পরাৎপর; একমাত্র রাধা ব্যতীত অন্য কাহাতেই এই মাদনাখ্য মহাভাবের সম্ভব হয় না। এইজন্যই শ্রীরাধিকা হইলেন 'কান্তাশিরোমণি'।[১]

মুখ্যতঃ রূপগোস্বামীর অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রাধিকার একটি অতি চমৎকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন, আমরা সেই বর্ণনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত।
কৃষ্ণেব প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ।

১ সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥

রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি-উদ্বর্তন।
তাহে সুগন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা-শ্যাম-পট্টশাটী পরিধান॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী-প্রণয়-চন্দন।
স্মিতকান্তি-কর্পূর তিনে অঙ্গবিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥
প্রচ্ছন্ন-মান বাম্য ধম্মিল্য-বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক-গুণ অঙ্গে পটবাস॥
রাগ-তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেম-কৌটিল্য নেত্র-যুগলে কজ্জল॥
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব-ভূষণ সর্ব অঙ্গে ভরি॥
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম-বৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল॥
মধ্য-বয়স্থিতা সখী স্কন্ধে কর ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব পর্যঙ্ক।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস কানে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যাম-রসমধু পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম॥

কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমরত্নের আকর।
অনুপম গুণগণ পূর্ণ-কলেবর ॥[১]

অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামের রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাকে সাহিত্যে রূপায়িত করিতে গিয়া বৈষ্ণব কবিগণকে মানুষের দৃষ্টান্ত এবং মানুষের ভাষাই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমও সেইজন্য মানবীয় প্রেম-লীলার সকল বৈচিত্র্যে এবং মাধুর্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। আলঙ্কারিক দৃষ্টি লইয়া রূপগোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে এবং তৎপরবর্তী কবি কর্ণপুর 'অলঙ্কার-কৌস্তুভ' গ্রন্থে যখন এই প্রেমকে রসমূর্তি দান করিয়াছেন তখন তাঁহারা 'রতি'কেই স্থায়িভাব রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যদিকে আবার অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত নায়ক-নায়িকার সর্ব-প্রকার ভেদ বিচার করিয়া কৃষ্ণ এবং রাধাই শ্রেষ্ঠ নায়ক-নায়িকা রূপে গৃহীত হইয়াছেন। অগাধ অসীম নিত্যপ্রেমলীলাবিস্তারকারী এই রাধা-কৃষ্ণের ভিতরে প্রবাহিত রসের বর্ণনা করিতে গিয়া নায়িকাশ্রেষ্ঠ রূপে বর্ণিতা শ্রীরাধার যে-সকল অনুভাবাদি বর্ণিত হইয়াছে এবং রতিরূপ স্থায়িভাবের যে ব্যভিচারী ভাবাদি বর্ণিত হইয়াছে তাহার ভিতরে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র এবং কামশাস্ত্রের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। গোস্বামিগণ বার বারই একথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে রাধা এবং অন্যান্য ব্রজদেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে এই লীলা তাহা প্রাকৃত কাম নহে; কিন্তু কাম না হইলেও 'কাম-ক্রীড়াসাম্যে' ইহাকে কাম নাম দেওয়া হইয়াছে এবং সাহিত্যের রূপায়ণে এবং আলঙ্কারিক বিশ্লেষণে ইহাকে প্রাকৃত কাম-ক্রীড়ার অনুরূপ ভাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে, ফলে রাধাকে পরিপূর্ণ প্রেমময়ী করিতে গিয়া যে যে চেষ্টা ও লীলা দ্বারা প্রাকৃত কামের বৈচিত্র্য ও সর্বাতিশয়িতা প্রকাশ পায় রাধার প্রতি তাহার সকলই আরোপিত হইয়াছে। ভারতীয় কামশাস্ত্রগুলিতে একটি শ্রেষ্ঠ নায়িকার যে সকল দেহ-ধর্ম এবং মনোধর্ম

১ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত হিন্দী কবি ধ্রুবদাসের নিম্নলিখিত পদটি এই প্রসঙ্গে তুলনীয়ঃ—

মহাভাব সুখ-সার-স্বরূপা, কোমল সীল সুভাউ অনূপা।
সখী হেত উদবর্তন লাবৈঁ, আনন্দ-রস সোঁ সবৈ অহ্নাবৈঁ॥
সারী লাজ কী অতি হী ধনী, অঁগিয়া প্রীতি হিয়ে কসি তনী।
হাব-ভাব-ভূষণ তন বনে, সৌরভ-গুনগন জাত ন গনে॥
রসপতি রস কোঁ রচি-পচি কীনোঁ, সো অংজন লৈ নৈননি দীনোঁ।
মেঁহদী-রংগ অনুরাগ সুরংগা, কর অরু চরণ রচে তিহি রংগা॥ ইত্যাদি।

বর্ণিত হইয়াছে আমরা তাহার সকলই এক রাধিকার ভিতরে দেখিতে পাই। বাৎসায়নের কামসূত্রের ভিতরে যে সকল নায়িকাগুণ বর্ণিত হইয়াছে, 'উজ্জ্বল-নীলমণি'র নায়িকা-বর্ণনায় আমরা প্রকারান্তরে তাহারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। এমন কি রাধাকৃষ্ণের অবৈধমিলন সঙ্ঘটিত করিয়া দিয়াছে যে বড়ায়ি বুড়ী তাহার মধ্যে 'যোগমায়া'র আভাসের সহিত কাম-শাস্ত্রোক্ত কুট্টনীরও পরিচয় মিলে। বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' কাব্যের 'বড়ায়ি' বুড়ীকে যোগমায়া-তত্ত্বের একটি প্রাকৃত সংস্করণ না বলিয়া একটি প্রাকৃত বুড়ীর রাধাকৃষ্ণের সান্নিধ্যহেতু যোগমায়া-তত্ত্বে উন্নয়ন বলা বোধহয় অধিকতর সমীচীন হইবে।

উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণীবিভাগের যে পদ্ধতি দেখিতে পাই তাহা মূলতঃ তৎপূর্ববর্তী সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মধুর ভাবের স্থায়িভাব 'রতি'কে অবলম্বন করিয়া যে সকল আলম্বন-উদ্দীপন বিভাব এবং অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের বর্ণনা রহিয়াছে তাহারও প্রাচীন আলঙ্কারিক ভিত্তি রহিয়াছে; কিন্তু রূপগোস্বামী সেই প্রাচীন ভিত্তির উপরে যে বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকেও অপূর্ব বলিয়া গ্রহণ করিতেই ইচ্ছা হয়। শুধু বিশ্লেষণ নহে, পুরাতন সাহিত্য হইতে এবং মুখ্যতঃ তাঁহার নিজের রচিত সাহিত্য হইতে এই প্রকারের প্রত্যেকটি বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের দৃষ্টান্ত দিয়া রূপগোস্বামী রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে অনন্ত-বিস্তার ও মধুরিমা দান করিয়াছেন। এই আলঙ্কারিক বিশ্লেষণ-মুখেই রাধা-প্রেম অনন্ত বৈভবে ও বৈচিত্র্যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। রূপগোস্বামী রাধাপ্রেমকে এই যে পরিপুষ্টি দান করিলেন, পরবর্তী কালে ইহাই বৈষ্ণব-কবিগণকে জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, রূপগোস্বামী তাঁহার পূর্ববর্তী কালের রাধাপ্রেম-অবলম্বনে রচিত একটা সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য পাইয়াছিলেন; দেশজ ভাষায় রচিত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কবিতাও তাঁহার সম্মুখে ছিল; তাহার সহিত আবার তাঁহার নিজের প্রতিভার বিরাট্ দানও যুক্ত হইয়াছিল; এইসকল উপাদানই তাঁহাকে বিশ্লেষণের এতখানি নিপুণতার সুযোগ দান করিয়াছিল; আবার বিশ্লেষণের মুখে তিনি বহু নূতন বৈচিত্র্য এবং চারুত্বের সৃষ্টিও করিয়া লইয়াছিলেন; তাঁহার এই আলঙ্কারিক সৃষ্টি এবং কবিসৃষ্টি মিলিত হইয়া পরবর্তী লীলা-প্রসার এবং তদবলম্বনে সাহিত্য-প্রসার এই উভয়কেই সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। আলঙ্কারিক দৃষ্টিতে রাধাপ্রেমের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ভিতরে আমরা আর

প্রবেশ করিব না ; আমরা শুধু রাধাপ্রেম সম্বন্ধে আর দু'একটি প্রধান প্রশ্ন সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা করিব।

রাধাপ্রেম-সম্বন্ধে একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্ব। পরকীয়া-প্রেম একটি তত্ত্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে, সম্ভবতঃ বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের পরবর্তী কালে। চৈতন্য-চরিতামৃতে অবশ্য দেখিতে পাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে পরকীয়া-তত্ত্বের আদর্শ স্বয়ং মহাপ্রভু কর্তৃকই প্রচারিত হইয়াছে। আমরা প্রেমের যে বিভিন্ন স্তরভেদ দেখিয়াছি পরকীয়া-তত্ত্ব সেই প্রেমেরই বা রসেরই একটি বিশেষাবস্থা। চৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হইয়াছে, 'পরকীয়া রসে অতি ভাবের উল্লাস্।' পরকীয়াতে প্রেমের সর্বাধিক স্ফুরণ। এইজন্য প্রেমের ভিতরে শ্রেষ্ঠ যে কান্তাপ্রেম তাহার ভিতরেও শ্রেষ্ঠ হইতেছে পরকীয়া রতি, রাধাপ্রেমেই এই পরকীয়া রতির পর্যবসান।[১] 'পরকীয়া' প্রেমই হইল নিকষিত হেম, কারণ, এ-প্রেম সর্বত্যাগী প্রেম, সর্বসংস্কারবিমুক্ত প্রেম, সর্ব-লজ্জা-ভয়-বাধা-নির্মুক্ত প্রেম ; ইহা শুধু-মাত্র প্রেমের জন্যই প্রেম, সুতরাং ইহাই হইল বিশুদ্ধ রাগাত্মিকা রতি।

বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রে দর্শনালিঙ্গনাদির আনুকূল্যনিষেবণের দ্বারা যুবক-যুবতির চিত্তে উল্লাসের উপরে যে ভাব আরোহণ করে তাহাকেই বলা হয় সম্ভোগ। এই সম্ভোগ মুখ্যতঃ চারিপ্রকারের,—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্। যে ক্ষেত্রে লজ্জা, ভয় ও অসহিষ্ণুতা হেতু ভোগাঙ্গসকল অল্পমাত্র ব্যবহৃত হয় তাহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে। সাধারণতঃ পূর্বরাগের পরেই এই-জাতীয় সম্ভোগের বিকাশ। নায়ক-কৃত বিপক্ষের গুণকীর্তন এবং স্ববঞ্চনাদির স্মরণের দ্বারা ভোগোপচারসমূহ যেখানে সঙ্কীর্ণভাবে দেখা দেয় তাহাই সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। ইহা কিঞ্চিৎ তপ্ত-ইক্ষু-চর্বণবৎ ; অর্থাৎ এককালেই স্বাদু এবং উষ্ণ। মানাদিস্থলে এইরূপ সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। প্রবাস হইতে আগত কান্তের সহিত যে সম্ভোগ তাহাকে বলে সম্পন্ন সম্ভোগ ; আর যেখানে যুবক-যুবতি পারতন্ত্র্যহেতু বিযুক্ত, এমন কি পরস্পরের দর্শনও যেখানে দুর্লভ, সেইক্ষেত্রে উভয়ের যে উপভোগের অতিরেক তাহাকেই বলে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে,

[১] পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥ (চৈতন্য-চরিতামৃত, আদি, ৪র্থ)

পারতন্ত্র্য না থাকিলে সম্ভোগ সমৃদ্ধ হয় না; লৌকিক ক্ষেত্রে ঔপপত্যাদিই সম্ভোগ-সমৃদ্ধির কারণ। লৌকিক কামক্রীড়া-সাম্যে এই কারণেই রাধাপ্রেমে কৃষ্ণকে উপপতি রূপেই ক্রীড়া করিতে হইয়াছে; ইহাই পরকীয়ার তাৎপর্য।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, আভীর জাতির মধ্যে যখন গোপাল-কৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রচলিত ছিল তখন কন্যা গোপীগণ এবং পরোঢ়া গোপীগণের সহিত তাঁহার প্রেম-লীলার কাহিনীই প্রচলিত থাকা স্বাভাবিক; কারণ পৃথিবীতে যত প্রেমগীতি রচিত হইয়াছে, বিশুদ্ধ দাম্পত্যলীলা লইয়া তাহার কোথাও স্ফূর্তি নাই। বিশেষতঃ রাখালিয়া সঙ্গীত দাম্পত্য-প্রেম লইয়া না হইবারই সম্ভাবনা।[1] এই কারণেই কৃষ্ণ-প্রণয়িনী গোপীগণ অন্যগোপের কন্যা বা স্ত্রীরূপেই বর্ণিতা। প্রধানা গোপিনী রাধিকার আমরা সাহিত্যে যখন হইতে আবির্ভাব দেখিতে পাইলাম, তখন হইতে তাহাকে পরোঢ়া গোপীরূপেই দেখিতে পাই। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, 'কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ে' রাধাপ্রেমের কবিতাকে অসতী-ব্রজ্যার ভিতরেই গ্রহণ করা হইয়াছে। পরবর্তী কালের সংগ্রহেও কুলটা-প্রেমের দৃষ্টান্তরূপে রাধাপ্রেমের কবিতার উল্লেখ দেখিতে পাই। আমরা রাধা-সম্বন্ধে যত প্রাচীন শ্লোকের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি সেগুলি লক্ষ্য করিলে অধিকাংশের ভিতরেই অবৈধ প্রেমের উল্লেখ বা আভাস দেখা যাইবে।

১। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর ভাণ্ডারকর বলেন,—"The dalliance of Krisna with cowherdesses, which introduced an element inconsistent with the advance of morality into the Vasudeva religion, was also an after-growth, consequent upon the freer intercourse between the wandering Abhiras and their more civilised Aryan neighbours. Morality cannot be expected to be high or strict among races in the condition of the Abhiras at the time; and their gay neighbours took advantage of its looseness. Besides, the Abhira women must have been fair and handsome as those of the Ahir-Gavaliyas or cowherds of the present day are." (Vaisnavism, Saivism ইত্যাদি, ৩৮ পৃষ্ঠা।) এ-বিষয়ে আমাদের মনে হয়, আভীর জাতির সত্যকারের ইতিহাস ঠিকমত কিছু না জানিয়া শুধু মাত্র অনুমানের উপরে এতগুলি কথা বলিবার বিশেষ কোন যৌক্তিকতা নাই। যে জাতির ভিতরেই যখন প্রেম-কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই প্রচলিত সমাজ-রীতি এবং সমাজ-নীতি ভাঙিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে; সুতরাং এ-বিষয়ে শুধু আভীর জাতির নৈতিক অবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখিতে পাইতেছি না।

এই অবৈধ প্রেমের প্রবাদটিকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন কালে রাধা সম্বন্ধে বিভিন্ন উপাখ্যান গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার ভিতরে প্রধান হইল এই, বৃষভানু গোপের কন্যা রাধা আয়ান ঘোষের বিবাহিতা স্ত্রী। এই আয়ান ঘোষ সম্বন্ধেও বহু মত প্রচলিত। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, শ্রীযুত যোগেশ রায় বিদ্যানিধির মতে সূর্যের 'অয়ন'ই শেষ পর্যন্ত আসিয়া আয়ান ঘোষের মধ্যে গোয়ালাদেহ ধারণ করিয়াছে। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের গ্রন্থে আয়ান ঘোষকে 'অভিমন্যু' রূপে পাইতেছি; বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে 'আইহন' রূপটি অভিমন্যু রূপের সমর্থক। কেহ কেহ বলেন প্রাকৃত 'আয়ান' নামটিই খাঁটি, সংস্কৃত 'অভিমন্যু' দ্বারা আয়ানকে খানিকটা সাধু করিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। এই আয়ান ঘোষ ছিল গোপরাজ মাল্যকের পুত্র, জটিলা তাহার মা। তাহারা ছিল তিন ভাই, তিন বোন। তিন ভাই হইল তিলক, দুর্মদ ও আয়ান; তিন বোন যশোদা, কুটিলা, প্রভাকরী। যশোদার ভাই বলিয়া আয়ান ঘোষ হইল কৃষ্ণের মামা, এবং রাধিকা কৃষ্ণের মামী। অন্যত্র দেখি আয়ান ঘোষের মা জটিলা হইল কৃষ্ণের 'মাতুর্মাতুলানী'[১]; সুতরাং আয়ান ঘোষ যশোদার মামাত ভাই এবং সেই হিসাবে কৃষ্ণের মামা। রাধিকা কৃষ্ণ অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন, বহু উপাখ্যানেই ইহার সমর্থন মেলে। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকেও ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। কৃষ্ণজন্মের পর রাধিকা প্রতিবেশিনী গোয়ালিনীদের সঙ্গে যশোদা-সুত কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিল, এবং তখন আদর করিয়া শিশু কৃষ্ণকে রাধিকা যখন কোলে করিয়াছিল, তখন রাধা-কৃষ্ণের স্বরূপ-স্মৃতি উদ্রিক্ত হওয়াতে সেই অবস্থায়ই তাহাদের প্রথম মিলন হইয়াছিল এইরূপ রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম সম্বলিত বহুপদ পদকর্তাগণ রচনা করিয়াছেন। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে আয়ান ঘোষ ছিল নপুংসক; সুতরাং নপুংসক স্বামীর প্রতি রাধার অবজ্ঞা এবং রূপে গুণে সর্বোত্তম নাগর কৃষ্ণের প্রতি তাহার অনুরক্তি অতি স্বাভাবিক ভাবেই সূচিত হইয়াছে। অসংখ্য বাঙলা বৈষ্ণবপদাবলীর ভিতরে কৃষ্ণ-প্রণয়িনী রূপে তাহাকে অনূঢ়া গোপকন্যা এবং পরোঢ়া গোপরমণী এই দুইরূপেই অঙ্কিত দেখিতে পাই।

এই পরকীয়া প্রেমবিষয়ে রাধিকার প্রধান প্রতিপক্ষ দেখিতে পাই অপর আর একটি পরোঢ়া গোপরমণী চন্দ্রাবলীকে।[২] চন্দ্রাবলী হইল চন্দ্রভানুর পুত্র

১ বিদগ্ধমাধব নাটক।

২ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী একই বলিয়া বর্ণিত।

গোবর্ধন মল্লের স্ত্রী। গোবর্ধন মল্ল এবং আয়ান ঘোষ অতি নিকট বন্ধু ছিল। 'ললিত-মাধব' নাটকে রাধা ও চন্দ্রাবলী সম্বন্ধে অনেক জটিল কিংবদন্তী দেখিতে পাই, সে-সকলের ভিতরে প্রবেশ করার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যোগেশ রায়ের মতে চন্দ্রই চন্দ্রাবলী এবং সূর্য-বিম্বরূপ কৃষ্ণের সহিত মিলন-ব্যাপারে রাধা-নক্ষত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। বৈষ্ণব-কবিতার মান-খণ্ডিতাদির পদ-গুলির ক্ষেত্রে চন্দ্রাবলীই রাধিকার প্রেমের মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপে দেখা দিয়াছে। আমরা 'উজ্জ্বলনীলমণি'র কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণে রাধা ও চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণের প্রিয়াশ্রেষ্ঠা নিত্যপ্রিয়া রূপে বর্ণিত দেখিয়াছি।[১] কিন্তু এই উভয় নিত্যপ্রিয়ার ভিতরেও তত্ত্বতঃ রাধার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র দেখান হইয়াছে। উভয়ের ভিতরে মূল পার্থক্য এই, রাধিকার প্রেমে আত্ম-সুখেচ্ছার লেশ মাত্র নাই, সকলই কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য। কিন্তু চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণপ্রীতির ভিতরে আত্মপ্রীতি-কামনার কিছু গন্ধ ছিল। রাধিকার যে স্বাঙ্গসঙ্গদানের দ্বারা সুখোৎপাদনের চেষ্টা সেখানে নিজে সুখী হইবারও বাসনা বর্তমান ছিল। এই জন্য দেখিতে পাই, পরবর্তী কালে রাধাতত্ত্ব এবং চন্দ্রাবলীতত্ত্ব বৈষ্ণবগণের নিকটে দুইটি পৃথক্ তত্ত্বরূপে দেখা দিয়াছিল।

রাধা-চন্দ্রাবলীর কথা বাদ দিয়া সাধারণ ভাবে গোপরমণীগণের সহিত কৃষ্ণের অবৈধপ্রেমের বাঞ্ছনীয়ত্ব সম্বন্ধে ভাগবত-পুরাণে প্রথম এবং স্পষ্ট প্রশ্ন দেখিতে পাই। রাস-লীলার বর্ণনায় দেখিতে পাই, পরোঢ়া গোপীগণ জার-বুদ্ধিতেই কৃষ্ণের সহিত সঙ্গতা হইয়াছিল। কৃষ্ণচরিত্রের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ধর্মনিষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবের প্রতি এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন,—"ধর্মের সংস্থাপনের জন্য এবং অধর্মের প্রশমের জন্য ভগবান্ জগদীশ্বর নিজের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ধর্মসেতুসমূহের বক্তা, কর্তা এবং অভি-রক্ষিতা সেই কৃষ্ণ কেন এই পরদারাভিমর্শন-রূপ প্রতিকূল আচরণ করিয়া-ছিলেন?"[২] তখন পর্যন্ত পরকীয়া-বাদ কোনও তত্ত্বরূপে গড়িয়া ওঠে নাই

রাধা-চন্দ্রাবলী-মুখ্যাঃ প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়া ব্রজে।
কৃষ্ণবন্নিত্যসৌন্দর্য-বৈদগ্ধ্যাদি-গুণাশ্রয়া॥ উজ্জ্বলনীলমণি, কৃষ্ণবল্লভাঃ, ৩৬

সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
স কথং ধর্মসেতূনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্॥ ভাগবত, ১০।৩৩।২৬-২৭

বলিয়া শুকদেব অতি স্পষ্ট এবং সহজ ভাবে ইহার জবাব দিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন,—"তেজস্বিগণের পক্ষে কিছুই দোষের নহে, যেমন সর্বভুক্ বহ্নির (কিছুতেই পাপস্পর্শ বা মালিন্যস্পর্শ ঘটে না)।……ঈশ্বরগণের বাক্যই হইল সত্য, আচরণ সর্বদা সত্য নয়; যে যে ক্রিয়া তাঁহাদের 'স্ববচোযুক্ত' অর্থাৎ যে আচরণ তাঁহাদের বচনের সহিত সঙ্গত, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শুধু তাহারই আচরণ করিবেন।"[১] ইহা ত গেল লৌকিক নীতির দিক্ হইতে; তত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, "যোগপ্রভাবের দ্বারা বিধুত হইয়াছে অখিল কর্মবন্ধ যে সকল মুনির সেই সকল মুনিও যাঁহার পাদপঙ্কজপরাগনিষেব-তৃপ্ত হইয়া স্বেচ্ছামত আচরণ করিয়াও বন্ধনগ্রস্ত হন না, সেই ভগবানের যে নিজের ইচ্ছায় গৃহীত বপু তাহার আর বন্ধন কোথায়? গোপীগণের, তাহাদের পতিগণের, সর্বপ্রকারের দেহধারিগণেরই যিনি অন্তশ্চরণ করেন সেই অধ্যক্ষ (বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী ভগবান্) ক্রীড়ার জন্যই মর্ত্যে দেহ ধারণ করেন।"[২] অর্থাৎ তত্ত্বতঃ যিনি সর্বপ্রাণীরই দেহে ও অন্তরে বিরাজমান থাকিয়া নিরন্তর 'রমণ' করিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে পরদার বলিয়া কেহই নাই, সুতরাং পরদারাভি-মর্শনের কোনও প্রশ্নই উঠে না।

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের আবির্ভাবের পূর্বে প্রধানা গোপিনী রূপে রাধা বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিতা। রাধা-চন্দ্রাবলী ও অন্যান্য গোপীগণকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের বিভিন্ন প্রকার ভেদ দেখাইতে গিয়া রূপগোস্বামী কৃষ্ণ-বল্লভাগণকে স্বকীয়া ও পরকীয়া রূপে ভাগ করিয়াছেন; সাধারণ ভাবে রুক্মিণী-আদি মহিষী-গণ স্বকীয়া ও রাধাদি গোপীগণ পরকীয়া রূপে গৃহীত। কিন্তু রূপগোস্বামীর

তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা ॥

* * * *

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥ ঐ, ১০।৩৩।২৯, ৩১

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুতঃ এব বন্ধঃ ॥
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্ ॥ ঐ, ১০।৩৩।৩৪, ৩৫

নাটকাদি রচনা এবং অন্যান্য লেখা আলোচনা করিলে মনে হয়, তিনিও তত্ত্বতঃ পরকীয়া-বাদ স্বীকার করেন না। এই জন্য তাঁহার ললিত-মাধব নাটকের পূর্ণমনোরথ নামক দশম অঙ্কে দেখিতে পাই, দ্বারকাস্থিত নব-বৃন্দাবনে সত্রাজিৎ রাজার কন্যা সত্যভামা-রূপিণী রাধিকার সহিত কৃষ্ণের বিধিমতে বিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহসভায় সতীশ্রেষ্ঠা অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, শচীদেবী সহ ইন্দ্রাদি দেবগণ, বৃন্দাবনের নন্দ-যশোদা, শ্রীদামাদি সখাগণ, ভগবতী পৌর্ণমাসী প্রভৃতি এবং দ্বারকার বসুদেব-দেবকী প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। 'বিদগ্ধ-মাধব' নাটকেও দেখিতে পাই অভিমন্যুগোপ বা আয়ান ঘোষের সহিত রাধিকার বিবাহ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, অভিমন্যুগোপের সহিত রাধিকার বিবাহ সত্য বিবাহ নহে, অভিমন্যুগোপকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তই স্বয়ং যোগমায়া তাহাদের বিবাহকে সত্যের ন্যায় প্রতীতি করাইয়াছেন। আসলে রাধাদি সকলই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী[১] তাহা হইলে রূপগোস্বামীর মতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীত্বই হইল রাধাদি গোপীগণের স্বরূপ-পরিচয়, বাহ্যে তাহাদের অনূঢ়া কন্যাত্ব বা অন্য-গোপীগণের স্ত্রীত্ব যোগমায়া-বিঘটিত একটা প্রাতিভাসিক সত্যমাত্র। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে, ভাগবতের রাসবর্ণনায়ও বলা হইয়াছে, গোপীগণ যখন রাস-কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসলীলায় রত তখনও যোগমায়ার প্রভাবে গোপীগণের মায়া-বিগ্রহ তাহাদের স্ব স্ব স্বামিগণের পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল।[২]

কৃষ্ণ-বল্লভা-প্রকরণে রূপগোস্বামী পরকীয়া-সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাদৃষ্টে বোঝা যায়, গোপীদের পরকীয়াত্বের প্রশ্নটাকে তিনি নানাভাবে এড়াইবার বা লঘু করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নায়ক-প্রকরণে রূপগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য আলোচনা-প্রসঙ্গে এই ঔপপত্যেই যে শৃঙ্গারের পরমোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে ভরত মুনির মত উল্লেখ করিয়াও দেখাইয়াছেন যে এই প্রচ্ছন্নকামুকত্বেই মন্মথের পরমা রতি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন,—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥

১। তদ্বঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকম্। নিত্য-প্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য। (১ম অঙ্ক)

২ ১০।৩৩।৩৭

অর্থাৎ প্রেমের এই ঔপপত্য বিষয়ে যে লঘুত্বের কথা বলা হইল তাহা প্রাকৃত নায়ক-পক্ষেই প্রযোজ্য, রসনির্যাসের আস্বাদনের নিমিত্ত যে কৃষ্ণাবতার তাহাতে ইহার কিছুই প্রযোজ্য নয়। রূপগোস্বামীর এই উক্তি ভাগবতের সুরের সহিতই যুক্ত।

রূপগোস্বামীর অনুসরণ করিয়া জীবগোস্বামী এই স্বকীয়া পরকীয়া সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। 'উজ্জ্বলনীলমণি'র 'লোচন-রোচনী' টীকায় জীবগোস্বামী উপরি-উক্ত শ্লোকটিকে অবলম্বন করিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। অন্যত্রও প্রাসঙ্গিক ভাবে জীবগোস্বামী নানাভাবে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল মতামত আলোচনা করিয়া দেখা যায়, জীবগোস্বামী তত্ত্বতঃ পরকীয়াবাদ সমর্থন করিতেন না। তাঁহার মতে পরমস্বকীয়াতেই রাধা-প্রেমেরও চরমোৎকর্ষ। স্বরূপে—অর্থাৎ অপ্রকট ব্রজ-লীলায় রাধা কৃষ্ণের পরমস্বকীয়া, সেখানে কৃষ্ণের ঔপপত্যের লেশমাত্র নাই। এই জন্য জীবগোস্বামী তাঁহার 'গোপাল-চম্পূ' নামক গদ্য-পদ্য কাব্যের উত্তর-চম্পূতে রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ সঙ্ঘটিত করিয়াছেন। পরকীয়া-বাদ সম্বন্ধে রূপ-গোস্বামীর চিত্তপ্রবণতা ব্যঞ্জনায় বুঝিতে পারিলেও এবিষয়ে তাঁহার মত স্পষ্ট নহে, কিন্তু জীবগোস্বামী এ-বিষয়ে তাঁহার মত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অপ্রকট গোলকলীলায় স্বকীয়াই পরম সত্য; পরকীয়া হইল মায়িক মাত্র; কৃষ্ণের যোগমায়া প্রকট-বৃন্দাবনলীলায় এই পরকীয়া ভাবের বিস্তার করিয়া থাকে। প্রকট-লীলায় রসনির্যাস-আস্বাদনের পরিপাটির জন্যই আত্মারাম পুরুষ নিজের মাযা দ্বারাই একটি পরকীয়াত্বের ভান সৃষ্টি করিয়া পরম বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেন। প্রকট-লীলার ক্ষেত্রে রাধা এবং অন্যান্য গোপীগণ ব্যবহারিক জীবনে তাহাদের পতি প্রভৃতিকে অস্বীকার করিতে পারে নাই; কিন্তু কৃষ্ণের সহিত তাহারা যখনই সঙ্গত হইত তখন কৃষ্ণকে তাহারা প্রাণ-বল্লভ জানিলেও যোগমায়ার প্রভাবে তাহাদের স্বরূপ-জ্ঞান এবং কৃষ্ণের সহিত তাহাদের স্বরূপ-সম্বন্ধের জ্ঞান আবৃত থাকিত; ইহারই ফলে ঘটিত একটা পরকীয়া অভিমান। প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিবারণাদির উপাধির দ্বারাই পরকীয়া রতিতে প্রেমেব বৈশিষ্ট্য সাধিত হয়; অপ্রকট ব্রজে যদি শ্রীরাধার স্বকীয়াত্বই পরম সত্য হয় তবে সেখানে প্রেমের এবংবিধ উল্লাসোৎকর্ষ কি করিয়া সাধিত হইতে পারে? ইহার জবাবে জীবগোস্বামীর বক্তব্য এই যে, অপ্রকট ব্রজধামে রাধার এইজাতীয় প্রেমোৎকর্ষ নিত্য এবং একান্ত স্বাভাবিক; মাদনাখ্য মহাভাব-

পরাকাষ্ঠার ভিতরে এইজাতীয় রাগোৎকর্ষ স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান। যাহা স্বাভাবিক তাহার মহিমা কোন অংশে ন্যূন নহে। একটি মত্ত হস্তী যখন সর্বপ্রকারের বাধা অতিক্রম করিয়া সম্মুখপথে অগ্রসর হয় তখন তাহার অসীম শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটে; কিন্তু তাই বলিয়া সে যখন স্থির হইয়া থাকে তখন ঐ জাতীয় শক্তিমত্তা তাহার ভিতরে নাই এ-কথা কেহই বলিবে না। সেইরূপ প্রকটলীলায় রাধা তাহার প্রেমের পথের সর্বপ্রকারের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যে রাগোৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে অপ্রকট ব্রজধামে পরম স্বকীয়াবস্থায় তাহার সেই রাগোৎকর্ষের কোনরূপ ন্যূনতা ঘটিয়াছে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

কিন্তু দেখা যাইতেছে, জীবগোস্বামীর পরবর্তী কালে পরকীয়াবাদ পরমতত্ত্বরূপেই স্বীকৃত হইয়াছে। পরবর্তী কালের লেখকগণ জীবগোস্বামীকেও পরকীয়াবাদী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা 'চৈতন্য-চরিতামৃত'কার কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরকীয়া-তত্ত্ব সমর্থনের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।[২] পরবর্তীকালের পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টি লইয়া এই পরকীয়া মতকে প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই তুল্যভাবে সত্য বলিয়া

১ উজ্জ্বলনীলমণির নায়ক-প্রকরণের উপরি-উক্ত শ্লোকের টীকায় জীবগোস্বামী পরকীয়াবাদের বিরুদ্ধে যত আলোচনা করিয়াছেন সকল আলোচনার শেষে অবশ্য একটি সংশয়-উদ্রেককারী শ্লোক রাখিয়া গিয়াছেন। উপসংহারে একটি শ্লোক রহিয়াছে—

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎ পূর্বাপরসম্বন্ধং তৎ পূর্বমপরং পরম্॥

এই শ্লোকের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। এ-বিষয়ে এবং পরকীয়া-বাদ সম্বন্ধে জীবগোস্বামীর মতামতের বিস্তারিত আলোচনা শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথের চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

২ কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীও চরিতামৃতের আদি লীলায় (চতুর্থ পরিচ্ছেদে) শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলায় অবতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥

এখানে কিন্তু মনে হয়, যোগমায়ার প্রভাবে গোপীগণের উপপতিভাব লইয়া যে লীলা উহা প্রকট-লীলারই বৈশিষ্ট্য, বৈকুণ্ঠাদিতে এইজাতীয় উপপতিভাবের লীলা নাই, এবং এইজন্যই বৈকুণ্ঠাদির লীলা হইতে কৃষ্ণাবতার রূপে অবতার-লীলাতেই লীলার অধিকতর রসপুষ্টি।

প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যত্নন্দন দাসের নামে প্রচলিত 'কর্ণানন্দ' গ্রন্থে এই পরকীয়া-বাদ স্থাপনই যে জীবগোস্বামীরও আসল উদ্দেশ্য তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। পরবর্তী কালে স্বকীয়া-পরকীয়া-বাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন তর্ক সভা বসিয়াছিল এবং তাহাতে পরকীয়া-বাদের প্রাধান্যই যুক্তিতর্কের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়; এ-সকলের প্রামাণিকতা অবশ্য সংশয়াতীত নহে।

মোটের উপর দেখা যায়, গোস্বামিগণের পরবর্তী কালে পরকীয়া-বাদ আস্তে আস্তে প্রাধান্য লাভ করে। তত্ত্বের দিক্ ছাড়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে এই পরকীয়া-বাদের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রধান দুইটি কারণ মনে হয়। প্রথমতঃ বাঙলা-দেশের বৈষ্ণব-ধর্ম ও সাহিত্য মুখ্যতঃ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনেই রস-সমৃদ্ধ। জয়দেবের পরে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি এবং তৎপরবর্তী কালে অসংখ্য বৈষ্ণব কবি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সূক্ষ্ম সুকুমার অসংখ্য বৈচিত্র্য লইয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই সকল কাব্য-কবিতার ভিতর দিয়া রাধার পরকীয়াত্বই এমন ভাবে সাহিত্যের ভিতরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল যে তত্ত্বের দিক্ হইতে তাহাকে আর অস্বীকার করিবার, অথবা শুধুমাত্র ব্যাখ্যা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবার উপায় ছিল না। পরকীয়াকে শুধুমাত্র মায়িক বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে রাধা-কৃষ্ণের প্রকট-লীলা (যাহা মুখ্যতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্যের উপজীব্য) তাহা প্রাণহীন হইয়া যাইত। বৈষ্ণব কবিগণ কর্তৃক অঙ্কিত প্রেমময়ী রাধিকার মূর্তিখানিকে জীবন্ত করিয়া গ্রহণ করিতে এই পরকীয়াবাদের পরমার্থত্বও স্বীকার করার প্রয়োজন ছিল। রাধাকৃষ্ণের সমৃদ্ধলীলার ক্রমপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাই পরকীয়া-বাদও ক্রমপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

রাধাকে অবলম্বনে এই পরকীয়া-বাদের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তৎকালীন একটি বিশেষ জাতীয় ধর্ম-সাধনারও প্রভাব বর্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহা হইল নর-নারীর যুগলরূপের সাধনা। হিন্দুতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, বৌদ্ধ-সহজিয়া প্রভৃতির ভিতর দিয়া এই নর-নারীর যুগল-সাধনার ধারা এ-দেশে প্রবাহিত ছিল। বৈষ্ণব-সহজিয়ায় আসিয়া এই ধারাটি একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সর্বত্রই ছিল একটা আরোপ-সাধনার ব্যবস্থা—সে বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি। এই আরোপ-সাধনায় যে নারী-গ্রহণের পদ্ধতি রহিয়াছে সেখানে পরকীয়ারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সহজিয়াদের সাধনায়। সহজিয়া সাধনায় এই পরকীয়ার প্রাধান্যও পরবর্তী কালে বৈষ্ণব-

ধর্মের রাধার পরকীয়াত্বে বিশ্বাস আরও দৃঢ় করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

তত্ত্বের দিক্‌ হইতে রাধা সম্বন্ধে আর একটি আলোচনার অবতারণা করিয়াই আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। আমরা দেখিয়াছি, পরম তত্ত্বের এই রসস্বরূপতাই হইল ইহার প্রেম-স্বরূপতা। এই প্রেমে কৃষ্ণ বিষয় রাধা আশ্রয়। আমরা বলিতে পারি, ভগবানের প্রেমরূপা হ্লাদিনী-শক্তির রাধিকাই হইল পূর্ণতম আধার। এই রাধিকার ভিতর দিয়া এই পরমপ্রেমানন্দ জগৎ-জীবে ভক্তিরস রূপে ছড়াইয়া পড়ে। সেই দিক্‌ হইতে রাধিকাই হইল ভগবানের ভক্তশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এইখানেই একটা বিষয়কে স্পষ্ট করিয়া লওয়া প্রয়োজন। রাধিকা কৃষ্ণের ভক্তশ্রেষ্ঠ হইলেও এবং রাধিকার ভিতর দিয়া হ্লাদিনীশক্তি ভক্তিরস রূপে জীবের ভিতরে প্রবাহিত হইলেও রাধিকা-স্বরূপত্ব-লাভ কিংবা রাধাভাবে কৃষ্ণসেবা জীবের কখনও সাধ্য নহে। জীব নিত্য-অণু-স্বভাব,সেই নিত্য-অণুস্বভাবজীবের পক্ষে কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়াস্বরূপ-শক্তি রাধিকার সম-ভাবাপন্ন হওয়া কখনও সম্ভব নহে। আমরা এইজন্য জীবের সখী-ভাবের সাধনার কথা শুনিতে পাই। কিন্তু এই সখীভাবের সাধনার ভিতরেও আবার দুই রকমের সাধনার ভেদ অতি স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে, প্রথম হইল রাগাত্মিকা স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা, আর দ্বিতীয় হইল রাগানুগা আনুগত্যময়ী সেবা। নিত্য-ব্রজধামে সুবলাদি, বা নন্দ-যশোদাদি বা রাধিকাদি কৃষ্ণের যে-সকল নিত্য-পরিকর রহিয়াছেন রাগাত্মিকা সেবায় শুধু মাত্র তাঁহাদেরই অধিকার। এখানে রাগ তাঁহাদের নিত্য-আত্মধর্ম; এই আত্মধর্মরূপে রাগে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে নিত্যসেবা তাহাই রাগাত্মিকা সেবা। জীব এইসকল ব্রজ-পরিকরগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের রাগেরঅনুগভাবেই কৃষ্ণসেবা করিতে পারে। সুবলাদি ব্রজ-সখাগণের কৃষ্ণের প্রতি যে সখ্যভাবে প্রীতি বা রাগ ইহা তাহাদের নিত্যসিদ্ধ আত্মধর্ম, সুতরাং সুবলাদির সখ্যভাবে কৃষ্ণসেবা রাগাত্মিকা সেবা; ভক্তের নিকট এই সুবলাদির সখ্যপ্রীতি পরমাদর্শ, পরম সাধ্য বস্তু; এই সাধ্যের জন্য সাধন হইবে রাগানুগভাবে, অর্থাৎ অনুরূপ-সেবার আচরণ, শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদির দ্বারা অনুরূপ রাগে রুচি উদ্বোধিত করিয়া লীলা আস্বাদন করা। জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তি-সন্দর্ভে বলিয়াছেন, এই যে রাগাত্মিকা ভক্তি তাহা হইল সাধ্যরূপা ভক্তি-লক্ষণা রাগ-গঙ্গায় তরঙ্গ-স্বরূপা; ইহার হইল সাধ্যত্বই, সাধন-প্রকরণে ইহার প্রবেশ নাই। রাগানুগার ক্ষেত্রে সাধক-ভক্তচিত্তে পূর্বোক্ত

রাগবিশেষে রুচিই জাত হয়, স্বয়ং রাগ-বিশেষ জাত হয় না; এস্থলে তাদৃশ রাগসুধাকরের কিরণাভাসের দ্বারা ভক্তহৃদয়রূপ স্ফটিকমণি যেন সমুল্লসিত হইয়া ওঠে; সেই চিত্তসমুল্লাস রূপ রুচি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে ভজন তাহাই হইল রাগানুগ সাধন, জীবের পক্ষে ইহাই সম্ভব।[১] রূপগোস্বামী তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহরীতে রাগাত্মিকা ভক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'ইষ্টে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাই রাগ, তন্ময়ী অর্থাৎ সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহাই হইল রাগাত্মিকা ভক্তি। আর ব্রজবাসিজনের ভিতরে অভিব্যক্তরূপে বিরাজমানা যে রাগাত্মিকা ভক্তি তাহার অনুসৃতা ভক্তিই রাগানুগা নামে খ্যাত।'[২] রাধাপ্রেম হইল পূর্ণ মধুর রসের রাগাত্মক প্রেম, তাহা এক রাধা ব্যতীত আর কোথাও সম্ভব নয়। এই রাধার কায়ব্যূহ-স্বরূপ হইল সখীগণ, সেই সখীগণের অনুগতা সেবাদাসী হইল মঞ্জরীগণ; শ্রীরূপমঞ্জরী আদি এই মঞ্জরীগণও গোলকের নিত্যপরিকর, তাঁহাদের অনুগভাবে সেবা ও লীলা-আস্বাদনই হইল জীবের শ্রেষ্ঠ কাম্য। এই রাগানুগ ভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 'অষ্টকালীন' লীলার স্মরণই হইল বৈষ্ণব-সাধকগণের প্রধান সাধন। কৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার আভাস পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, রূপগোস্বামী কয়েকটি শ্লোকে সংক্ষেপে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয লীলার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কবি কর্ণপূরের 'শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত' কাব্যে এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতে' এই অষ্টকালীন লীলার সুমধুর বিস্তার দেখিতে পাই। সিদ্ধকৃষ্ণদাস বাবাজীর 'ভাবনা-সার-সংগ্রহে' এই অষ্টকালীয় লীলা সম্বন্ধে ধারাবদ্ধ এবং সুবিন্যস্ত প্রায় তিন সহস্র শ্লোক উদ্ধৃত

১ তস্যাশ্চ সাধ্যায়াং রাগ-লক্ষণায়াং ভক্তি-গঙ্গায়াং তরঙ্গরূপত্বাৎ সাধ্যত্বমেবেতি ন তু সাধনপ্রকরণেঽস্মিন্ প্রবেশঃ। অতো রাগানুগা কথ্যতে। যস্য পূর্বোক্তে রাগবিশেষে রুচিরেব জাতাস্তি ন তু রাগবিশেষে এব স্বয়ং, তস্য তাদৃশরাগসুধাকরকরাভাসসমুল্লসিতহৃদয়স্ফটিকমণেঃ শাস্ত্রাদিশ্রুতাসু তাদৃশ্যা রাগাত্মিকায়া ভক্তেঃ পরিপাটীষ্বপি রুচির্জায়তে। ততস্তদীয়ং রাগং রুচ্যানুগচ্ছন্তী সা রাগানুগা তস্যৈব প্রবর্ততে॥ ৩১০॥

২ ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥
বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥

আছে। বৈষ্ণব কবিগণও তাঁহাদের বাঙলা পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের এই অষ্ট-কালীয় লীলার মধুর রূপ দান করিয়াছেন। 'নিশান্তলীলা' হইতে এই অষ্ট-কালীয় লীলার আরম্ভ; তারপরে 'প্রাতর্লীলা', 'পূর্বাহ্নলীলা', 'মধ্যাহ্নলীলা', 'অপরাহ্ণ-লীলা', 'সায়ংলীলা', 'প্রদোষ-লীলা', ও সর্বশেষে 'নৈশলীলা'। বিচিত্র অবস্থানের ভিতর দিয়া শ্রীরাধিকাকেই এই কৃষ্ণলীলার প্রধান অবলম্বন দেখিতে পাই; অন্যান্য ব্রজপরিকরগণ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এই লীলারই রস-পরি-পোষণ করিয়াছেন।

একাদশ অধ্যায়

চৈতন্য-চরিতামৃতে ব্যাখ্যাত গৌরতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানিকে তত্ত্বালোচনার দিক্ হইতে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের গ্রন্থসকলে আলোচিত তত্ত্ব-সমূহের একটি কবিত্বময় সার-সঙ্কলন বলা যাইতে পারে। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে রূপ-সনাতন-আলোচিত তত্ত্ব-সমূহ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কর্তৃক উপদিষ্ট এইভাবে প্রচার করিয়াছেন; ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ-বিষয়ে মতানৈক্যের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কিন্তু এই একটি প্রধান জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতে শ্রীরাধা এবং শ্রীচৈতন্য ভক্তকবিগণের তত্ত্বালোচনায় এবং কাব্য-রূপায়ণে বহু স্থানেই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব তাঁহার গৌর অঙ্গে যখন অরুণ-বর্ণের বসন গ্রহণ করিলেন তখন হইতেই তিনি দেহমনে যেন রাধা হইয়া গিয়াছেন। পরবর্তী কালে প্রেমোন্মাদ দশায় তাঁহার সকল চেষ্টা ও আচরণই প্রেমোন্মাদিনী রাধিকার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। অন্ততঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বর্ণনার ভিতরে চৈতন্যদেবকে আমরা এই রূপে এবং এই ভাবেই পাইতেছি। 'আমার গোরা ভাবের রাধারাণী'—ইহা গৌড়ীয় সকল ভক্ত এবং কবির একটি স্থিরবদ্ধ বিশ্বাস। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন,—

> রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর।
> সেই ভাবে সুখদুঃখ উঠে নিরন্তর॥
> শেষলীলায় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
> ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
> রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
> সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে॥
> রাত্রে বিলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
> আবেশে আপন ভাবে কহেন উঘাড়ি॥

—চৈতন্য-চরিতামৃত (আদি, ৪র্থ)

এই ভাবে চৈতন্যপরবর্তী কালে বাঙলা-সাহিত্যে শ্রীরাধার একটি নূতন

রূপ ফুটিয়া উঠিল; একদিকে চৈতন্যদেবও যেমন তাঁহার সকল প্রেম-বিরহ-চেষ্টা লইয়া শ্রীরাধার অনুরূপ ভাবেই চিত্রিত হইতে লাগিলেন, আবার শ্রীরাধাও তেমনই চৈতন্যদেবের ভাবরূপে অঙ্কিত হইতে লাগিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে প্রেমাবেশে বিহ্বল মহাপ্রভুর বর্ণনায় দেখি—

আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়।
সুবর্ণ পর্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥

চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত একটি পদে (পদটি চৈতন্য-পরবর্তী যুগে রচিত হইবারই সম্ভাবনা) রাধার বর্ণনা দেখি—

অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি পড়ে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতুলি যেন ধূলায় লুটায়॥

এখানে কে কাহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে সে তর্ক না করিয়াও এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে এখানে রাধা ও গৌরাঙ্গ এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধাকে দেখি, কৃষ্ণ-বিরহে অঙ্গুলি দ্বারা নিরন্তর ভূমিতে দাগ কাটিয়াছেন,—

উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখিগণ সঙ্গ।
পদ-অঙ্গুলি দেই খিতি পর লেখই
পাণি কপল-অবলম্ব॥

মহাপ্রভুরও তেমনই দেখিতে পাই—

ভাবাবেশে কভু প্রভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈয়া॥ (মধ্য, ১৩শ)

কবি বিদ্যাপতির ভণিতায় একটি রাধা-বিরহের পদ পাওয়া যায়—

মাধব কত পরবোধব রাধা
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জিউ করব সমাধা॥
ধরণি ধরিয়া ধনি যতনহি বৈঠত
পুনহি উঠই নহি পারা।
সহজহি বিরহিণি জগ মাহা তাপিনি
বৈরি মদন-শর-ধারা।

অরুণ-নয়ন-লোরে তীতল কলেবর
বিলুলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরি গণতহি শেষা॥

পদটি পড়িলে মনের মধ্যে যে চিত্রটি ফুটিয়া ওঠে তাহাতে পদটি চৈতন্যদেবের পরবর্তী কালের বাঙলাদেশের কোনও চৈতন্য-প্রভাবিত বিদ্যাপতির লেখা বলিয়া গ্রহণ করিতেই মন উৎসুক হয়। জ্ঞানদাসের একটি প্রসিদ্ধ অভিসারের পদে দেখি—

আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ-আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া॥
রবাব খমক বীণা সুমিল করিয়া।
বৃন্দাবনে প্রবেশিল জয় জয় দিয়া॥

এত রবাব, খমক, বীণা বাজাইয়া যে দলটি জয়ধ্বনি দিতে দিতে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল সে দলটি যে মহাপ্রভুরই কীর্তনের দল এবং ভাবাবেশে সখীর (গদাধর প্রভৃতির ?) অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া যিনি আধপদ চলেন আবার মূর্ছিত হইয়া পড়েন, তিনিও যে স্বয়ং মহাপ্রভু ইহা বুঝিয়া লইতে কোনও কষ্ট হয় না।[১]

আসলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সমস্ত জীবন হইল এই অপ্রাকৃত রাধা-প্রেমেরই ভাবব্যাখ্যা। সাধারণ লোকের পক্ষে অপ্রাকৃত রাধাপ্রেম একটা অমূর্ত তত্ত্বভাবনা মাত্র ;এই তত্ত্ব-ভাবনা সকল বিষয়ীকৃত হইয়াছিল মহাপ্রভুর জীবনে; সাধারণ জীবের পক্ষে তাই মহাপ্রভুর প্রেমের দ্বারা রাধা-প্রেমকে বুঝিয়া লওয়াই হইল প্রকৃষ্ট পন্থা। চৈতন্যোত্তর কবিগণ মহাপ্রভুর রাধাভাবে ভাবিত প্রেমমূর্তি

১ চৈতন্যপরবর্তী যুগের বৈষ্ণব কবিগণ শুধু শ্রীরাধার বর্ণনায়ই যে মহাপ্রভুর বিরহচেষ্টাদির চিত্রদ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, স্থানে স্থানে বিরহকাতর শ্রীকৃষ্ণও মহাপ্রভুর আদর্শেই বর্ণিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গোবিন্দদাসের প্রসিদ্ধ পদ—

'রা' কহি 'ধা' পহুঁ কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুসমণি লোটায় ধরণি পুন
কো কহ আরতি ওর॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের এই বর্ণনা মহাপ্রভুর বিরহ-বর্ণনার সহিত এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছে।

লইয়া ঠিক রাধার অনুরূপভাব-চেষ্টাদি বর্ণনা করিয়া বহু পদ রচনা করিয়াছেন। এই পদগুলিই এখন কীর্তনারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা রূপে ব্যবহৃত হয়। মহাপ্রভুর এই প্রেম যেন রাধা-প্রেমের নিগূঢ় রহস্যের ভিতরে প্রবেশ করিবার চাবি-কাঠি; বাসুদেব ঘোষ (নরহরি সরকার ?) এই তত্ত্বটিকে অতি চমৎকার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :—

যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে ॥
মধুর-বৃন্দাবিপিন-মাধুরী-
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥

বৃন্দাবনের বিপিনে যে লীলা-মাধুর্যের বিস্তার ঘটিয়াছে তাহার ভিতরে 'প্রবেশ-চাতুরী-সার' হইল এই গৌরাঙ্গ-প্রেম; এইজন্যই রাধা-প্রেম কীর্তন করিবার পূর্বে ভক্তচিত্তে নিগূঢ় তত্ত্বভাবনা জাগ্রত করিবার জন্য এই গৌরচন্দ্রিকা কীর্তন করিয়া লইতে হয়।

গৌরচন্দ্রিকায় শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে যে পদগুলি তাহা যে শুধু রাধা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তাহা নহে, সমভাবে কৃষ্ণ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বাসুদেব ঘোষের প্রসিদ্ধ পদ রহিয়াছে,—

গোরা-রূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি ॥
কি খেনে দেখিলাম গোরা কি না মোর হইল।
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল ॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসুঘোষে কহে গোরা রমণীমোহন ॥

ইহাই হইল 'নদীয়া-নাগর' গৌরাঙ্গ; কৃষ্ণ ছিলেন 'বৃন্দাবন-নাগর', তিনিই আবার অবতীর্ণ হইলেন 'নদীয়া-নাগর' রূপে। গৌড়ীয় ভক্তগণের বিশ্বাসে

গৌরাঙ্গ স্বরূপে হইলেন পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণেরই অবতার, কৃষ্ণ-স্বরূপেই তিনি রাধিকার শুভ্র ভাব-কান্তি বা দেহ-কান্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাই হইলেন 'অন্তঃকৃষ্ণ', 'বহির্গৌর'।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥'

ভাগবতের এই শ্লোকটিকে অবলম্বন করিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গ দেবের অন্তঃকৃষ্ণত্ব (কৃষ্ণবর্ণং) এবং বহির্গৌরত্ব (ত্বিষা অকৃষ্ণং) স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই ভাবটি অবলম্বন করিয়াই স্বরূপগোস্বামী তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্॥

"রাধা হইলেন কৃষ্ণেরই প্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি; এইজন্য তাঁহারা একাত্ম হইয়াও পৃথিবীতে (বৃন্দাবনধামে) দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধুনা আবার সেই দুই ঐক্য লাভ করিয়াছে; রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত চৈতন্যাখ্য সেই প্রকট কৃষ্ণস্বরূপকে আমি প্রণাম করি।"[২] রায় রামানন্দের সহিত রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনার পর রায় রামানন্দ যখন মহাপ্রভুর স্বরূপ-দর্শনের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন—

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥ (মধ্য, ৮ম)

পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবার এই চৈতন্য-অবতারে একাধারে রাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপে আবির্ভাবের তাৎপর্য কি? এই তাৎপর্যের ভিতরেই চৈতন্য-অবতারের

১ ১১।৫।২৯

২ তুলনীয় গোবিন্দদাসের পদ :—

জয় নিজ কান্তা- কান্তি-কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।
জয় ব্রজ-সহচরী লোচন-মঙ্গল
জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ॥

সকল গূঢ়-রহস্য নিহিত রহিয়াছে। এ-বিষয়ে স্বরূপ দামোদরের কড়চায় একটি মাত্র শ্লোকে সবতত্ত্বটি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

"যে প্রেমের দ্বারা রাধা আমার অদ্ভুতমধুরিমা আস্বাদন করে শ্রীরাধার সেই প্রণয়মহিমাই বা কি রকম; আর রাধাপ্রেম কর্তৃক আস্বাদ্য যে আমার অদ্ভুত-মধুরিমা তাহাই বা কি রকম; আমাকে অনুভব করিয়া রাধার যে সুখ হয় তাহাই বা কি রকম,—ইহারই লোভে রাধাভাবযুক্ত হইয়া শচীগর্ভরূপ সিন্ধুতে হরি (গৌরাঙ্গ) রূপ ইন্দু (চন্দ্র) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে ভূভার হরণের নিমিত্ত যে কৃষ্ণের অবতার হইয়াছিল ইহা একটা বহিরঙ্গ কথা; তাঁহার আবির্ভাব হইল প্রেমরসনির্যাস আস্বাদনের জন্য। এই প্রেমরসনির্যাস-আস্বাদনরূপ মুখ্য প্রয়োজনের সহিত আনুষঙ্গিক ভাবে ভূভার হরণের প্রয়োজন আসিয়া যুক্ত হইয়াছিল মাত্র। এই কৃষ্ণাবতারের পর আবার গৌর-অবতার কেন? গৌর-অবতারে লীলা-আস্বাদনের আরও পরিপুষ্টি দেখা যাইতেছে। কৃষ্ণাবতারের পরেও প্রেমাস্বাদন-বিষয়ে ভগবানের কিছু কিছু লোভ ছিল; সেই লোভের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন স্বরূপদামোদর উপরি-উক্ত শ্লোকের ভিতরে। এই শ্লোকে দেখিলাম, এই লোভ ছিল তিন প্রকারের—১। রাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ; ২। রাধা-আস্বাদিত কৃষ্ণের মাধুর্যমহিমা কিরূপ; ৩। কৃষ্ণ-সম্বন্ধী প্রেম-

১ তুলনীয়:—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ রূপগোস্বামীর স্তবমালা, ২।৩

"যে কুতুকী (শ্রীকৃষ্ণ) প্রণয়িজনবৃন্দের (অনির্বচনীয়) অপার মধুর রসসমূহ হরণ করিয়া তাহাকে উপভোগ করিবার জন্য এই জগতে তাহার (সেই প্রণয়িজনবৃন্দের) দ্যুতি প্রকটিত করিয়া নিজের (শ্যাম) কান্তিকে আবৃত করিয়াছিলেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব আমাদিগকে অতি শীঘ্র কৃপা করুন।"

আস্বাদনে রাধার সুখ কিরূপ। এই তিন প্রয়োজনেই অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌররূপে গৌরাঙ্গের অবতার। এই প্রয়োজন তিনটি এবং এগুলিকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরাধা ও তাহার প্রেমের স্বরূপ কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের আদিলীলার চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই বর্ণনা অনুসরণ করিয়াই আমরা বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

রাধাপ্রেমের মহিমা-বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ॥
কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা—ক্রীড়ার সহায় ॥

এই কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি রাধিকা হইতেই অন্যান্য কান্তাগণের বিস্তার। কৃষ্ণকান্তাগণ ত্রিবিধ প্রকারের, প্রথম লক্ষ্মীগণ, দ্বিতীয় মহিষীগণ এবং তৃতীয় ললিতাদি ব্রজাঙ্গনাগণ। ইহার ভিতরে—

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ ॥
আকার-স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥

বহুকান্তা ব্যতীত বসেব উল্লাস হয না, এইজন্য এক রাধিকাই এই তিন প্রকারের বহুকান্তারূপে কৃষ্ণকে অনন্ত বিচিত্র লীলারসাস্বাদন করান। এইজন্য—

গোবিন্দানন্দিনী রাধা—গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব—সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥

* * * *

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥
কিংবা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥

* * * *

জগত মোহন কৃষ্ণ—তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নহে ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

এই অনন্ত-বিচিত্র-প্রেমে মহিমময়ী রাধার সহিত সমস্ত লীলা-রস আস্বাদন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের তিনটি লোভ বাকি রহিয়া গিয়াছিল; যাহার জন্য আবার গৌর-অবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই তিনটি লোভের ভিতরে—

তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা প্রেমাস্বাদ॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময়;
রাধাপ্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই॥

* * * *

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥

আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি কবি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ ধকৃধকী॥

ইহাই হইল কৃষ্ণাবতাবের পর গৌর-অবতারের প্রথম লোভরূপ প্রয়োজন। রাধিকা প্রেমের আশ্রয়, কৃষ্ণ শুধু প্রেমেব বিষয; প্রেমের আশ্রয়ত্বের ভিতরে যে কি মহিমা রহিয়াছে তাহা অনুভব কবিবাব জন্যই গৌর-অবতারে হরি একাধারেই প্রেমের বিষয় এবং আশ্রয় হইযা উভয মুখে প্রেমের মহিমা আস্বাদ করিলেন।

গৌরাবতারে হরির দ্বিতীয় লোভ হইল এই, প্রেমের বিষয়ের ভিতরে যে 'অদ্ভুতমধুরিমা' থাকে বিষয় নিজে তাহা আস্বাদ করিতে পারে না। এক-মাত্র আশ্রয়দ্বারেই এই প্রেমবিষয়েব মাধুর্য প্রকাশ পায়। শ্রীবাধার হৃৎ-মুকুরেই কৃষ্ণমাধুর্যের চরম প্রকাশ এবং আস্বাদন; শুধু তাহাই নহে, রাধিকার প্রেম-গভীরতা এবং বৈচিত্র্যের দ্বাবাই কৃষ্ণের সৌন্দর্য মাধুর্য যেন উত্তরোত্তব বর্ধিত হইতে থাকে। সুতবাং রাধারূপ গ্রহণ না কবিলে কৃষ্ণ তাঁহার নিজের ভিতরে নিহিত অনন্ত মাধুর্যকেই নিজে আস্বাদ কবিতে পাবে না। নিজের মধুর-স্বরূপ-উপলব্ধির জন্যই তাই কৃষ্ণকে গৌব-অবতারে রাধিকাব ভাবকান্তি গ্রহণ কবিতে হইল। তাই দ্বিতীয় লোভ সম্বন্ধে চবিতামৃতে বলা হইয়াছে—

এই এক শুন আর লোভেব প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ কবেন বিচার॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোব মধুবিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বাবে নিত্য বাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল বাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে।
এ-দর্পণের আগে নবনবরূপে ভাসে॥

মম্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম—দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥

কবিরাজ গোস্বামী ইহাকেই অন্যত্র বলিয়াছেন,—"আপনি আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন"; গৌরহরিরূপে তিনি রাধাভাবে বিভোর হইয়া নিরন্তর নিজ-মাধুর্যই নিজে আস্বাদন করিয়াছেন।

গৌর-রূপ অবতারের প্রতি কৃষ্ণের আর একটি লোভ ছিল; তাহা হইল কৃষ্ণের সহিত মিলনে রাধার যে সর্বাতিশায়ী সুখ, রাধার অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার করিয়া সেই সুখকে একবার আস্বাদ কবা। মিলনজনিত সুখ বস্তুটি শ্রীরাধার ভিতরে যে সর্বাতিশায়িনী বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল তাহা আর কোনও লোকে আর কাহারও ভিতরে সম্ভব নহে, তাহা ব্রজধামে একমাত্র রাধার ভিতরেই সম্ভব হইয়াছিল। কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার 'কাম' ছিল, রাধিকাই হইলেন 'কামেশ্বরী'; কিন্তু 'অধিরূঢ় মহাভাব'রূপ রাধার এই কামের ভিতরে প্রাকৃত কামের লেশমাত্র ছিল না, রাধার অপ্রাকৃত কাম হইল বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম। কবিরাজ গোস্বামীর মতে কাম ও প্রেম লৌহ আর স্বর্ণের ন্যায় স্বরূপবিলক্ষণ; একটি হইল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা, অপরটি হইল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা; একটি হইল অন্ধতমঃ, অপরটি হইল নির্মল ভাস্কর।, আমরা পূর্বালোচনায় বহুবার দেখিয়াছি, রাধার প্রেম হইল বিশুদ্ধ 'কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য'।[১] 'চন্দ্রাবলী'র ভিতরে আত্মপ্রীতির লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকাতে তাহা রাধার প্রেম হইতে নিকৃষ্ট।

অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥
আত্মসুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

গোপীগণের এই বিশুদ্ধ কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য প্রেমের নিকট স্বয়ং কৃষ্ণকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে; এইজন্যই ভাগবতে কৃষ্ণবাক্য দেখিতে পাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, এই গোপীপ্রেম তাঁহার নিজের সাধ্য নহে।[১] গোপীগণের যে নিজদেহপ্রীতি তাহাও মূলে সেই কৃষ্ণপ্রীতির জন্যই।[২] কিন্তু কামগন্ধহীন এই গোপীপ্রেমের ভিতরে একটি অদ্ভুত রহস্য রহিয়াছে; এখানে 'সুখ বাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটি গুণ'! ইহা একটি গোপীপ্রেমের অদ্ভুত স্ব-বিরোধ। এই স্ব-বিরোধ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় বলিয়াছেন,

গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ-সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিবোধেব একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণেব বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এত সুখে গোপীব প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণশোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীশোভা বাড়ে তত॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ গুণে।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥

১ ১০।৩২।২১

২ তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহোত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তার ধন তার এই সম্ভোগ সাধন॥
এ-দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তাষণ।
এই লাগি করে দেহে মার্জ্জন ভূষণ॥

এই যে গোপীপ্রেম এবং প্রেমজনিত সুখের কথা বলা হইল ইহার মধ্যে আবার—

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥

এই রাধিকার ত্রিভুবনে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে তাঁহার সকল প্রেমচেষ্টা দ্বারা তিনি পূর্ণানন্দ এবং পূর্ণরসস্বরূপ কৃষ্ণকেও আনন্দিত করেন, কৃষ্ণসুখেই তাঁহার সকল সুখচেষ্টা ও প্রেমচেষ্টার পর্যবসান। কৃষ্ণ তাই মনে মনে বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছেন—

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন জন॥
আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হইতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্য নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত ঘ্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ-গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥
এই মত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত॥

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে আগোয়ান॥
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোরভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে নেত্রে হয় অন্ধ॥
তাম্বুল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ-সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥
লীলা অন্তে সুখে ইহার যে অঙ্গমাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি॥

* * * *

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥

ইহাই হইল গৌর-অবতারের রাধাভাব-অঙ্গকান্তি ধারণ করিবার রহস্য।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভগবত্তা এবং সেই ভগবত্তার স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর সহিত এক করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে রাধার মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন এবং রাধাতত্ত্বের স্থাপনা করিয়াছেন যথাসম্ভব কবিরাজ গোস্বামীর নিজের ভাষাতেই আমরা তাহার পরিচয় দিলাম। এই আলোচনাটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, শ্রীরাধিকার অধ্যাত্ম-মূর্তির মহিমময় পূর্ণ-প্রকাশ এই চৈতন্যযুগে। চৈতন্যপূর্ববর্তী রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-সাহিত্যে—এবং চৈতন্য-পরবর্তী রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-সাহিত্যেও রাধিকার একটি দ্বৈত সত্তা রহিয়াছে, তাহার অপ্রাকৃত অধ্যাত্ম মূর্তি একটি অশরীরী ছায়ার ন্যায়ই তাহার কাব্যে-রূপায়িত

প্রাকৃত মূর্তির চারিদিকে ক্ষণে ক্ষণে একটি দিব্য পরিমণ্ডলের আভাস মাত্র দিয়াছে ; সাহিত্যিক রূপায়ণে আমরা বরঞ্চ প্রাকৃতেরই জয় দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-সাহিত্যকে আধ্যাত্মিকতার অতখানি উচ্চগ্রাম হইতে দেখিবার এবং গ্রহণ করিবার যে একটি দৃষ্টি রহিয়াছে সে দৃষ্টিটি মুখ্যতঃ চৈতন্য-যুগেরই দান বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্যের দিব্য ভাবে এবং আচরণে—তাঁহার পরমভক্ত এবং পরমজ্ঞানিগুণী পরিকরবর্গের ধ্যানমননের মধ্যে শ্রীরাধার এক নব আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম ; এই আবির্ভাবের দিব্যদ্যুতি এখনও বাঙালীর চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে, এবং এই কারণেই আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যের আস্বাদন-কালে সাহিত্য-রসের সহিত অধ্যাত্ম-রসের মিশ্রণ না ঘটাইয়া পারি না, এই মিশ্রণ বা সমন্বয় ব্যতীত বৈষ্ণব-সাহিত্যের আস্বাদনে কোথায় একটি অপূর্ণতা থাকিয়া যায়। সেইজন্যই বলিতে হয়, ভক্তকবি নরহরি সরকার যে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—'মধুর-বৃন্দা-বিপিন-মাধুরী-প্রবেশ-চাতুরী-সার' —চৈতন্য-জীবনের ইহা অপেক্ষা সুষ্ঠুতম বর্ণনা আর হয় না।

দ্বাদশ অধ্যায়

বৈষ্ণব সহজিয়া মতে রাধাতত্ত্ব

আমরা এতক্ষণ যে রাধা-তত্ত্বের আলোচনা করিলাম ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তসম্মত রাধাতত্ত্ব। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বলিতে আমরা চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের কথাই বুঝি। চৈতন্য-প্রবর্তিত এই বৈষ্ণব ধর্ম পরবর্তী কালে শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব গোস্বামিগণ কর্তৃক নানাভাবে বিধিবদ্ধ হইয়া দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও ধর্মাচরণ উভয় ক্ষেত্রেই একটা বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম ব্যতীত বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের আরও অনেকগুলি ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার ভিতরে বৈষ্ণব সহজিয়া ধারাটি প্রধান। এই সহজিয়া-গণের নিজস্ব কতগুলি দার্শনিক সিদ্ধান্ত ছিল ; সেই মূল সিদ্ধান্তের অনুরূপে তাঁহাদের রাধাতত্ত্বও একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল।

এই বৈষ্ণব-সহজিয়া মতের মূল আলোচনা করিতে গিযা দেখি, এই সহজিয়া মতের মূল. বিশেষ কোনও বৈষ্ণব দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, এ-ধর্মের প্রতিষ্ঠা আসলে কতগুলি গুহ্য সাধনের উপরে। সহজিয়াগণের এই গুহ্য সাধনার ধারাটি ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে একটি অতি প্রাচীন ধারা। এই সাধনাগুলি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মমতের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে ; কোথাও ইহা তান্ত্রিক সাধনা রূপে প্রচলিত, কোথাও ইহা আসিয়া গ্রহণ করিয়াছে বৌদ্ধ-সহজিয়ার ভিতরে রূপান্তর ; সেই সকল সাধন-প্রণালী বৈষ্ণব ধর্মের সহিত যুক্ত হইয়া আবার বৈষ্ণব-সহজিয়া সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছে। নর-নারীর পরস্পর মিলিতভাবে একটি ধর্ম-সাধনার ধারা ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে বহুদিন পূর্ব হইতে প্রচলিত আছে ; এই সাধনার বিভিন্ন পরিণতিতেই বামাচারী তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা প্রভৃতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই সকল ধর্ম-সম্প্রদায় বাহির হইতে যতই পরস্পর পৃথক্ বলিয়া মনে হোক, আসল সাধনা বিচার করিলে সকলের ভিতরেই একটা গভীর ঐক্য অনুভূত হইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে এই সাধনার প্রচলনের সঙ্গে কতগুলি দার্শনিক সিদ্ধান্ত জড়িত

আছে। সব সিদ্ধান্তের মূলেই দেখিতে পাই, চরম সত্য হইল এক অদ্বয় পরমানন্দ স্বরূপ ; এই অদ্বয় আনন্দ-তত্ত্বই হইল পরম সামরস্য। এই অদ্বয় আনন্দ-তত্ত্বের মধ্যে দুইটি ধারা রহিয়াছে ; অদ্বয় তত্ত্ব কিন্তু এই দুইটি ধারার অস্বীকৃতি নয়, অদ্বয় তত্ত্ব হইল সেই চরম তত্ত্ব যেখানে এই দুইটি ধারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আবার এক অখণ্ড তত্ত্বের ভিতরে গভীরভাবে মিলিত হইয়া আছে। ইহাই মিথুনতত্ত্ব, বা যামলতত্ত্ব বা যুগলতত্ত্ব ; ইহাই বৌদ্ধগণের যুগনদ্ধতত্ত্ব। তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে এই অখণ্ড যুগলতত্ত্বই হইল কেবলানন্দতত্ত্ব, আর এই অদ্বয়তত্ত্বের হইল দুইটি ধারা—একটি শিব, অপরটি শক্তি। তান্ত্রিক মতে এই শিব-শক্তির মিলন-জনিত কেবলানন্দই হইল পরম সাধ্য। এই সাধ্য লাভ করিবার সাধন-পদ্ধতি বহু প্রকারের ; সাধক নিজের দেহের ভিতরেই এই শিব-শক্তি তত্ত্বকে পূর্ণ-জাগ্রত ও পূর্ণ-পরিণত করিয়া নিজের দেহের ভিতরেই এই উভয়তত্ত্বের মিলনজনিত অপূর্ব সামরস্য-সুখ বা কেবলানন্দ অনুভব করিতে পারেন। এই শিব-শক্তি তত্ত্ব লইয়া বহু প্রকারের সাধনার ভিতরে একটি বিশেষ প্রকারের সাধনা হইল নর-নারীর মিলিত সাধনা। এই সাধনার সাধকগণের বিশ্বাস, শিব-শক্তির নিত্যতত্ত্বটি স্থূলে পৃথিবীর নর-নারীর ভিতর দিয়া রূপ লাভ করিয়াছে। নর-নারী উভয়েই তাহার স্বরূপে শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব এই উভয় তত্ত্বেরই অধিকারী হইলেও ইহার ভিতরে আবার বিশেষ করিয়া পুরুষ শিবতত্ত্বের এবং নারী শক্তিতত্ত্বের প্রতীক। শুধু সূক্ষ্মভাবেই নহে, স্থূলভাবেও পুরুষের প্রতিতত্ত্বে শিবের এবং নারীর প্রতিতত্ত্বে শক্তির সমধিক বিকাশ। সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম সাধনা হইল এই পুরুষ ও নারী উভয়ের ভিতরে সুপ্ত শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্বের পূর্ণ জাগরণ ; পুরুষের ভিতর দিয়া শিবতত্ত্ব এবং নারীর ভিতর দিয়া শক্তিতত্ত্ব এইভাবে যখন পূর্ণ পরিণত এবং পূর্ণ জাগ্রত হইল তখন পরস্পরের ভিতর দিয়া হইবে পরস্পরের শিব-শক্তি-তত্ত্বের আস্বাদন ; অর্থাৎ পুরুষ নিজের ভিতর দিয়া শিবতত্ত্বকে পূর্ণ পরিণত এবং পূর্ণ জাগ্রত করিয়া—নিজেকে সর্বভাবে শিব রূপে উপলব্ধি করিয়া নারীকে পূর্ণ শক্তিতত্ত্ব রূপে অনুভব করিবে ; আবার নারী নিজের ভিতরে শক্তিতত্ত্বকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া নিজেকে সাক্ষাৎ শক্তি রূপে এবং পুরুষকে সাক্ষাৎ শিব রূপে অনুভব করিবে। সাধনার এই অবস্থায় পুরুষ-নারী উভয়ের স্থূল দেহের প্রতিতত্ত্বেও শিব-শক্তির জাগরণ ঘটে ; তখন উভয়ের যে মিলন তাহা সাধক-সাধিকাকে পূর্ণ সামরস্যে পৌছাইয়া দেয়—এই পূর্ণ সামরস্যজনিত যে অসীম অনন্ত আনন্দানুভূতি—ইহাই তন্ত্রের ভাষায়

সামরস্য-সুখ, বৌদ্ধদের ভাষায় মহাসুখ এবং বৈষ্ণবগণের ভাষায় মহাভাব-স্বরূপ। সংক্ষেপে ইহাই হইল তন্ত্রের নারী-পুরুষের মিলিত সাধনার রহস্য। বৌদ্ধ তান্ত্রিক এবং বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনারও ইহাই মূল কথা। সেখানে শিব-শক্তির স্থানে দেখিতে পাইতেছি শূন্যতা-করুণা-তত্ত্বের বিগ্রহ ভগবতী-ভগবান্‌কে, বা বজ্রেশ্বরী (বা বজ্রধাত্বে[শ্বী ?]শ্বরী) বজ্রেশ্বরকে, বা প্রজ্ঞা এবং উপায়কে; ইহাদের চরম লক্ষ্য হইল মহাসুখ-রূপ প্রজ্ঞা বা সহজানন্দ লাভ। এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থান্তরে করিয়াছি বলিয়া এখানে আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।[১] পাল রাজগণের সময়ে বাঙলা দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম এবং সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রসার ছিল। বৌদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে গুহ্য সাধনপদ্ধতি বাঙলা দেশে চলিত ছিল সেই সাধনা এবং হিন্দুতন্ত্রোক্ত সাধনপদ্ধতি মূলতঃ একই ছিল। সেন রাজাদের আমল হইতে বাঙলাদেশে রাধাকৃষ্ণ-সম্বলিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার হইতে থাকে বলিযা মনে হয়। এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের পরে পূর্বোক্ত গুহ্য-সাধনা বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গেও জড়িত হইয়া পড়ে এবং এই করিয়াই বৈষ্ণব-সহজিয়া মত গড়িয়া ওঠে।

নারী-পুরুষের মিলিত এই গুহ্য সাধন-প্রণালী বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ লাভ করিয়া একটি রূপান্তর লাভ করিল; হিন্দু এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে—এমন কি বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভিতরেও-যাহা ছিল মূলতঃ একটি যোগ-সাধনা, বৈষ্ণব সহজিয়ার ভিতবে তাহা যোগ-সাধনাকে অবলম্বন করিয়াই একটি প্রেম-সাধনায় রূপান্তরিত হইল। আমবা পূর্বাপর দেখিয়া আসিয়াছি, বৈষ্ণব ধর্ম—বিশেষ করিয়া রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া যে বৈষ্ণব ধর্ম—তাহা হইল প্রেমধর্ম। বৈষ্ণব সহজিয়াতে আমবা পূর্ববর্তী শক্তি-শিব বা প্রজ্ঞা-উপায়ের স্থানে পাইলাম রাধাকৃষ্ণকে; শিব-শক্তির মিলনজনিত সামরস্য ছিল শুধু আনন্দস্বরূপ, বৌদ্ধেরা ইহাকে বলিয়াছেন মহাসুখ-স্বরূপ; বৈষ্ণব-সহজিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলনজনিত আনন্দকে প্রেম ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারেন না; যদিও এখানেও চরমাবস্থায় প্রেমই হইল আনন্দ, আর আনন্দই হইল প্রেম। যে পথে এই চরমাবস্থা লাভ হয় তাহাকেও বৈষ্ণব-সহজিয়াগণ যোগের পথ বলিবেন না, ইহাকে তাঁহারা বলিবেন প্রেমের পথ।

১ এই বিষয়ে লেখকের Obscure Religious Cults এবং An Introduction to Tantric Buddhism গ্রন্থ দুইখানি দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব-সহজিয়া মত সম্বন্ধে আমি স্থানান্তরে আলোচনা করিয়াছি;[১] বর্তমান প্রসঙ্গে এই সহজিয়া মতের ভিতর দিয়া রাধাতত্ত্বটি কি রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে তাহাই শুধু লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণব-সহজিয়া মতে যুগল-তত্ত্বই হইল পরমতত্ত্ব। এই যুগলেই হইল মহাভাব রূপ 'সহজে'র স্থিতি। এই সহজ হইল সমরসে স্থিত প্রেমের পরাকাষ্ঠা অবস্থা। এই 'সহজ'ই হইল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত চরম সত্য; ইহা হইতেই জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি, ইহাতেই সকল কিছুর স্থিতি, ইহাতেই আবার লয়। এই সহজ হইল 'নিত্যের দেশে'র বস্তু; চণ্ডীদাস 'নিত্যে'র নিকট হইতেই সকল সহজতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, 'নিত্যে'র উপদেশেই সকল সহজ সাধনায় রত হইয়াছিলেন, 'নিত্যের আদেশে'ই তিনি জগতে 'সহজ জানাবার তরে' গান রচনা করিয়াছিলেন। ইহা 'বনবৃন্দাবন' ও 'মনোবৃন্দাবন' অতিক্রম করিয়া 'নিত্যবৃন্দাবনে'র বস্তু; এই নিত্যবৃন্দাবনই হইল সহজিয়াগণের 'গুপ্তচন্দ্রপুর'। এই গুপ্তচন্দ্রপুরে চলিয়াছে রাধাকৃষ্ণের নিত্যবিহার—এই নিত্যবিহারের ভিতর দিয়া নিত্যপ্রবাহিত সহজ-রসের ধারা, আর এই 'রস বই বস্তু নাই এ তিন ভুবনে'।[২] সহজিয়াগণের বিশ্বাস, এই যে নিত্যবৃন্দাবনের 'গুপ্তচন্দ্রপুরে' রাধা-কৃষ্ণের ভিতর দিয়া সহজ-রসের অবিরাম প্রবাহ, তাহারই প্রকাশ পৃথিবীর সকল নরনারীর ভিতরে প্রবাহিত প্রেমরস-ধারার ভিতরেও। উপনিষদে বলা হইয়াছে, সকল জাগতিক স্থূল আনন্দের ভিতর দিয়া প্রাণিগণ সেই এক ব্রহ্মা-নন্দেরই 'মাত্রামুপজীবন্তি'। উপনিষদের এই সুরে সুর মিলাইয়া সহজিয়াগণের সঙ্গে বলা যাইতে পারে, নর-নারীর জাগতিক প্রেম—এমন কি স্থূল দৈহিক সম্ভোগের ভিতর দিয়া জীবগণ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সেই এক সহজ-রসের ধারারই মাত্রা উপভোগ করে। এই বৃন্দাবনের গুপ্তচন্দ্রপুরে যে রাধাকৃষ্ণের নিত্য-সহজলীলা ইহা হইল তাঁহাদের 'স্বরূপলীলা', আর জীবের ভিতর দিয়া স্ত্রী-পুরুষ রূপে যে লীলা ইহাই হইল 'শ্রীরূপলীলা'। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের স্বরূপ-লীলারই প্রাকৃত জগতে আসিয়া শ্রীরূপ-লীলায় পর্যবসান।

জীবের দৃষ্টান্তে কি করিয়া একটি আদিম যুগলে বিশ্বাস আসে এ-কথাটি ভক্তপ্রবর শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার 'শ্রীকালাচাঁদ গীতা' গ্রন্থখানির ভিতর

১ Obscure Religious Cults দ্রষ্টব্য।

২ সহজিয়া-সাহিত্য, মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, গান সং ৫৯।

অতি সহজভাবে এবং সহজ ভাষায় বড় চমৎকার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেখানে বলা হইয়াছে,—

আবার দেখেছি এই জগ মাঝে।
যুগ্মরূপে জীব মাত্রেতে বিরাজে॥
পুরুষ প্রকৃতি দেখি সব জীবে।
এই দুই ভাব ভগবানে হবে॥
ভজনীয় যদি থাকে কোন জন।
অবশ্য হইবে মনুষ্য মতন॥
তাঁর ছায়া মোরা যুগল সকল।
যাঁর ছায়া সেও হইবে যুগল॥

বৃন্দাবনে একে দুই, আবার দুইয়ে এক হইয়া নিত্যবিরাজিত স্বরূপলীলা;[১] ইহার কোন পারাপার নাই, গঙ্গাধারার ন্যায় ইহা অবিশ্রাম প্রবাহিত।[২] পৃথিবীর 'বনবৃন্দাবনে' যে গোপ-গোপী রূপে রাধাকৃষ্ণের অবতার ও নর-নারীরূপে লীলা তাহা শুধু সেই অপ্রাকৃত-প্রেম রূপ সহজ বস্তুকে মানুষীরূপে মানুষের নিকটে প্রকট করিবার নিমিত্ত।[৩] মর্ত্যের বৃন্দাবনে যে ঐতিহাসিক লীলা তাহা নিত্য-লীলাতত্ত্বের একটা আভাস দিবার জন্যই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। 'দীপকোজ্জ্বল' গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে রাধাকৃষ্ণের প্রকট বৃন্দাবন-লীলা হইল 'রূপাবেশ' হইয়া—অর্থাৎ দেহধারী হইয়া—সেই লীলা আস্বাদনের জন্য, তাঁহারা নর-নারীর 'রসময়

১ রাধা-কৃষ্ণ রস-প্রেম একুই যে হয়।
নিত্য নিত্য ধ্বংস নাই নিত্য বিরাজয়॥
সহজ-উপাসনা-তত্ত্ব, তরুণীরমণ-কৃত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪ খণ্ড, ১ সং

২ নিত্যলীলা কৃষ্ণের নাহিক পারাপার।
অবিশ্রাম বহে লীলা যেন গঙ্গাধার॥
সহজ-উপাসনা-তত্ত্ব, মুকুন্দ দাস প্রণীত, (মণীন্দ্রকুমার নন্দী প্রকাশিত), পৃঃ ৫৮; পৃঃ ৫৮-৬৪ দ্রষ্টব্য।

আরও— নিজ-শক্তি শ্রীরাধিকা পাঞা নন্দ-সুত।
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা করয়ে অদ্ভুত॥—ঐ, ৯১ পৃঃ।
সে কৃষ্ণ রাধিকার হয়েন প্রাণ-পতি।
রাধাসহ নিত্যলীলা করে দিবারাতি॥—ঐ

৩ রতি-বিলাস-পদ্ধতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথি, ৫৭২ নং।

দেহ' আশ্রয় করিয়া মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া রস আস্বাদন করিয়াছেন।[১] সহজিয়াগণের মতে রাধাকৃষ্ণ যে শুধু বৃন্দাবনের গোপ-গোপীরূপেই পরম রস-তত্ত্ব আস্বাদন করিয়াছেন তাহা নহে, মানুষের ভিতর দিয়া নর-নারী রূপেই তাঁহারা কৌতুকে বিহার করেন।[২] তন্ত্র-মতে (হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়ই) যেমন দেখিতে পাই, প্রত্যেক পুরুষ স্বরূপে শিব-বিগ্রহ এবং নারী শক্তি-বিগ্রহ, তেমনই সহজিয়া-মতে প্রত্যেক পুরুষ হইল স্বরূপে কৃষ্ণ-বিগ্রহ, প্রত্যেক নারী হইল রাধা-বিগ্রহ। আবার তন্ত্রাদিতে আমরা অর্ধনারীশ্বরের পরিকল্পনা দেখিতে পাই; প্রত্যেক জীবের ভিতরেই এই অর্ধনারীশ্বরতত্ত্ব বিরাজিত রহিয়াছে; দেহের দক্ষিণ অঙ্গই শিব বা ঈশ্বর এবং বাম অঙ্গই নারী বা শক্তি। বৈষ্ণব-সহজিয়াগণেরও অনুরূপ বিশ্বাস দেখিতে পাই। কোথাও দেখিতে পাই, দক্ষিণ নেত্রে কৃষ্ণ এবং বাম নেত্রে রাধিকার অবস্থান; এই দক্ষিণ নেত্রই হইল সাধকের শ্যামকুণ্ড এবং বাম নেত্র রাধাকুণ্ড।[৩]

নর-নারীর ভিতর দিয়াও যে রাধাকৃষ্ণের সহজ-রসের লীলা এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে বৈষ্ণব-সহজিয়াগণের স্বরূপ-লীলা ও শ্রীরূপ-লীলা এই দুইটি লীলাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রাকৃত জগতের একজন পুরুষের যে পুরুষ রূপ তাহা হইল তাহার বাহিরের 'রূপ' মাত্র; এই বাহিরের 'রূপে'র ভিতরে এই রূপকে আশ্রয় করিয়াই একটি 'স্বরূপ' অবস্থান করে। মানুষের ভিতরে প্রত্যেকটি পুরুষের বাহিরের রূপের ভিতরে অবস্থান করিতেছে কৃষ্ণ-

---

১ প্রকট হইতে যদি কভু মনে হয়।
রূপাবেশ হইয়া তবে লীলা আস্বাদয়॥
সর্ব্ব পররস-তত্ব করিয়া আশ্রয়।
রসময় দেহ ধরি রস আস্বাদয়॥
দী(বী ?)পকোজ্জ্বল, পুঁথি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৬৪নং)

২ মনুষ্য স্বরূপে করে কৌতুক বিহার॥
চম্পক-কলিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৭ সন, ১ম সংখ্যা।

৩ বামে রাধা ডাহিনে কৃষ্ণ দেখে রসিক জন।
... ... দুই নেত্রে বিরাজমান॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দুই নেত্রে হয়।
সজল নয়ন যারে ভাবে প্রেম আস্বাদয়॥
রাধা-বল্লভদাসের 'সহজ-তত্ব'; বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ২য় খণ্ড।

'স্বরূপ', আবার প্রত্যেক নারীর বাহিরের রূপের ভিতরে অবস্থান করিতেছে তাহার রাধা-'স্বরূপ'। সাধনার প্রথম কথা এবং প্রধান কথা হইল উজান বাহিয়া এই রূপ হইতে স্বরূপে প্রত্যাবর্তন। স্বরূপে স্থিতি লাভ করিবার জন্ম নর-নারীর যে মিলন তাহাই হইল প্রেমলীলা—তাহার ভিতর দিয়াই ঘটে বিশুদ্ধ সহজ-রসের আস্বাদন। 'শ্রীরূপ' তাই সাধকের সাধনপথে অবলম্বন মাত্র, এই শ্রীরূপ অবলম্বনে স্বরূপেই তাঁহার আসল স্থিতি।

সহজিয়াদের প্রথম সাধনা তাই হইল শুধু বিশুদ্ধির সাধনা। সোনাকে যেমন পোড়াইয়া পোড়াইয়া নিখাদ করিয়া তুলিতে হয়, তেমনই মর্ত্যের প্রাকৃত দেহ-মনকেও পোড়াইয়া পোড়াইয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়; বিশুদ্ধতম দেহ-মনকে অবলম্বন করিয়া যে প্রেম তাহা তখন হইয়া ওঠে 'নিকষিত হেম', তাহাই পূর্ণ সমরস, তাহাই ব্রজের মহাভাব-স্বরূপ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সহজিয়াগণের মতে মর্ত্য এবং বৃন্দাবন, প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের ভিতরে যে ভেদ তাহাও সাধনা দ্বারা মুছিয়া ফেলা সম্ভব ; অর্থাৎ প্রাকৃতকেই সাধনা দ্বারা অপ্রাকৃতে রূপান্তরিত এবং ধর্মান্তরিত করা যাইতে পারে। তখন—'শ্রীরূপ স্বরূপ হয় স্বরূপ শ্রীরূপ' ;[১] অর্থাৎ রূপের ভিতরেই স্বরূপের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় রূপ ও স্বরূপের ভেদ ঘুচিয়া যায় ; 'এ দেশ' এবং 'সে দেশে'ও একটা সহজ মিলন ঘটিয়া যায়। এই কথাটিই চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত একটি পদে অতি চমৎকার করিয়া বলা হইয়াছে ;—

> সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর
> জানয়ে সকল লোকে।
> সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে
> এ কথা কয়ো না কাকে ॥[২]

আমরা দেখিতে পাইতেছি, মহাভাব-স্বরূপ 'সহজে'র দুইটি ধারা, একটি ধারায় রহিয়াছে আস্বাদ্য-তত্ত্ব, অপর ধারায় রহিয়াছে আস্বাদক-তত্ত্ব ; নিত্য-বৃন্দাবনে রাধা এবং কৃষ্ণই হইল এই দুই তত্ত্বের মূর্তি। সহজিয়াগণ এই দুই তত্ত্বকে পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব বলেন। সহজিয়াগণ

১ রত্নসার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি (১১১১ নং)।
২ সহজিয়া-সাহিত্য, মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, ৮৪ সংখ্যা।

নানাভাবে এই তত্ত্বের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'রত্নসারে'[১] বলা হইয়াছে,—

পরমাত্মার দুই নাম ধরে দুই রূপ।
এই মতে এক হয়্যা ধরয়ে স্বরূপ॥
তাহে দুই ভেদ হয় পুরুষ-প্রকৃতি।
সকলের মূল হয় সেই রস-মূরতি॥

* * *

পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতি দুই রূপ।
সহস্রার-দলে করে রসের স্বরূপ॥[২]

এই প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, তন্ত্র-পুরাণাদিতে আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই যে, এক দেবতা নিজের রমণেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য দুই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন; এই বিশ্বাসটি ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল এবং এইজন্যই পরবর্তী কালের ছোট বড় সকল ধর্মমতের ভিতরেই ইহার স্পষ্ট-অস্পষ্ট রেশ দেখিতে পাওয়া যায়। 'দীপকোজ্জ্বল-গ্রন্থে' বলা হইয়াছে,—

এক ব্রহ্ম যখন দ্বিতীয় নাহি আর।
সেই কালে শুনি ঈশ্বর করেন বিচার॥
অপূর্ব্ব রসের চেষ্টা অপূর্ব্ব কারণ।
কেমনে হইব ইহা করেন ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে এক উদয় হইল।
মনেতে আনন্দ হৈয়া বিভোল হইল॥
অর্দ্ধ অঙ্গ হৈতে আমি প্রকৃতি হইব।
অংশিনী রাধিকা নাম তাহার হইব॥

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি।

২ তুলনীয়— রস আস্বাদন লাগি হইলা দুই মূর্ত্তি।
এই হেতু কৃষ্ণ হয় পুরুষ প্রকৃতি॥
প্রকৃতি না হইলে কৃষ্ণ সেবা জন্ম নয়।
এই হেতু প্রকৃতি ভাব করয়ে আশ্রয়॥

দীপকোজ্জ্বল-গ্রন্থ, পুঁথি।

আপনি রসের মূর্ত্তি করিব ধারণ।
রস আস্বাদিব আমি করিয়া যতন ॥[১]

বৈষ্ণব-সহজিয়াগণের মতে পরম 'একে'র এই যে দুইটি ধারা রাধাকৃষ্ণের ভিতর দিয়া প্রবহিত হইল, মর্ত্ত্যের নর-নারীর ভিতর দিয়াও চলিয়াছে সেই একই ধারার দুই প্রবাহ; প্রাকৃতগুণ-সংস্পর্শে সে ক্লিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; সাধনা দ্বারা এই প্রাকৃতগুণ-সংস্পর্শ দূর করিয়া দিতে পারিলেই এই নর-নারীর প্রেম আবার অপ্রাকৃত ব্রজের বস্তু হইয়া ওঠে। নর-নারীর ভিতরে সহজ প্রেমের যে দুইটি ধারা বহিয়া যাইতেছে তাহাকে নির্মলতম করিয়া আবার এক করিয়া দিতে পারিলেই ব্রজের যুগল-প্রেমের আস্বাদন লাভ হয়। চণ্ডীদাসের একটি গানে দেখিতে পাই,—

প্রেম সরোবরে দুইটি ধারা।
আস্বাদন করে রসিক যারা ॥
দুই ধারা যখন একত্রে থাকে।
তখন রসিক যুগল দেখে ॥

এই দুইটি ধারার প্রতীক পুরুষ-প্রকৃতি বা কৃষ্ণ-রাধাকে সহজিয়ারা বলিয়াছেন 'রস' ও 'রতি'। 'রস' শব্দের তাৎপর্য হইল আস্বাদক-রূপ রস-স্বরূপ, আর রতি হইল রসের বিষয়। পারিভাষিকভাবে কৃষ্ণ-রাধাকে 'কাম' ও 'মদন'ও বলা হইয়াছে। 'কাম' শব্দের অর্থ হইল প্রেম-স্বরূপ—যিনি প্রেমের আস্পদকে তাঁহার দিকে আকর্ষিত করেন; আর 'মদন' হইল প্রেমোদ্রেকের কারণ-স্বরূপ। সাধনার ক্ষেত্রে নায়কই হইল 'রস' বা 'কাম', নায়িকা হইল 'রতি'।[২] এই এক—

১। তুলনীয়— সেই রূপেতে করে কুঞ্জেতে বিহার।
সেই কৃষ্ণ এই রাধা একুই আকার ॥
রাধা হইতে নিরাকার রসের স্বরূপ।
অতএব দুই রূপ হয় এক রূপ ॥
রাধিকা-রস-কারিকা, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ৩য় খণ্ড

২ পরস্পরে নায়ক নায়িকা অনঙ্গ রতি।
স্বতঃসিদ্ধভাবে হয় ব্রজেতে বসতি ॥
রতি-বিলাস-পদ্ধতি, পুঁথি (কঃ বিঃ)

আরও— রতির স্বরূপ শ্রীরাধিকা সুন্দরী।
কামের চিত্ত আকর্ষয় রূপের লহরী ॥
রাগময়ী কণা, পুঁথি (কঃ বিঃ)

'রস-রতি' বা 'কাম-মদন'ই নিখিল নায়ক-নায়িকার রূপ ধরিয়া নিত্যকাল বিলাস করিতেছে।[১]

সহজিয়াগণ 'নায়িকা-ভজনে'র কথা বলিয়া গিয়াছেন; এই নায়িকা-ভজনের তাৎপর্য হইল রাধা-ভজন। সাধক হইতে হইলে প্রত্যেক নায়ক-নায়িকাকে তাহাদের প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা রূপের ভিতরে কৃষ্ণ-রাধার স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই উপলব্ধি প্রথমেই সম্ভব নহে, তাই প্রথমে করিতে হয় 'আরোপ'-সাধন। আরোপ-সাধনের অর্থ হইল, যে পর্যন্ত রূপের ভিতরে স্বরূপের পরিপূর্ণ উপলব্ধি না হইল সে পর্যন্ত স্বরূপকে রূপের ভিতরে 'আরোপ' করা; অর্থাৎ যে পর্যন্ত নায়ক-নায়িকা তাহাদের নিজেদের সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ-রাধা বলিয়া উপলব্ধি করিতে না পারে, সে পর্যন্ত নায়ক-নায়িকা পরস্পর পরস্পরের ভিতরে কৃষ্ণ-রাধাকে আরোপ করিয়া সাধনা করিতে থাকিবে। চণ্ডীদাস তাঁহার রাগাত্মিক গানে এই আরোপকেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।—

ছাড়ি জপ তপ সাধহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।

রজকিনী রামীর ভিতরে তিনি প্রথমে রাধিকার আরোপ করিয়া সাধনা করিয়াছেন; এই আরোপ-সাধনে সিদ্ধিলাভ ঘটিলে রজকিনী রামী আর রজকিনী রামী থাকে না, সে সর্বভাবে পরিপূর্ণ রাধিকা বিগ্রহই হইয়া যায়। তাই চণ্ডীদাসের গানে দেখি—

স্বরূপে আরোপ যার রসিক নাগর তার
প্রাপ্তি হবে মদনমোহন।

১ জয় জয় সর্ব্বাদি বস্তু রসরাজ কাম।
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস নিত্য ধাম॥
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আর মহা অপ্রাকৃতে।
বিহার করিছ তুমি নিজ স্বেচ্ছামতে॥
স্বয়ং কাম নিত্যবস্তু রস-রতিময়।
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আদি তুমি মহাশ্রয়॥
এক বস্তু পুরুষ প্রকৃতি রূপ হইয়া।
বিলাসহ বহুরূপ ধরি দুই কায়া॥

সহজ-উপাসনা-তত্ত্ব, তরণীরমণ-কৃত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৫, ৪র্থ সংখ্যা।

সে দেশের রজকিনী হয় রসের অধিকারী
রাধিকা-স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমি ত রমণের গুরু সেহ রসের কল্পতরু
তার সনে দাস অভিমান ॥

আরোপ সাধনার তাই উদ্দেশ্যই হইল—

রূপেতে স্বরূপে দুই একু করি
মিশাল করিয়া থুবে ॥
আবার— স্বরূপ রূপেতে একত্র করিয়া
মিশাল কবিয়া থুবে।
সেই সে রতিতে একান্ত করিলে
তবে সে শ্রীমতী পাবে ॥[১]

রূপে একবার স্বরূপের আরোপ করিয়া রূপে-স্বরূপে কখনও ভিন্ন বাসিতে হয় না।—

আরোপিয়া রূপ হইযা স্বরূপ
কভু না বাসিও ভিন্ন ॥

এই ভিন্নবোধ দুব হইলে—আবোপের ভিতর দিয়া স্বরূপ ভজনা করিতে পারিলেই সত্যকার রাধা-প্রাপ্তি সম্ভব হয়।—

আরোপে স্বরূপে ভজিতে পাবিলে
পাইবে শ্রীমতী রাধা ॥

এই নায়িকার ভিতর দিয়া রাধার উপলব্ধি—রূপের ভিতর দিয়া স্বরূপের উপলব্ধি—সহজ নয়। পদ্মেব প্রতিটি অণুপরমাণুব সহিত যেমন করিয়া পদ্মগন্ধ

১ তুলনীয়—

এ রতি এ রতি একত্র করিয়া
সেখানে সে রতি থুবে।
রতি রতি দুহে একত্র করিলে
সেখানে দেখিতে পাবে ॥
স্বরূপে আরোপ এই রস-কূপ
সকল সাধন পায়।
স্বরূপ বুঝিয়া সাধনা করিলে
সাধক হইতে পায় ॥

অপৃথগ্‌ভাবে মিশিয়া থাকে একটি নায়িকার প্রতি অণুপরমাণুর ভিতরেও তেমনই তাহার স্বরূপ মিশিয়া থাকে। স্বরূপ ছাড়িয়া শুধুমাত্র রূপাশ্রয়ই হইল বন্ধন, রূপের ভিতরে স্বরূপের উপলব্ধিই হইল মুক্তি।

স্বরূপ স্বরূপ অনেকে কয়।
জীবলোক কভু স্বরূপ নয়॥

* * *

পদ্মগন্ধ হয় তাহার গতি।
তাহারে চিনিতে কার শকতি॥

* * *

স্বরূপ বুঝিলে মানুষ পাবে।
আরোপ ছাড়িলে নরকে যাবে॥

এই সহজ সাধনায় তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মানুষকে সহজিয়াগণ সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন; 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—চণ্ডীদাসের এই একটি উক্তির ভিতর দিয়া সহজিয়াগণের মূল ধারণাটি প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষকে বাদ দিয়া কোনও ব্রজতত্ত্ব নাই,—সৌন্দর্য-মাধুর্যের প্রতিমা—মূর্তিমতী প্রেমরূপিণী নারীর ভিতর দিয়া ব্যতীত রাধাতত্ত্বের আস্বাদনের আর কোনও পথ নাই। এই রাধাতত্ত্বের আবিষ্কার এবং উপলব্ধি সম্ভব হইয়াছিল সেই চণ্ডীদাসের পক্ষে, যে চণ্ডীদাস (তাহার ঐতিহাসিক সত্য যাহাই হোক) রূপে রসে পরিপূর্ণ প্রেমের জীবন্ত মূর্তি রজকিনী রামীকে বলিতে পারিয়াছিলেন—

শুন রজকিনী রামী।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥
তুমি বেদ-বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥

অথবা— এক নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ
শুন রজকিনী রামী।
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি॥
রজকিনী-রূপ কিশোরী-স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥
তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃপিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্ব্বত
তুমি সে নয়ানের তারা॥

এই রজকিনী রামীই হইল রাধাতত্ত্বের মূর্ত প্রতীক; ইহার ভিতর দিয়া ব্যতীত রাধাতত্ত্ব কখনও আস্বাদ্য হয় না। এই রাধাতত্ত্বই রহিয়াছে বাঙলা দেশের নায়িকা-ভজন বা কিশোরী-ভজনের পশ্চাতে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, পুরাণাদির যুগে যেমন শিব-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি, বিষ্ণু-লক্ষ্মী মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, সহজিয়া মতের ভিতরে আবার রাধা-কৃষ্ণ, শক্তি-শিব, প্রকৃতি-পুরুষ জনবিশ্বাসের ভিতরে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

আরও একটি জিনিস এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারি। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রথম দিকে পরকীয়াবাদকে গ্রহণ করিতে চান নাই; রূপগোস্বামীর মত লইয়া বিতর্ক থাকিলেও জীবগোস্বামী অতি স্পষ্টভাবেই রাধাতত্ত্বের ক্ষেত্রে পরকীয়াবাদকে অস্বীকার করিয়া পরম-স্বকীয়াবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যতই দিন গিয়াছে ততই বৈষ্ণবগণের ভিতরে পরকীয়াবাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করিতে পারি। বিধিবদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতের ভিতরে এই পরকীয়াবাদের প্রাধান্যের একটা

বড় কারণ মনে হয় এই সহজিয়া মতের পরোক্ষ প্রভাব। এই সহজিয়া-সাধনায় প্রেম-সাধনার পক্ষে উপযুক্ততম নায়িকা হইল পরকীয়া নায়িকা। এইজন্ত সহজিয়াগণ মনে করিতেন, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ—সকলেই বিশেষ কোনও পরকীয়া নায়িকার সহিত সহজ-সাধনা করিয়াছেন। সহজ-সাধনায় গৃহীত নায়িকা রাধিকা-স্বরূপা, এবং সে স্বভাবতঃই পরকীয়া, এই মতবাদই পরবর্তী কালের রাধিকাকে পরকীয়া রূপেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে মনে হয়। অবশ্য পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সাহিত্যে রাধিকা সর্বদাই পরকীয়া নায়িকা-রূপে বর্ণিতা, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। এই সাহিত্যের ধারা এবং সহজিয়া-সাধনার প্রভাব—উভয় মিলিয়া পরকীয়াবাদকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

‘রাধা-বল্লভী’ সম্প্রদায়ের রাধা ও বাঙালী বৈষ্ণব কবিগণের ‘কিশোরী’-তত্ত্ব

হিন্দী বৈষ্ণব কবিতা ও বাঙলা বৈষ্ণব কবিতার তুলনামূলক আলোচনায় একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি। হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণের ভিতরে ‘রাধা-বল্লভী’ সম্প্রদায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সম্প্রদায়ের ভিতরে রাধাকৃষ্ণ এই উভয় তত্ত্বের মধ্যে রাধাতত্ত্বকে যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে তাহা রাধাবাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রাধাতত্ত্বের আলোচনায় দেখিয়াছি, ‘ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ’। রাধাই হইলেন প্রেমপ্রদায়িনী, এই কারণে সাধনরাজ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রাধাকেই অনেক সময় প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধানাথ, রাধাবল্লভ, রাধারমণ প্রভৃতিই অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়। আমরা প্রসঙ্গক্রমে এ-কথারও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ‘জয় রাধে’ই বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের ধ্বনি। এখন পর্যন্তও বাঙলা দেশের যত বৈষ্ণব ভিখারী দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষার জন্য বাহির হয় তাহারাও ‘জয় রাধে’ বলিয়াই গৃহস্থের নিকটে নিজেদের আবেদন জানায়।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ‘শ্রীরাধাসুধানিধি’[১] গ্রন্থে এই রাধিকার প্রেম ও মহিমা চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে রাধিকার বর্ণনায় দেখিতে পাই—

> প্রেমোল্লাসৈকসীমা পরমরসচমৎকারৈকসীমা
> সৌন্দর্যৈকসীমা কিমপি নববয়োরূপলাবণ্যসীমা।
> লীলামাধুর্যসীমা নিজজনপরমৌদার্যবাৎসল্যসীমা
> সা রাধা সৌখ্যসীমা জয়তি রতিকলাকেলিমাধুর্যসীমা॥
> শুদ্ধপ্রেমবিলাসবৈভবনিধিঃ কৈশোরশোভানিধিঃ
> বৈদগ্ধীমধুরাঙ্গভঙ্গিমনিধিঃ লাবণ্যসম্পন্নিধিঃ।
> শ্রীরাধা জয়তান্মহারসনিধিঃ কন্দর্পলীলানিধিঃ
> সৌন্দর্যৈকসুধানিধি মধুপতেঃ সর্বস্বভূতো নিধিঃ॥[২]

১ মতান্তরে হিতহরিবংশ রচিত।

২ শ্রীহরিদাস দাসের শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য গ্রন্থে উদ্ধৃত।

রাধা সম্বন্ধে এইজাতীয় বর্ণনা আরও অনেক পাওয়া যায়। নীলরতন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আমরা শ্রীকৃষ্ণের মুখে শ্রীরাধার অপূর্ব মহিমা-কীর্তন দেখিতে পাই। সেখানে বলা হইয়াছে,—

রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥

আবার,—

আর এক বাণী শুন বিনোদিনী
দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন সাধন কিছুই না জানি
সদাই ভাবি হে তোরে॥
ভজন সাধন করে যেই জন
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি রসময়ই নিধি॥

আবার,—জগতে তোমার নাম বংশীধারী অনুপাম
তোমার বরণে পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরী আইনু গোকুলপুরী
বরজমণ্ডলে পরকাশ॥
ধনি, তোমার মহিমা জানে কে।
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাইয়া করিতে নারি শেষ॥

অথবা,—

প্রেমেতে রাধিকা স্নেহেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাকান্ত নাম[১]
পেয়েছি অনেক আশে॥

১ অন্য পদে আছে—

রাধারে ভজিয়া রাধা-বল্লভ নাম
পেয়েছি অনেক আশে॥

জ্ঞানেতে রাধিকা ধ্যানেতে রাধিকা
রূপেতে রাধিকাময়।
সর্ব্বাঙ্গে রাধিকা স্বপ্নেহ রাধিকা
সর্ব্বত্র রাধিকাময়।

এই সকল পদ রাধিকারই মহিমা প্রকাশ করে। ইহা ছাড়াও চণ্ডীদাসের যে 'কিশোরী' সম্বন্ধে পদগুলি রহিয়াছে সেগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।—

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী চরণ সার॥
শয়নে স্বপনে গমনে কিশোরী
ভোজনে কিশোবী আগে।
করে করে বাঁশী ফিবি দিবা নিশি
কিশোরীর অনুরাগে॥
কিশোরী চরণে পরাণ সঁপেছি
ভাবেতে হৃদয় ভরা।
দেখো হে কিশোরী অনুগত জনে
করো না চরণ-ছাড়া॥
কিশোরীর দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে
বিফল ভজন তার॥

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীতে এই জাতীয় কিশোরী-ভজনের অনেক পদ পাই। এই পদগুলি কোন্ চণ্ডীদাস কখন রচনা করিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে আমরা একেবারে নিশ্চিত নই; কিন্তু আমরা জানি বাঙলার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'কিশোরা-ভজনের' একটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজিয়াদের অনুরূপভাবে পুরুষে কৃষ্ণের আরোপ ও স্ত্রীতে কিশোরীর (রাধার) আরোপ করিয়া সাধনার প্রথা চলিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু মোটের উপরে সব ধর্ম্মমতের ভিতরে 'কিশোরী'রই প্রাধান্য দেখা যায়।

উত্তর ভারতে 'রাধা-বল্লভী' সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন গোঁসাই হিত-হরিবংশ। ইঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে; খুব সম্ভব ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে অবতীর্ণ হন। হিতহরিবংশজী রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপেরই সাধক ছিলেন, তাঁহার কবিতাতেও তিনি এই যুগল-প্রেমেরই গান করিয়াছেন; কিন্তু সকলের ভিতর দিয়া শ্রীরাধার প্রাধান্যই এই সম্প্রদায়ের সাধনা এবং সাহিত্যকে একটা বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

হিতহরিবংশজী গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ এবং প্রথমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রাধা-বল্লভী সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের পিছনে নিজস্ব কোনও দার্শনিক মতবাদ ছিল বলিয়া জানা যায় না; অন্ততঃ এবিষয়ে আমরা কোন প্রামাণিক গ্রন্থ পাই না। হিতহরিবংশের পরেও অনেক ভক্ত কবি এই সম্প্রদায়ে আবির্ভূত হইয়াছেন; তাঁহারাও গান-রচনা ব্যতীত কোথাও কোনও তত্ত্বালোচনা করেন নাই। নাভাদাসজী তাঁহার ভক্তমালগ্রন্থে বলিয়াছেন যে, শ্রীহিত-হরিবংশ গোঁসাইর ভজন-রীতি সুস্পষ্টরূপে কেহই জানে না; তাঁহারা শ্রীরাধার চরণই দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতেন এবং যুগলের কুঞ্জকেলি দর্শন ও আস্বাদন করিতেন। এই সম্প্রদায়ের সাধনমার্গ যাঁহারা অবলম্বন করেন শুধু তাঁহারাই এই সম্প্রদায়ের মত ভাল করিয়া জানিতে পারেন, অপরে জানিতে পারেন না।

শ্রীহরিবংশ গুসাঈ ভজন কী রীতি সকৃত (সুকৃত?) কোউ জানি হৈ।
শ্রীরাধাচরণ প্রধান হৃদৈ অতি সুদৃঢ় উপাসী।
কুংজ কেলি দম্পতি তহাঁ কী করত খবাসী।
সর্বসু মহা প্রসাদ প্রসিদ্ধতা কে অধিকারী।
বিধি নিষেধ নহিঁ দাস অনন্য উৎকট ব্রতধারী।
শ্রীব্যাস সুবন পথ অনুসরৈ সোই ভলে পহিচানি হৈ।
শ্রীহরিবংশ গুসাঈ ভজন কী রীতি সকৃত কোউ জানি হৈ।

এই সম্বন্ধে প্রিয়াদাসজী বলিয়াছেন, শ্রীহিতজীর যে রতি তাহা লাখের ভিতরে কেউ একজন হয়ত জানে; তাহারা রাধাকেই প্রধান বলিয়া মানে, তাহার পরে হইল কৃষ্ণের ধ্যান।—

শ্রীহিত জু কী রতি কোউ লাখনি মেঁ এক জানে।
রাধাহি প্রধান মানে পাছে কৃষ্ণ ধ্যাইয়ে।

কথিত আছে গোঁসাইজী নিজে স্বপ্নে শ্রীরাধাদ্বারা দীক্ষিত হন। 'হরি রসনা রাধা-রাধা রট'—এই গানই রাধা-বল্লভী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যসূচক।

রাধার এই প্রাধান্য কেন? হিতহরিবংশের 'শ্রীহিতচৌরাসী' গ্রন্থে একটি পদে দেখিতে পাই,—

সুনি মেরো বচন ছবীলী রাধা।
তৈঁ পায়ো রসসিন্ধু অগাধা॥
তু বৃষভানু গোপ কী বেটী।
মোহনলাল রসিক হঁসি ভেঁটী॥
জাহি বিরংচি উমাপতি নায়ে।
তাপৈ তৈঁ বনফুল বিনায়ে॥
যো রস নেতি-নেতি শ্রুতি ভাখ্যো।
তাকৌ অধর-সুধারস চাখ্যো॥
তেরো রূপ কহত নহিঁ আবৈ।
হিত হরিবংশ কছুক জস গাবৈ॥

"আমার কথা শোন, হে সুন্দরী রাধা, তোমা হইতেই পাইয়াছি অগাধ রস-সিন্ধু। তুমি বৃষভানু গোপেব মেয়ে, মোহনলাল রসিকের (কৃষ্ণের) সঙ্গে তুমি হাসিয়া মিলিত হও। যাঁহাকে বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) এবং উমাপতি (শিব) বন্দনা করেন তাঁহার জন্য তুমি গাঁথ বনফুল। যে বসেব কথা শ্রুতি নেতি নেতি করিয়া বলে তুমি কব তাহাবই অধব-সুধাবস পান। তোমার রূপ কখনও বর্ণনায় আসে না, হিতহবিবংশ তাহার কিছু কিছু যশ গান করিতেছে।" এইখানেই হইল শ্রীবাধিকার অপার মহিমা। রাধা সম্বন্ধে এই জাতীয় কবিতা অষ্টছাপের কবিগণের ভিতরে যে আদৌ পাওয়া যায় না তাহা নহে। সুবদাসেব একটি কবিতায় দেখি—

নীলাম্বর পহিবে তনু ভামিনি, জনু ঘন মেঁ দমকত হৈঁ দামিনি।

জগ নায়ক জগদীশ পিয়াবী জগত জননী জগরাণী।
নিত বিহার গোপাল লাল সঙ্গ বৃন্দাবন বাজধানী॥
অগতিন কো গতি ভক্তন কো পতি শ্রীরাধা পদ মঙ্গল দানী।
অশরণ শরণী ভব ভয় হরণী বেদ পুরাণ বখানী॥
রসনা এক নহীঁ শত কোটিক শোভা অমিত অপারী।
কৃষ্ণভক্তি দীজৈ শ্রীরাধে সূরদাস বলিহারী॥

পরমানন্দ দাস বলিয়াছেন—

ধনি যহ রাধিকা কে চরণ।
হৈঁ সুভগ শীতল অতি সুকোমল কমল কৈসে বরণ।
রসিকলাল মন মোদকারী বিরহ সাগর তরণ।
বিবশ পরমানন্দ ছিন ছিন শ্যামজী কে শরণ॥[১]

রাধা-বল্লভীগণ এই রাধার কৃপার উপরেই সর্বাপেক্ষা বেশী জোর দিলেন। বৃন্দাবন ধামে যে অনন্ত প্রেমের বিচিত্র লীলা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবার একমাত্র উপায় শ্রীরাধিকার কৃপা; এই কৃপা ব্যতীত সকল প্রেমরহস্যই থাকে 'অগম্য'।

প্রথম জথামতি প্রণমউঁ শ্রীবৃন্দাবন অতি রম্য।
শ্রীরাধিকা কৃপা বিনু সবকে মননি অগম্য॥

যুগল-লীলা আস্বাদনের হিতহরিবংশ-রচিত অনেক সুন্দর সুন্দর পদ আছে। একটি পদে দেখি, প্রভাতে লতামন্দিরে ঝুলন-মিলন হইতেছে যুগলবরের এবং তাহাতে হইতেছে প্রচুর সুখ-বর্ষণ। গৌরী রাধা আর শ্যাম কৃষ্ণ অভিরাম প্রেমলীলায় ভরপুর—ঝুলিয়া পাদস্পর্শ করিতেছেন অবনীপর। হিতহরিবংশ এই লীলাগানে মত্ত।

আজু প্রভাত লতা মংদির মেঁ,
সুখ বরষত অতি যুগলবর।
গৌর শ্যাম অভিরাম রংগ রংগ ভবে,
লটকি লটকি পগ ধরত অবনি পর॥
কুচ কুমকুম রংজিত মালাবলি,
সুরত নাথ শ্রীশ্যাম ধামবর।
প্রিয়া প্রেম অংক অলংকৃত চিত্রিত,
চতুর শিরোমণি নিজ কর॥
দম্পতি অতি অনুরাগ মুদিত কল,
গান করত মন হরত পরস্পর।
জৈ শ্রীহিত হরিবংশ প্রসংস পরায়ণ,
গাইন অলি সুর দেত মধুরতর॥

১ দীনদয়াল গুপ্তের সংগ্রহ।

এই যুগল-প্রেমের আর একটি হিতবংশ-রচিত মধুর পদে দেখি—

জোঈ জোঈ প্যারো করৈঁ সোই মোহি ভাবৈ।
ভাবৈ মোহি জোঈ সোঈ সোঈ করৈঁ প্যারে॥
মোকো তৌ ভাবতী ঠৌর প্যারে কে নৈনন মেঁ।
প্যারো ভয়ো চাহৈ মেরে নৈননি কে তারে॥
মেরে তো তন-মন-প্রাণহুঁ মেঁ প্রীতম প্রিয়।
অপনে কোটিক প্রাণ প্রীতম মো সোঁ হারে॥
কৈ শ্রীহিতহরিবংশ হংস হংসিনী সাঁবল গৌর।
কহৌ কৌন করে জল তরংগিনি ন্যারে॥

"যাহা যাহা করে প্রিয় তাহাই লাগে আমাব ভাল; আবার যাহা যাহা লাগে আমার ভাল তাহা তাহাই কবে আমার প্রিয়। আমাব যাহা ভাল লাগে তাহার স্থান হইল আমার প্রিয়েব তুইটি নয়নে; প্রিয় আবার চাহিয়া থাকে আমার চোখের তারার দিকে। আমাব ত তনু-মন-প্রাণে হইল সেই প্রীতম প্রিয়; কিন্তু নিজে কোটি কোটির প্রীতম হইয়াও সে আমাব সঙ্গে হাবে। হিতহবিবংশ জয় দিতেছে সেই শ্যামল-গৌব হংস-হংসিনীব; কহিতেছে, কি কবিবে জল— যদি তবঙ্গিণী না থাকে কাছে।"

হরিদাস ব্যাস বাধা-বল্লভী সম্প্রদায়েব আব একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। ইনি হিতহরিবংশেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। ইঁহার কবিতার ভিতরেও দেখিতে পাই যে, যে হবি হইল ব্যাসজীর প্রিয়তম তাঁহার পরিচয় হইল 'রাধা-বল্লভ';—

রাধা-বল্লভ মেবৌ প্যারৌ।

অন্যত্র ব্যাসজী বলিয়াছেন, অনন্ত রসিক জাতিই হইল তাঁহাব জাতি, এবং রাধাই হইল তাঁহার কুলদেবী।—

রসিক অনন্ত হমারী জাতি।
কুলদেবী বাধা, বরসানৌ খেরৌ, ব্রজবাসিন সোঁ পাঁতি॥

এই রাধা-বল্লভীগণেব নিকটে বৃন্দাবনই হইল সর্বাপেক্ষা 'সাচ্চা ধন'; কারণ এইখানে স্বয়ং লক্ষ্মীও শ্রীরাধার চরণরেণু গ্রহণ করেন।—

বৃন্দাবন সাঁচো ধন ভৈয়া।
* * *
জই শ্রীরাধা চরণরেণু কী কমলা লেতি বলৈয়া॥

ব্যাসজীর আর একটি গানে দেখি,—

পরম ধন রাধে-নাম অধার।
জাহি শ্যাম মুরলী মেঁ টেরত, সুমিরত বারংবার॥
জংত্র-মংত্র ঔর বেদ-তংত্র মেঁ সবৈ তার কৌ তার।
শ্রীশুক প্রগট কিয়ো নহিঁ যাতেঁ জানি সার কৌ সার।
কোটিন রূপ ধরে নংদ-নংদন তউ ন পায়ো পার॥
ব্যাসদাস অব প্রগট বখানত ভারি ভার মেঁ ভার॥

"পরমধন হইল রাধানাম আশ্রয়,—যে নাম শ্যাম তাহার মুরলীতে গান করে, আর স্মরণ করে বার বার। যন্ত্র-মন্ত্র আর বেদ-তন্ত্রের ভিতরে ইহাই (এই রাধা নামই) হইল রহস্যের রহস্য; এই নামটি সকল সার-বস্তুর ভিতরে সার-বস্তু জানিয়া শ্রীশুকদেব (ভাগবত পুরাণের মধ্যে) এই নামটি আর প্রকট করিয়া যান নাই। কোটি রূপ ধরিয়াছে নন্দ-নন্দন, তবু পায় নাই ইহার পার; ভারের মধ্যে ভার ছাড়িয়া দিয়া (দর্শন-পাণ্ডিত্যের সকল ভার ছাড়িয়া দিয়া) ব্যাসজী এখন প্রকটে সব ব্যাখ্যা করিতেছে।"

শ্রীরাধা এই রাধা-বল্লভী সম্প্রদায়ের ভিতরে কি স্থান অধিকার করিয়াছিল উপরি-উদ্ধৃত পদটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রাকৃত ধাম পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত ধামে প্রবেশের জন্য শ্রীরাধাই ছিল রাধা-বল্লভীগণের তরণী। তাই ব্যাসজী এই শ্রীরাধিকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

লটকতি ফিরতি জুবন-মদমাতী, চংপক-বিথিন চংপকবরণী।
রতনারে অনিয়ারে লোচন, লখিকৈঁ লাজতি হৈঁ নব হরিণী॥
অংস ভুজা ধরি লটকত লালহিঁ, নিরখি থকে মদগজ গতি করণী।
বৃন্দাবিপিন বিনোদহি দেখত, মোহীঁ বৃন্দাবন কী ঘরণী।
রাস-বিলাস করত জহঁ মোহন, বলি বলি, ধনি ধনি হৈ বহ ধরণী।
শ্রীবৃষভানু নংদিনী কে সম, ব্যাস নহীঁ ত্রিভুবন মহঁ তরণী॥

"ঝুলনে ঝুলিতেছে, এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিতেছে যৌবন-মদমত্তা রাধা—চম্পক-বীথিতে চম্পক-বরণী। ঈষৎ-রক্তিম তীক্ষ্ণ তাহার লোচন দেখিয়া লাজ পায় নব-হরিণী। কাঁধ এবং হাত ধরিয়া ছোট ছোট শিশুরা ঝোলে, মদগজ গতি দেখিয়া করিণী থমকিয়া যায়; বৃন্দাবিপিনের বিনোদকে দেখিয়া বৃন্দাবন-ঘরণী মোহিত হয়। যেখানে মোহন রাস-বিলাস করে, বলিহারি ধন্য ধন্য সেই ধরণী; হে ব্যাস, ত্রিভুবনের মধ্যে শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর সমান তরণী আর নাই।"

ধ্রুবদাস হিতহরিবংশের নিকটে স্বপ্নে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত। মহাভাব-রূপিণী রাধার বর্ণনামূলক ধ্রুবদাসের একটি চমৎকার পদ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।[১] এই ধ্রুবদাস তাঁহার একটি দোঁহায় বলিয়াছেন,—

ব্রজদেবী কে প্রেম কী বঁধী ধুজা অতি দূরি।
ব্রহ্মাদিক বাংছত রহৈঁ তিনকে পদ কী ধূরি॥

ব্রজদেবীর প্রেমের ধ্বজা অতি উচ্চে বাঁধিয়া ব্রহ্মাদিও তাঁহার পদধূলি বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত বাঙলা-কবিতায় এবং হিন্দী রাধা-বল্লভী সম্প্রদায়ের কবিগণের কবিতার মধ্যে আমরা এই যে রাধার প্রাধান্য দেখিতে পাই, পূর্ববর্তী কালের ভারতীয় শক্তিবাদের ভিতরেই আমরা ইহার বীজ নিহিত দেখিতে পাই। তন্ত্রাদি-শাস্ত্রে শিব-শক্তি সম্বন্ধে যত রকমের আলোচনা দেখিতে পাই, আমরা মোটামুটি ভাবে তাহাকে তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম মত হইতেছে, পরমতত্ত্ব হইতেছে এক অদ্বয় সমরস-তত্ত্ব—শিব এবং শক্তি উভয়েই সেই পরম-তত্ত্বের দুইটি অংশ মাত্র। দ্বিতীয় মত হইতেছে, শিবই হইলেন শক্তিমান্—সুতরাং শক্তির মূলাশ্রয়; এই শক্তির আশ্রয় শিবই হইলেন পরমতত্ত্ব। এই দ্বিতীয় মতটিরই সর্বসাধারণের ভিতরে অধিকতম স্বীকৃতি। তৃতীয় আর একটি মত রহিয়াছে, যে মতে ত্রিভুবনব্যাপিনী শক্তিই হইলেন পরমতত্ত্ব—এই শক্তির আধারই হইলেন শিব। বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি যাঁহার ভিতরে আধারীভূতা হইয়াছেন তিনিই শিব—শক্তির আধারত্ব তাঁহার আসল শক্তিমত্ত্ব। 'দেবী-ভাগবতে'র ভিতরে দেখিতে পাই, ঋক্-আদি শ্রুতিগণ দেবীকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ঋগ্‌বেদ বলিয়াছেন—

যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্বং প্রবর্ততে।
যদাহু স্তৎপরং তত্ত্বং সাদ্যা ভগবতী স্বয়ম্॥

যজুর্বেদ বলিয়াছেন,—

যা যজ্ঞৈরখিলৈ রীশা যোগেন চ সমিজ্যতে।
যতঃ প্রমাণং হি বয়ঃ সৈকা ভগবতী স্বয়ম্॥

সামবেদের মতে—

যয়েদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভি র্যা বিচিন্ত্যতে।
যদ্ভাসা ভাসতে বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী॥

১ মহাভাব সুখ-সার-স্বরূপ ইত্যাদি। এই গ্রন্থের ২২৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

অথর্ববেদের মতে—

যাং প্রপশুন্তি দেবেশীং ভক্ত্যানুগ্রাহিনো জনাঃ।
তামাহুঃ পরমং ব্রহ্ম দুর্গাং ভগবতীং মুনে॥

তখন,—শ্রুতীরিতং নিশম্যেত্থং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
দুর্গাং ভগবতীং মেনে পরংব্রহ্মেতি নিশ্চিতম্॥

এই দেবী সম্বন্ধে পরবর্তী বর্ণনায় দেখিতে পাই,—"যিনি স্বীয় গুণের দ্বারা এবং মায়া দ্বারা দেহী পরম-পুরুষের দেহাখ্যা, চিদাখ্যা এবং পরিস্পন্দাদিরূপা পরাশক্তি, তাঁহার মায়ায় পরিমোহিত হইয়া দেহধারী নরগণ ভেদজ্ঞানবশতঃ দেহস্থিতা তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া বলে, সেই অম্বিকাকে নমস্কার। স্ত্রীত্ব পুংস্ত্ব প্রভৃতি উপাধিসমূহের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন তোমার যে স্বরূপ তাহাই ব্রহ্ম; তাহার পরে জগতের সৃষ্টির জন্য প্রথম আবির্ভূত হইল যে সিসৃক্ষা—তাহাই স্বয়ং তুমি —শক্তি। সেই শক্তি হইতেই পরম পুরুষ—পুরুষ-প্রকৃতি এই মূর্তিদ্বয়ও এক পরাশক্তি হইতে সমুদ্ভূত; তন্মায়াময় পরব্রহ্মও হইল শক্ত্যাত্মক। জল হইতে জাত করকাদিকে জলময় দেখিয়া মতিমান্ ব্যক্তিগণের যেরূপ (করকাদি) সকলকে জল বলিয়াই নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে, তেমনই ব্রহ্ম হইতে উত্থিত সকলকে মনে মনে শক্ত্যাত্মক দর্শন করিয়া শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মের আর স্বরূপ পাওয়া যায় না; এইরূপ শক্তিত্বে বিনিশ্চিতা পুরুষধী-ই পরম্পরা ক্রমে ব্রহ্মে উপস্থিত হয়।"[১]

[১] যা পুংসঃ পরমস্য দেহিন ইহ স্বীয়ৈ গু´ণৈ র্মায়য়া
দেহাখ্যাপি চিদাত্মিকাপি চ পরিস্পন্দাদিশক্তিঃ পরাঃ।
তন্মায়া পরিমোহিতা স্তনুভৃতো যামেব দেহস্থিতাং
ভেদজ্ঞানবশাদ্বদন্তি পুরুষং তস্যৈ নমস্তেঽম্বিকে॥
স্ত্রীপুংস্ত্বপ্রমুখৈরুপাধিনিচয়ৈ র্হীনং পরং ব্রহ্ম যৎ
ত্বত্তো যা প্রথমং বভূব জগতাং সৃষ্টৌ সিসৃক্ষা স্বয়ং।
সা শক্তিঃ পরমোঽপি যচ্চ সমভূন্মূর্তিদ্বয়ং শক্তিত-
স্তন্মায়াময়মেব তেন হি পরং ব্রহ্মাপি শক্ত্যাত্মকম্॥
তোয়োত্থং করকাদিকং জলময়ং দৃষ্ট্বা যথা নিশ্চয়ঃ
তোয়ত্বেন ভবেদ্গ্রহো মতিমতাং তথ্যং তথৈব ধ্রুবম্।
ব্রহ্মোত্থং সকলং বিলোক্য মনসা শক্ত্যাত্মকং ব্রহ্মত-
চ্ছক্তিত্বেন বিনিশ্চিতা পুরুষধীঃ পারম্পর্য্যা ব্রহ্মণি॥

এইরূপ 'শাক্ত-মত-চন্দ্রিকা', 'ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্র', 'কূর্মপুরাণ', 'দেব্যাগম', 'যোগিনী-তন্ত্র', 'নবরত্নেশ্বর' প্রভৃতি বহু তন্ত্রাগমে দেবীকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[১] 'ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্রে' বলা হইয়াছে, এক সূর্য যেমন বিভিন্ন দর্পণের সান্নিধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়, এক আকাশ যেমন ঘটাদিভেদে বিভিন্নরূপে ভিন্ন হয়, সেইরূপ এক মহাবিদ্যারূপিণী শক্তিও বহু দেবতা এবং বহু বস্তু রূপে নাম-মাত্রে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতিভাত হন।[২] প্রত্যেক দেবতাই শক্তিমান্, শক্তি-মত্ত্বের তাহা হইলে তাৎপর্য হইল, এক সূর্য যেমন দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনই একই শক্তি বিভিন্ন দেবতার আধারে আধারীভূতা হইয়াছেন। পরা শক্তিকে এই বিশেষ বিশেষ আধারে বিশেষ বিশেষ রূপে ধারণ-ক্ষমত্বই হইল আসল শক্তিমত্ত্ব। সুতরাং শক্তিমান্‌কে আশ্রয় করিয়া শক্তির অবস্থান নয়, শক্তিকে ধারণ করিয়াই শক্তিমানের অবস্থান। কূর্মপুরাণে বলা হইয়াছে,—

সর্ববেদান্তবেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
একং সর্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥
যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্।
অনন্তমক্ষয়ং ব্রহ্ম কেবলং নিষ্কলং পরম্ ॥
যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পবং পদম্।
পরাৎপরতরং তত্ত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্ ॥"[৩]

প্রচলিত পুরাণাদির ভিতবে এই শক্তি-প্রাধান্যবাদের একটি ধারার নানা ভাবে আভাস পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতালখণ্ডে আমরা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি দেখিতে পাই,—

অহং চ ললিতা দেবী রাধিকা যা চ গীয়তে ॥
অহং চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাত্মকঃ।
সত্যং যোষিৎ-স্বরূপোঽহং যোষিচ্চাহং সনাতনী ॥

১ শিবধন বিদ্যার্ণব কৃত 'তন্ত্রতত্ত্ব', ১ম খণ্ডে এই সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

২ ভিদ্যতে সা কতিবিধা সূর্যো দর্পণসন্নিধৌ।
আকাশো ভিদ্যতে যাদৃক্ ঘটস্থাদিস্তথা চ সা।
একৈবহি মহাবিদ্যা নামমাত্রং পৃথক্ পৃথক্ ॥

৩ তন্ত্রতত্ত্ব, ১ম খণ্ডে উদ্ধৃত।

অহং চ ললিতা দেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা।
আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ ॥[১]

এই সকল লেখা ঠিক কোন্ সময়ের সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নহি ; কিন্তু এখানে দেখিতেছি কৃষ্ণ সত্য, সত্য যোষিৎ-স্বরূপ, এবং ললিতাদেবী-রূপা যে আদ্যাশক্তি পরতত্ত্ব তাহাই পুংরূপা হইয়া কৃষ্ণবিগ্রহা হইয়া উঠে। এ-মতে তাহা হইলে রাধা কৃষ্ণ হইতে উদ্ভূতা নহে, কৃষ্ণই রাধার রূপান্তর। 'শক্তি-সঙ্গমতন্ত্রে' দেখিতে পাই—

কদাচিদ্দাদ্যা ললিতা পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা।
লোকসম্মোহনার্থায় স্বরূপং বিভ্রতী পরা ॥
কদাচিদাদ্যা শ্রীকালী সৈব তারাস্তি পার্বতী।
কদাচিদাদ্যা শ্রীতারা পুংরূপা রামবিগ্রহা ॥

এই শক্তি-প্রাধান্যবাদই যুগোচিত বিবর্তনের ভিতর দিয়া চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত পদগুলিতে কিশোরী-প্রাধান্যের সৃষ্টি করিয়াছে, রাধা-বল্লভী সম্প্রদায়ের ভিতরে রাধা-প্রাধান্যের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণ করা যাইতে পারে, 'রাধাস্বামী' সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সাধক শিবদয়ালের (জন্ম ১৮২৮) জপমন্ত্র ছিল 'রাধাস্বামী'। এ-বিষয়ে বলা হয়, "সদ্গুরু কবীর অগমের ধারাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, অগমের 'ধারা'কে উল্টাইয়া 'স্বামী'র সঙ্গে মিলাইয়া স্মরণ কর।"[২] অগমের 'ধারা' অর্থাৎ অগমের শক্তি-প্রবাহকে উল্টাইয়া লইলেই 'রাধা' হয় ; সেই অগমের সহিত শক্তি-ধারাকে উল্টাইয়া লইলেই পাওয়া যাইবে পরম ইষ্ট 'রাধাস্বামী'কে।

১ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত সংস্করণ।

২ কবীর ধারা অগম কী সৎগুরু দই লখায়।
উলটি তাহি সুমিরন করো স্বামী সংগ লগায় ॥—সংত-বাণী-সংগ্রহ

চতুর্দশ অধ্যায়

বল্লভ-সম্প্রদায়ের হিন্দী-সাহিত্যে রাধা

আমরা উপরে বিবিধ প্রসঙ্গে শ্রীরাধা-সম্বন্ধে যত আলোচনা করিয়াছি তাহা সমস্ত একত্রে বিচার করিলে বাঙলা-সাহিত্যে বর্ণিত রাধা সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একটা ধারণা করা যাইবে। গ্রন্থের পরিশিষ্টের আলোচনার ভিতরে এই প্রসঙ্গের কয়েকটি বিষয়ে আবার আমরা ফিরিয়া যাইবার সুযোগ পাইব। আমরা পূর্বে যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা হইতে বলা যাইতে পারে, প্রথমে মুখ্যতঃ সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই শ্রীরাধাব বিকাশ; ধর্ম তাহার সহিত পরোক্ষ-ভাবে যুক্ত থাকিলেও সেখানে ধর্মের কোনও স্পষ্ট স্ফুরণ নাই। সাহিত্য-ধারার ভিতর দিয়া ক্রমবিকশিত শ্রীরাধাই ক্রমে তাঁহার বিভিন্ন কবিবর্ণিত মানবীদেহের পরিমণ্ডলে বিচিত্র রম্য ধর্মবিশ্বাস এবং দার্শনিক-তত্ত্বের বর্ণশাবল্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং ইহার ভিতর দিয়াই প্রেমধর্মের কেন্দ্রমণি রাধা দিন দিন 'কান্তাশিরোমণি'রূপে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে লাগিলেন। এই 'কান্তাশিরোমণি' রূপে শ্রীবাধার পূর্ণ পরিণতি চৈতন্যযুগে।

রাধার কথা পূর্বে যখন আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তখন বলিয়াছি, ভারতীয় প্রেমিক কবিমনে পরিপূর্ণ নাবী-সৌন্দর্য এবং পরিপূর্ণ নারীপ্রেম-মাধুর্যকে অবলম্বন করিয়া যে অপরূপ মানস প্রতিমা সৃষ্ট হইয়াছিল রাধার ভিতরে পাইয়াছি তাহারই সুকুমার অথচ সুনিপুণ অভিব্যক্তি; বৃন্দাবনেব পটভূমিকায় সাহিত্যের ভিতরে তাহা আরও উজ্জ্বল এবং মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। চৈতন্যযুগে এবং চৈতন্যোত্তর যুগে রাধার ভিতরে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের একটা অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে। ইহাতে যে শুধু রসের স্বাদবৈচিত্র্যই ঘটিয়াছে তাহা নহে, উদ্গতির ভিতর দিয়া এখানে রসের স্বরূপের ভিতরেও বিবিধ বিচিত্র পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু এ-সকল যুগেও 'কামক্রীড়া-সাম্যে'ই হোক অথবা বাস্তব আলম্বনরূপেই হোক, প্রাকৃতেই রাধার প্রতিষ্ঠা, ক্ষণে ক্ষণে অপ্রাকৃত-স্পর্শে তাঁহার অসীম মহিমা বিস্তার। চৈতন্যযুগে এবং চৈতন্যপরবর্তী যুগে অবশ্য অনেক কবি প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া রাধা-প্রেম সম্বন্ধে

কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; সংস্কৃত প্রাকৃত বৈষ্ণব কবিতার পরে প্রথমে ভারতীয় দেশজ ভাষায় আমরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সম্বলিত বৈষ্ণব কবিতা পাইলাম পঞ্চদশ শতকের (চতুর্দশ?) মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি ও বাঙলার কবি চণ্ডীদাসের রচনায়। আমরা পূর্বেই বিবিধপ্রসঙ্গে আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বিদ্যাপতি ছিলেন একজন বিদগ্ধ রসিক কবি। ধর্মমতে তিনি আদৌ বৈষ্ণব ছিলেন কিনা এ-বিষয়ে ঘোর সংশয় প্রকাশ করিবারও যুক্তিযুক্ত কারণ রহিয়াছে। রতিশাস্ত্রে বিদ্যাপতির জ্ঞান ছিল প্রগাঢ় এবং সূক্ষ্ম। বিদ্যাপতি-রচিত সখী-শিক্ষার পদগুলি রতি-রহস্যের ভিতরে কবির গভীর নিমজ্জনের পরিচয়ই বহন করে। চণ্ডীদাসের রাধা সম্বন্ধে বলিতে হয়, 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'কেই যদি 'আদি এবং অকৃত্রিম' চণ্ডীদাসের আসল রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বলিব, সেখানে রাধা শুধু মানবী-প্রেমেরই মূর্ত বিগ্রহ নয়, মানবীয় প্রেমের মধ্যেও যে একটা স্থূল অমার্জিত 'ধামালি' উপাদান রহিয়াছে 'কৃষ্ণ-কীর্তনে'র রাধার বহুলাংশের ভিতরেই মূর্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে সেই 'ধামালি';[১] বিরহ পর্যায়ে আসিয়াই তাহা সূক্ষ্মতা লাভ করিয়াছে।

আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, রাধা সম্বন্ধে যে দু'একটি শ্লোক পুরাণাদিতে পাওয়া যায় তাহা সন্দিগ্ধ; কিন্তু তাহাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও রাধাকে অবলম্বন করিয়া ছোট বড় অসংখ্য উপাখ্যানে যে প্রেমলীলার বিস্তার ঘটিয়াছে, পুরাণাদিতে তাহার উল্লেখ নাই। একমাত্র ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অর্বাচীন সংস্করণে কিছু কিছু আছে, রাধাকৃষ্ণ-লীলা-সমৃদ্ধির তুলনায় তাহাও একান্ত নগণ্য। রাধার কথা ছাড়িয়া দিয়াও, গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের যে বৃন্দাবনলীলা, পুরাণাদিতে তাহারও বিস্তার খুব বেশি নয়। গোপী-কৃষ্ণ-লীলার সমৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা অধিক হইল ভাগবত-পুরাণে। এই ভাগবত-পুরাণে এবং অন্যান্য কিছু কিছু পুরাণে গোপী-কৃষ্ণ-লীলার ভিতরে সর্বোত্তম লীলা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে রাস-লীলা। রাস-লীলাতেই ভগবানের মাধুর্যরসের সম্যক্ বিকাশ। এই রাস-লীলার প্রভাব জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বৈষ্ণব কবির

১ অষ্টছাপের হিন্দী বৈষ্ণবগণের গানেও 'ধামার' বা 'ধামারি' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রায়শঃই 'হোরি'র (হোলি) প্রসঙ্গেই এই শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অদ্যাবধি হোলির সহিত যে অতিশয় নিম্নরুচির নৃত্যগীতাদি সম্বলিত প্রেম-গাথার প্রচলন রহিয়াছে তাহার ভিতর দিয়াই 'ধামারি' বা 'ধামালি' কথাটির তাৎপর্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উপরেই অল্পবিস্তর পড়িয়াছে। ভাগবত-পুরাণে এই রাস-লীলা ব্যতীত অন্যান্য গোপী-লীলার ভিতরে দশম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ে শরৎকালের বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীগণের বিহ্বলতা এবং আকুল চেষ্টিতসকল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ভুবনমোহন সর্বাকর্ষক বাঁশীর শব্দে শুধু গোপীরা নয়, বনের পশুপাখী, তরুলতা, এমন কি নদীগুলি পর্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল;[১] এই বংশীধ্বনিব প্রভাব পরবর্তী কালেব সকল বৈষ্ণব কবির উপরেই পড়িয়াছে। ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে আমরা কুমারী ব্রজকুমারীগণের নন্দগোপসুত কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তি-কামনায় কাত্যায়নী-অর্চনা উদ্‌যাপন করিতে দেখি এবং এই সঙ্গে গোপীগণের বস্ত্রহরণ-লীলার বর্ণনা পাইতেছি। ইহার পরে গোপীলীলা দেখিতে পাই বাস-পঞ্চাধ্যায়ীতে। এই রাস-বর্ণনার শেষেই অতি সংক্ষেপে গোপীগণেব সহিত কৃষ্ণের জল-বিহার এবং বন-বিহারের

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্‌॥
ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেষম্‌।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥

*　　*　　*　　*

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযূষমুত্তম্ভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থু
র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ॥
প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্‌
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্‌।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্‌ রুচিরপ্রবালান্‌
শৃণ্বন্ত্যমীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥
নদ্যস্তদা তদুপাধার্য মুকুন্দগীত-
মাবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারে-
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ॥—১০-১১, ১৩-১৫

বর্ণনা পাই। এই দশম স্কন্ধের পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, দিনের বেলা কৃষ্ণ গোষ্ঠে গোচারণে চলিয়া গেলে সারাদিন গোপীগণ কৃষ্ণলীলা অনুকরণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে—কৃষ্ণধ্যানে নিজদিগকে নিমজ্জিত রাখিত। ইহার পরে আবার পাইলাম অক্রূরের সহিত কৃষ্ণের বৃন্দাবন পরিত্যাগ এবং তৎপ্রসঙ্গে গোপীগণের আর্তি; ইহার পরে আর পাই গোপীগণের প্রতি উদ্ধব-সন্দেশ। ইহাই মোটা-মুটিভাবে ভাগবত-বর্ণিত গোপীলীলা।

হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণ (আমরা মুখ্যভাবে বল্লভ-সম্প্রদায়ের অষ্টছাপ বৈষ্ণব-গণের কথাই বলিতেছি) মুখ্যভাবে এই ভাগবত-বর্ণিত লীলাকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙলাদেশে আমরা রাধাকৃষ্ণকে লইয়া নিরন্তর লীলাবিস্তার দেখিতে পাইতেছি। এই লীলা-উপাখ্যানের উৎপত্তি ও বিস্তার প্রথমাবধিই কবি-কল্পনায়। প্রত্যেক যুগের কবি-কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া লীলা-উপাখ্যান নিত্যনূতন শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে মানুষের এই প্রেমকে নিত্য নূতন অবস্থানের ভিতর দিয়া আমরা নূতন করিয়া লই। সকল বৈষ্ণব কবিকেই এক রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া কবিতা রচনা করিতে হইয়াছে; এইএক রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকে বিচিত্র করিয়া না লইতে পারিলে তাহাকে অবলম্বন করিয়া নিত্য নূতন কাব্য-কবিতা রচনা করা সম্ভব নহে। এইজন্য বিভিন্ন যুগের কবিগণকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে লইয়া দেশোচিত এবং যুগোচিত বিচিত্র অবস্থান সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে। এইজন্য রাধাকৃষ্ণ-সাহিত্যকে ঐতিহাসিক ক্রমে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, যত দিন অগ্রসর হইয়াছে ততই লীলার বিস্তার ঘটিয়াছে। জয়দেবের পূর্ববর্তী রাধাকৃষ্ণ-কবিতার ভিতরে বিবিধ লীলার আভাস মেলে, কিন্তু জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দ কাব্যে এই রাধাকৃষ্ণ লীলাকে নিজের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার দ্বারা অনেকখানি বিস্তার করিয়া লইলেন; জয়দেবের ভিতরে যে লীলা পাইতেছি, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের ভিতরে তাহা আবার বিচিত্রভাবে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে দেখি রাধাকে লইয়া, ভার লীলা, দান-লীলা, নৌকা-লীলা প্রভৃতি লইয়াই কবি সুখী হইতে পারেন নাই; কবিকে মিলন-বিরহের আরও অসংখ্য 'ব্যপদেশ' সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। রাধার সহিত মিলন-বৈচিত্র্যের জন্য কৃষ্ণকে কি-না করিতে হইয়াছে? তাঁহাকে বেদে হইয়া সাপের ঝাঁপি মাথায় লইতে হইয়াছে, দোকানী হইয়া পসরা লইয়া ঘুরিতে হইয়াছে, বাজিকর হইয়া কত রকমের বাজি দেখাইতে হইয়াছে। শুধু কি তাই? কৃষ্ণ প্রয়োজন মত

নাপিতানী, মালিনী, দেয়াসিনী, বণিকিনী, চিকিৎসক, গ্রহবিপ্র প্রভৃতি সবই হইয়াছেন। গোবিন্দদাসের একটি প্রসিদ্ধ পদে দেখি, কৃষ্ণকে গোরখযোগী সাজিয়া শিঙ্গা বাজাইয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া রাধার অভিমান ভাঙাইতে হইয়াছে।

হিন্দী বৈষ্ণব-সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া বল্লভী-সম্প্রদায়-ভুক্ত অষ্টছাপ কবিগণের—রাধা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বাঙলা বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে এত কথা বলিবার একটি বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। এই লীলা-বিস্তারের দিক্ হইতে হিন্দী সাহিত্য ও বাঙলা সাহিত্যের ভিতরে একটা পার্থক্য রহিয়াছে, সেই পার্থক্যটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই বাঙলা বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে উপরে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইল। বাঙলা দেশের বৈষ্ণব কবিতার ভিতবে রাধাকৃষ্ণ লীলার যত উপাখ্যান-প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য রহিয়াছে হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতার ভিতরে আমরা সেরূপ প্রাচুর্য দেখিতে পাই না। ইহার প্রধান কারণ এই, হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতা যাঁহারা রচনা করিযাছেন, তাঁহারা অধিকাংশই বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত; নিম্বার্কাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াও কেহ কেহ কথিত হন। এই উভয় সম্প্রদায়ের ভিতরেই কৃষ্ণের সহিত রাধাকেও গ্রহণ করা হইয়াছে বটে এবং যুগল উপাসনার কথাও তাঁহারা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু বাঙলার চৈতন্য-সম্প্রদায়ের ভিতরে এই যুগল-উপাসনা এবং তাহার সঙ্গে লীলা-বাদকে যেরূপ সমস্ত সাধ্য-সাধনের মূলীভূত তত্ত্বরূপে গ্রহণ কবা হইয়াছে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে বা বল্লভ-সম্প্রদায়ে যুগল লীলাবাদের উপরে এতখানি প্রাধান্য আমরা দেখিতে পাই না। সেখানে শ্রীকৃষ্ণেব লীলার উপরে যেটুকু জোব দেওয়া হইয়াছে তাহা সবটুকুই কান্তা-প্রেমেব উপরে নহে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতিব উপরেও সমভাবেই জোর দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দী কবিগণের ভিতরে রাধাবল্লভী সম্প্রদাযের কবিগণ ব্যতীত অষ্টছাপের কবিগণের প্রায় সমকালবর্তিনী উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব কবি হইলেন মীরাবাঈ। মীরাবাঈ সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহাতে দেখিতে পাই বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয় কোন কোন গোস্বামীর সহিত (রূপগোস্বামী? জীব-গোস্বামী?) তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল। কিন্তু মীরাবাঈ-এর কবিতা এবং তাহার ভিতর দিয়া যে প্রেমধর্মের প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেব ন্যায় কোনও অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের যুগল-লীলাবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। মীরাবাঈ

কোনও সম্প্রদায় বিশেষের অন্তর্ভুক্ত ভক্ত বা কবি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি স্বাধীন বনবিহগীর ন্যায়ই তাঁহার 'পিতমে'র (প্রিয়তমের) গান করিয়াছেন। মীরাবাঈ-এর নামে যত গান প্রচলিত রহিয়াছে তাহার ভিতরে রাধার উল্লেখ খুবই কম রহিয়াছে। দুই একটি পদে মাত্র রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়—দু' একটি পদে রাধার আভাস রহিয়াছে। যেখানে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানেও রাধা-কৃষ্ণ-লীলা আস্বাদনের কোনও প্রশ্ন নাই—শুধু গোপালকৃষ্ণের বিবিধ লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গেই রাধার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

আলী ম্হাঁনে লাগে বৃন্দাবন নীকো।

* * * *

কুংজন কুংজন ফিরত রাধিকা সবদ সুনত মুরলী কো।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর ভজন বিনা নর ফীকো॥

"সখী, আমার বৃন্দাবন বড় ভালো লাগে। ···কুঞ্জে কুঞ্জে ফেরে রাধিকা—শব্দ শুনে মুরলীর। মীরার প্রভু গিরিধর নাগর—(তাহার) ভজন বিনা মানুষ ফিকা (মলিন, রসহীন)।"

অথবা—

হমরো প্রণাম বাঁকে বিহারী কো।
মোর মুকুট মাথে তিলক বিরাজে কুংডল অলকা কারী কো॥
অধর মধুর পর বংশী বজাবৈ রীঝ রিঝাবৈ রাধা প্যারী কো।
ইহ ছবি দেখ মগন ভঈ মীরা মোহন গিরবরধারী কো॥

"আমার প্রণাম বাঁকা বিহারীকে, যাহার মাথায় ময়ূর (পুচ্ছের) মুকুট, তিলক (কপালে) বিরাজ করে—আর যে ধারণ করে কুণ্ডল ও অলকা। অধরে মধুর বাঁশী বাজায়, রাধা প্যারীর হৃদয় করে মোহিত। মোহন গিরিবরধারীর এই শোভা দেখিয়া মগ্ন হইয়া গেল মীরা।"

অথবা—

মাঈ রী মৈঁ তো গোবিন্দো লীনো মোল।

* * * *

কোই কহে ঘর মেঁ, কোই কহে বন মেঁ রাধা কে সংগ কিলোল।
মীরা কুঁ প্রভু দরসণ দীজ্যো পূরব জনম কো কোল॥

"মাগো, আমি গোবিন্দকে লইলাম কিনিয়া।····· কেহ কহে ঘরে, কেহ কহে বনে, কিন্তু সে রাধার সঙ্গে (করিতেছে) কেলি; মীরার প্রভু, দর্শন দাও, ইহাই

তোমার পূর্বজন্মের প্রতিশ্রুতি।" দুই একটি পদ রহিয়াছে যেখানে মীরা রাধার কোন স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই, শুধু আপনার প্রেম-বিহ্বলতাই বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু মীরার নিজের সেই প্রেম-বিহ্বলতা প্রকাশের ভিতরে শ্রীরাধার একটি আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন—

> নৈনা লোভী রে বহুরি সকে নহিঁ আয়।
> রোম রোম নখসিখ সব নিরখত, ললচ রহে ললচায়॥
> মৈঁ ঠারী গৃহ আপণে রে, মোহন নিকসে আয়।
> সারংগ ওট তজে কুল অংকুস, বদন দিয়ে মুসকায়॥
> লোক কুটুম্বী বরজ বরজহী, বতিয়াঁ কহত বনায়।
> চঞ্চল চপল অটক নহিঁ মানত পর হাথ গয়ে বিকায়॥
> ভলী কহোঁ কোই বুরী কহে মৈঁ, সব লই সীস চঢ়ায়।
> মীরা কহে প্রভু গিরিধর কে বিন, পল ভর রহো ন জায়॥

"নয়ন দু'টি লোভী, তাই আর ফিরিয়া আসিতে পারিল না। সর্বদেহ—নখ হইতে শিখা পর্যন্ত সব নিরখিয়া লালসা আরও লুব্ধ হইয়া রহে। আমি দাঁড়াইয়াছিলাম আপনার ঘরে—মোহন আসে সেই দিকে; আঁখি কুল-মর্যাদার যবনিকাকে করিল ত্যাগ, বদন দিল হাসিয়া। লোক-কুটুম্ব সবাই করে বারণই বারণ—বানাইয়া বলে কত কথা; চঞ্চল চপল (মন) মানে না কোন বাধা—পরের হাতেই গেল বিকাইয়া। কেহ কহে ভাল, কেহ কহে মন্দ, সব লই আমি মাথায় তুলিয়া; মীরা কহে, প্রভু গিরিধর বিনা এক মুহূর্তের জন্যও থাকা যায় না।"

ইহার ভিতরে মীরার প্রেম ও তাহার অভিব্যক্তি স্বতঃই আমাদিগের মনে অন্য বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণিত রাধা-প্রেমের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দিবে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই, মীরা নিজেই এখানে রাধার স্থান অধিকার করিয়া আছেন; রাধার অনুরূপ ভাবেই হইল মীরার প্রেম-সাধনা। এই জিনিসটি আমরা বাঙলাদেশের বৈষ্ণব কবিতায় কোথায়ও পাইব না। বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই একটু দূর হইতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—রাধার ভাব কেহই অবলম্বন করিতে চাহেন নাই। আমরা পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে, সখী বা মঞ্জরীর অনুগভাবে সাধন করিয়া নিত্য যুগল-লীলা আস্বাদন করাই ছিল বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণের সাধ্যসার। বাঙলার সকল বৈষ্ণব কবিই বিধিপূর্বক দীক্ষিত বৈষ্ণব না হইলেও

এই বৈষ্ণব ধর্মাদর্শের দ্বারা বাঙলা দেশের বৈষ্ণব কাব্যাদর্শ সাধারণভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। এই কারণেই উপরে মীরাবাঈ-এর যে জাতীয় কবিতা দেখিলাম এইজাতীয় কবিতা আমরা বাঙলায় দেখিতে পাই না। মীরাবাঈয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এইজাতীয় কবিতাতেই তাহারবৈশিষ্ট্য। মীরার একটি পদে দেখি—

সখী মোরী নীঁদ নসানী হো।
পিয়া কো পংথ নিহারতে, সব রৈন বিহানী হো॥
সখিয়ন মিলকে সীখ দই, মন এক ন মানী হো।
বিন দেখে কল ন পড়ে, জিয় ঐসী ঠানী হো॥
অংগন ছীন ব্যাকুল ভঈ, মুখ পিয় পিয় বানী হো।
অন্তর বেদন বিরহকী বহ, পীব ন জানী হো॥
জ্যোঁ চাতক ঘন কো রটৈ, মছরী জিমি পানী হো।
মীরা ব্যাকুল বিরহিনী, সুধ বুধ বিসরানী হো॥

"সখি, আমার ঘুম গেল নষ্ট হইয়া; প্রিয়ের পথ চাহিতে চাহিতে সব রাত্রি গেল প্রভাত হইয়া। সখীরা সকলে মিলিয়া (কত) দিল বুঝাইয়া, মন ত তাহার একটিও মানিতেছে না; তাহাকে দেখা বিনা সোয়াস্তি নাই, মন (জীবন) আছে এইভাবেই স্থির হইয়া। অঙ্গ সকল হইল ক্ষীণ এবং ব্যাকুল, মুখে শুধু 'পিয় পিয়' বাণী; অন্তরে বেদনা বিরহের, উহা তো জানে না কোনও দরদী। চাতক যেমন চায় মেঘকে, মাছ যেমন চায় জল—মীরাও হইয়াছে ব্যাকুল বিরহিণী—সে হারাইয়া ফেলিয়াছে সব বিচার বুদ্ধি।"

নিম্নে মীরাবাঈয়ের আর একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি; এই পদটিও রাধার মুখে চমৎকার শোভা পাইত।—

মৈঁ হরি বিনু কৈসে জিউঁ রী মায়।
পিয় কারণ জগ বৈরী ভঈ, জস কাঠই ঘুন খায়॥
ঔষধ মূল ন সংচরৈ, মোহি লাগো বৌরায়।
* * * *
পিয় ঢুঁঢন বন বন গঈ, কহুঁ মুরলী ধুন পায়।
মীরা কে প্রভু লাল গিরিধর, মিলি গায়ে সুখদায়॥

"আমি হরি বিনে কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিব, ওগো মা। প্রিয়ের জন্য জগৎ হইল বৈরী, যেমন কাঠ খায় ঘুণে। ঔষধে (এখন আর) মূল সঞ্চার হয় না (কোনও কাজ করে না), আমাতে লাগিল পাগলামি।......প্রিয়কে খুঁজিতে বনে

বনে গেলাম, কোথা হইতে শুনিতে পাই মুরলী-ধ্বনি। মীরার প্রভু গিরিধরলাল সেই সুখদায়ী মিলিয়া গেল।"

মীরাবাঈয়ের এইজাতীয় কবিতার সহিত বাঙলাদেশের বৈষ্ণব-কবিতার মিল নাই, এ-কথার উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। বৈষ্ণব কবিতার এই ধরণটির সহিত দক্ষিণদেশীয় আলোয়ার সম্প্রদায়ের কবিতার ধরণের বেশ মিল পাওয়া যায়। এই আলোয়ার সম্প্রদায়ের ভক্তগণ নিজেদের নায়িকা ভাবে ভাবিত করিয়া বিষ্ণুকে নায়করূপে গ্রহণ করিয়া মধুররসাশ্রিত কবিতা রচনা করিয়াছেন। সেখানেও বিরহের আর্তি এবং মিলনের জন্য ব্যাকুল বাসনা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই আলোয়ারগণের ভিতরে নম্ম-আলোয়ারের কন্যা অণ্ডালের সহিত মীরা-বাঈয়ের জীবন ও প্রেমসাধনার আশ্চর্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। অণ্ডালও রঙ্গনাথকেই জীবনসর্বস্বরূপে গ্রহণ করিয়া রঙ্গনাথের মন্দিরেই বাস করিতেন; রঙ্গনাথকে প্রিয়রূপে লাভ করিয়া তিনিও আর বিবাহের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই অণ্ডাল গোপীভাবে রঙ্গনাথ সম্বন্ধে অনেক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে কবিতারচনাকারী কবিগণের মধ্যে 'অষ্ট-ছাপে'ব আটজন কবিই হইলেন প্রসিদ্ধ। এই 'অষ্টছাপ' কবিসম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করিতে পারি। প্রায় সমসাময়িককালে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে উড়িষ্যায়ও 'পঞ্চসখা' সম্প্রদায় বলিয়া একটি ভক্ত বৈষ্ণব কবি-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। অচ্যুতানন্দ দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস, চৈতন্য দাস প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের কবি ছিলেন। ইঁহারা চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবেই প্রভাবান্বিত হইলেও রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা লইয়া ইঁহারা কাব্য কবিতা রচনা করেন নাই, ইঁহাদের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ হইলেন 'শূন্যমূর্তি' 'শূন্যপুরুষ', ইঁহাদের সাধন-পদ্ধতিতে দেখিতে পাই নাথ-সম্প্রদায়ের সাধনার অনুরূপ কায়া-সাধনের উপরে জোর।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের অধিকাংশ সময় উড়িষ্যার পুরী-ধামে কাটাইলেও চৈতন্য-সম্প্রদায় ব্যাখ্যাত রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে ওড়িয়া সাহিত্যের উপরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতকের কয়েকজন ওড়িয়া কবির কাব্যে আমরা রাধাসহ কৃষ্ণলীলার প্রাধান্য দেখিতে পাই। ইহার ভিতরে অভিমন্যু সামন্তসিংহারের 'বিদগ্ধ-চিন্তামণি' কাব্যখানির আমরা উল্লেখ করিতে পারি। তিনি 'রাধিকাভক্ত'

বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভক্তকবি হইলেও তাঁহার সমগ্র কাব্যে যমক ও অনুপ্রাস অলঙ্কার প্রয়োগের নৈপুণ্যই বহুস্থানে ভক্তিরসের আবেগ হইতে বড় হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে তিনি বিশেষ কোনও প্রকারের যমক বা অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন, কোথাও বা প্রত্যেক চরণের আদিতে একটি বিশেষ বর্ণ লইয়া অনুপ্রাস দিয়াছেন। রাধিকাকে তিনি প্রথম হইতেই পূর্ণশক্তিরূপিণী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাল্যে রাধিকার বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'বিদ্যা কি স্বয়ংসিদ্ধ মহাবিদ্যা যে' (চতুর্থ-ছন্দ); অর্থাৎ যিনি নিজে মহাবিদ্যা-স্বরূপিণী তাঁহার আবার বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন কি? এই রাধাকে বলা হইয়াছে--

অবিচ্ছিন্নানন্দময়ী কিশোরী। অজ নিগু´ণ প্রেমপূর্ণকরী॥
অনুভূতি সানুভূতি উল্লাস। অতি অগম্য নিগূঢ় বিশেষ॥ (পঞ্চম ছন্দ)

অভিমন্যু কবি রাধাকৃষ্ণলীলাবর্ণনা বাঙলাদেশের বৈষ্ণবগণের অনুরূপ ভাবেই করিয়াছেন। প্রথমেই দেখিতে পাই, রাধা ও কৃষ্ণ সখী ও সখামুখে পরস্পর পরস্পরের নাম শুনিয়াই পূর্বরাগদ্বারা পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। এই নাম শ্রবণ সম্বন্ধে বাঙলার চণ্ডীদাসের যেমন পদ পাই—

নাম পরসঙ্গে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

তেমনই 'বিদগ্ধ-চিন্তামণি'তেও দেখিতে পাই,—

যা নাম স্বাদু লোভে মানস রত। তা রূপ হোইসিব সুধারস ত যে।
(নবম ছন্দ)

নামশ্রবণেই পাগল হইবার পরে শ্রীমতী রাধার পটে কৃষ্ণমূর্তি দর্শন। তাহার পরে রাধার ভাবদশা। এইভাবেই শ্রীরাধার উত্তরোত্তর প্রেম-গভীরতা বর্ণিত হইয়াছে। রাধা-অবলম্বনে ওড়িয়া বৈষ্ণব সাহিত্য প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতকের ভূপতি-পণ্ডিতের 'প্রেম-পঞ্চামৃত' এবং দেবদুর্লভদাসের 'রহস্য-মঞ্জরী'রও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক আর একজন পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আচার্য ছিলেন আসামের শঙ্করদেব। শঙ্করদেবের সহিত চৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইবার কিংবদন্তী আছে, যদিও তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার মতন কোনও ঐতিহাসিক তথ্য নাই। এই শঙ্করদেব শুধু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য এবং প্রচারকই ছিলেন না, তিনি আসামের প্রাচীন সাহিত্যের সর্বপ্রধান কবি বলিয়াও খ্যাত। ইঁহার প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ হইল ভাগবতের অনুবাদ। মূলতঃ ভাগবতকে অবলম্বন

করিয়া এবং নামকীর্তনের উপরে জোর দিয়া শঙ্করদেব যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিলেন এবং বৈষ্ণব সাহিত্য রচনা করিলেন তাহার ভিতরে আমরা রাধার কোনও বিশিষ্ট স্থান দেখিতে পাই না। মারাঠা দেশেও বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছিল। নামদেব, তুকারাম প্রভৃতির রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসিদ্ধি সমস্ত ভারতবর্ষেই রহিয়াছে। মারাঠী বৈষ্ণব সাহিত্যেও রাধার উল্লেখ কদাচিৎ পাওয়া যায়। যেখানে 'রাহী'রূপে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানেও কৃষ্ণ-প্রেয়সীরূপ রাধার বিশেষ কোনও মর্যাদা দেখা যায় না। মারাঠা দেশের কৃষ্ণ (বিঠোবা বা বিট্‌ঠল = বিষ্ণু?) বহুদিন পর্যন্ত কোন শক্তি বা স্ত্রী ব্যতীতই মারাঠা দেশে পূজিত; যখন শক্তি বা স্ত্রীর প্রবর্তন দেখি তখন হইতে রুক্মিণীই মুখ্য কৃষ্ণ-প্রেয়সী বলিয়া গৃহীতা। বাঙলা-সাহিত্যে এবং হিন্দী-সাহিত্যে কৃষ্ণের যেমন রাধা-বল্লভ, রাধা-নাথ, রাধা-রমণ প্রভৃতি নামে পরিচয়, মারাঠী-সাহিত্যে তেমনই কৃষ্ণের পরিচয় রুক্মিণী-পতি বা রুক্মিণী-বর বলিয়া।[১] সাহিত্যে এই রুক্মিণীই 'রখমাঈ' বা 'রখমাবাঈ' রূপে পরিচিত। কৃষ্ণলীলা সকলই এই স্বকীয়া নারী 'রখমাঈ' বা রখমাবাঈর সহিত বলিয়া মারাঠী সাহিত্যে কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কোনও পরকীয়া প্রেমলীলার সমৃদ্ধি নাই, সকল প্রেমলীলাই পতি-পত্নী সম্বন্ধের লৌকিক বিশুদ্ধি বহন করে। কিন্তু হিন্দী অষ্টছাপ কবিগণের উপরে রাধা-কৃষ্ণেব প্রেমলীলার গভীর প্রভাব পড়িয়াছে। এই অষ্টছাপের আটজন কবি ছিলেন, সুরদাস, কুম্ভনদাস, পরমানন্দ দাস, কৃষ্ণদাস, গোবিন্দ স্বামী, নন্দদাস, ছীতস্বামী ও চতুর্ভুজ দাস। এই সকল কবিই বল্লভাচার্যের 'পুষ্টিমার্গ' সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। এই 'পুষ্টি'-সম্প্রদায়ের ভক্তগণের বিশ্বাস ছিল যে বল্লভাচার্য এবং তৎপুত্র বিট্‌ঠল নাথ শ্রীকৃষ্ণের অবতাব ছিলেন এবং অষ্টছাপের আটজন কবি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখাসখীর অবতার। আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভিতরেও এই বিশ্বাস দেখিতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীচৈতন্যের রাধা-আদি অষ্ট-গোপীর অবতার ছিলেন গদাধরাদি পার্ষদগণ। বল্লভ-সম্প্রদায় মতে এই অষ্ট-ছাপের অষ্ট কবির দিনে হইল সখা-ভাব এবং রাত্রে হইল সখী-ভাব। কুম্ভনদাস হইলেন দিনে অর্জুন সখা, রাত্রে বিশাখা সখী; সুরদাস কৃষ্ণ সখা এবং চম্পকলতা সখী; পরমানন্দদাস স্তোক সখা, চন্দ্রভাগা সখী; কৃষ্ণদাস ঋষভ সখা ও ললিতা সখী; গোবিন্দস্বামী শ্রীদাম সখা ও ভামা সখী; নন্দদাস ভোজ সখা ও চন্দ্ররেখা সখী; ছীতস্বামী সুবল সখা ও পদ্মা সখী; চতুর্ভুজদাস বিশাল সখা ও বিমলা সখী।

১ ভাণ্ডারকরের Vaisnavism, Saivism ইত্যাদি বইখানি দ্রষ্টব্য।

পুষ্টিমার্গের প্রবর্তক শ্রীবল্লভাচার্য গোপালকৃষ্ণের উপাসনাকে তাঁহার ধর্ম-সাধনায় গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বালরূপের উপরেই জোর দিয়াছেন; এইজন্ম তাঁহার আলোচনার কোথায়ও আমরা রাধা সম্বন্ধে কোনও আলোচনা বা উল্লেখ পাই না। এই সম্প্রদায়ের উপাসনার ভিতরে এই রাধাবাদকে বল্লভাচার্যের পুত্র আচার্য বিট্‌ঠলনাথই প্রবর্তিত করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। 'স্বামিন্যষ্টক' এবং 'স্বামিনী-স্তোত্র' নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ বিট্‌ঠলনাথ কর্তৃক লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; এই দুই গ্রন্থে আমরা রাধা সম্বন্ধীয় স্তোত্র পাইতেছি। বিট্‌ঠলনাথ কোনও বিশেষ ভক্তি-সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়া রাধাবাদকে নিজেদের ধর্মমতে গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে; তবে তাঁহার সময়েই যে এই রাধাবাদের প্রচলন পুষ্টিমার্গের ভিতরে ঘটিয়াছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বল্লভ-সম্প্রদায়ের ধর্মমতে তথা সাহিত্যে রাধাবাদের প্রচলনের ভিতরে চৈতন্ত মহাপ্রভু এবং তাঁহার ভক্ত বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিগণের যথেষ্ট প্রভাব থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে। স্বয়ং বল্লভাচার্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক, বৃন্দাবনে এতদুভয়ের সাক্ষাৎ হওয়া এবং ভাবের আদান-প্রদান হওয়ার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি 'নিজবার্তা', 'বল্লভদিগ্বিজয়' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই জানা যায়। এই সকল গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে বল্লভাচার্যের চৈতন্তদেবের প্রতি এবং তাঁহাব অনুগামী বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমভাব ছিল। একই লোক চৈতন্ত-সম্প্রদায় এবং বল্লভ-সম্প্রদায় এই উভয় সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত ছিলেন বলিয়াও প্রসিদ্ধি রহিয়াছে।[১]

এই সকল তথ্য আলোচনা করিলে মনে হয়, বল্লভাচার্য নিজে বালকৃষ্ণের উপাসনার কথাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং এই কারণে আমরা অষ্টছাপ হিন্দী সাহিত্যে বাৎসল্য রসের এমন সমৃদ্ধি দেখিতে পাই। কিন্তু খানিকটা পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জয়দেব-বিদ্যাপতির কাব্য প্রভাবে এবং কিছুটা চৈতন্ত-সম্প্রদায়ের প্রভাবে হিন্দী অষ্টছাপ সাহিত্যে যুগললীলা এবং তৎসহ শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এস্থলেও একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। অষ্টছাপের পূর্ববর্তী কবি জয়দেব-বিদ্যাপতির রাধা পরকীয়া, এবং তাঁহাদের সাহিত্যে আমরা

১ দ্রষ্টব্য—অষ্টছাপ ঔর বল্লভ-সম্প্রদায় (হিন্দী)—শ্রীদীনদয়াল গুপ্ত প্রণীত। ২য় খণ্ড, ৫২৭-২৮ পৃষ্ঠা।

সর্বত্রই পরকীয়া প্রেমলীলার বর্ণনা দেখিতে পাই। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মত ঠিক স্বকীয়াবাদ কি পরকীয়াবাদ ছিল ইহা লইয়া বিতর্ক থাকিলেও চৈতন্যযুগের বাঙলা বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই পরকীয়া লীলার অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু বল্লভ-সম্প্রদায়ের ভিতরে কোথাও আমরা পরকীয়াবাদের প্রতিষ্ঠা দেখি না, রাধা এখানে সর্বত্রই স্বকীয়া।

বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতা ও হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতা পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলে উভয়ের ভিতরে কতকগুলি পার্থক্য অতি সহজেই চোখে পড়ে। প্রথমতঃ আদি হইতেই মধুর রসকেই শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া বাঙলা দেশে গৃহীত হইয়াছে; ফলে শান্ত, দাস্য ও বাৎসল্যের পদ বাঙলায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম। হিন্দী কবিতায় শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াও শান্ত ও দাস্য রসাশ্রিত সাধারণ ভক্তি ও প্রপত্তিমূলক কবিতা প্রচুর পাওয়া যায়; কিন্তু বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতায় এ-জাতীয় পদ খুব কম। বাঙলায় সাধারণভক্তিমূলক, আত্মসমর্পণ- ও প্রপত্তি-মূলক যত কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা কৃষ্ণকে লইয়া খুব কম, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে লইয়াই বেশী। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক এইরূপ পদের সংখ্যা অবশ্য কম নয়। মধুর রসের ভিতরে আমাদের বাঙলা-সাহিত্যে যুগল-লীলার প্রাধান্য হেতু কান্তাপ্রেমের পদই হইল সর্বাপেক্ষা বেশী। এই কান্তাপ্রেমের পদ আবার গোপীগণকে লইয়া নয়, কৃষ্ণ যেরূপ 'কান্তশিরোমণি' রাধিকা আবার সেইরূপ 'কান্তাশিরোমণি' হওয়াতে এই কান্তাপ্রেমের পদ প্রায় সবই হইল রাধিকাকে লইয়া। বাঙলার বাৎসল্য রসের ভাল ভাল পদ কিছু কিছু থাকিলেও হিন্দী বাৎসল্য রসের পদের তুলনায় তাহা অনেক কম। বাৎসল্য রসের পদেই হিন্দীর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি সুরদাসের বৈশিষ্ট্য। হিন্দীতে আবার কান্তাপ্রেমের পদ রাধাকে লইয়া বেশী নয়, বেশীই হইল গোপীগণকে লইয়া। সুরদাসের এই-জাতীয় পদগুলির ভিতরে প্রসিদ্ধতম পদ হইল 'উদ্ধব-সংবাদে'র পদ। উদ্ধব-সংবাদের পদগুলিতে কিন্তু রাধাই একমাত্র কৃষ্ণপ্রেয়সী রূপে দেখা দেয় নাই, বিরহিণী গোপীগণেরই হৃদয়বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে—রাধা সেই গোপীগণের ভিতরে স্থানে স্থানে প্রধানারূপে দেখা দিয়াছে। বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতায় বৃন্দাবনের গোপীগণ অনেক স্থানেই রাধার পরিমণ্ডলে প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, অষ্টসখী রাধারই কায়াব্যূহ রূপ, ষোল সহস্র গোপিনী প্রেমময়ী রাধারই বিচিত্র প্রসার; হিন্দী বৈষ্ণব কবিতায় গোপীগণেরও যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে।

বাঙলা ও হিন্দী বৈষ্ণব কবিতার এই পার্থক্যের মূল কারণ আমরা পূর্বেই

উল্লেখ করিয়াছি, ইহা হইল বাঙলা দেশে জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সাহিত্যে ও ধর্মে রাধাকৃষ্ণের যুগল-লীলার প্রাধান্য। বল্লভাচার্য বালকৃষ্ণের উপাসনার উপর জোর দিয়াছেন বলিয়াই বোধহয় সুরদাস প্রভৃতি কবিগণের রচিত কৃষ্ণের বাল্যলীলা-বিষয়ক পদগুলি এমন চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় হিন্দী কবিগণের শ্রীমদ্‌ভাগবতকে অনুসরণ। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া বাঙলাদেশের কবিগণ লীলা-রচনায় তাঁহাদের নিত্য নবনবোন্মেষ-শালিনী কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণের বর্ণনায় লীলাবৈচিত্র্য অনেক কম, ভাগবতকে কেন্দ্রে রাখিয়াই কবি-প্রতিভা আবর্তিত হইয়াছে। এইজন্য সুরদাসের কবিতা অনেক সময়ে ভাগবতেরই ভাষায় রূপান্তর বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। অন্যান্য হিন্দী কবিগণও সুরদাসের অনুসৃত পথকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রাপ্ত পালাবাঁধা কতগুলি কবিতা ব্যতীত ভাগবতের ঠিক এইজাতীয় অনুসরণ আমরা বাঙলায় খুব বেশী দেখিতে পাই না।

কোনও বিশেষ দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম-সিদ্ধান্তরূপে যুগল-লীলার উপাসনাকে অষ্টছাপের কবিগণ গ্রহণ না করিলেও ভক্তিধর্মের স্বতঃ-প্রবাহে এবং কবিধর্মের স্বতঃপ্রবাহে এই যুগল-লীলার স্মরণ, কীর্তন ও আস্বাদন অষ্টছাপের কবিগণের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনতত্ত্ব, গোপীতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা বাঙলা দেশের কবিগণের ভিতরে মোটামুটিভাবে যে ধারণা বা বিশ্বাস দেখিতে পাই হিন্দী অষ্টছাপ কবিগণের ভিতরেও তাহাই দেখিতে পাই। আমরা পূর্বে মীরাবাঈয়ের যে ধরণের কবিতা দেখিয়া আসিয়াছি সমজাতীয় কবিতা অষ্টছাপের কবিগণের রচনার ভিতরেও পাওয়া যায়; তাঁহারাও নিজেদের গোপীভাবে ভাবিত করিয়া 'প্রেমরসৈকসীম' কৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুলতা এবং তাঁহার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া পদ রচনা করিয়াছেন। এইজাতীয় পদের পাশাপাশিই আবার দেখিতে পাই, গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের মতন তাঁহারাও যুগল-লীলার জয়গান করিয়া সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে দূর হইতে সখী বা অন্যান্য পরিকরের ন্যায় নিত্য-যুগল-লীলার আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুরদাস নিত্য নব নব এই ব্রজবিহারে মুগ্ধ হইয়াছেন।—

রাধা-মাধব ভেঁট ভঈ।
রাধা মাধব, মাধব রাধা, কীট-ভৃঙ্গগতি হোই জো গঈ॥

মাধব রাধাকে রঁগ রাচে, রাধা মাধব-রংগ রঈ।
মাধব রাধা প্রীতি নিরংতর, রসনা কহি ন গঈ॥
বিহঁসি কহ্যো হম-তুম নহিঁ অন্তর, যহ কহি ব্রজ পঠঈ।
স্থরদাস প্রভু রাধা-মাধব, ব্রজ-বিহার নিত নঈ নঈ॥

রাধা-মাধবের মিলন হইল। (সেই মিলনের ফলে) রাধা হইয়া গেল মাধব, মাধব হইয়া গেল রাধা, কীট-ভৃঙ্গ গতির মত হইল তাহাদেব অবস্থা (অর্থাৎ ভৃঙ্গী যেমন পোকাকে ছুঁইয়া দিয়া তাহাকেও ভৃঙ্গী করিয়া লইয়া উভয়ে একরূপতা প্রাপ্ত হয় রাধা-মাধবও সেইরূপ দুই মিলিয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া গেল)। মাধব রাধার অনুরাগে রঞ্জিত হইল (প্রেমে মগ্ন হইল), রাধা রহিল মাধবের অনুরাগে (মগ্ন); মাধব ও রাধার এই প্রীতি হইল নিরন্তর, রসনায় ইহাকে বলা যায় না। হাসিয়া কহিল,—"আমি তুমি নই একটুও অন্তর (পৃথক্)", এই বলিয়া পাঠাইল ব্রজে। স্থরদাস বলে, (আমার) প্রভু রাধা-মাধব, (তাঁহাদের) ব্রজ-বিহার হইল নিত্য নব নব।

আবার— বসৌ মেবে নৈনন মেঁ যহ জোরী।
স্থন্দর শ্যাম কমলদল লোচন সংগ বৃষভানু কিশোরী॥

* * * *

স্থরদাস প্রভু তুম্হবে দরস কো কা বরনৌঁ মতি থোরী।

* * *

যুগল কিশোর চরণ রজ মাঁগোঁ, গাউঁ সবস ধমার।
শ্রীরাধা গিরিবরধর উপর স্থরদাস বলি হার॥

আমার দুই নয়নের মধ্যে বসিয়া আছে এই যুগল। স্থন্দর শ্যাম—কমলদল-লোচন—সঙ্গে বৃষভানু-নন্দিনী কিশোরী।······স্থরদাস বলে, প্রভু, তোমার এই দর্শনের কি করিব আমি বর্ণনা, আমি যে অতি অল্পমতি!

······যুগল কিশোরের চরণধূলি আমি মাগি, এই সরস হোলীর সঙ্গীতই গান করিব; শ্রীরাধা ও গিরিবরধারী (শ্রীকৃষ্ণের) বলিহারী যায় স্থরদাস।

স্থবদাস ব্যতীত অষ্টছাপের অন্যান্য কবিগণেরও এই যুগল-লীলা আস্বাদনের কিছু কিছু পদ রহিয়াছে। পরমানন্দ দাস বলিয়াছেন,—

গোপীনাথ রাধিকা বল্লভ তাহি উপাসত পরমানংদা।[১]

'রাধিকাবল্লভ গোপীনাথ—তাঁহাকে উপাসনা করে পরমানন্দ।'

---

১ দীনদয়াল গুপ্তের অষ্টছাপ ঔর বল্লভসম্প্রদায় গ্রন্থে উদ্ধৃত।

এই পরমানন্দ দাসের আর একটি চমৎকার পদে দেখি—

নন্দকুঁবর খেলত রাধা সংগ যমুনা পুলিন সরস রংগ হোরী।
নব ঘনশ্যাম মনোহর রাজত শ্যামা সুভগ তন দামিনী গৌরী।

* * * *

থকে দেব কিন্নর মুনিগণ সঁব মন্মথ নিজ মন গয়ো লজ্যোরী।
পরমানন্দ দাস যা সুখ কোঁ যাচত বিমল মুক্তি পদ ছোরী ॥[১]

"নন্দকুমার খেলে রাধার সঙ্গে যমুনা-পুলিনে—সরস রঙ্গ হোরী; নব ঘনশ্যাম মনোহর শোভা পাইতেছে—রাধিকার সুভগ তনু যেন (নবীন মেঘে) গৌরবর্ণা দামিনী।......(এই লীলা দেখিবার জন্য—আস্বাদ করিবার জন্য) দেব, কিন্নর, মুনিগণ সব থকিয়া গেল, আর মন্মথ নিজের মনে গেল লজ্জা পাইয়া; পরমানন্দ দাস এই সুখকেই যাচে—বিমল মুক্তিপদ ছাড়িয়া।"

গোবিন্দস্বামী বলিয়াছেন—

নন্দলাল সঙ্গ নাচত নবলকিসোরী।

* * * *

গোবিন্দ প্রভু বনী নবনাগরী গিরধর রস জোরী ॥[২]

"নন্দলালের সঙ্গে নাচিতেছে নওলকিশোরী। গোবিন্দের প্রভু—নবনাগরী (রাধা) ও গিরিধর হইল রসের জোড়া।"

তাঁহার আর একটি পদে দেখি—

আবতি মাই রাধিকা প্যারী জ্যুবতী জুথ মেঁ বনী।
নিকসি সকল ব্রজরাজ ভবন তে সিংহদ্বার ঠাঢ়ে ললন কুঁবর গিরধারী ॥
নিরখি বদন ভেঁাহ মোরি তোরি ত্রন চোনি ওর চিতবনি।

১ অষ্টছাপ ঔর বল্লভ সম্প্রদায়। আরও তুলনীয় পরমানন্দ দাসের পদ:—

লটকি লাল রহে রাধা কে ভর।
সুংদর বীরী বনায় সুংদরি হঁসি হঁসি জায়, দেত মোহন কর ॥
গোপী সনমুখ চিতবতি ঠাঢ়ী তিন সোঁ কেলি করত সুংদর বর।
জ্যোঁ চকোর চংদা তন চিতবত ত্যোঁ আলী নিরখত গিরিবর ধর ॥ ইত্যাদি ঐ

আবার— আজ বনী দম্পতি বর জোরী।
সাঁবর গৌর বরণ রূপনিধি নন্দকিসোর বৃষভানু কিসোরী ॥ ইত্যাদি, ঐ।

২ ঐ।

তিনি ছিন অঁচরা সঁভারি ঘুংঘট কী ওট হৈব লিয়ো হৈ লাল মনুহারী॥
গোবিংদ প্রভু দম্পতি রংগ মূরতি দৃষ্টি সোঁ ভরত অঙ্কবারী।[১]

আসিতেছে প্রেমময়ী রাধিকা—যুবতি-যূথের মধ্যে সাজিয়া; ব্রজরাজ-ভবন হইতে বাহির হইয়া সিংহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রিয় কুমার গিরিধারী, (কৃষ্ণের) বদনের ভ্রূভঙ্গিমা দেখিয়া তৃণ কাটিল, কৃষ্ণের প্রতি তাহার দৃষ্টি হইল তীক্ষ্ণ। সেইক্ষণে নিজের আঁচল সামলাইয়া ঘোমটার আড়াল করিয়া লইল, তাহাতেই নিল কৃষ্ণের মন হরণ করিয়া। গোবিন্দ বলে প্রভুর এই যুগল প্রেমমূর্তি, তাহা দৃষ্টি ভরিয়া (দেখিয়া) বুক ভরে।

ছীতস্বামীও যে কৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন তাঁহার বর্ণনায় দেখি—

রাধিকা রমণ গিরিবরধরণ, গোপীনাথ মদনমোহন কৃষ্ণ নটবর বিহারী॥[২]

যুগল-মিলন আস্বাদনের পদে তিনি বলিয়াছেন—

রাধে রূপ নিধান গুণ আগরী নন্দ নন্দন রসিক সঙ্গ খেলী।
কুঞ্জকে সদন অতি চতুর বর নাগরী চতুর নাগরি সোঁ করতি কেলী॥[৩]

কৃষ্ণদাসের রাধার পদ রহিয়াছে—

নমো তরণি তনয়া পরম পুনীত জগপাবনী,
কৃষ্ণ মন ভাবনী রুচিরনামা।
অখিল সুখ দায়িনী সব সিদ্ধি হেতু
শ্রীরাধিকা রমণ রতি কারণ শ্যামা॥[৪]

যুগল-লীলার আস্বাদনে কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—

বাম ভাগ বৃষভানু নন্দিনী চঞ্চল নয়ন বিশাল।
কৃষ্ণদাস দম্পতি ছবি নিরখত অঁখিয়া ভঙ্গী নিহাল॥

রাধা-কৃষ্ণের মিলনে যে শ্যামলতমালবেষ্টিত কনকলতার উপমা আমরা বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণের ভিতরে প্রায়ই পাইয়া থাকি হিন্দী কবিগণের ভিতরেও তাহা পাওয়া যায়। নন্দদাস বলিয়াছেন—

নন্দদাস প্রভু মিলি শ্যাম তমাল ঢিংগ কনকলতা উলহয়ে।

বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণের ঠিক অনুরূপ ভাবেই কুম্ভনদাসের পদে দেখিতে পাই—

১ ঐ। ২ ঐ।
৩ ঐ। ৪ ঐ।

নৌতন স্যাম নন্দনন্দন বৃষভানু সুতা নব গৌরী।
মনহুঁ পরস্পর বদন চন্দ কো পিবত চকোর চকোরী ॥[১]

পরমানন্দ দাস আবার বলিয়াছেন,—ঝুলনে ঝুলিতেছে কিশোর-কিশোরী, একজন শ্যামসুন্দর নওল-কিশোর, আর একজন গৌরী; নীলাম্বর এবং পীতাম্বর মিলিয়া উড়িতেছে—যেন মেঘের বুকে দামিনী—

ঝুলত নবল কিশোর কিশোরী।
উত ব্রজভূষণ কুঁবর রসিকবর ইত বৃষভান নংদিনী গোরী ॥
নীলাংবর পীতাংবর ফরকত, উপমা ঘনদামিনী ছবি থোরী।

অষ্টছাপের কবিগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রায় সকলেই অন্তিমে এই যুগলমূর্তির ধ্যান করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ও সাহিত্যে যেরূপ সখীভাবের যুগল-উপাসনার কথা দেখিতে পাই, অষ্টছাপের কবিগণের ভিতরে সেই সখীভাবেরই চমৎকার পদ আমরা উপরি-উদ্ধৃত পদগুলির ভিতরে দেখিতে পাইলাম। সুরদাস ত এই লীলাধাম বৃন্দাবনে তৃণলতা, পশুপাখী, এমনকি ব্রজরেণু—যে-কোনও রূপ ধারণ করিয়া এই লীলা আস্বাদনের অধিকার প্রার্থনা করিয়াছেন।—

করহু মোহি ব্রজ রেণু দেহু বৃন্দাবন বাসা।
মাঁগোঁ যহৈ প্রসাদ ঔর নহিঁ মেরে আসা ॥
জোঈ ভাবৈ সো করহু লতা সলিল দ্রুম গেহু।
গ্বাল গাই কো ভৃত্য করৈ মনৌ সত্য ব্রত এহু ॥[২]

"কর আমাকে ব্রজের রেণু, দেহ বৃন্দাবনে বাস,—এই চাহি তোমার প্রসাদ—আর নাই আমার কোনও আশা। যাহা ভাব তাহাই কর—লতাদ্রুম—গৃহ,—গাভীর ভৃত্য গোয়ালা কর, ইহাকেই মানি সত্য ব্রত।"

১ তুলনীয় পরমানন্দ দাসের রাধা সম্বন্ধে একটি পদ :—

অমৃত নিচোয় কীয়ো এক ঠৌর।
তেরো বদন সমারি সুধানিধি তাদিন বিধিনা রচী ন ঔর ॥
সুনি রাধে কহা উপমা দিজে স্যাম মনোহর ভয়ে চকোর।
সাদর পীবত মুদিত তহি দেখত, তপত কাম.উর নংদকিসোর ॥

২ দীনদয়াল গুপ্তের সংগ্রহ।

যুগল-মিলনের পাশে থাকিয়া সুরদাস বলিয়াছেন—

সঁগ রাজতি বৃষভানু কুমারী।
কুংজ সদন কুসুমনি সেজ্যা পর দম্পতি শোভা ভারী॥
আলস ভরে মগন রস দোউ অংগ অংগ প্রতি জোহত।
মনহুঁ গৌর শ্যাম কৈ রব শশি উত্তম বৈঠে সম্মুখ মোহত॥
কুংজ ভবন রাধা মনমোহন চহুঁ পাশ ব্রজনারী।
সুর রহি লোচন ইকটক করি ডারতি তন মন বারী॥

"সঙ্গে শোভা পাইতেছে বৃষভানুর কুমারী। কুঞ্জ গৃহে কুসুমের শয্যা—তাহার উপরে দম্পতির ভারী শোভা। আলস ভরে রসে মগ্ন দুইজনই, প্রতি অঙ্গ খুঁজিতেছে প্রতি অঙ্গ;[১] মনে হয় গৌর-শ্যাম—অথবা রবি-শশী উত্তমরূপে বসিয়া সম্মুখে শোভা পাইতেছে। কুঞ্জ ভবনে রাধা-মনোমোহন—চারি পাশে রহিল ব্রজনারী; সুর রহে লোচন এক করিয়া—তনুমন ডারিয়া দেয় অর্ঘ্যরূপে।"

বাঙালী বৈষ্ণব কবিগণ রাধিকার অসীম সৌভাগ্যের জয়গান করিয়াছেন; কারণ ত্রিভুবনের আরাধ্য যে হরি, তিনিও এই রাধার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহার অধীন হইয়া আছেন। পরমানন্দ দাসও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন—

রাধে তু বড় ভাগিনী কৌন তপস্যা কীন।
তীন লোককে নাথ হরি সো তেরে অধীন॥[২]

পূর্বরাগের রাধার বর্ণনা করিতে গিয়া বাঙালী কবিরা যেমন বলিয়াছেন, যমুনায় জল আনিতে গিয়া রাধা মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণরূপ দেখিয়াই ঘরের কথা ভুলিয়া গেল, সুরদাসের পদেও তেমনই দেখি,—

আবত হী যমুনা ভরে পানী।
শ্যাম বরণ কাহু কো ঢোঁটা নিরখি বদন ঘর গঈ ভুলানী॥
উন মো তন মৈঁ উন তন চিতয়ো তবহী তে উন হাথ বিকানী।
উর ধকধকী টকটকী লাগী তনু ব্যাকুল মুখ ফুরত ন বানী॥

"যমুনায় আসিয়াছিলাম জল ভরিতে। শ্যামবর্ণ কাহার ছেলে, মুখখানি দেখিয়া ঘর গেলাম ভুলিয়া। সে আমার সর্ব তনুতে, সমস্ত তনু ভাবাইয়া তুলিল—সেই হইতে তাহার হাতে গেলাম বিকাইয়া; আমার বুক ধকধকী—আঁখি স্থির—তনু ব্যাকুল—মুখে স্ফুরে না বাণী!"

১ তুঃ—প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥ —জ্ঞানদাসের পদ।

২ দীনদয়াল গুপ্তের সংগ্রহ।

আবার—

সুন্দর বোলত আবত বৈন।
না জানৌঁ তেহি সময় সখীরী সব তন শ্রবন কি নৈঁন॥
রোম রোম মেঁ শব্দ সুরতি কী নখ শিখ জ্যোঁ চখঐন।
যেতে মান বনী চংচলতা সুনী ন সমুঝী সৈন॥
তবতকি জকি হ্বৈ রহী চিত্র সী পল ন লগত চিত চৈন।
সুনহু স্থর যহ সাঁচ, কী সংভ্রম সপন কিধৌঁ দিন রৈন॥

"সুন্দর বচন বলিয়া সে আসে; না জানি, সেই সময় সখি, সব তনু শ্রবণ হইয়া যায় কি নয়ন হইয়া যায়। আমার প্রতি রোমে রোমে স্মরণের শব্দ, আমার নখ হইতে শিখা পর্যন্ত সব তনু করে তাহার আস্বাদন। যত হয় মান, যত হয় চঞ্চলতা তাহাতে—শুনিয়াও বুঝি না তাহার কোনও সঙ্কেতই। তখন হইতে চিত্রের মতন রহিলাম স্তম্ভিত হইয়া, এক পলেও চিত্তে আসে না শান্তি; শোন স্থর, ইহা সত্য,—কি ভ্রম, না স্বপ্ন? সে কি দিন কিংবা রজনী!"

কৃষ্ণদাসের একটি চমৎকার পদে দেখি—

গ্বালিন কৃষ্ণ দরস সোঁ অটকী।
বার বার পনঘট পর আবত সির যমুনা জলে মটকী॥
মন মোহন কো রূপ সুধানিধি পীবত প্রেমরস গটকী।
কৃষ্ণদাস ধন্য ধন্য রাধিকা লোক লাজ সব পটকী॥[১]

"গোয়ালিনী আটকা পড়িয়াছে কৃষ্ণের দর্শনে। বার বার মাথায় জলের ঘট লইয়া হেলিতে দুলিতে আসে যমুনার জলে। মনোমোহনের রূপসুধানিধি পান করে—প্রাণ ভরিয়া পান করে প্রেমরস; কৃষ্ণদাস (কহে) ধন্য ধন্য, রাধিকা লোক-লাজ সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে।"

কৃষ্ণের নাম শুনিয়াই পাগল হইয়াছিল রাধা। এই নামশ্রবণে পূর্বরাগ সঞ্জাত হইবার ভাব অবলম্বনে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ হইল চণ্ডীদাসের, 'সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম'। এই পদের সহিত আমরা নন্দদাসের একটি পদ একসঙ্গে বেশ মিলাইয়া পড়িতে পারি—

কৃষ্ণ নাম জব তৈ সুন্যো রী আলী,
ভুলী রী ভবন হৌঁ তৈ বাবরী ভঈ রী।

১ দীনদয়াল গুপ্তের সংগ্রহ।

ভরি ভরি আবৈঁ নৈঁন চিত হুঁ ন পরৈ চৈন,
তন কী দসা কছু ঔরে ভঈ রী ॥
জেতিক নেম ধর্ম ব্রত কীনে রী, মৈঁ বহুবিধি,
অংগ অংগ ভঈ মৈঁ তো শ্রবনমঈ রী।
নংদদাস জাকে শ্রবন সুনে ঐসি গতি,
মাধুরী মূরতি কৈধোঁ কৈসী দই রী ॥

"যখন হইতে শুনিয়াছি রে সখি, সেই কৃষ্ণ নাম, ঘর ভুলিয়া আমি তখন হইতে হইয়াছি পাগল। নয়ন ভরিয়া ভরিয়া আসে, চিত্তে আসে না শান্তি, দেহের দশা কেমন যেন অন্য রকম হইয়া গেল। যত না করিয়াছিলাম আমি বহুবিধ নিয়ম ধর্ম ব্রত—(কিন্তু আজ ত সব গিয়া) অংগে অংগে হইলাম আমি শ্রবণময়ী! নন্দদাস বলে, যাহাকে শ্রবণে শুনিয়া হইল এমনই গতি, তাহার মাধুরী-মুরতি—না জানি সে কি অদৃষ্ট!"

অবশ্য এইজাতীয় কবিতার ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে, বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণ এইসকল ক্ষেত্রেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামের রাধা-কৃষ্ণের পূর্বরাগাখ্য প্রেমকেই দূর হইতে পরিকর রূপে আস্বাদন করিযাছেন; কিন্তু হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণ এসকল ক্ষেত্রে শুধু রাধা-কৃষ্ণের বা গোপী-কৃষ্ণের পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন-বিরহকেই আস্বাদন করেন নাই, নিজেরাই রাধাভাবে বা গোপীভাবে পরিভাবিত হইয়া এইজাতীয় কৃষ্ণপ্রেম আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। পরমানন্দ দাসের এইজাতীয় একটি বিরহের পদে দেখি—

যা হরি কো সংদেস ন আয়ো।
বরস মাস দিন বীতন লাগে বিনু দরসনু দুখ পায়ো ॥
ঘন গরজ্যো পাবস ঋতু প্রগটী চাতুক পীউ সুনাযো।
মত্ত মোর বন বোলন লাগে বিরহিন বিরহ জনায়ো ॥
রাগ মল্হার সহয়ো নহি জাঈ কাহু পথিকহি গায়ো।
পরমানন্দ দাস কহা কীজে কৃষ্ণ মধুপুরী ছায়ো ॥[১]

"হরির ত আসিল না কোন সংবাদ। (এই ভাবেই) বরষ, মাস, দিন ব্যতীত হইতে লাগিল, দরশন বিনা পাইলাম দুঃখ। মেঘ করিতেছে গর্জন, বর্ষাকাল প্রকটিত হইল, চাতক শুনাইতেছে পিউ পিউ রব; মত্ত ময়ূরের রবে বন

১ দীনদয়াল গুপ্তের সংগ্রহ।

আরম্ভ করিল কথা বলিতে—বিরহিণীর বিরহ দিল সব জানাইয়া। রাগ মল্লার ত পারি না সহিতে—কেন পথিক গায় সেই গান; পরমানন্দদাস কহিতেছে, কৃষ্ণ (বিরহের কালোছায়া) মধুপুরী ছাইয়া ফেলিল।"

উপরে আলোচিত হিন্দী অষ্টছাপের আটজন কবি ব্যতীত ইহাদের সম-সাময়িক আর একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন স্বামী হরিদাস। স্বামী হরিদাস প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় হরিদাসী-সম্প্রদায় বা সখী-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেন এই সাধক হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। ইঁহাদের নিজস্ব বিশেষ কোনও দার্শনিক মতবাদ ছিল না, ছিল শুধু বিশেষ সাধন-পদ্ধতি। এই সাধন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল সখী-ভাব। আমরা উপরে অষ্টছাপ কবিগণের সখী-ভাবের পদ লইয়া আলোচনা করিয়াছি। স্বামী হরিদাস কেবল মাত্র সখী-ভাবের সাধনাকেই সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাভাদাস জী তাঁহার ভক্তমাল গ্রন্থে এই স্বামী হরিদাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইঁহার প্রেমভক্তির নিয়ম ছিল কেবলমাত্র রাধা-কৃষ্ণের যুগল পূজা করা। রাধার সঙ্গে কুঞ্জবিহারী কৃষ্ণই ইহাদের উপাস্য। ইহারা সর্বদাই সখী-ভাবে রাধাকৃষ্ণের আনন্দ-বিহার অবলোকন এবং আস্বাদন করিতেন। এই স্বামী হরিদাসজী চৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছিলেন এইরূপ মত প্রচলিত আছে। এই মত গ্রহণ-যোগ্য কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে; কিন্তু এই প্রসিদ্ধি দৃষ্টে মনে হয়, স্বামী হরিদাসজী নিজে ঠিক চৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত লোক না হইলেও চৈতন্য-সম্প্রদায়ের সহিত এবং তাহার ভিতর দিয়া চৈতন্য-মতের সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন, এবং খুব সম্ভব তাঁহার এই অনন্যশরণ হইয়া নিয়মব্রতাদি সকল পরিহার করিয়া শুধুমাত্র সখী-ভাবে যুগল-লীলা আস্বাদনের সাধনায় চৈতন্য মতের গভীর প্রভাব ছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পরবর্তী কালের রাধা

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি, বিধিবদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে রাধা-তত্ত্ব তন্ত্রাদির শক্তি-তত্ত্ব এবং সাংখ্যের প্রকৃতি-তত্ত্ব হইতে যতই পৃথক্‌ হোক না কেন, বৈষ্ণব সহজিয়া-মতে রাধা-তত্ত্ব আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া জনপ্রিয় শক্তি-তত্ত্ব এবং প্রকৃতি-তত্ত্বের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আমাদের দৃষ্টি যদি গোস্বামিগণ-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি নিবদ্ধ না রাখিয়া বাঙলার সাধারণ জন-সমাজের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দেই তাহা হইলে দেখিতে পাইব, চৈতন্যোত্তর যুগেও তন্ত্রেব শক্তি, সাংখ্যের প্রকৃতি এবং বেদান্তের মায়ার সহিত অনেকখানি অভিন্নরূপেই রাধা জন-সমাজে গৃহীত হইতেছে। অনেক পরবর্তী কালের শাক্তগণের কবিতায় অনেক সময় দেখিতে পাই, তাঁহাদের শক্তির বর্ণনা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বৈষ্ণব কবিগণেব রাধা-বর্ণনার সহিত ভাবে ও ভাষায় আশ্চর্য-ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপে পৌনে দুইশত বৎসরের প্রাচীন কমলাকান্তের 'সাধক-রঞ্জন' কাব্যের উল্লেখ করিতে পারি। গ্রন্থখানিতে মূলা-ধারস্থিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির উর্ধ্বগতিতে শিবধামে গিয়া শিবের সহিত মিলিত হওয়াকে বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীবাধিকার সঙ্কেতকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য অভিসারের একান্ত অনুরূপ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন—

কদম্ব কুসুম জনু সতত শিহরে তনু
যদবধি নিরখিলাম তারে।
জদি পাসরিতে চাই আপনা পাসরে জাই
এনা ছল কহিব কাহাবে॥
সেই সে জীবন মোর রসিকের মনচোর
রমণী বসের শিরোমণি।
পরিহরি লোকলাজে রাখিব হৃদয় মাঝে
না ছাড়িব দিবস রজনী॥

হেন অনুমানি তারে বান্ধি হৃদি কারাগারে
নয়ান পহরী দিয়ে রাখি।
কামিনী করিয়ে চুরি হৃদয় পঞ্জরে পুরি
অনিমেখে হেন রূপ দেখি ॥[১]

গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রার দানলীলায় দেখি কবি শ্রীরাধিকার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—

প্রেমময়ী হ্লাদিনী গোবিন্দ-হৃদি-বাসিনী
তুমি গো আদি-কামিনী;
গোবিন্দ দাসে নিদান শেষে হ'য়ো শমন-শাসিনী ॥

এখানে যে দেবীকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করা হইতেছে বর্ণনার ভিতরে তাঁহার

১ সাধক-রঞ্জন, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত।—পৃষ্ঠা ১০

আরও তুলনীয়— গজপতি নিন্দিত গতি অবিলম্বে।
কুঞ্চিত কেশ নিবেশ নিতম্বে ॥
চারু চরণ গতি আভরণবৃন্দে।
নখরমুকুরকর হিমকর নিন্দে ॥
উরসি সরসীরুহ বামা।
করিকর শিখর নিতম্বিনী রামা ॥
মৃগপতি দূর শিখরমুখ চায়।
কটিতট ক্ষীণ সুচঞ্চল বায় ॥
নাভি গভীর নীরজবিহার।
ঈষৎ বিক০ কমলকুচ ভার ॥
বাহুলতা অলসে সখী অঙ্গে।
দোলিত দেহ সুনেহ তরঙ্গে ॥
সুমধুর হাস প্রকাশই বালা।
বালাতপরুচি নয়ন বিশালা ॥
সিন্দুরবর[ণ] দিনকর সম শোভা।
অম্বুজ বদন মদনমনোলোভা ॥
প্রদলিত অঞ্জন সিথি অতিদেশ।
আধ কলেবর বাহু বিশেষ ॥
চির দিন অন্তর সতী পতি পায়।
পরমোল্লাস লসিত বরকায় ॥

একটি মিশ্ররূপ বেশ স্পষ্ট। পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন শক্তি বিষয়ে গান লিখিয়াছেন—

তুমি অন্নপূর্ণা মা,
তুমি শ্মশানে শ্যামা,
কৈলাসেতে উমা তুমি বৈকুণ্ঠে রমা।
ধর বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণু রূপ
স্বজনে লয় পালনে।
তুমি পুরুষ কি নারী
তাত বুঝিতে নারি;
স্বয়ং না বুঝালে সে কি বুঝিতে পারি।
তাইত আধা রাধা আধা কৃষ্ণ
সাজিলে বৃন্দাবনে॥

আবার গোবিন্দ চৌধুরীর গানে দেখি :—

অজ্ঞানে ভুলাতে রে মন পাতে এমন ইন্দ্রজাল,
কভু কালী-রূপে তাবা কবে ধরে করবাল,
কখন বা সীতা হয়, মূলে কিন্তু কিছু নয়,
ব্রহ্মাদি দেবতা কিছুই বুঝিতে নারে।
আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুর্গারূপে এসেছে,
কাল দেখবে রাধা-রূপে শ্যামের বামে বসেছে।

রতন বেদি পর সুরতরুমূল।
মণিময় মন্দির তঁহি অনুকূল॥
সহচরী সঙ্গ প্রবেশই নারী।
কমলাকান্ত হেরি বলিহারি॥ —ঐ, ৩০৪ পৃঃ।

আবার—চঞ্চল চপলা জিনিয়ে প্রবলা অবলা মৃদু মধুহাসে।
সুমনি উন্মনি লইয়ে সঙ্গিনী ধাইল ব্রহ্মনিবাসে॥
উন্মত বেশা বিগলিত কেশা মণিময়.অভরণ সাজে।
তিমির বিনাশি বেগে ধায় রূপসী ঝুনুঝুনু নূপুর বাজে॥
জাতি কুল নাশিয়ে উপনীত আসিয়ে অমৃত সরোবর তীরে।
প্রেমভরে রমণী সিহরে পুলকে তনু মন্দ সমীরে॥ ইত্যাদি। ঐ ৩৪ পৃঃ

তাই বলি, এই কায়া কিছু নয় শুধু মায়া,
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো—লুকায় আবার ওঙ্কারে ॥

এইজাতীয় গানের বাঙলা সাহিত্যে অভাব নাই। এই গানগুলি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, এখানে শ্রীরাধা বাঙলা দেশের সর্বপ্রকারের 'দেবী'গণের সহিত কিরূপ সহজে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া আছেন। এই সহজ মিলনের কারণ হইল, বাঙলাদেশের জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের বা ধর্মসংস্কারের ভিতরেই এই সকল দেবী অতি সহজভাবে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া আছেন।

আধুনিককালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর আলোচনা দেখিতে পাই আমরা ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঠাকুরাণীর কথা'র ভিতরে। তাঁহার আলোচনা পূর্ববর্তী গোস্বামিগণের আলোচনার উপরে উপরে গ্রথিত হইলেও তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে কিছু কিছু মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তকেও স্থানে স্থানে তিনি বেশ মাধুর্যমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিও তাঁহার সকল আলোচনায় রাধাকে 'মূলা আদ্যা প্রকৃতি শক্তি' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আলোচনার প্রারম্ভেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য নির্দেশ করিতে গিয়া লেখক শ্রীরাধিকার অতি সুন্দর এবং তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনাগর্ভ পরিচয় দিয়াছেন। "রাই-কনকলতা-বেষ্টিত কৃষ্ণতমাল যত্র বিরাজমান, যত্র নিবিড়ান্ধকারের মত গোবিন্দ-নীলমণির দুর্লক্ষ্য দুর্লভ মূর্ত্তিকে লোক-লোচনের সুলভ করিবার জন্যই করুণাময়ী রাই-চন্দ্রবদনী উজ্জ্বল দীপরূপে শ্যামসুন্দরের নিত্য-সহচর।" এই যুগল তত্ত্বই নিত্য-সত্য; ব্রহ্মাবস্থায়ও রহিয়াছে এই যুগল। আমরা গোস্বামিগণের আলোচনায় দেখিয়া আসিয়াছি, ব্রহ্ম ভগবানেরই অংশমাত্র, ভগবানেরই 'তনুভা'; এখানে শক্তির বিকাশ ন্যূনতম, নাই বলিলেই হয়। বর্তমান লেখকের মতে এই ব্রহ্মতত্ত্ব গোবিন্দেরই সুষুপ্তাবস্থা; ইহা হইল লীলার সকল তরঙ্গায়িত ভাব সম্যক্ বর্জন পূর্বক বৃহদারণ্যকের—'প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরং'—সেই অবস্থা; "তখন পুরুষ জানে না যে সে পুরুষ, নারী জানে না যে সে নারী। এই যে অদ্বয় নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মানন্দ তাহাই তৈত্তিরীয় 'রসো বৈ সঃ'। ইহাই কুঞ্জমধ্যে রাধালিঙ্গিত সুষুপ্ত গোবিন্দ; ইহাই গৌরীপট্টে লিঙ্গমূর্ত্তি—প্রাচীন শিবমদ্বৈতম্।" রাধা হইল সেই নিত্যনারী, কৃষ্ণ সেই নিত্যপুরুষ; ইহার ভিতরে কে প্রধান কে অপ্রধান এই প্রশ্ন ওঠে না; বরঞ্চ সেবক ভক্তগণের

"লৌকিক ব্যাকরণ উল্টাইতে হইবে—পুংলিঙ্গ শব্দ ইন্দ্র ব্রাহ্মণাদিশব্দকে প্রধান করিয়া তদধীন স্ত্রী-প্রত্যয়সিদ্ধ ইন্দ্রাণী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি শব্দ পাইতে হইবে না ; সখীর মত রাধারাণীকে 'প্রাণেশ্বরী' ধার্য্য করিয়া তাহার পুংলিঙ্গে, তদধীন, তাহার কান্তকে 'প্রাণেশ্বর' সম্বোধন করিতে হইবে ; গোবিন্দ সখীজনের সাক্ষাৎ প্রাণেশ্বর নহে। প্রাণেশ্বরীর বল্লভ বলিয়াই প্রাণেশ্বর।"[১]

বেদান্ত শাস্ত্রের যে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ উহা ভ্রান্ত নহে, তবে উহা আসল "রসশাস্ত্রের একদেশ মাত্র, অল্প দেশ—রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জভবনে সুষুপ্তি।" কিন্তু এই সুষুপ্তিভঙ্গের পরে লীলাতরঙ্গিত "অপর দেশই অধিক দেশ, ও তাহা—সুষুপ্তিমুক্ত রাধাশ্যাম, প্রিয় সখীজন, মাতা যশোমতী, কামধেনুবৃন্দ, কল্পতরুগণ, বৃন্দারণ্যের কোকিল ও পুষ্পবাটিকা, যমুনার স্নিগ্ধ বারি, শারদ চন্দ্রের মেলা ও নানা নর্ম্ম পরিহাস লীলা।" যেখানে ব্রহ্মরূপ সেখানেও সুষুপ্ত "এক অদ্বয় রাধাগোবিন্দ ;

নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে শুতল কুসুমশেজে
দুহুঁ দোহা বান্ধি ভুজপাশে।"

আমরা পূর্বে জীবগোস্বামীকে অনুসরণ করিয়া ভগবৎ-শক্তি সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা করিয়া আসিয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি যে, শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির প্রকাশ দুই ভাবে, এক তাঁহার স্বরূপে, আর তাঁহার স্বরূপ-বিভবে। ভগবানের স্বরূপ-শক্তির ভিতরে স্বপ্রকাশতালক্ষণ বৃত্তিবিশেষ রহিয়াছে, তাহাই হইল বিশুদ্ধসত্ত্ব। ভগবানের এই বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতেই ধাম, পরিকর, লীলাপার্ষদ, সেবকাদি বৈভবের বিস্তার। আর ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমূহ ভগবানের তটস্থাশক্তি হইতে জাত। জড়-জগৎ তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে সৃষ্ট। কিন্তু বর্তমান লেখকের মতে সমগ্র ব্রজধাম—এমন কি ব্রজেতর ধামও মূলা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি একমাত্র রাধার পরিণাম ও বিবর্তন। "শ্রীরাধা, মহামায়া, যোগমায়া, যোগনিদ্রা, শ্রীললিতা, পৌর্ণমাসী, ভালবাসা যে নামেই লওয়া যাউক—গোবিন্দের স্বরূপশক্তি, প্রকৃতি, নারী, ভালবাসা-ঠাকুরাণী গোবিন্দের প্রীত্যর্থ আপনাকে গোবিন্দের আলিঙ্গন মধ্যে রক্ষা করিয়া এবং গোবিন্দকে নিজ প্রেমালিঙ্গনের ভিতর রাখিয়া উভয়ে সম্মিলিত হইয়া, উভয়ে আত্মহারা হইয়া, সুষুপ্ত সুখরূপ ব্রহ্ম হইয়া থাকে, এবং পরস্পর অল্পবিস্তর-বিরহিত হইয়া, সম্মুখে পৃথক্ দাঁড়াইয়া, পরস্পর স্পর্শন-

[১] তুলনীয় পূর্বালোচিত 'রাধাবল্লভী'-সম্প্রদায়ের মত।

যোগ্য হইয়া, বা গোষ্ঠাদি প্রদেশান্তরিত সুতরাং দর্শনের অগোচর হইয়া সমুৎকণ্ঠিত থাকেন। এবং নিজে সম্পূর্ণ অখণ্ডাকারে থাকিয়াও শ্রীরাধা—ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে চন্দ্রা, পদ্মা, যশোদা, নন্দগোপাদি, পশু-পক্ষি-যমুনাদি রূপে স্বয়ং বিস্তৃতা, পরিণতা হইয়া সুপ্তোত্থিত জাগ্রৎ ব্রজভূমি হয়েন। এবং গোবিন্দেরই সুখের জন্য মথুরা, দ্বারকা, বৈকুণ্ঠ, পৃথিবী, পাতালাদি দেশ ও দেশের জীব ও অন্যান্য সম্পত্তিরূপে স্বয়ং বিবর্তিত হইয়া স্বপ্নবৎ ব্রজেতর লোক হয়েন। শ্রীমতীর তিন মূর্ত্তি; স্বরূপ রাধামূর্ত্তি, পরিণাম ব্রজভূমি, ও বিবর্ত্ত ব্রজেতর লোকমূর্ত্তি।" এই মতে তাহা হইলে দেখিতেছি রাধা সৎ চিৎ ও আনন্দরূপী কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির তিন অংশের এক অংশ মাত্র নহে, রাধাই সমগ্রাংশ—এক এবং অদ্বিতীয়া। এই অখণ্ড-শক্তির পরিণামই হইল সমগ্র স্বজন-পার্ষদ-জীবজন্তু-পশুপক্ষী সহ ব্রজভূমি, আর যাহাকে বলা হয় জগৎকারণ বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তাহা হইল রাধার বিবর্ত মাত্র। ইহার ভিতরে আরও লক্ষ্য করিতে হইবে,—লৌকিক মৃৎ-পরিণতি মৃদ্‌ঘট এবং অলৌকিক রাধা-পরিণতি ব্রজের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে; সে পার্থক্য এই যে, "মাটী ঘটে শরাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে সমগ্র ক্ষুদ্রাংশগুলি একত্র না হইলে সমগ্র মাটী পাওয়া যায় না; কিন্তু 'সমর্থা' রাধারাণী আপনি অখণ্ডাকারেও দণ্ডায়মান বটে, অথচ খণ্ডাকার ব্রজ—গোপ-গোপী প্রভৃতি বস্তুতেই, ঘটে মাটীর মত, বর্ত্তমানা। রাধা মূলরূপে পৃথকও আছেন, অথচ সমগ্র ব্রজ রাধারই কায়ব্যূহ।"[১]

রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গে পূর্বে অনাদি শাশ্বত 'পুরুষ' এবং অনাদি শাশ্বত 'নারী'র কথা বলা হইয়াছে। এই 'পুরুষ' এবং 'নারী' তত্ত্বই হইল 'বিষয়-আশ্রয়' তত্ত্ব। কৃষ্ণকে যাহারা ভালবাসে তাহারা ভালবাসার 'আশ্রয়' এবং কৃষ্ণ নিজে ভালবাসার বিষয়। আশ্রয়গুলি নিয়ত কৃষ্ণের তৃপ্তির জন্য বহুবিধ চেষ্টা করে। এই আশ্রয়গুলিই ভোগ্য, সেবক—ইহাই নারীতত্ত্ব; যাহা বিষয়, ভোক্তা, সেব্য তাহাই পুরুষতত্ত্ব। "সকল ব্রজবাসীই, কি নন্দ, সুবল, কি যশোমতী, কুন্দ, চন্দ্রা, পদ্মা, ললিতা, রাধা—যে যাহার নিজ নিজ ভাব-অনুসারে কৃষ্ণকেই ভালবাসে, সুতরাং তত্র গোবিন্দই এক অদ্বিতীয় পুরুষ হইতেছে; অপর সকলেই নারী। ......পুরুষবেশী নন্দ-সুবল-শ্রীদামাদি রাধা-পরিণামের ও বিবর্তের উদাহরণ;

১ তুঃ— পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

তাহারা ত পুরুষ নহে, তাহারা রাধা পরিণাম, রাধা-ধাতুতে নির্ম্মিত—খণ্ড নারীগণ।" ব্রজে পুরুষবেশিগণের স্বরূপতঃ নারী হইয়াও যে পুরুষাভিমান তাহা বিবর্তমাত্র; বিবর্তবশে এই পুরুষাভিমান এবং তজ্জাত পুরুষাভিনিবেশ না থাকিলে পিতৃবাৎসল্য ও সখ্যরসের ব্যাঘাত হইত।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, "যদি ভালবাসিলেই নারী হওয়া হয়, তবে কৃষ্ণও ত আমাদের ঠাকুরাণীকে ভালবাসেন বলিয়া নারী হইতেছেন, ও ঠাকুরাণী ভালবাসার 'বিষয়' হইয়া পুরুষই হইতেছেন।" ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে,—"স্পষ্ট কথা বলিতে কি, রাই-কানুর মধ্যে যে কে পুরুষ, কে নারী, তাহা বিবেচনা করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই; হয়ত তাঁহারাই নিজে জানেন না। রাই ও তাঁহার পরিণাম সমগ্র ব্রজভূমি কৃষ্ণ-প্রীতির আশ্রয় বলিয়া নারী; এবং ব্রজকে ভাল-বাসিয়া ব্রজ-প্রীতির আশ্রয় বলিয়া কৃষ্ণও নারী।"

সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, "কারণে"র সুষুপ্তি-রূপতাই ব্রহ্ম-নির্বিশেষ; জাগ্রৎ ভাবটি ব্রজলোক, এবং স্বপ্নলোকটি জগৎ-লোক; এই জগৎ-লোকটি সাধারণতঃ ব্রজের বাহিরে কল্পিত হয়। কিন্তু লেখকের মতে—"ব্রজেতর বহির্দেশ নাই; যেহেতু ব্রজ অনন্তব্যাপী, সমগ্র দেশটিই ব্রজ ও নিত্যলোক; তদতিরিক্ত স্থান কিছুই নাই। আমরা যথা গৃহের ভিতর শয়ান থাকিয়া গৃহাভ্যন্তরেই স্বপ্নে বড় বড় সহর প্রান্তর রচিত দেখি, তাহা যেন গৃহের বাহিরে অথচ গৃহের বাহিরে নহে—গৃহ মধ্যেই, তদ্বৎ, ব্রজে থাকিয়াই কুঞ্জমধ্যে নিদ্রিত যুগল যখন স্বপ্ন দেখেন, তখন ব্রজমধ্যেই ব্রজের বাহিরে ইব, নানা লোক রচিত পাওয়া যায়। তত্র তত্র গোবিন্দ আপনাকে—চতুর্ভুজ বাসুদেব, শ্মশানাধিপতি শিব, অযোধ্যার রাম, জাঙ্গল নারসিংহ, দ্বারকার রাজা, সমুদ্রতীরে মোহিনী, পাতালের কূর্মাদি মনে করেন; শ্রীমতী ঠাকুরাণী আপনাকে লক্ষ্মী, রুক্মিণী, সত্যভামা, সীতা, দশভুজাদি মনে করেন।" এই যে জগৎ-লোকের জীব আমরা —"আমরাই যে ব্রজের নন্দ-যশোমতী, শুক-শারী, ভ্রমর-ভ্রমরী, বৃক্ষ-লতা, শ্রীদাম-সুবল, কৃষ্ণ-প্রেয়সী বা সখীগণ—অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবক নারীগণ, তাহা ভুলিয়াছি বটে, কিন্তু স্বরূপ ভুলিলে কি হয়, আমরা নারীই আছি।" এই যে নিখিল জীবের শাশ্বত নারীত্ব ইহাই নিখিল জীবের শাশ্বত রাধাত্ব।

সাংখ্য মতে যে প্রকৃতি-পুরুষের আলোচনা হইয়াছে সেখানে প্রকৃতি একা, জড়া এবং স্বতন্ত্রা; অচেতন প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণরূপে দুই। সন্নিধান সম্পর্কে প্রকৃতি বা পুরুষের, বা উভয়ের চাঞ্চল্য হয়; এই চাঞ্চল্যই বন্ধন। এই

মতে প্রেমই বন্ধন, অপ্রেম—ঔদাসীন্যই মুক্তি ; দুঃখের অত্যন্তাভাবেই মুক্তি—তা বলিয়া মুক্তি আনন্দঘন নহে। লেখকের মতে এই জাতীয় মতের সাংখ্যকার "ঋষি বটে, কিন্তু মহর্ষি নহেন, অন্ধ-ঋষি মাত্র।" এই মায়াটি পুরুষের—ব্রহ্মের শক্তি—"যদ্দ্বারা ব্রহ্ম সগুণ হইয়া মহেশ্বর হইয়াছেন। প্রকৃতিটি ঈশ্বরের 'নারী', ঈশ্বরের উপাধি।" বেদান্ত বলিতে পারে, কোনও উপাধি, শক্তি, কারণতা ব্রহ্মে থাকিলেই ব্রহ্ম অদ্বয় না হইয়া সদ্বয় হন। কিন্তু বৈষ্ণব মতে প্রকৃতি বা শক্তি অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহা ব্রহ্মের অদ্বয়তার কোনও হানি করে না। শক্তি ও শক্তিমান্ ঈশ্বর অভেদে একই। ব্রহ্মকে আনন্দ-স্বরূপ হইতে হইলেই আনন্দের যে প্রধান অংশ 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' এই দুইভাগে বিভক্ত হইতে হইবে ; এই বিষয়-আশ্রয়ই ত পুরুষ-নারী—কৃষ্ণরাধা। আনন্দের জন্য—লীলার জন্য "শক্তিমান্ গোবিন্দ হইতে শক্তি শ্রীমতী ভালবাসা ঠাকুরাণীর পৃথক্ নির্দ্দেশ হইল, কিন্তু তাহাতে বস্তু সদ্বয় হইল না ; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই নিশ্চিত বস্তু। বিবক্ষাবশতঃ দুইটির উল্লেখ হইল মাত্র।" এই যে বিবক্ষাবশতঃ দুইএর উল্লেখ এখানে মনে রাখিতে হইবে,"শব্দের জ্ঞাপকত্বই আছে, কারকত্ব নাই।" "এখানে এক উপহিত, অপর উপাধি (কৃষ্ণ উপহিত হইলে রাধা উপাধি, রাধা উপহিত হইলে কৃষ্ণ উপাধি), সম্বন্ধ—অবিনাভাব।" রাধা হইল কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি ; স্বরূপ-শব্দেরই তাৎপর্য, "স্ব ও স্বরূপ একই বস্তু ; যে রাধা সেই গোবিন্দ ; যে গোবিন্দ সেই রাধা। গোবিন্দ রাধাকে ভালবাসে; রাধাও গোবিন্দকে ভালবাসে; ভালবাসাই রস ; রাধাও রস, গোবিন্দও রস !"

কৃষ্ণ 'মদন-মোহন'। মদনকে লইয়া কেহ কৃষ্ণের নিকটে গেলে কৃষ্ণ সে মদনকে মোহিত করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছায় পর্যবসিত করে। তাই কৃষ্ণের 'সে রূপ হেরিলে কাম হয় প্রেমময়'। "কিন্তু কৃষ্ণেরও বড় আমাদের রাই ; তিনি মদন-মোহন-মোহিনী।" "রাই আমাদের তরুণী, করুণাময়ী এবং লাবণ্যময়ী ; তাহার প্রধান মাধুরী এই যে—তাহার কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা অসীম ; সে ভালবাসাতে স্বয়ং কৃষ্ণ অবশে আকৃষ্ট হয়েন, সে ভালবাসার পদতলে পড়িয়া থাকিবার জন্য কৃষ্ণ লালায়িত ; 'সখীগণ কর হইতে চামর লইয়া হাতে, (কৃষ্ণ রাইকে) আপনে করয়ে মৃদু বায়' ; অভিসারিকা নিকুঞ্জে আসিয়া মিলিলে গোবিন্দ—'নিজ করকমলে চরণযুগল মোছই, হেরই চিরথির আঁখি'।"

"রাই যোগনিদ্রা বা যোগমায়া বা মহামায়া, রাই সুষুপ্ত গোবিন্দকে

আলিঙ্গনমুক্ত করিলেই নিত্যধাম ব্রজের উৎপত্তি যেন আরম্ভ হইল; এবং নানাবিধ কেলিবিলাস, ছোটবড় বিরহ ও উজ্জ্বল-সমরান্তে পুনরায় দুইজনে সুষুপ্ত এবং পুনরায় জাগরণ ও ব্রজের সমুৎপত্তি। এই পারম্পর্যই পূর্ণ তত্ত্ব; বিরহ এবং মিলন, পুনরায় বিরহ এবং পুনরায় মিলনই রস। চিরমিলনে বিরহিণীর চক্ষুর জল ঘুচিয়া গেলে নিরুৎসাহ রসের রসত্বের অভাব হইত। তাহাই রাধা-গোবিন্দ পরামর্শ করিয়া ব্রজে একেবারে চক্ষুর জল ঘুচান না; ক্ষুদ্র-দীর্ঘ বিরহে প্রেয়সীব চক্ষুর জল প্রবাহিত করিয়া পরে পুনর্মিলন সংঘটন দ্বারা, নিজ পদ্মহস্তে চুম্বন করিয়া, গোবিন্দ প্রেয়সীর কাঁচা-চাঁদ-বদনে অশ্রু মুছান; মিলনের অশ্রু যতই উছলিয়া উঠে, গোবিন্দ ততই সযতনে সমাদরে অশ্রু মুছান।"

সুষুপ্তিতেও কৃষ্ণেব যেমন রাধার সঙ্গে গাঢ় আলিঙ্গনে মিলন, জাগিয়া উঠিযাও তেমন সর্বত্রই রাধা—সবই রাধা। কথাটি লেখক ভারি সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণ জাগিয়া উঠিয়া পার্শ্বে দেখিলেন পীত-বসন; সোনার বরণ পীত বসন অঙ্গে জড়াইতে গিয়া দেখেন তাহা বসন নহে, তাহা শ্রীরাধা—হ্লাদিনী—ভালবাসাঠাকুরাণী।" এই এক বাধাই তাঁহাব ষোলকলা দ্বারা ষোল সহস্র গোপী সৃষ্টি করিযা প্রত্যেক গোপীর প্রেমবৈচিত্র্য কৃষ্ণকে আস্বাদ করাইয়াছেন; সেই এক বিশ্বব্যাপিনী নারীই নিজে অভিমন্যু (আয়ান ঘোষ) হইয়া, জটিলা-কুটিলা হইয়া অসংখ্য বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়া প্রেমের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে, সুবল, মধুমঙ্গল, শ্রীদামাদি হইয়া নর্মসখা প্রিয় কৃষ্ণকে সখ্যরস আস্বাদ করাইয়াছে, নন্দ-যশোদা হইয়া বাৎসল্য রস আস্বাদ করাইযাছে; এইরূপে সমগ্র ব্রজটিই শ্রীবাধার কাযব্যূহ হইয়া উঠিয়াছে। এই সর্বব্যাপিনী প্রীতি—এই সর্বব্যাপিনী নারী শ্রীরাধারই জয়,—সে জয়কার শুধু ভক্তকণ্ঠে নয়—স্বয়ং শ্রীভগবানের কণ্ঠেই।

পরিশিষ্ট

(ক) বাঙলার বৈষ্ণব প্রেম-সাহিত্য ও পার্থিব প্রেম-সাহিত্য

বাঙলাদেশের বৈষ্ণব-কবিতায় বর্ণিত শ্রীরাধার একটি প্রাকৃত মানবীয় মূর্তি আছে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সাহিত্যের দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে বৈষ্ণব সাহিত্যের বহুস্থানে এই প্রাকৃত মানবী রাধাই কায়া-মূর্তি, বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত রাধা তাহার অশরীরী ছায়া-মূর্তি; অথবা বলিব, প্রাকৃত মানবীরই ঘটিয়াছে প্রতিষ্ঠা—তাহার উপরে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের ক্ষণে ক্ষণে ছোঁওয়া লাগিয়াছে। এই বৈষ্ণব-কবিতার রাধা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একস্থানে অতি প্রণিধানযোগ্য কয়েকটি উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"কাজলরেখার সহিষ্ণুতা, মহুয়ার ক্রীড়াশীল বিচিত্র প্রেম, মলুয়ার ও চন্দ্রাবতীর নিষ্ঠা, কাঞ্চনমালার প্রেমের অগ্নিতে জীবন-আহুতি—এক কথায় যে কোন কালে যে কোন নায়িকা প্রেমের পথে চলিয়া যে সকল অমানুষী গুণ দেখাইয়াছেন,—রাধা তাঁহাদের সকলের প্রতীক।......শত শত সতী চিতায় পুড়িয়া যে ছাই হইয়াছে—সেই চিতার পূত বিভূতি হইতে রাধিকার উদ্ভব। সেই সকল 'সতী' ও নায়িকা হব্যস্বরূপ, কিন্তু যখন সেই হব্য হোমাগ্নির আহুতি হয় তখন তাহার নাম রাধা-ভাব।" সাহিত্যের দিক্‌ হইতে বিচার করিলে দেখিতে পাই, বাঙলা দেশের বুকে যুগে যুগে যে সকল নারী প্রেমের সাধনা করিয়াছে তাহাদের সহিত রাধিকার একটা সজাতীয়ত্ব রহিয়াছে। বাঙলাদেশের রাধা অনেক স্থানে 'অবলা-অখলা' বাঙালী ঘরের মেয়ে বা কুলবধূ হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম সর্বদেশে সর্বকালে এক হইলেও বিভিন্ন দেশের জীবন-যাত্রা ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিয়া প্রেমও তাহার অবস্থান ও প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়া বিশিষ্ট হইয়া ওঠে। এইজন্য বৈষ্ণব-কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে বসিয়া 'মানিনী রাধা' কথাটির ঠিক ঠিক প্রতিশব্দ দিতে পারি নাই। আসলে 'মানিনী রাধা'র মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম সুকুমার ভারতীয়ত্ব রহিয়াছে যাহা ইউ-রোপীয় প্রেমজীবনে সুলভে নহে; যাহা জীবনে সুলভ নহে তাহা ভাষায় সুলভ হইবে কি করিয়া? ভারতবর্ষের রাধাপ্রেমকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসঙ্ঘটনের কতগুলি বিশেষ অবস্থান ছিল। হয় কুলের বধূ

রাধা কলসীকাঁখে জল আনিতে গিয়া ঘাটের পথে কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়াছে, নতুবা গোচারণে রত কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া প্রেমাসক্ত হইয়াছে, নতুবা গোয়ালার কুলবধূ দধিদুগ্ধ লইয়া হাটে চলিয়াছে, পথে কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ও মিলন হইয়াছে। ভারতীয় রমণীগণ শৈশব ছাড়িয়া যৌবনে প্রবেশ করিলেই বা কুলবধূ হইলেই সর্বাবস্থায় 'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ'; গ্রাম্য জীবনের এইজাতীয় সামাজিক পরিবেশের ভিতরে প্রেম-সঙ্ঘটনের যাহা যাহা সুযোগ ছিল রাধিকার প্রেমলীলায় আমরা তাহারই শুধু উল্লেখ বা প্রসিদ্ধি দেখিতে পাই। ঝুলন, রাস, দোল প্রভৃতি লীলাও পল্লীবালা বা পল্লীবধূগণের পক্ষে প্রশস্ত নহে; রাজোদ্যান ও রাজ-অন্তঃপুরেই ইহার সম্ভাবনা সমধিক ছিল; এইজন্যই দেখিতে পাই, পূর্বানুবৃত্তিরূপে বাঙালী কবিগণ এইসকল লীলার কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এইসকল লীলার ভিতর দিয়া রাধা-প্রেমের উল্লাস নাই; সেই উল্লাস সহজভাবে প্রকাশ করিবার জন্য বিবিধ পল্লী-প্রেমলীলার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রকৃতির সহিত ভারতবর্ষের জীবনধারার যে সহজ বন্ধন রহিয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই ভারতবর্ষের বর্ষাঋতু এবং ভারতবর্ষের প্রেমের সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য নিবিড় যোগ রহিয়াছে; এই যোগের সুবিচিত্র এবং সুমধুর প্রকাশ আদিকবি বাল্মীকির যুগ হইতে আজ পর্যন্ত একটানা চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের সার্থক বিরহের কবিতা তাই বর্ষার কবিতা। বৈষ্ণব-কবিতাতেও তাহাই দেখিতে পাই। এই বর্ষার সহিত আবার নিবিড় যোগ ভারতবর্ষের কদম্বকুঞ্জের; এই কারণেই কি কদম্বকুঞ্জ আস্তে আস্তে এমন করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রধান হইয়া উঠিল এবং প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গেল? ঘনবর্ষার এই নীপকুঞ্জের মহিমা ভারতবর্ষে যেমনটি করিয়া ফুটিয়া ওঠে, জগতের অন্যত্র তাহা দুর্লভ; এইজন্যই হয়ত শুধু ভারতীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে নয়, ভারতীয় প্রেম-সাহিত্যেই এই নীপকুঞ্জ এতখানি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

জলের ঘাটে জল আনিতে গিয়া অচেনা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ এবং প্রেম-সঙ্ঘটন ইহা শুধু বাঙলা দেশের বৈষ্ণব-সাহিত্য নয়, বাঙলা দেশের সকল প্রেম-সাহিত্যের ভিতরেই লক্ষণীয়। বৈষ্ণব-কবিতা ব্যতীত বাঙলাদেশের আর যে প্রেম-কবিতাগুলি পাওয়া যায়, সেই মৈমনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকা-গুলির ভিতরে আমরা প্রায় সর্বত্রই এই জিনিসটি দেখিতে পাই। এই গীতিকাগুলি

কোন্ সময়ে কাঁহা কর্তৃক রচিত হইয়াছে তাহা লইয়া যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে; কিন্তু সেইসকল বিতর্ক এবং সংশয় সত্ত্বেও পরবর্তী কালের সকল স্থূল সূক্ষ্ম হস্তাবলেপের সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়াও একটা কথা স্বীকার করিতে হয়, এই গীতিকাগুলিতে বাঙলাদেশের প্রাণধর্ম এবং প্রেমধর্মের খাঁটি পরিচয়ের কতগুলি সার্থক চিত্র রহিয়াছে। সাহিত্যের দিক হইতে ইহাই এগুলির বিশেষ মূল্য। এই প্রেম-গীতিকাগুলির সহিত বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার তুলনা করিলে কতগুলি জিনিসের আমরা আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করিতে পারি,—এ মিলগুলি শুধু মাত্র ঘটনাগত নয় – ভাবগতও বটে, ভাষাগতও বটে। এই মিলগুলিকে দেখিয়া আমরা স্বভাবতঃই এই গীতিকাগুলির উপরে বৈষ্ণব-কবিতার প্রভাবের কথা বলিতে পারি। কিন্তু এই মিলগুলি একের উপরে অপরের প্রভাবজনিত না হইয়া ইহাই হয়ত সত্য যে বাঙলাদেশের বিশেষ একটি জীবনধারা—এবং সেই বিশেষ জীবনে প্রেমেরও একটি বিশেষ ধারা ছিল,—সেই প্রেম-প্রকাশেরও আবার কতগুলি বিশেষ ভঙ্গি ছিল। সেই ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গি একটা সাধারণ জাতীয়-উত্তরাধিকাররূপে বৈষ্ণব কবিতা ও অন্য প্রেম-গীতিকা সকলের ভিতরেই দেখা দিয়াছে। ভাব ও প্রকাশভঙ্গির দিক্ হইতে এই মিল স্থানে স্থানে যে কত গভীর কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করিলেই তাহা বোঝা যাইবে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে যেমন দেখিতে পাই, কৃষ্ণ রাধিকাকে জলের ঘাটে আসিবার জন্য বাঁশীতে সঙ্কেত করিয়াছেন, এই গীতিকাগুলির ভিতরেও বহু গীতিকায় দেখিতে পাই নায়ক তেমনই করিয়া নায়িকাকে একাকিনী জলের ঘাটে আসিবার সঙ্কেত জানাইয়াছে।[১]

১ তুঃ— শিরে ছিল আর বাঁশিটী তুল্যা নিল হাতে।
ঠার দিয়া বাজাইল বাঁশী মহুয়ারে আনিতে॥
আসমানেতে চৈতার বউ ডাকে ঘনে ঘন।
বাঁশী শুন্যা সুন্দর কইন্যার ভাঙ্গ্যা গেল ঘুম॥ মহুয়া,

(মৈমনসিংহ গীতিকা)

আষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশী মধ্যে মধ্যে ছেদা।
নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা॥
সেই বাঁশী বাজাইয়া মইষাল গোষ্ঠে যায়।
আজি কেন সুন্দর কন্যা ফির‍্যা ফির‍্যা চায়॥
আজি কেন মইষাল তোমার হইল এমন।
তোমার হাতে বাঁশী হইল দোষমণ॥

মৈমনসিংহ গীতিকার[১] 'মহুয়া' কবিতায় জলের ঘাটে নদ্যার ঠাকুর ও মহুয়ার গোপন সাক্ষাৎ ও কথোপকথন,—

জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ॥

প্রভৃতি আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের যমুনার ঘাটে রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ এবং উভয়ের কথোপকথন—

কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী।
কেহ্নে যমুনাতে তোলসি পাণী॥

প্রভৃতিই স্মরণ করাইয়া দিবে। 'মহুয়া' গীতিকায় দেখি, এই কথোপকথনের শেষে নদ্যার ঠাকুরের বিবাহের প্রস্তাবের পরে উভয়ের কথা হইতেছে—

"লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর॥"
"কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি॥"

ইহার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের দান-খণ্ডের রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি তুলনীয় :—

আরে ভৈরব পতনে গাঅ গড়াহলি গিআঁ।
গঙ্গা জলে পৈস গলে কলসি বান্ধিআঁ॥

* * * *

তোর দুই উরু রাধা ভৈরব পতনে।
নিকটে থাকিতেঁ দূর জাইবোঁ কি কারণে॥

নিতি নিতি হইলে দেখা এমন না হয়।
আজি কেন সুন্দর কন্যার জীবন সংশয়॥ মইষাল বন্ধু,
(পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা)

আমার উদ্দেশে বন্ধুরে আরে দুঃখু বাজায় মোহন বাঁশী।
আমার আসার আশারে আরে দুঃখু থাকে জলের ঘাটে বসি॥
কান্দিয়া বাঁশীর সুরে হায়রে বন্ধু কয় মনের কথা।
তাহার কান্দন শুন্যারে আরে দুঃখু আমার চিত্তে হইল ব্যথা॥ ইত্যাদি,
(মাঞ্জুর মা, পূঃ গীঃ, ৩।২)

১ প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

তোর দুঈ কুচ কুম্ভ বান্ধি নিজ গলে।
বোল রাধা পৈসোঁ মো লাবণ্য গঙ্গা জলে॥[১]

যে প্রেমের বারমাসী বা ছয়মাসী দেখিতে পাই রাধার বিরহে তাহাই দেখিতে পাই এই গীতিকাগুলির বহু নায়িকার ভিতরে সমান কথায় সমান সুরে। দানলীলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন দেখিতে পাই, কৃষ্ণ পথিমধ্যে সহসা রাধাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়াছে,—লজ্জায় ভয়ে রাধা নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য কত মিনতি জানাইয়াছে। 'ধোপার পাট' গীতিকাটিতেও দেখিতে পাই, জলের ঘাটে কাঞ্চনমালার সেই মিনতি—

পুষ্করিণীর চাইর পারে রে ফুটল চাম্‌পা ফুল।
ছাইরা দেরে চেংরা বন্ধু ঝাইড়া বান্‌তাম চুল॥
* * * *
দুষমণ পাড়ার লোক দুষমণি করিবে।
এমন কালে দেখলে বন্ধু কলঙ্ক রটাবে॥

হস্ত ছাড় পরাণের বন্ধু চইলা যাইতাম ঘরে।
কি জানি কক্ষের কলসী ভাসাইয়া নেয় সুতে॥
দূরে বাজে মনের বাঁশী ঐ না কলা বনে।
তোমার সঙ্গে অইব দেখা রাত্রি নিশা কালে॥[২]

কিন্তু এই 'রাত্রি নিশাকালে' মিলনের সঙ্কেত করিয়া রাধাও যেমন ঘরের বাহির হইতে না পারিয়া সারা রাত মনস্তাপে কাটাইয়াছে, তেমনই—

১ তুঃ— যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসাঁ মরে॥
তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরুপোঁস জান।
তোহ্মে মোর সব তীথ তোহ্মে পুণ্য স্থান॥ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন।

আবার— লজ্জা নাইরে নিলাজ কানাই লজ্জা নাইরে তোর।
গলে কলসী বান্ধ্যা গিয়া জলে ডুব্যা মর॥
কোথায় পাব কলসী রাধে কোথায় পাব দড়ী।
তোমার কাঁখের কলসী দাও আর খোঁপা বান্ধা দড়ী॥

২ পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

পারলাম না পারলাম না বন্ধু মইলাম মাথার বিষে।
সত্য ভঙ্গ হইল রে কুমার পারলাম না আসিতে ॥
যাও বাপ জাইগ্যা আছে আসিতাম কেমনে ॥
ঘর কইলাম বাহির রে বন্ধু পর কইলাম আপন।[১]
অবলার কুলভয় হইল দুষমণ ॥
কিসের কুল কিসের মান আর না বাজাও বাঁশী।
মনপ্রাণে হইয়াছি তোমার শ্রীচরণে দাসী ॥
একটুখানি থাকরে বন্ধু একটুখানি রইয়া।
কাচা ঘুমে বাপ মাও না পড়ুক ঘুমাইয়া ॥
আসমানেতে কাল মেঘ ডাকে ঘন ঘন।
হায় বন্ধু আজি বুঝি না হইল মিলন ॥
বৃষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর বাইরে কেন ভিজ।[২]
ঘরের পাছে মানের পাতা কাইট্যা মাথায় ধর ॥
ভিজিল সোণার অঙ্গ রাত্রি নিশাকালে।
অভাগী নিকটে থাক্‌লে মুছাইতাম কেশে ॥
সংসার ঘুমাইয়া আছে কেবল বাজে বাঁশী।
হইয়া ঘরের বাহির কোন পথে আসি ॥
কাট্যা গেছে কালা মেঘ চান্দের উদয়।
এই পথে যাইতে গেলে কুলমানের ভয় ॥[৩]
ডাল নাই পাল নাই ফুটিয়া না রইছে ফুল।
বন্ধুরে পাইলে আমার কিসের জাতিকুল ॥

এই পদগুলি সম্বন্ধে দীনেশবাবু যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অতি অর্থব্যঞ্জক বলিয়া তুলিয়া দিতেছি। "এই সকল পদ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ পদগুলির ভিত্তি কোথায়। এ সকল চণ্ডীদাসের পরবর্তী কিনা বলিতে

১ তুঃ— ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥ চণ্ডীদাস।

২ তুঃ— আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে প্রভৃতি। চণ্ডীদাস।

৩ তুঃ— কহিও বন্ধুরে সই কহিও বন্ধুরে।
গমনবিরোধী হৈল পাপ শশধরে ॥ চণ্ডীদাস।

পারি না, কিন্তু সমস্ত বাঙলা দেশে যে-সকল কবিতা কোন পূর্বযুগে ফুলের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই পরবর্তী বৈষ্ণব-কবিতায় যোগান দিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়।" কাঞ্চনমালার আক্ষেপোক্তিও আমাদিগকে চণ্ডীদাসের বহু পদের কথা স্পষ্ট এবং অস্পষ্টভাবে স্মরণ করাইয়া দিবে।

তোমার লাগিয়া আমি জীয়ন্তে যে মরা।
কর্ম্মদোষেতে আমি হইলাম কপালপোড়া॥

* * * *

বড়র সঙ্গে ছোটর পিরীত হয় অগঠন।
উচা গাছে উঠলে যেমন পড়িয়া মরণ॥
জমীন ছাইড়া পাও দিলে শূন্তে না লয় ভর।
হিয়ার মাংস কাট্যা দিলে আপন না হয় পর॥
ফুলের সঙ্গে ভমরার পিরীত যেমন আগে বুঝা দায়।
এক ফুলের মধু খাইয়া আর ফুলেতে যায়॥
মেঘের সঙ্গে চান্দের ভালাই কত কাল রয়।
ক্ষণে দেখি অন্ধকার ক্ষণেকে উদয়॥
কুলোকের সঙ্গে পিরীত শেষে জ্বালা ঘটে।
যেমন জিহ্বার সঙ্গে দাঁতের পিরীত আর ছলেতে কাটে॥
না বুঝিয়া না শুনিয়া আগুনে হাত দিলে।
কর্ম্মদোষে অভাগিনী আপনি মজিলে॥

এইরূপে দেখিতে পাই, এই গীতিকার প্রেম-উপাখ্যান ও তাহার বর্ণনার ভিতরে বহু স্থান আছে যাহা বৈষ্ণব-কবিতার পদ—বিশেষ করিয়া খাঁটি বাঙালী কবি চণ্ডীদাসের পদ স্মরণ করাইয়া দিবে।[১] 'শ্যামরায়ের পালা'য় দেখি—

সুখেরে কইরাছি বৈরী রে বন্ধু দুঃখেরে দোসর।
তুই বন্ধের পিরীতে মজ্যা আপন কইলাম পর॥

১ তুঃ— না লইও না লইও বন্ধু কাঞ্চনমালার নাম।
তোমার চরণে আমার শতেক পরণাম॥ (ধোপার পাট, পূঃ গীঃ, ২।২)
"তোমার চরণে বঁধু শতেক পরণাম।
তোমার চরণে বঁধু লিখ আমার নাম।
লিখিতে দাসীর নাম লাগে যদি পায়।
মাটিতে লিখিয়া নাম চরণ দিও তায়।" চণ্ডীদাস।

কুলেরে করিলাম বৈরীরে আমি অবুলা রমণী।
তোমার পিরীতে ডাক্যা কলঙ্কেরে আনি ॥
ঘরেতে লাগিল আগুন রে বন্ধু দেয়ারেতে কাটা।
সাধ করিয়া খাই পিরীত গাছের গোটা ॥
যে জনে খাইয়াছে বন্ধু পিরীত গাছের ফল।
কলঙ্ক মরণ দুর বন্ধু জীবন সফল ॥

এইসব কবিতা প্রচলিত চণ্ডীদাসের 'পীরিতি' সম্বন্ধীয় পদের প্রভাবেই রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; বরঞ্চ এই কথাই মনে হয় যে, বাঙলা দেশের আকাশে-বাতাসে 'পীরিতি'র এই যে কাব্যরূপ টুকরা টুকরা হইয়া ভাসিয়া বেড়াইত তাহার সুবিন্যস্ত গ্রথিত রূপই প্রচলিত চণ্ডীদাসের রাধা-প্রেমের

পীরিত যতন পীরিত রতনরে
আরে ভালা পীরিত গলার হার।
পীরিত কর‍্যা যে জন মরে রে
আরে ভালা সফল জীবন তার ॥
(মঞ্জুর মা, পূঃ গীঃ, ৩।২)

চান্দ ছাড়া কাল রে নিশি দেখ সদাই হে আন্ধারা।
যৈবন কালে নারীর পতি পুষ্পের ভমরা ॥ বন্ধু যাইও না রে ॥
খরদর ঢেউয়ের নদীরে তাতে যৈবন তরী।
এমন কালে ছাইরা গেলে কে অইব কাণ্ডারী ॥ বন্ধু যাইও না রে ॥

/সোনা নয় রূপা নয় নয়রে পিতল কাসা।
ভাঙ্গিলে সে গড়া যায়রে পরে আছে আশা ॥ বন্ধু যাইও না রে ॥
অভাগ্যা নারীর যৈবন ধইরাছে জোয়ারে।
এই পানি ভাট্যাইলে দেখ আরত নাই সে ফিরে ॥/ বন্ধু যাইও না রে ॥
ইত্যাদি, (আয়না-বিবি, পূঃ গীঃ, ৩।২)

যেই রে বিরক্ষের তলে যাই আরে ছায়া পাওনের আশে রে।
পত্র ছেন্দ্যা রৌদ্র লাগে দেখ কপালের দুষে রে ॥
দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইরা শুকায়।
গায়ের না বাতাস লাগলে আর ভালা আগুনি ঝিমায় রে ॥ ইত্যাদি, (ঐ)

পদাবলী। এই গীতিকাগুলির স্থানে স্থানে রাখালের বাঁশী শুনিয়া মুগ্ধা নব-অনুরাগিণী পল্লীবালাগণের এমন সব গান পাওয়া যায় যাহার ভাষা ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া দিয়া চণ্ডীদাসের ভণিতায় চালাইয়া দিলে তাহাকে অন্য বলিয়া ধরিবার কোন উপায় থাকে না। নমুনাস্বরূপে আমরা 'মইষাল বন্ধু' গাতিকাটি[১] হইতে একটি অংশ তুলিয়া দিতেছি। ঘাটে জল আনিতে গিয়া 'কন্যা' মাঠের রাখাল 'মইষাল' বন্ধুর বাঁশী শুনিয়াছে; তখন—

সুতেতে ভাসায়ে কলসী শুনে বাঁশীর গান।
বাঁশীর সুরে হইরা নিল অবলার প্রাণ॥

এই 'অবলা নারী'ই আর একটু সংস্কার-সম্পন্ন সুনিপুণ কবিগণের কাব্য-সৃষ্টিতে রাধারূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই অবলার আর্তিতে পূর্বরাগের রাধার সকল আর্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

আমার বন্ধু হইত যদি দুই নয়নের তারা।
তিলদণ্ড অভাগীরে না হইত ছাড়া॥ (সময় পাই না)
দেহের পরাণী ভালা বন্ধু হইত আমার।
অভাগীরে ছাইরা বন্ধু না যাইত স্থান দূর॥ (সময় পাই না)
এক অঙ্গ কইরা যদি বিধি গড়িত তাহারে।
সঙ্গে কইরা লইয়া যাইত এহি অভাগীরে॥
(গো সখি, সময় পাই না)
আমি ত অবুলা নারীরে বন্ধু হইলাম অন্তরপুরা।
কূল ভাঙ্গিলে নদীর জল মধ্যে পড়ে চড়া॥
রে বন্ধু মধ্যে পড়ে চড়া॥
বইন্যা কান্দে ফুলের ভ্রমর উইড়া কান্দে কাগা।
শিশুকালে করলাম পিরীত যৌবনকালে দাগা॥
রে বন্ধু যৌবনকালে দাগা॥
সুজন চিন্যা পিরীত করা বড় বিষম লেঠা।
ভাল ফুল তুলিতে গেলে অঙ্গে লাগে কাঁটা॥
রে বন্ধু অঙ্গে লাগে কাঁটা॥

১ পূর্ববঙ্গ গীতিকা, (২।২)

লাজ বাসি মনের কথা কইতে নাই সে পারি।
বুকেতে লাইগাছে বন্ধু দেখাই কারে চিরি॥
রে বন্ধু দেখাই কারে চিরি॥
কইতে নারি মনের কথা মাও বাপের কাছে।
লীলারি বাতাসে আমার অন্তর পুইরা আছে॥
রে বন্ধু অন্তর পুইরা আছে॥
নদীর ঘাটে দেখা শুনা কান্ধেতে কলসী।
ঐছন করিয়া গেছে তোমার মোহন বাঁশী॥
রে বন্ধু তোমার মোহন বাঁশী॥
ঘরের বাহির হইতে নারি কুলমানের ভয়।
পিঞ্জরা ছাড়িয়া মন বাতাসে উড়য়॥
রে বন্ধু বাতাসে উড়য়॥
কত কইরা বুঝাই পাখী নাই সে মানে মানা।
ভরা কলসী হইল রে বন্ধু দিনে দিনে উণা॥
রে বন্ধু দিনে দিনে উণা॥[১]

১ তুঃ— আন্ধাইরে ডুইবাছে বন্ধু, আরে বন্ধু চন্দ্র সূয্য তারা।
তোমারে দেখিয়া বন্ধু আরে বন্ধু হৈছি আপন হারা;
* * * * *
বিফলে ফিরিয়া আরে বন্ধু যাও নিজ ঘরে।
একেলা শুইয়া বন্ধু আরে বন্ধু কান্দি আপন মন্দিরে॥
বাইরেতে শুনিলে বন্ধু আরে বন্ধু তোমার পায়ের ধ্বনি।
ঘুম হইতে জাইগা উঠি আমি অভাগিনী॥
বুক ফুটিয়া যায়রে বন্ধু আরে বন্ধু মুখ ফুটিয়া না পারি।
অন্তরের আগুনে আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি॥
পাখী যদি হইতাম বন্ধু আরে বন্ধু রাখতাম হৃদ্‌পিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে বন্ধু আরে বন্ধু গাইথা রাখতাম ভোরে॥
চান্দ যদি হইতে বন্ধু আরে বন্ধু জাইগা সারা নিশি।
চান্দ মুখ দেখিতাম নিরালা বসি॥ ইত্যাদি।
কমলা (মৈমনসিংহ গীতিকা)

তুলনীয়,—দেওয়ান ভাবনা; মৈমনসিংহ গীতিকা, ১৭০-৭১ পৃষ্ঠা।
রূপবতী, ঐ, ২৪৩ পৃষ্ঠা।

পূর্ববঙ্গ গীতিকা চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'শীলাদেবী'র গাথার ভিতরে যে একটি গান রহিয়াছে সেই গানটি বিশ্লেষণ করিলেও আমরা দেখিতে পাই, সাহিত্য হিসাবে ভাব এবং প্রকাশভঙ্গি উভয় দিক্ হইতেই বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতার সহিত ইহার কিরূপ একটি সজাতীয়ত্ব রহিয়াছে।[১]

তুমি রে ভমরা বন্ধু আমি বনের ফুল।
তোমার লাইগারে বন্ধু ছাড়লাম জাতি-কুল॥
ধেনুবৎস লইয়া তুমি যাওরে বাথানে।
বন্দের লাইগা থাকি চাইয়া পথ পানে॥
পথ নাহি দেখিরে বন্ধু ঝুরে আঁখি জলে।
পাগলিনী হইয়া ফিরি তিলেক না দেখিলে॥
নয়নের কাজলরে বন্ধু আরে বন্ধু তুমি গলার মালা।
একাকিনী ঘরে কান্দি অভাগিনী লীলা॥
না যাইও না যাইও বন্ধুরে আরে চরাইতে ধেনু।
আতপে শুকাইয়া গেছেরে বন্ধু তোমার সোনার তনু॥ ইত্যাদি।

কঙ্ক ও লীলা, মৈমনসিংহ গীতিকা

এই প্রসঙ্গে 'কঙ্ক ও লীলা' গাথায় লীলার বিরহদশার বর্ণনা লক্ষণীয়।

১ বন্ধু আজ তোমারে স্বপন দেখি রাইতে।
লোকলাজে সময় পাই না কইতে॥
আমি যে অবলা নারী মনের কথা কইতে নারি
চক্ষের জলে বুক ভেসে যায় বালিস ভাসে শুতে।
সময় পাই না কইতে॥
মনের মানুষ পূজবাম বইলা গাঁথলাম বনমালা।
কাল বিধাতা বাদী হইল আমার ছুটলো বিষম জ্বালা॥
(গো সখি) সময় পাই না……
(আমার) চন্দন বনে ফুল ফুটিল গন্ধের সীমা নাই।
কোন দেবেরে দিল আগুন আমার সকল পুহড়া ছাই॥
(গো সখি) সময় পাই না……
এক দিন পথের দেখা গো আমি পাশুরিতে না পারি।
মনে ছিল প্রাণবন্ধুরে আমি কাজল কইরা পরি॥ (সময় পাই না)

* * * * *

বন্ধু যদি হইত কনক চাম্পার ফুল॥
সোণায় বান্ধাইয়া তারে কানে পরতাম ফুল॥ (সময় পাই না)

অবলা নারীর প্রাণ লইতে বৃন্দাবনেই যে শুধু কৃষ্ণের বাঁশী বাজিয়াছিল তাহা নহে, বাঙলাদেশের ঘাটে-মাঠেও বাঁশী বাজিয়াছে, আজও বাজে। বিশ্বব্যাপী প্রেমের ইহাও এক প্রকারের নিত্যলীলা। অপ্রাকৃত প্রেমের নিত্যলীলার গান করিতে গিয়া রসিক বিদগ্ধ—এমন কি ভক্ত কবিগণকেও সকল উপজীব্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে এই প্রাকৃত প্রেমের নিত্যলীলা হইতে। চণ্ডীদাস প্রভৃতির বৈষ্ণব-কবিতা যে অবলার প্রাণ-হরণকারী বাঁশীর সুরে ভরপুর, এই গীতিকা-গুলির বহু গীতিকাও সেই একই বাঁশীর সুরে ভরপুর। রাখাল কঙ্কের বাঁশী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

কঙ্কের বাঁশী শুনে নদী বহে উজান বাঁকে।
সঙ্গীতে বনের পশু সেও বশ থাকে॥
ভাটিয়াল গানেতে ঝরয়ে বৃক্ষের পাতা।
এক মনে শুন কহি তাহার বারতা॥[১]

(বন্ধু যদি হইত আমার পইরন নীলাম্বরী।
সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিয়া পরতাম নাইসে দিতাম ছাড়ি॥ (সময় পাই না)
বন্ধু যদি হইত রে ভালা আমার মাথার চুল।
ভাল কইরা বানতাম খোপা দিয়া চাম্পা ফুল॥) (সময় পাই না)

১ কঙ্ক ও লীলা; মৈমনসিংহ গীতিকা।

তুঃ—
গলা জলে নামিয়া কন্যা চারি দিকে চায়।
ঐ পারে মইষালের বাঁশী শব্দে শুনা যায়॥
লীলারি বয়ারে বাঁশী বাজে ঘন ঘন।
বাঁশীর সুরে হইরা নিল যৈবতীর মন॥
আগল পাগল কালা মেঘ বাতাসেতে উড়ে।
কোন গহনে বাজে বাঁশী অইনা মধুর সুরে॥
নিতি নিতি জলের ঘাটে বাঁশীর শান সে শুনি।
বাঁশীর সুরে মন পাগলা হইলাম উন্মাদিনী।
কেওয়া ফুলের মধু খাইয়া উইরা যায় ভ্রমরা।
কোন জনে বাজায় বাঁশী কইয়া যারে তরা॥
কইয়া দেরে তরা মোরে দেরে দেখাইযা।
অভাগী হারাইলাম আঁখি কান্দিয়া কান্দিয়া॥
আজি আসি কালি আসি ফিইরা ফিইরা যাই।
যে জনে বাজাইল বাঁশী তারে দেখতে নাইসে পাই॥ ইত্যাদি।

মইষাল বন্ধু (পূঃ গীঃ, ২।২)

'শ্যামরায়ের পালা'য়[১] দেখি, অনুরাগিণী ডোম-কন্যা বলিতেছে—

বাঁশের বাঁশী হইতাম দূতী লো পাইতাম মনে সুখ।
বাজনের ছলে দিতাম বঁধুর মুখে মুখ রে॥ (আমি নারী)

'আন্ধা বন্ধু' গাথায় দেখি,—

বন্ধুরে আরে বন্ধু যেদিন শুন্যাছি তোমার বাঁশী।
কুল গেল মান গেল বন্ধু হইলাম তোমার দাসী রে॥
অন্তরারে কইয়া বুঝাই বন্ধু বুঝ নাই সে মানে।
মন যমুনা উজান লইল বন্ধু তোমার বাঁশীর গানে রে॥

* * * *

মানায় ত না মানে মন দ্বিগুণা উথলে।
তোষির আগুনে যেমুন ঘুষ্যা ঘুষ্যা জ্বলেরে॥

* * * *

কাঞ্চনা বাঁশেতে বন্ধু ধরিয়াছে ঘুণ।
(আমার) অন্তরাতে লাগল আগুন বন্ধু চক্ষে নাই সে ঘুমরে॥

* * * *

তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু সুখ নাই সে চাই।
যোগিনী সাজিয়া চল কাননেতে যাইরে॥
চন্দন মাখিয়া কেশে বানাইব জটা।
সংসারের সুখের পথে বন্ধু দিয়া যাইলাম কাঁটারে॥[২]

আমরা বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণের ভিতরে চণ্ডীদাসকেই শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানি। এই চণ্ডীদাস কৃষ্ণ-কীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস নন, বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত কবি চণ্ডীদাস—প্রচলিত পদগুলির কবি চণ্ডীদাসই বটেন। তাহাতে তাঁহার আদি চণ্ডীদাস হইতে বাধা থাকিতে পারে, কিন্তু খাঁটি চণ্ডীদাস হইতে কিছু বাধা দেখি না। চণ্ডীদাসের এই খাঁটিত্ব কোথায়?—এ প্রশ্নের জবাবে বলা যাইতে পারে, বাঙালী কবি চণ্ডীদাসের খাঁটিত্ব ভাবের দিক হইতে বাঙালী জীবনের মর্মে প্রবেশে—প্রকাশের দিক হইতে বাঙালীর সত্যকার মনের কথা এবং মুখের কথায় বাঙালীর মর্ম প্রকাশে। প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, বাঙালীর পল্লী-জীবন-যাত্রা—সেই বিশেষ জীবন-

১ (পূঃ গীঃ, ৩।২)

২ (পূঃ গীঃ, ৪।২)

যাত্রার ভিতর হইতে উৎসারিত প্রেম—বাঙলাদেশের নারীর প্রাণ—তাহারই একটি জীবন্ত প্রতীক হইল চণ্ডীদাসের রাধা। এই রাধাকে অবলম্বন করিয়া চণ্ডীদাসের যে ভাব, ভাষা, ছন্দ, উপমা—ইহার প্রত্যেকের ভিতরেই সহজ বাঙালী জীবনের একটি অকৃত্রিম আভাস রহিয়াছে। এই কারণেই উপরের পল্লী-গাথাগুলির ভিতর দিয়া যে প্রেমচিত্রগুলি দেখিতে পাইলাম, সেখানকার ভাব, সুর, কথা— সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ মিল দেখিতে পাইতেছি চণ্ডীদাসের। এই চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়াছে —এ চণ্ডীদাস কোনও বিশেষ একজন কবি কিনা সে সম্বন্ধেও সন্দেহ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু আমরা বাঙলার প্রেম-সাহিত্য আলোচনা করিয়া এই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে নূতন আলো লাভ করিলাম তাহাতে বলিতে পারি, বাঙলাদেশের বিচিত্র প্রেম—সেই প্রেমকে প্রকাশ করিবার বাঙালীর যে নিজস্ব বিচিত্র ভঙ্গি—তাহাকে অবলম্বন করিয়া বহুসংখ্যক পদ একত্র সমাবিষ্ট হইয়াই বাঙালীর খাঁটি চণ্ডীদাসের কবি-পুরুষটিকে যেন গড়িয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধা তাই একটি খাঁটি বাঙালী কবির মানস-প্রতিমা—বাঙালী কবির চিত্তধৃত প্রেম-প্রতিমা। এই প্রেম-প্রতিমা রাধার সৃষ্টিতে তাই দেখিতে পাই, বাঙালী কবি এখানে বাঙলাদেশ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান নাই,—বৃন্দাবনভূমি দূর হইতে আসিয়া ক্ষণে ক্ষণে বাঙালী কবির মনোভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে বাঙালীর কবিমানসের প্রেম-প্রতিমা তাহার প্রাকৃত রূপের ভিতরেই দিব্য জ্যোতিতে অপ্রাকৃতের মহিমা লাভ করিয়াছে। আমাদের রাধা-প্রেমে প্রাকৃত কোনস্থানেই অস্বীকৃত নয়—প্রাকৃতই ধীরে ধীরে দিব্যমূর্তিতে উদ্ভাসিত।

(খ) বাঙলার মুসলমান-কবি ও রাধাবাদ

এ কথা বহুবিদিত যে বাংলার অনেক মুসলমান কবি রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি বৈষ্ণব কবিতা রচনা করিয়াছেন। ধর্মের ভাব বা সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক হইতে বিচার করিলে যে এই কবিতা বা গানগুলি সর্বত্রই উল্লেখযোগ্য তাহা বলা যায় না। কয়েকটি গান ব্যতীত অন্যত্র আমরা খানিকটা একটা প্রথাবদ্ধপথে বিচরণ, খানিকটা অনুকরণ বা অনুসরণ, খানিকটা পূর্বতন আকারপ্রকারের উপর স্থূল-সূক্ষ্ম হস্তাবলেপন লক্ষ্য করিতে পারিব। সুতরাং সেই দিক হইতে বিচার করিলে আমরা এই গানগুলির হয়ত যথেষ্ট মূল্য দিতে স্বীকৃত নাও হইতে পারি ; কিন্তু আমাদের বাঙালী জাতীয় মনের ক্রমবিকাশেব ধারাটি লক্ষ্য কবিতে এই গানগুলির একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। আমাদের আলোচ্য রাধাবাদের পরিণতির দিক্ হইতেও এই গানগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

যে-সকল মুসলমান কবি রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া প্রেম-কবিতা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব-কবি বা বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি ছিলেন এ-কথা আমরা স্বীকার করি না—যেমন করিয়া স্বীকার করি না এই কথা যে হিন্দু কবিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ সকল রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-কবিতা রচনাকারী কবিই বৈষ্ণব ছিলেন। দেখা যায় কোনও কোনও ধর্মের ভাবধারা তাহাব ব্যাপক ও গভীর প্রসারের দ্বাবা তাহার একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মের রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জাতির একটি চিত্তপ্রবণতা রূপে একটি সাংস্কৃতিক রূপ পবিগ্রহ কবে। কোনও একটি বিশেষ-জাতীয় সাহিত্যও যখন এইরূপ ব্যাপক ও গভীর প্রসারের দ্বারা জাতীয় চিত্তপ্রবণতারই নিয়ন্ত্রক হইয়া দাঁড়ায় তখনই সাহিত্য সংস্কৃতির গভীর রূপ ধারণ করে। সাংস্কৃতিক রূপে পরিণত এই-জাতীয় ধর্ম ও সাহিত্যকে জাতি অনেক সময় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একটা সামাজিক উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ করিতে থাকে।

বাংলাদেশের কয়েকটি ধর্মমত এবং তদাশ্রিত সাহিত্য এইরূপ একটা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রূপে বৃহৎ বাঙালী সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছে যে সমাজ তাহার সম্বন্ধে এই কথাটি স্পষ্ট মনে রাখিতে হইবে যে তাহা একটা বড় 'বাঙালী সমাজ' ; তাহা 'বাঙালী সমাজ' এই জন্য যে সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত জনগণ তাহাদিগকে হিন্দু

মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান রূপে অত্যন্তভাবে পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লয় নাই; অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস রূপে যে সম্প্রদায় যে মতই গ্রহণ করিয়া থাকুক না কেন সাংস্কৃতিক জীবনে আভ্যন্তরীণ চিত্ত-প্রবণতার বিচারে তাহাদের একটা অখণ্ড 'বাঙালী' পরিচয় ছিল। বাঙলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৈষ্ণব-ধর্ম ও সাহিত্য, নাথ-ধর্ম ও সাহিত্য ও বিভিন্ন সহজিয়া-ধর্ম ও সাহিত্য এইরূপে বাংলার সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; তাহার ফলে বৃহৎ বাঙালী সমাজ যখন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান আদি রূপে নিজেদের ধর্মের ক্ষেত্রে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে লাগিল তখনও তাহার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে কেহই পরিত্যাগ করিল না, তাহারা সেই সংস্কৃতি-প্রভাবিত চিত্তপ্রবণতাকে পৃথক্ পৃথক্ ধর্মের ক্ষেত্রেও সক্রিয় করিয়া লইল। সেই কারণে দেখিতে পাই বাঙলাদেশের হিন্দু যেমন 'বাঙালী হিন্দু', বাঙলাদেশের মুসলমানও তেমনই 'বাঙালী মুসলমান,' বাংলাদেশের বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানগণেরও তাই একটা বিশেষ বাঙালী পরিচয় আছে।

ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে একটি 'কৃষ্ণচৈতন্য' রূপে, অর্থাৎ একটি বিশেষ ভগবৎচৈতন্যের মূর্তবিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইলেন বাঙালীর সমগ্র জাতীয় জীবনের ইতিহাসেই তাহার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয়। তৎপ্রবর্তিত ধর্মের মূল কথা হইল এই যে, ধর্মকে স্পষ্টসিদ্ধান্তহীন ন্যায়ের তর্কজালের মধ্যে আবৃত এবং বন্ধ্যা করিয়া রাখিলে চলিবে না, শ্রুতি-স্মৃতি-নির্ধারিত আচার-বিচার, যাগযজ্ঞাদির কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা বিশেষ ক্রিয়াবিধিতে পরিণতি করিয়া রাখিলেও চলিবে না; ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এমন একটি ভগবৎ-চৈতন্যের উপরে যাহা সহজভাবে জীব ও ভগবানের ভিতরকার একটি প্রেম-সম্বন্ধ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্য করিয়া তোলে। চৈতন্য-দেবের জীবন ও বাক্যকে অবলম্বন করিয়াও শাস্ত্র গড়িয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্মের মূল কথা যেটি তাহা সমগ্র বাঙলা দেশে ছড়াইয়া পড়িল অসংখ্য গানে গানে। তাই তাহার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব সক্রিয় হইয়া উঠিল সর্বস্তরের বাঙালী জাতিরই মননের উপরে—অনেকখানি জাতিধর্মনিরপেক্ষ ভাবে।

বাঙালী-চিত্তের উপর বৈষ্ণব সাহিত্যের যে প্রভাব তাহারও জাতিধর্ম-নিরপেক্ষ ভাবে একটি সামগ্রিক রূপ আছে। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও তাহার প্রকাশভঙ্গি আমাদিগকে এমন ভাবেই

পাইয়া বসিয়াছিল যে মনে হয়, দীর্ঘ চারি-পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া একটি সমগ্রজাতি তাহার মনের যত প্রেমের কথা তাহা ঐ রাধাকৃষ্ণের বাঁধুনিতে এবং সেই ব্রজলীলার ছন্দে ভাষায়ই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভাবের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গির দিক হইতেও জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সর্বস্তরের বাঙালী কবিগণকেই কতখানি প্রভাবিত করিয়াছেন তাহার প্রমাণ দেখিতে পাই সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি দৌলত কাজির 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যের কিছু কিছু বর্ণনার মধ্যে। যেমন—

আয় ধনী কুজনী কি মোক শুনাওসি
বেদ উকতি নহে পাঠং।
লাখ উপায়ে মিটাতে কে পারয়
যো বিধি লিখিল ললাটং॥
না বোল না বোল, ধাই, অনুচিত বাণী।
ধরম না চাহসি তেজি সতীত্ব মতি
লোর-প্রেমে করাওসি হানি॥
মোহর সুনায়ক গুণের পালক
মধুর মুরতি মুখ ভেশং।
সো মধু তেজিয়ে করাওসি বিষ-পান
ভাল, ধাই, কহ উপদেশং॥…
দুরন্ত দুর্মতি দূতি দূতীপনা দূর করি
চিন্তহ মোর কল্যাণং।
কাজি দৌলতে ভণে, দাতা মনোভব মনে
শ্রীযুত আশরফ খানং॥[১]

জয়দেব কবির 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত পদ্যও দেখিতে পাওয়া যায় এই কাব্যের মধ্যে। যেমন—

ভাদ্রমাসে-চন্দ্রমুখী সুচরিতা একাকিনী
বসতি তিমির অতি ঘোরং।
অধর মধুরৌ তাম্বুল বিনা ধূসরৌ
নিচল চকোর আঁখি ঝোরং॥

১ 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যের শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল কর্তৃক লিখিত ভূমিকা, সাহিত্য-প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী), ১৮-১৯ পৃ।

রাণী লো ময়নাবতী, তেজ নিজ মান পরিখেদং।
দুরন্ত বিরহানল দহতি তব অন্তর
তথাপি ন চেতন ময়না চেতং ॥
বকফুল মঞ্জরী কিমিতি অতি সীদতি
মলিন অঞ্জন মুখ ভেশং।
বিষাদিত বিলপসি সকল দিন যামিনী
অবিরত বিকল বিশেষং ॥ ইত্যাদি।[২]

উদ্ধৃত পদগুলির কাব্যমূল্যের কোনও কথা বর্তমান প্রসঙ্গে উঠিতেছে না, অনুকরণ হিসাবেও এগুলি হয়ত অসার্থক; কিন্তু অন্য একটি দিক হইতে ইহারা সার্থক, প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব কিরূপ সর্বাতিশয়ী ছিল তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ রূপে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় 'বাঙ্গলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' নাম দিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে এই জাতীয় ১০২ জন মুসলমান কবি লিখিত ১০২টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পদোদ্ধৃতির পরে তিনি এই সকল মুসলমান কবিগণের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাইতেছি যে এই কবিগণের মধ্যে দুই-চারিজন কবি কিছু প্রাচীন হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু অধিকাংশই হইলেন উনবিংশ শতাব্দীর এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। এই সময়ের মধ্যে ধর্মমননের ক্ষেত্রে কতগুলি ভাব বাংলার জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে। উচ্চ কোটির বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চিন্তা-পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও কতগুলি ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বজাতীয় জনমনের ভিতরে একটা আশ্চর্য ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয়। এই ভাব-চিন্তাগুলির প্রকাশের ক্ষেত্রেও কতগুলি বহুস্বীকৃত পদ্ধতির জনপ্রিয়তাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেই ভাবৈক্য এবং প্রকাশ-ভঙ্গির সমতা কিভাবে এই মুসলমান কবিগণ লিখিত রাধাকৃষ্ণ-কবিতার মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে সেই কথাটাই আমরা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বাংলার মুসলমান কবিগণ রাধাকৃষ্ণকে লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা কোনও বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব

২ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২১-২২।

ধর্মের আওতায় রচিত নহে। ফলে দেখা যায় বাংলাদেশে যে জনপ্রিয় ভক্তিধর্ম বাংলার মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াও সেই ভক্তিধর্মই প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইহাতে এই মুসলমান কবিগণরচিত রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের লীলা হইতে অনেকখানি পৃথক্ হইয়া দেখা দিয়াছে। আমরা জানি, বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণ অবলম্বনে যে প্রেমলীলার অসংখ্য কবিতা বা গান রচিত হইয়াছে সেই গানে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, এখানকার যত প্রেমলীলা তাহার ভিতরে মানুষের কোনও স্থান নাই। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, লীলা হইতেছে নিত্যকাল অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে (স্বরূপ-ধামে) কৃষ্ণ এবং তাঁহার হ্লাদিন্যাত্মক স্বরূপশক্তি রাধার সঙ্গে; জীব সেখানে লীলা-পরিকরভূত সাক্ষী মাত্র, সে দূর হইতে লীলা দর্শন ও আস্বাদন করে এবং কথায় সুরে সেই লীলার কীর্তন করে। শ্রীরাধা এবং স্বরূপভূত নিত্যসিদ্ধ গোপগোপীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলার কোনও অধিকার নাই; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনবাসনাও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। সুতরাং আমরা সাধারণভাবে ভক্তিধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক হইয়া মিলিবার আকাঙ্ক্ষা করি ইহা আমাদের হৃদয়সম্মত হইলেও বৈষ্ণবশাস্ত্রসম্মত নহে। আমরা পূর্বে এ-কথার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যের আলবারভক্তগণ যেরূপ নিজেদের নায়িকাভাবে পরিভাবিত করিয়া পরমদয়িত ভগবানের প্রতি প্রেম নিবেদন করিয়াছেন এবং মধুররসাশ্রিত সাধনাকে অবলম্বন করিয়াছেন বাংলা বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে কোথাও তাহার আভাস মিলিবে না। হিন্দীর ভক্তকবি মীরা যেমন করিয়া নিশিদিন প্রেমবিহ্বলা হইয়া তাঁহার পরম 'প্রীতম' গিরিধারীলালের মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, অথবা হিন্দীর অষ্টছাপের কবিগণও স্থানে স্থানে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার অংশীদার হইবার ব্যাকুল বাসনা জানাইয়াছেন বাংলা বৈষ্ণব কবিতায় তাহার কোথাও আভাস নাই, থাকিবারও কথা নহে। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাধনা হইল সখীর সখী যে মঞ্জরীগণ তাঁহাদেরই 'অনুগা'ভাবে; সখীগণেরই কখনও কৃষ্ণের সহিত মিলন নাই, সে ক্ষেত্রে মঞ্জরীর 'অনুগা'-গণের কৃষ্ণ-মিলনের তো কোনও কথাই উঠিতে পারে না।

বৈষ্ণব ধর্মের 'সাধ্য' ও 'সাধন' সম্বন্ধে এইসব তত্ত্ব বাংলাদেশে অবশ্য

ষোড়শ শতকে গড়িয়া উঠিয়াছে বৃন্দাবনস্থিত গোস্বামিগণের ধ্যান-মননে; কিন্তু আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করিতে পারি যে বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই ভাবদৃষ্টিটি চলিয়া আসিয়াছে দ্বাদশ শতকের বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে। জয়দেব তাঁহার সমগ্র 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে লীলা-কীর্তন করিয়া শুধু লীলার জয়-জয়কারই ঘোষণা করিলেন, নিজে কোথাও সেই লীলার অংশীদার হইতে চাহিলেন না। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও আমরা সেই একই সত্য লাভ করিতে পারি। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী কবিগণের তো কথাই নাই। কবিগণ কোনও ধার্মিক বা দার্শনিক সচেতনতা লইয়াই যে এইভাবে রাধাকৃষ্ণের গান রচনা করিয়াছেন তাহা নহে, এইটাই দেখা দিয়াছে বাংলাদেশের চলতি ভঙ্গিরূপে। হয়ত এই চলতি ভঙ্গিই প্রভাবিত করিয়াছে বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনকেও।

কিন্তু রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে ইহাই বাংলার কবিগণের চলতি ভঙ্গি বটে, বৈষ্ণব ধার্মিক এবং দার্শনিকগণেরও ইহাই তত্ত্বসম্মত আদর্শ এবং সাধন-প্রণালী বটে; কিন্তু বাংলার বৃহৎ জনসমাজে রাধাকৃষ্ণলীলার ফলশ্রুতি কি? কোনও আসরে যখন একটি বিশেষ লীলা-সম্বলিত কীর্তনপদাবলী গীত হয় তখন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব সাধক যিনি তিনি নিজেকে একজন বৃন্দাবনের পরিকররূপে পরিভাবিত করিয়া লইবেন এবং লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আত্মানন্দ-অনুভবের যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই সম্ভাবনাকেই কি করিয়া তিনি আস্বাদন করিতেছেন তাহা স্মরণ-মননের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বৃহৎ জনসাধারণের মধ্যে এই লীলা-কীর্তনের ফলশ্রুতি দেখা দেয় ভিন্ন-ভাবে। শ্রোতা যেখানে আদৌ ধর্মবাসিতচিত্ত নহেন, সেখানে ফলশ্রুতি সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহার কথা ছাড়িয়া দিতেছি। যেখানে ধর্মপ্রবণতা আছে সেখানে রাধার সকল প্রেমের আর্তি কৃষ্ণৈকচিত্ত পরমভক্তের হৃদয়-আর্তি বলিয়াই গৃহীত হইবে; রাধার সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সকল বিঘ্নবাধাকে অতিক্রম করিয়া যে কৃষ্ণমিলনাকাঙ্ক্ষা তাহা প্রেমের পথের পথিক সাধকের প্রেমসাধনার প্রতি-চ্ছবিতেই গৃহীত হইবে। ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে এই ফলশ্রুতি হয়ত নিজেকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রেমের জন্য সর্বস্বত্যাগিনী রাধার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবার প্রেরণায় পর্যবসিত হইবে।

বাঙালী হিন্দুগণের মধ্যে যত বৈষ্ণব কবিই হইয়াছেন তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণবদর্শনসম্মত বৈষ্ণব হোন বা না হোন, একই ঐতিহ্যধারা দ্বারা জ্ঞাতে-

অজ্ঞাতে প্রভাবিত হইয়া তাঁহারা মোটামুটিভাবে সেই মুখ্য ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যরূপ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দিল মুসলমান কবিগণের ভিতরে; কারণ তাঁহারা চৈতন্যপ্রবর্তিত একটা সাধারণ প্রেমধর্মের প্রভাব সামাজিক উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিলেন, একটা সাহিত্যিক বিষয়-বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গিও উত্তরাধিকারসূত্রেই পাইলেন, কিন্তু পাইলেন না রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে কোনও স্থিরবদ্ধ ভাবদৃষ্টি। সুতরাং বাংলার জনসমাজে যে সাধারণ ভক্তিধর্ম ও যোগধর্ম প্রচলিত ছিল এই সকল কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সেই সকলের সঙ্গেই যুক্ত করিয়া লইলেন।

বাংলাদেশের প্রেমপন্থী মুসলমান সাধকগণ অল্পবিস্তর সকলেই সুফীপন্থী। সুফীমতে প্রেমই হইল ভগবানের পরম স্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই আবার এই জগৎসৃষ্টি। নিজের অনন্ত প্রেম আস্বাদনের জন্যই এক পরমস্বরূপের বহুরূপে লীলা, ইহাই হইল সৃষ্টির তাৎপর্য। জীব হইল এই 'একে'র সৃষ্টি-লীলার প্রধান শরিক—লীলা-দোসর। কিন্তু লীলার পাকে পড়িয়াও 'এক' তাঁহার সেই পরম প্রেমস্বরূপতাকে কখনও ভুলিয়া যান নাই—কিন্তু জীব তাহার প্রেম-স্বরূপতাকে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবকে তাহার আপাতপৃথক্ সত্যকে ভুলিয়া যাইতে হইবে—ইহাই তাহার বড় সাধনা। যিনি মূল প্রেম-স্বরূপ তিনিই ত হইলেন পরম দয়িত— সেই পরম দয়িতের 'প্রেম-দিবানী' হইয়া উঠিতে হইবে জীবকে। প্রেম-সমাধিতে ('ফানা') যে আত্মস্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি তাহাই সুগম করিয়া দেয় অনন্তের সঙ্গে নিত্য মিলনের পথ।

বাংলার যে সুফীধর্ম—শুধু বাংলার নয়, ভারতবর্ষেরই যে সুফীধর্ম—ইহা একটি মিশ্রধর্ম; ইহার ভিতরে পারস্যের প্রেমধর্মের সহিত ভারতবর্ষের প্রেমধর্মের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে। ফলে ভারতবর্ষের প্রেমধর্মের কাহিনী-উপাখ্যানও সুফীধর্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। সুফী প্রেমধর্ম এবং বাংলার প্রেমধর্ম জনগণের মধ্যে যে একটি জনপ্রিয় সহজ সমন্বয় লাভ করিয়াছে বাংলাদেশের মুসলমান কবিগণ সেই সমন্বয়জাত প্রেমধর্মের আদর্শের সহিত রাধাকৃষ্ণকে অনেক স্থলে মিশাইয়া লইয়াছেন। ফলে রাধার যে পূর্বরাগ অনুরাগ বিরহের আর্তি তাহা কবিগণের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পরম দয়িতের জন্য নিখিল প্রেমসাধকগণের পূর্বরাগ অনুরাগ বিরহের আর্তিতেই পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং সেই আর্তির ক্ষেত্রে কবি নিজেকে শুধু দর্শক বা আস্বাদক-রূপে খানিকটা দূরে সরাইয়া লন নাই, নিখিল আর্তির সহিত নিজের চিত্তের

আর্তিকেও মিলাইয়া দিয়াছেন। ইহারই ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের ভাবদৃষ্টি হইতে বঙ্গীয় মুসলমান কবিগণের ভাবদৃষ্টি অনেক স্থানে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু বৈষ্ণব কবিগণের ভাবদৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহাদের পদের ভণিতায়; এই ভণিতাচ্ছলে বৈষ্ণব কবিগণ নিজেদের কিছু কিছু মন্তব্যাদি যোগ করিয়া দিয়াছেন—তাহার মধ্যেই তাঁহাদের ভাবদৃষ্টির ইঙ্গিত রহিয়াছে। আমরা মুসলমান কবিগণের রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধীয় পদগুলির ভণিতা লক্ষ্য করিলেই এই কবিগণের মূল ভাবদৃষ্টিরও ইঙ্গিত পাইব। আমরা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে পদ-সংগ্রহের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার ভিতরে প্রথমেই দেখিতে পাই কৃষ্ণকে বলা হইতেছে—

তোমার কঠিন হিয়া, ভজ নানা নারী লৈয়া,
কোথা গেলা বসি রৈনু আমি।
পালঙ্ক সাজাই নারী, জাগিয়া কান্দিয়া পুড়ি,
নিশি গেল না আসিলা তুমি॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে, প্রভু ভাব রাত্রিদিনে,
মায়াজালে না করিও হেলা।
আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী
আর কি পাইব তব মেলা॥ ৩ সংখ্যক

ইহার ভিতরে প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারি, যাঁহার জন্য পালঙ্ক সাজাইয়া রাখিয়া জাগিয়া কাঁদিয়া পুড়িতে হইয়াছে তিনি কিছু পরেই এক সার্বজনীন 'প্রভু'রূপ ধারণ করিয়াছেন। বাংলাদেশের এই 'প্রভু'টির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বৈষ্ণবগণের 'কৃষ্ণ', সাধারণ হিন্দুগণের 'হরি', মুসলমানগণের 'খোদা' এবং খ্রীস্টানগণের 'গড্' ভাঙিয়া বাংলাদেশের এই সার্বজনীন 'প্রভু'র উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণ-কথা কহিতে কহিতে আসিয়া এই 'প্রভু ভাব রাত্রিদিনে' কথা বলার বিশেষ তাৎপর্য আছে—অর্থাৎ কৃষ্ণকে এখানে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবতার গণ্ডী হইতে লইয়া আসিয়া বাংলার জনমানসের সাধারণ পরমদয়িতের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল; এই যুক্তির ফলে রাধাও ব্রজকুঞ্জ-নিকুঞ্জ হইতে মুক্তি পাইয়া সকল 'প্রেম-দিয়ানী' সাধকের সহিত একাত্মা হইয়া গেল; তখন আর এই রাধার স্থান কবির নিজের গ্রহণ করিতে কোনও বাধা রহিল না, তখন কবি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—

আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী,
আর কি পাইব তব মেলা ॥

কবি আকবর আলীর পূর্বরাগের (স্বপ্নদর্শন) যে পদটি রহিয়াছে সেখানেও লক্ষ্য করিতে পারি এই একই সত্য—

একা ঘরে শুইয়া থাকি, সুতিলে স্বপন দেখি।
ও আমার কর্মদোষে না পাইলাম জাগিয়া ॥
ছারাল আকবর আলী বলে, পিরিতে মর অঙ্গ জলে।
ও বন্দে প্রাণে মাইল স্বপ্নে দেখা দিয়া ॥ ৫ সং

এখানেও বলা যাইতে পারে, 'ছারাল' আকবর আলী অতি সহজভাবেই কৃষ্ণ-লীলায় শ্রীরাধার স্থান দখল করিয়া লইয়াছেন, অথবা বলিতে পারি নিজেকে রাধা-স্থানীয় করিয়া লইয়াছেন। কবির নিজেকে এই রাধা-স্থানীয় করিয়া লইবার দৃষ্টান্ত বহু কবিতার মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি। নিজেকে রাধার ন্যায় প্রেম-দিরানী মনে করিয়াই কবি প্রশ্ন করিয়াছেন এই প্রেমপথের পরম-অভিজ্ঞা রাধাকে—

তোরে মিনয় করি, চরণ ধরি, বৈলা দে গো রাই ;
হৃদয়ের ধন রতনমণি, কোথায় গেলে পাই।

যুগে যুগে দেশে দেশে সকল 'প্রেম-পাগলিনী'গণের সঙ্গে রাধার যে একটি স্বাজাত্য রহিয়াছে, অথবা রাধা যে নিখিল-প্রেমপাগলিনীর প্রতীক এই সত্যের ব্যঞ্জনা অনেক পদের মধ্যেই লাভ করি ; এই ব্যঞ্জনাকে অবলম্বন করিয়া এই পদগুলিতে রাধা ও পদকর্তা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। নিম্নে যে কবিগণের ভণিতাসহ পদ্যাংশগুলি উদ্ধৃত করিতেছি তাহার প্রত্যেকটির মধ্যেই এই সত্য লক্ষণীয়।

যে যাইব জলের ঘাটে নতুন যৌবন লইয়া।
ঐ বন্দের চরণে দিব কুলমান সঁপিয়া ॥
আবুল হছনে বলে সে রূপ না পাইয়া।
নয়ানের পলক বাদী, দেখিলাম ভাবিয়া ॥ ১১ সং
দেখা দিয়া না দেয় দেখা একি বিসম জ্বালা।
ঘরের বৈরি যৌবন পতি বাইরে চিকণ কালা ॥
অধম আসরফে বলে কি বুঝ মন পাখী।
বন্ধুয়ার চরণ বিনে উপায় নাই দেখি ॥ ১৮ সং

কালার পিরিতে ডুবি লুটাইয়াছি কুলমান।
প্রেমের পোড়া, আঙ্গার কালা, কালা গো কালাম ॥
চউকের পুতুলা কালা আর যে আছমান।
উদাসীয়ার অঙ্গ কালা না পাইয়া তোমার নিশান ॥ ২২ সং

যখনে পিরিতি কৈলা, দিবারাত্রি আইলা গেলা,
ভিন্নভাব না আছিল মনে।
সাধিয়া আপন কাজ, কুলেতে রাখিলা লাজ,
ফিরিয়া না চাহ আঁখি কোণে ॥
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া আনলেতে তৃণ দিয়া,
কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া ?
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে, জল ঢাল সে আনলে,
নিবাও লো প্রেমরস দিয়া ॥ ৩০ সং

চাঁদকাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমুনা'জীমুনা আমি না দেখিলে হরি ॥ ৪০ সং

মোরে কর দয়া দেহ পদ-ছায়া
শুনহ পরাণ-কানু।
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু ॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিলু তুযা পায়ে
জীবন-মরণ ভরি ॥ ৭০ সং

আরকুম রচিত একটি পদে দেখিতে পাই, খণ্ডিতাভাবের পদের ভিতরে রাধার বাম্যতার স্থলে মিনতি দেখা দিয়াছে।

আজ নিশাকালে রে সাম, আজ নিশাকালে
আমারে ছাড়িয়া কালা কার কুঞ্জে রহিলে ॥
মমের বাতি, সারা রাত্রি, জুড় পালঙ্গে জ্বলে,
দয়া গুণে প্রাণ বন্ধু আইস রাধার কুলে ॥

কিন্তু এই পদটির শেষেই যখন দেখিতে পাই—

পাগল আরকুম বলে, শিশুকালে, প্রেম না করিলে,
না আসিব প্রাণবন্ধু রাত্রি নিশাকালে ॥

তখন এই ভণিতা ও মন্তব্য সমস্ত পদটিরই পারিপার্শ্বিকতা এবং অধ্যাত্মব্যঞ্জনা বদলাইয়া দিল। শিশুকালে প্রেম না করিলে রাত্রিনিশাকালে প্রাণবন্ধুকে

পাওয়া যায় না কথার ইঙ্গিত কোন্ দিকে? জীবনের প্রভাত হইতে প্রেমের পথে না চলিলে, প্রেম-সাধনাকে সমগ্র জীবনব্যাপী না করিয়া লইলে, জীবন-নিশাতে কখনও সেই প্রাণবন্ধুর দেখা মেলে না। এই অর্থের আলোতে দেখিতে পাইব, রাধার যে 'আজ নিশাকালে' তাহার জীবনকুঞ্জে শ্যামকে আহ্বান ইহার সুরের মিল বৈষ্ণব কবিতার বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভৃতির পদের সাধারণ সুরের সঙ্গে নহে।

বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণলীলার যত বিস্তার ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে নৌকা-লীলা বা নৌকা-বিলাসের লীলা-বিস্তারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; উল্লেখ-যোগ্য এই কারণে যে যতদূর আমাদের জানা আছে তাহাতে এ-জাতীয় লীলা বাংলা বৈষ্ণবসাহিত্যেই পাওয়া যায়, অন্য সাহিত্যে পাওয়া যায় না, পুরাণাদিতেও বিশেষ পাওয়া যায় না। আমাদের বিশ্বাস নদীমাতৃক বাংলা-দেশের ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হইতেই বাংলাদেশের কবিমানসে ইহার উৎপত্তি ও বিস্তার। নিষ্ঠাবান্ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দৃষ্টিতে ইহা রাধা-কৃষ্ণের অনন্ত অপ্রাকৃত লীলাবৈচিত্র্যের একটি প্রকারভেদ মাত্র—ভক্ত সাধককে ইহাকেও লীলা-পরিকরভাবে দূর হইতে দর্শন ও আস্বাদন করিতে হইবে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, এই যে প্রভাতবেলা ওপার হইতে এপারে আসিয়া সারাদিন বিষয়কর্মে রত থাকিয়া বেলা শেষে আবার ওপারে যাইবার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় 'পাড়ী'র জন্য খেয়াঘাটে বসিয়া থাকা—এই ঘটনাটি বহুদিন পূর্ব হইতে বাঙালীর কবিচিত্তে এক উদাস অধ্যাত্মভাব উদ্রিক্ত করিয়া আসিয়াছে; পাড়ের জন্য অপেক্ষা বাঙালীচিত্তে ভবপারের ব্যাকুলতা, পরম্পারের অজ্ঞাত রহস্য এবং অজানা 'পাড়ী'র কাছে আত্মসমর্পণের ভাবকেই উদ্রিক্ত করিয়াছে। 'উন্মর' কবি রচিত একটি পদে দেখি—

> আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার।
> প্রেম সাগরে ধইলাম গো পাড়ি না জানি সাতার॥…
> উন্মর পাগলে কয় সুনছি তুমি দয়াময় গো।
> এগো দিয়া তরি শীঘ্র করি এখন মরে কর পার॥
> আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার॥ ২৩ সং

পদটি নৌকা-বিলাসের ভিতরেই বাঙালীর সেই স্থিরবদ্ধ অধ্যাত্মভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে। স্থিরবদ্ধ অধ্যাত্মভাব বলিতেছি এইজন্য পদকর্তাগণ যেভাব

অবলম্বন করিয়াই পদরচনা করিয়া থাকুন না কেন, কীর্তন-পদাবলীর শ্রোতাগণকে পদগুলি সেই অধ্যাত্মব্যঞ্জনাতেই মুগ্ধ করে। কীর্তনীয়াগণ যখন আখরের দ্বারা পদগুলির ভাব-সম্প্রসারণ করিতে থাকেন তখন তাঁহারাও এই আধ্যাত্মিকভাবেই পদগুলির অর্থের বিস্তার করিতে থাকেন। কৃষ্ণ রাধার নিকট যখন পারের কড়ি চায় রাধা তখন এক আনা দু আনা করিয়া দর কষাকষি করিতে থাকে; গায়ক তখন নিজেই শুধু রাধা নয়, আসরস্থ সকলের প্রতি উপদেশ দিয়া সুরে বলেন, 'ষোল আনাই ঢেলে দাও—গোবিন্দায় নমঃ বলে ষোল আনাই ঢেলে দাও'। আসরের শ্রোতৃমণ্ডলীও এই উপদেশ পাইয়াই সুখী। সমস্ত জিনিসটি লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায় কীর্তন-আসরেও নৌকা-বিলাসের আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোন্ দিকে। এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের প্রসিদ্ধ পদকর্তা জ্ঞানদাসেরও একটি পদ উদ্ধার করা যাইতে পারে; তিনিও নৌকা-বিলাস লীলা-গানের মধ্যে যে ইঙ্গিতটি দিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পদটি এই—

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ॥
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হৈয়া থাক দেখি।
এখনি না ভাবহ বিষাদ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের চট্টগ্রামবাসী আলিরাজা (ওরফে কানু ফকির) প্রেম ও যোগধর্ম মিশ্রিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'জ্ঞান-সাগর' গ্রন্থখানিতে জনপ্রিয় হিন্দুধর্ম ও জনপ্রিয় মুসলমান ধর্মের ভাবধারার একটি চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করিতে পারি। এই আলিরাজার একটি পদ আছে—

শুন সখি সার কথা মোর।
কুলবধূ প্রাণি হরে সে কেমন চোর॥
সে নাগর চিত্তচোরা কালা যার নাম।
জিতা রাখি প্রাণি হরে বড় চৌর্য কাম॥

মোর জিউ সে কি মতে লই গেল হরি।
শূন্য ঘরে প্রেমানলে পুড়ি আমি মরি ॥
গুরুপদে আলিরাজা গাহে প্রেম ধরে।
প্রেম খেলে নানারূপে প্রতি ঘরে ঘরে ॥

এখানে লক্ষ্য করিতে পারি, ব্রজের নাগর 'কালা'র যে 'কুলবধুপ্রাণি' হরণ করা লীলা তাহা যে পরব্যোমের ওপারে কোন অপ্রাকৃত বৃন্দাবনেই সংঘটিত হইতেছে তাহা নহে, প্রতি ঘরে ঘরে—অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই চলিতেছে 'নাগর কালা'র এই প্রেমলীলা, গুরুপদ আশ্রয় করিয়া চিত্তবিশুদ্ধির সাধনায় অগ্রসর হইলেই এই সত্য উপলব্ধি করা যাইবে। এই সত্যই প্রকাশ পাইয়াছে ইরপান কবির একটি পদেও—

ছারাল সা ইরপানে কইন বন্ধু আমার বংশীধারী।
ওরে বাজাইয়া মোহন বাঁশী আমার প্রাণী কৈল চুরি ॥ ২০ সং

আলিরাজার পূর্বোদ্ধৃত পদটিতে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে মুন্সী বিলায়েত হোসেনের (ইনি কালীপ্রসন্ন ভণিতায় শ্যামাসংগীত ও বৈষ্ণবসংগীত রচনা করিতেন) একটি পদেও সেই তত্ত্বের সন্ধান পাই।—

প্রেম কি গাছের ফল পাড়িবে করিয়া বল।
দেহ প্রাণ করিলে নাশ মিলে সে চিকণ কালা ॥
কালীপ্রসন্ন এই বলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভূমণ্ডলে
চলিতেছে কালে কালে সকলি তাঁর লীলাখেলা ॥

কৃষ্ণের মায়ার লীলাখেলা স্বর্গ-মর্ত্য-ভূমণ্ডলে চলিতেছে বৈষ্ণব দার্শনিকগণ সে কথা স্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার প্রেমের লীলাখেলাও স্বর্গ মর্ত্য ভূমণ্ডলে চলিতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এ কথা স্বীকার করিবেন না (সহজিয়াগণ ব্যতীত)। কিন্তু গৌড়ীয় মুসলমান কবিগণের সে কথা বলিতে কোনই দ্বিধা ছিল না,— কারণ—

মনরে ছৈয়দ নিয়ামতে কয় আমি না দেখি উপায়।
সঙ্কটতারণ আমার মুর্শিদ শ্যামরায় ॥ ৫৫ নং

শ্যামরায় যে শুধু অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের লীলা-নাগর নয়— সে যে ব্যক্তিজীবনের 'মুর্শিদ'। মুর্শিদ-ভজনেও শ্যামরায়কে পাওয়া যায়, আবার পরম মুর্শিদও হইল শ্যামরায়। মনুঅর কবি বলিয়াছেন—

নআনে লাগিল রূপ আসি আচুম্বিত।
জাগিতে হারায়িলুঁ হরি শোকে দহে চিত॥
কি দেখিলুঁ কি হইল পলক অন্তর।
ভজ গুরু পাইবে পুনি কহে মনুঅর॥ ৭২ সং

মিয়াধনের একটি গানে রাধাভাবে ভাবিত কবির বিরহ-আর্তি সুন্দর প্রকাশ লাভ করিয়াছে—

প্রাণ ললিতা ত্বরা যাও গো বন্ধুরে আনিয়া দাও তরা।
আমি দাসী চির দোষী শ্যাম পিরিতের মরা॥
বন্ধুরে আনিয়া দাও তরা॥ ৭৫ সং

শিতালং ফকির তাঁহার একটি গানে প্রেমপাগল সাধক ভক্তকে প্রেম-পাগলিনী রাধার প্রতিচ্ছবিতে বর্ণনা করিয়াছেন। নব 'পিরীতে'র চিহ্নই হইল এই, সে 'সদায় থাকে উদাসিনী'—আর এই উদাসিনীর মলিন ভাবেই তাহার 'দিবানিশি বেকরার'—দিবানিশিই তাহার অসীম ব্যাকুলতা।

ক্ষুধা নিদ্রা নাই তার মনে জলধারা দুই নয়নে গো
এগো ছির ঘুরে প্রেমধুন্ধে
দিবানিশি ইন্তিজার।
হাসি খুসি নাই তার মনে সদায় থাকে ঘোর নয়নে গো
এগো লাজভয় নাই তার
কলঙ্ক তার অলঙ্কার॥ ৮৮ সং

আমরা বৈষ্ণবগণের রাধার এই বর্ণনা পাইয়াছি, আর পাইয়াছি শ্রীচৈতন্য-দেবের এইরূপ বর্ণনা; সূফী কবিগণের মধ্যে 'প্রেম-দিরানী'র এই বর্ণনা অনেক পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় বাংলার বাউল কবিগণের বর্ণনাতেও। এখানে বাউল বর্ণনার সহিত বৈষ্ণবের রং লাগিয়াছে।

বাংলাদেশের সহজ প্রেম-সাধনার উপরে যোগতন্ত্রের প্রভাব পড়িয়াছে। সে প্রভাব সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া দেখা গিয়াছে একটি সাধারণ বিশ্বাসে যে পরম সত্যরূপ যে পরম দয়িত সে শুধু বাহিরে নয়—সে 'ঘরে'র মধ্যেই রহিয়াছে, আমাদের দেহই হইল সেই 'ঘর'। বৌদ্ধ সহজিয়াগণের গানগুলির মধ্যেই আমরা এই ভাবটির প্রাধান্য লক্ষ্য করিতে পারি, তাঁহারা বার বার বলিয়াছেন, 'দেহহিঁ বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই'—'এই দেহেই বাস করিতেছেন বুদ্ধ—পণ্ডিতেরা সে কথা জানেন না'। তাঁহারা বলিয়াছেন—

অসরীর কোই সরীরহি লুক্কো।
যে তহি জানই সো তহি মুক্কো॥

'অশরীরী একজন আছে এই শরীরের ভিতরেই লুকাইয়া, যে তাহাকে জানে সে-ই হয় মুক্ত।'

আবার—

ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেক্খই পড়িবেসী পুচ্ছই।

'সে আছে (দেহ) ঘরে—তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ বাহিরে! পতি দেখিতেছ, (তাহার কথা) জিজ্ঞাসা করিতেছ প্রতিবেশিগণের নিকটে।'

বৈষ্ণব সহজিয়াগণেরও মূলসুর ছিল—'বস্তু আছে দেহ বর্তমানে'—সব বস্তু বা তত্ত্বই আছে দেহের মধ্যে। ভারতবর্ষীয় সুফী সাধকগণও এই সত্যটি গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙলার বাউলরা ত দেহকেই দেউল করিয়া লইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া বাংলার মুসলমান কবিগণও এই ভাবটির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। এই কবিগণ বলিয়াছেন যে রাধা-কৃষ্ণ অভেদতত্ত্ব—দুই-ই এক—ঘর-ঘরিণী রূপে দুইয়ের লীলা,—কে ঘর কে ঘরিণী বলা শক্ত; রাধা যদি ঘর হয়, কৃষ্ণ হইবে গৃহী, আর কৃষ্ণ যদি ঘর হয়—রাধা তবে ঘরিণী। মোটামুটি ভাবে একই অদ্বয়তত্ত্বের ঘর-ঘরিণী রূপে লীলা।

রাধা কানু এক ঘরে কেহ নহে ভিন্।
রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাত্র দিন।
কানু রাধা এক ঘরে সদায় করে বাস।
চলিয়া যাইবা নিঠুর রাধা কানু হইবা নাশ॥

ইহার পরেই কবি বলিতেছেন—

রাধা কেবা কানু কেবা চিনিবারে চাও।
তনে মনে রুজু হইয়া মুরশিদ বাড়ী যাও॥

এই দেহ-দেহী—মূর্ত ও অমূর্তের—সীমা ও অসীমের লীলা ইহা যদি বুঝিতে হয় তবে সদ্‌গুরুর আশ্রয় ছাড়া অন্য উপায় নাই। অনেক কবি বলিয়াছেন, নিজের দেহই হইল রাধা—তাহার মধ্যে যিনি 'রমণ' তিনিই ত হইলেন কৃষ্ণ। বাহিরের এই রূপ হইল রাধা—তাহার ভিতরকার স্বরূপই ত কৃষ্ণ। রূপ চায় সেই স্বরূপের প্রেমের মধ্যে আপন সার্থকতা, তাইত রাধার কৃষ্ণান্বেষণ। ঘরের মালিককেই যদি খুঁজিয়া বাহির করা না গেল তবে শূন্য ঘরের আর কি সার্থকতা! আবার এরূপ ভাবও দেখিতে পাই যে, দেহ হইল ঘর, এই

ঘরের মধ্যে জীব হইল রাধা, আর পরমাত্মাই হইল কৃষ্ণ। সেই ইঙ্গিত রহিয়াছে ওহাবের একটি গানে—

বন্ধুরে হায় কঠিন বন্ধু, কঠিন তোমার মন রে,
রাখ প্রাণী দরশন দিয়া।
আমি নারী তুমি রে পতি একই গৃহেতে বসতি,
ঘরের গৃহী না পাই ধুড়িয়া॥ ২৬ সং

এই ভাবটিও যেমন পাওয়া যায়, তেমনই এ-ভাবটিও পাওয়া যায় যে দেহ-খাঁচায় কৃষ্ণই হইল সেই বাউলদের বর্ণিত খাঁচার ভিতরকার 'অচিন পাখী'। মন-পবনই হইল সেই অচিন পাখীর পিঞ্জর। খলিল কবি বলিয়াছেন, যতই প্রেম করিতে চেষ্টা করি, 'চঞ্চল কানুরায়'; কখন যে পাখী কোথায় ছুটিয়া পলাইবে ঠিক নাই।—

সখী গো অধম খলিলে পিরিত করি ঠেকিও না,
মন পবন পিঞ্জিরার পাখী ছুটলে ধরা দিবে না। ৩৪ সং

বদিয়ুদ্দিন বলিয়াছেন,—

তোমার কৃপার ফলে, মোহর ভাগ্যের বলে,
আসিয়াছ অবলা মন্দিরে।
এই ঘর আন্ধার করি, একদিন যাইবা ছাড়ি,
কেনে দেখা না দেও রাধারে॥
তনুর অন্তরে পশি, মনুরা রহিছে বসি,
কিরূপে ভজিলে দেখা পাই।
কহন্ত বদিয়ুদ্দিনে, গুরুর আদেশ বিনে,
দেখিবারে আর লক্ষ্য নাই॥ ৬৪নং

এখানে 'অবলা-মন্দির' বা রাধার মন্দির হইল দেহ, এই 'তনুর অন্তরে' রহিয়াছে 'মনুরা'—রূপের অন্তরে স্বরূপ। হুছন কবির গানেও দেখি, এই সত্যের প্রতিধ্বনি—'দেহার মাঝে কালাচান্দ তারে চিন না।' সিরতাজ কবির গানে দেখি, এই 'ঘরের সোআমী'র (স্বামীর) যে সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, সে যে অন্তরের মধ্যে দেখা দিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে না, ইহাই ত চরম বেদনা।

সই সই কি মোর নিশি কি মোর দিশি
কি মোর এ রবি শশী।
ঘরের সোআমী হাসিয়া ন বোলাএ
মুঞি অপরাধী দুখী॥

সই সই ন জানি কি দোষে পিআ মোরে রোষে
নিদআ হৃদএ পিউ।
কহে সিরতাজে সোআমী উদ্দেশে
সহজে তেজিমু জীউ॥ ৯৩ সং

প্রেমধর্মের সঙ্গে যোগধর্মের মিশ্রণের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। শুধু বাংলাদেশে নয়—সমগ্র ভারতবর্ষেই এই জিনিসটি লক্ষ্য করিতে পারি। পূর্বে বলিয়াছি, সূফীরাও প্রেমসাধনার সঙ্গে যোগসাধনা যুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই যোগসাধনা হইল মুখ্যত: দেহবিশুদ্ধি ও চিত্তবিশুদ্ধির জন্য। এই বিশুদ্ধি-সাধনের দ্বারা প্রাণপ্রবাহকে মনঃপ্রবাহের সহিত যুক্ত করিয়া লইতে হয়; বৈষ্ণবরাও বলিয়াছেন,—'প্রাণ মন ঐক্য ক'রে ডাক যশোদা-কুমারে।' এই প্রাণপ্রবাহকে মনঃপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্যই হইল প্রেমসাধনায় যোগসাধনাব প্রয়োজন। মুসলমান কবিগণেব রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার গানের মধ্যে অনেক সময় যোগ-সাধনার বিভিন্ন কথা নানাভাবে ছড়াইয়া আছে। গোলাম হুছনের একটি গানে আছে—

আকাষ্ঠা কাষ্ঠের নাওখানি যমুনার মাঝ।
কাঞ্চাকুরা কালা নিশান শুধু রাধার সাজ॥
আখির মাঝে আখি গুলি রাই নিরখিয়া চাও।
নায়ের মাঝে আছে হরি চরণে নেপুর দিও॥
কর্ণের মাঝে কর্ণ দিয়া রাই নাসিকায় দাঁড় বাহও।
মুখের মাঝে মুখ দিয়া রাই হরির মধু খাইও॥
গলইর মধ্যে নায়ের পন্থ রাই সর্গমুখে যায়।
সুপন্থে চলিলে রাধা হরির লাগ পায়॥ ৩৮ সং

এখানে 'নাওখানি' হইল দেহ নাওখানি, যমুনা এখানে, কাল-প্রবাহ। 'আকাষ্ঠা কাষ্ঠের নাও' অর্থাৎ বাজে কাঠের নাও হইল যোগেব দ্বাবা বিশুদ্ধ হয় নাই এমন দেহ (অপক্ক দেহ)—সুতরাং তাহার 'কুরা' অর্থাৎ নৌকা ঠেলিবার লগিও 'কাঞ্চা'—অর্থাৎ কাঁচা বাঁশের (অমজবুত); কালো নিশানও সেই অবিশুদ্ধিরই প্রতীক; মোটের উপবে দেহমনের কোনও বিশুদ্ধি লাভ ঘটে নাই, বাহিরে শুধু 'রাধার সাজ'। 'আখির মাঝে আখি গুলি'র ইঙ্গিত 'আবৃতচক্ষু:' হইবার দিকে, 'কর্ণের মাঝে কর্ণ' প্রভৃতির ইঙ্গিতও এই ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্তর্মুখীনতার দিকে; 'নায়ের মাঝে আছে হরি' কথার তাৎপর্য দেহের মধ্যে পরম দয়িতকে আবিষ্কার করা এবং উপলব্ধি করা।

'নাসিকায় দাঁড় বাইও' কথার ইঙ্গিত শ্বাসে শ্বাসে জপের প্রতি। 'মুখের মাঝে মুখ দিয়া' কথার ইঙ্গিত একেবারে তাদাত্ম্যের দিকে। 'গলইর মধ্যে নায়ের পন্থ' দেহমধ্যস্থ নাড়ী-চক্র-সাধনার ইঙ্গিত করিতেছে; আর 'সর্গমুখে ধায়' কথাটি সাধকগণের উল্টা-সাধনা বা ঊর্ধ্বসাধনার ব্যঞ্জন দিতেছে। এই কবিরই অপর গান আছে—

আবের পত্তন ঘর খাকের বন্দন।
তার মাঝে করে খেলা সাম নিরঞ্জন ॥
পবনে চালাইয়া দাগ আতসের পানি।
রসের ঠিকুনি ঘর মমের গাছনি ॥···
দুই মুখে ফুটে ফুল ঘরে দিপ যলে।
প্রেম নিরখিয়া দেখ গোলাম হুছন বলে ॥ ৩৯ সং

পদটির ভিতরকার সকল ইঙ্গিত স্পষ্ট করিয়া ধরা যায় না (অনেক সময় পদকর্তার মনেও হয়ত সব কথা স্পষ্ট নয়)—তবে কিছু কিছু ইঙ্গিত গ্রহণ করা যাইতে পারে। 'আবের (জলের) পত্তন (পত্তন, ভিত্তি) ঘর খাকের (মাটির) বন্দন (বন্ধন)' হইল পঞ্চভূতাত্মক দেহ; 'পবনে চালাইয়া দাগ' প্রভৃতির ইঙ্গিত শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা যোগসাধনার প্রতি; 'রসের ঠিকুনি ঘর' সম্ভবত মস্তকস্থিত চক্র; দুইমুখী ফুল বোধহয় সহস্রারস্থিত 'বিশ্বপদ্মে'র (উভয়মুখী পদ্ম) পরিকল্পনার ইঙ্গিত করিতেছে; 'দিপ (দীপ) যলে, (জ্বলে) দিব্যজ্যোতি বা 'নূরে'র সন্ধান দিতেছে।

ছৈয়দ আলীর একটি গানে দেখি—

এই তনে ছাপিয়া রইছে সেই রতন ॥···
রূপের ঘরে রূপ জ্বলতেছে বিনা চক্ষে দরশন ॥
কহিল ফকির ছৈয়দ আলী জিতে না হইল মরণ।
আঠার মোকাম ধুড়ি ত্রিপুন্নিতে দরশন ॥ ৪৩ সং

'রূপের ঘরে রূপ'ই হইল স্বরূপ, তাহাকে 'বিনা চক্ষে দরশন',—ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই স্বরূপ—শুধু বিশুদ্ধচিত্তে সংবেদ্য। জীয়ন্তে মরা না হইলে, অর্থাৎ বাহিরের দেহধর্ম সম্পূর্ণ নিরস্ত না হইলে এই সাধনা হয় না; দেহস্থ ত্রিনাড়ীর (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না = গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী) সংগম যেখানে সেখানেই ত্রিধারা মিশিয়া ঊর্ধ্বস্রোতা একধারা হইয়া যায়—সেই ত্রিবেণীতেই ত বেণীমাধব কৃষ্ণের দর্শন মিলে।

যোগসাধনার মধ্যে নাদ-সাধন মধ্যযুগের অনেক প্রেমসাধক সম্প্রদায় গ্রহণ

করিয়াছেন। নাদ-সাধনের মধ্যে অনাহত-ধ্বনিতত্ত্ব একটি প্রধানতত্ত্ব। কোন কোন মুসলমান কবি শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির সহিত এই অনাহত নাদতত্ত্বকে মিলাইয়া লইয়াছেন, জালালউদ্দীনের গানে সেই তত্ত্বের আভাস পাই।—

আয় না রে ভাই শুনি অপরূপ রূপধ্বনি
ঝঙ্কারে বাজিছে দিনরজনী।
কে বাজায় কোথায় বসে চলো যাই তার উদ্দেশে
মন কাহাইয়া সেই দেশে তারে চিন নি॥ ৪৪ সং

রহিমুদ্দিনও বলিয়াছেন—

ত্রিপুন্নিয়ার (=ত্রিবেণীর) ঘাটে বসি কালাচান্দে বাজায় বাঁশী গো
এগো বাঁশীর স্বরে প্রাণী হরে করিল মোরে উদাসিনী।…
দমে নামে মিলন করি বাঁশীর উপর ধ্যান করি গো
এগো দেখ চাইয়া তোর লা মোকামে (=দেহে) বিরাজ করে নীলমণি। ৮৩ সং

আমরা আলোচনার আরম্ভেই বলিয়াছি, বাংলাদেশের মুসলমান কবিগণ কর্তৃক রচিত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা বিষয়ক এই পদগুলির সাহিত্যিক মূল্য হয়ত খুব বেশি নয়; কিন্তু বৈষ্ণব ভাবদৃষ্টি মুসলমান কবিগণের ভিতরে গিয়া কি রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে তাহা সত্যই আমাদের লক্ষণীয়। বাংলার সামগ্রিক ধ্যান-মননের পরিচয়ে এই পদগুলির মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। আর আমরা লক্ষ্য করিতে পারিলাম, বাঙলাদেশে রাধাবাদ সমাজের বিভিন্ন স্তরে কত রকমের বিস্তার এবং পরিণতি লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থ-পঞ্জী

অগ্নিপুরাণ—১৮, ১৯, ১৯ পা *

অথর্ব উপনিষদ্—২০৩

অথর্ব বেদ—৮, ৯, ১৯, ২৭৪

অধ্যক্ষ কৃষ্ণমাচার্য লিখিত জয়াখ্য-সংহিতার সংস্কৃত ভূমিকা—২৪ পা

অবস্কিওর্ রিলিজিয়াস্ কাল্ট্স্ এ্যাজ্ ব্যাক্-গ্রাউণ্ড্ অব্ বেঙ্গলী লিটারেচার—এস্, বি, দাশগুপ্ত (Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature)—৬, ৮৫, ২৫৩ পা, ২৫৪ পা

অমরুশতক—১৪২, ১৪৬, ১৪৮, ১৬৮

অলঙ্কার-কৌস্তুভ (কবিকর্ণপূর)—১১৯, ২২৩

অষ্টছাপ ঔর বল্লভ সম্প্রদায় (হিন্দী)—শ্রীদীনদয়াল গুপ্ত প্রণীত—২৮৭ পা, ২৯০-৯৬ পা

অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা—দেবশিখামণি রামানুজাচার্য সম্পাদিত (অডেয়ার পুস্তকালয় প্রকাশিত)—১৭, ২২-৩৬ পা

আদিপুরাণ—১০৭

আনন্দচন্দ্রিকা টীকা—২২১ পা

আনন্দ-ভৈরব—৭-৩৭ পা।

আর্লি হিস্ট্রি অব্ বৈষ্ণবিজম্ ইন্ সাউথ ইণ্ডিয়া—এস্, কে, আয়েঙ্গার (Early History of Vaisnavism in South India)—১১১ পা

ইন্ট্রোডাক্শান্ টু দি পঞ্চরাত্র এ্যাণ্ড দি অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা—স্চ্রাডার (Introduction to the Pancharatra and the Ahirbudhnya-Samhita)—২৪ পা, ৩০-৩২ পা, ৩৫ পা

ইন্ট্রোডাক্শান্ টু তান্ত্রিক বুদ্ধিজ্ম্—এস্, বি, দাশগুপ্ত (Introduction to Tantric Buddhism)—২৫৩ পা

ইণ্ডিয়ান্ এ্যাণ্টিকোয়ারী (Indian Antiquary)—১১৮-২০ পা

ইণ্ডিয়ান্ বুদ্ধিস্ট্ আইকোনোগ্রাফি—ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য (Indian Buddhist Iconography)—৫ পা

ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা (কা-সং-গ্র-মা)—৪১ পা, ৪৪-৪৬ পা

ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার অভিনব গুপ্ত কৃত বিমর্শিনী টীকা—৪৪-৪৫ পা

উচ্ছুষ্ম-ভৈরব—৩৭ পা

উজ্জ্বলনীলমণি—রূপ গোস্বামী—১০১, ১০৯, ১৭৪, ১৮০, ২১২, ২১৯, ২২৩, ২২৪, ২২০, ২২৮, ২২৮ পা ;—কিরণ—২২০, ২২০ পা

উত্তররামচরিত—ভবভূতি—১৬৯

ঋক্পরিশিষ্ট—১০৯

ঋগ্বেদ—৬-৭, ১১, ১৯, ২৪, ২৭৩

এ হিস্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়ান্ ফিলসফি (৩য় খণ্ড)—ডাঃ এস্, এন্, দাশগুপ্ত (A History of Indian Philosophy, vol III)—৮৮ পা

কন্দর্প-মঞ্জরী—১১৯

* পা—পাদটীকা

শব্দ-সূচী